ককেশাস ও চেচনিয়া যুদ্ধের
শ্বাসরুদ্ধকর ইতিহাস নিয়ে রচিত

সেবাস্টিয়ান স্মিথ

আল্লাহ'স মাউন্টেন

অনুবাদ
মাহমুদ উল হাসান
হুজাইফা তুল ইয়ামান

BanglaBook.org

প্রাচীন পর্যটকরা ককেশাসকে বলত 'মাউন্টেন অব ল্যাঙ্গুয়েজ'। গ্রিক, পারসিক, রোমান, গথ, আরব, মঙ্গোল. তুর্কি—সকলেই এ অঞ্চল পাড়ি দিয়ে গেছে। কবি ও চিত্রশিল্পীরাও ককেশাসের চোখধাঁধানো সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন বার বার। তবুও এর ইতিহাস অত্যন্ত মর্মান্তিক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যুদ্ধের দামামা বেজে চলেছে এ অঞ্চলে। ইমাম শামিল আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে জারদের বিরুদ্ধে টানা ত্রিশ বছর যুদ্ধ করেন।

সর্বশেষ যুদ্ধটি ছিল ১৯৯৯ সালে ভ্লাদিমির পুতিন কর্তৃক চেচনিয়া আক্রমণ। এই সময়েই চেচনিয়া ভ্রমণ করেন এএফপি'র সিনিয়র করসপন্ডেন্ট সেবাস্টিয়ান স্মিথ। ঘুরে বেড়িয়েছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত চেচনিয়ার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত, সাক্ষাতকার নিয়েছেন অসংখ্য যুদ্ধপীড়িত মানুষ, গেরিলা ও রাশিয়ান সৈনিক থেকে শুরু করে স্বয়ং যোখার দুদায়েভ, শামিল বাসায়েভের মতো কিংবদন্তী চেচেন গেরিলা নেতাদের। যুদ্ধের ভয়াবহ ও শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনা ছাড়াও এই বইয়ের লক্ষাধিক শব্দের বুননে উঠে এসেছে ককেশীয়দের কয়েক'শ বছরের ইতিহাস, সংস্কৃতি, বেঁচে থাকার লড়াই। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বরুপ, রাশিয়ার রাজনীতির অন্দরমহল, এসপিওনাজ, প্রোপাগান্ডা, তেলের বাজার নিয়ে পরাশক্তিগুলোর দ্বন্দ্ব, ভ্লাদিমির পুতিনের উত্থান—কোনো কিছুই বাদ রাখেননি সেবাস্টিয়ান স্মিথ। ভ্রমণকাহিনী, ইতিহাস ও ওয়ার-জার্নালিজমের এক রুদ্ধশ্বাস অভিযানে আপনাকে স্বাগত।

www.BanglaBook.org

789849 415251

চিত্তাকর্ষক এবং সুবিস্তর।

-দ্য সানডে টাইমস

ইতিহাস রচনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্মিথের ঐতিহাসিক বিবরণ কেবল উপন্যাসের মতোই নয়, বরং তারচেয়ে উত্তম। কেননা এতে আরো আছে প্রত্যক্ষদর্শীর ঘনিষ্ঠতা এবং অকপটতা। একটি অদ্ভুত ভয়ংকর যুদ্ধের স্মরণীয়, গবেষণালব্ধ বিবরণ প্রদান করেছেন তিনি।

-লিটারেরি রিভিউ

'আল্লাহ'স মাউন্টেন' শুধু একটি সাংবাদিক রিপোর্ট নয়। প্রশংসনীয়ভাবে স্মিথ বর্তমানকে ছাপিয়ে ককেশীয়দের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন। তার অধিবাসী, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে অর্জন করেছেন অগাধ জ্ঞান ও রেখেছেন তার ছাপ।

-ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স

'সেবাস্টিয়ান স্মিথের 'আল্লাহ'স মাউন্টেন' যুদ্ধ বিবরণের একটি দুর্দান্ত লড়াই।'

-দ্য ট্যাবলেট

দুর্দান্ত, অবশ্যপাঠ্য, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।

-জেইন'স ইন্টেলিজেন্স রিভিউ

স্মিথের বইটির লেখনী ব্যতিক্রমধর্মী, কঠোর প্রতিবেদন এবং গভীর ব্যক্তিগত চিত্রায়ণের পালাবদলে ককেশাস অঞ্চলের স্বাদ ও আবেগের রঙ অনুভব করা যায়।

-দ্য মস্কো টাইমস

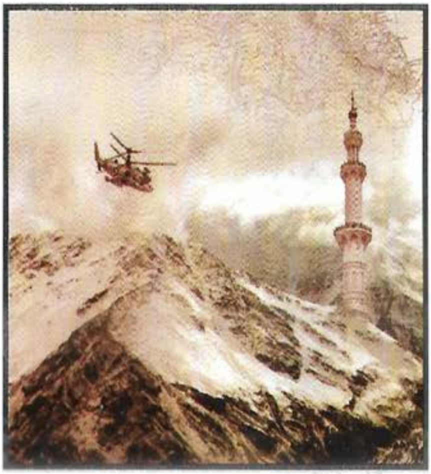

সেবাস্টিয়ান স্মিথ একজন পুরস্কার বিজয়ী লেখক ও সাংবাদিক। এএফপি'র হয়ে তিনি ওয়াশিংটন, মস্কো, নিউ ইয়র্ক, তিবলিসি, লন্ডন—নানান জায়গায় কাজ করেছেন।

বর্তমানে তিনি এএফপি'র হোয়াইট হাউস করসপন্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

www.BanglaBook.org

আল্লাহ'স মাউন্টেন

সেবাস্টিয়ান স্মিথ

অনুবাদ
মাহমুদ উল হাসান
হুজাইফা তুল ইয়ামান

সম্পাদনা
জোজন আরিফ

নন্দন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নন্দন

আল্লাহ্'স মাউন্টেন
সেবাস্টিয়ান স্মিথ

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০২০

প্রকাশক
নন্দন
২৭, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১৪৭৮৩৫৬৭

প্রচ্ছদ
আবুল ফাতাহ

মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা
নন্দন ডিজাইন

মূল্য: ৪৫০.০০ টাকা

বইমেলা পরিবেশক

অনলাইনে আমাদের সকল বই পেতে
www.rokomari.com/book/publisher/8859

Allah's Mountan by Sebastian Smith
Frist published on Ekushe Boimela 2020, Published by NANDAN
27 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100
Price: BDT 450.00, US: 15.00
ISBN: 978-984-94152-5-1

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রকাশকের কথা

এই বইটির সন্ধান আমাকে দেন, অধুনালুপ্ত জনপ্রিয় ইসলামি ম্যাগাজিন 'রহমত'র সম্পাদক মনযূর আহমাদ। বইয়ের নামটাই এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট। তার উপর জানা গেল, বইটি রচিত চেচনিয়ার যুদ্ধ এবং ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। এ বিষয়ে বাংলাতে কোনো সমৃদ্ধ বই আছে বলে আমাদের জানা নেই। তখনই 'আল্লাহ'স মাউন্টেন'র অনুবাদ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেই আমরা।

মূল বইটি লেখা হয়েছে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত চলমান চেচেন-রাশিয়া যুদ্ধকে উপজীব্য করে। ১৯৯৬ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলসিন শান্তিচুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ করলে তখনই লেখক সেবাস্টিয়ান স্মিথ ভবিষ্যতবাণী করেন– যতোদিন রাশিয়ার রাজনৈতিক কাঠামো একনায়ককেন্দ্রিক থাকবে ততোদিন যুদ্ধের শংকা থেকেই যাবে। অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল স্মিথের কথা। ১৯৯৯ সালে নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ফের আক্রমণ চালান চেচেনদের উপর। তার আগ্রাসন ছাড়িয়ে গিয়েছিল পূর্বতন রাষ্ট্রপ্রধানদেরও। এই বইটি প্রকাশিত হয় ২০০৫-এ, তখনও পুতিন কর্তৃক চেচনিয়ায় আগ্রাসন জারি। সে বিষয়েও লেখক বইয়ের 'ভূমিকা'তে বিশদ আলোচনা করেছেন।

সব মিলিয়ে, ককেশাস, চেচনিয়ার ইতিহাস ও জীবনযুদ্ধ সম্পর্কে জানার জন্য 'আল্লাহ'স মাউন্টেন'র বিকল্প নেই।

সবশেষে বইটির পেছনে যারা রয়েছেন– অনুবাদকদ্বয়, সম্পাদক, বীক্ষণ সম্পাদনা সংস্থা, সর্বোপরি মনযূর আহমাদ– তাদের সবার প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

-প্রকাশক

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভূমিকা

কেবলমাত্র একশ বছর আগেই লিও তলস্তয় তার 'হাজী মুরাত' উপন্যাসিকায় রাশিয়ান সেনা এবং চেচেন গেরিলাদের মধ্যকার দাঙ্গার কথা উল্লেখ করেন। একটি জঙ্গলের প্রান্তে অবস্থানরত রুশ সেনারা হঠাৎ গুটিকয়েক অশ্বারোহী চেচেন যোদ্ধাকে দেখতে পায়, ব্যস, শুরু হয় লড়াই। উভয়পক্ষের মধ্যে চলে গুলি বিনিময়। চেচেন যোদ্ধারা মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায় বৃক্ষরাজির মাঝে। অফিসারদের কাছে এসব সংঘর্ষ খেল-তামাশার মতো হলেও আকস্মিক এ সংঘর্ষে একটি বুলেট মারাত্মকভাবে আঘাত করে এক রুশ সেনাকে। অপরদিকে চেচেনদের মধ্যে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। সামরিক পরিভাষায় এটা ছিল একটি গুরুত্বহীন সংঘর্ষ। অথচ তলস্তয় লিখেছেন, 'যখন হেডকোয়ার্টারকে রিপোর্ট করা হয়, তখন সামান্য এই সংঘর্ষ ফুলে ফেঁপে বীরোচিত লড়াইয়ে রূপ নেয়। রিপোর্টে লেখা হয়, 'এই সংঘর্ষে দু'জন রুশ সেনা সামান্য আহত এবং একজন নিহত হয়। পাহাড়িদের হতাহতের সংখ্যা ছিল একশ।'

তলস্তয় ছিলেন ককেশাস সেনাদলের প্রাক্তন সদস্য। তলস্তয় জানতেন, তিনি কোন বিষয়ে লিখছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কাল ঘিরে রচিত হাজী মুরাতে তিনি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিলের জন্য মিথ্যাচারকে সূক্ষ্মভাবে প্রশ্রয় দান করেন।

প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলসিন রুশ বাহিনিকে চেচনিয়ার নিয়ন্ত্রণ ও 'সাংবিধানিক আদেশ সংরক্ষণ'-এর নির্দেশ প্রদান করার পর এক দশকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমনকি পাঁচ বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেছে ভ্লাদিমির পুতিন সেনাবাহিনিকে পুনরায় চেচনিয়ায় প্রেরণ করার পর থেকে।

তথাকথিত প্রথম চেচেন (১৯৯৪-১৯৯৬) ও দ্বিতীয় চেচেন যুদ্ধ (১৯৯৯-

২০০৯) উভয়েরই ছিল মহান অভীষ্ট। তবে পরিণতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে সাংবিধানিক বা অন্য কোনো ধরনের শৃঙ্খলা ছিল না। বরং বেশ কয়েক বছর যাবত চেচনিয়া ছিল একটি আইনশৃঙ্খলাহীন সম্প্রদায়। সেখানে সেনা ও পুলিশ বাহিনি অবাধে লুটপাট, ধর্ষণ ও হত্যা চালিয়েছে। তারা প্রায় নিশ্চিত ছিল, তাদের কোনো শাস্তি হবে না। চেচেন বিদ্রোহীদের আক্রমণেও নিহত হয়েছে মিলিটারি টার্গেটের আশেপাশে অবস্থানরত বহু সাধারণ মানুষ।

অপরদিকে রাশিয়াকে ‘সন্ত্রাসবাদ’ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট পুতিনের যুদ্ধ রচনা করেছে এক ন্যাক্কারজনক অধ্যায়ের : যাত্রীবাহী বিমান ভূপাতিত করা, মস্কো থিয়েটারে বহু সংখ্যক লোককে জিম্মি, মস্কো মেট্রোতে বিস্ফোরণ এবং বেসলানের একটি স্কুলে রক্তের সাগর প্রবাহিত করা। যদি রাজনৈতিক-সামরিক লক্ষ্যের নামে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর সহিংসতাকে সন্ত্রাসবাদ বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়, তবে চেচনিয়ায় রাশিয়ান সামরিক বাহিনি কর্তৃক সংঘটিত কাজগুলোর বেশিরভাগই এই নিষ্ঠুর তালিকায় যোগ করা উচিত। সেবা সংস্থা মেডেসিনস স্যান্স ফ্রন্টিয়েরস-এর সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা যায়, পৃথিবীর সবচাইতে উচ্চ পর্যায়ের মানসিক আঘাতের শিকার হয়েছে চেচেনবাসী। প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন যুদ্ধে তাদের ঘনিষ্ঠ কাউকে হারিয়েছে। ৬ জনের মধ্যে ১ জন সচক্ষে দেখেছে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যু। ৮০ শতাংশ মানুষ দেখেছে জনসাধারণের হতাহতের চিত্র। দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বলেছে, তারা কখনো নিরাপদ বোধ করেনি। প্রায় প্রত্যেক সাক্ষাৎকারদাতা নিজেও বোমা হামলা বা ক্রসফায়ারের সামনে পড়েছে। ‘সন্ত্রাসবাদ’ শব্দটি যথার্থ এক্ষেত্রে।

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হিসেব অনুযায়ী, এক মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্য হতে গত দশকে এক লাখেরও বেশি চেচেনকে হত্যা করা হয়েছে এবং শত শহস্র লোক একটা সময় ঘরবাড়ি হারিয়েছে অথবা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। গ্রোজনি, একদা প্রায় সাড়ে চার লাখ মানুষের শহর এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান তেলশোধন কেন্দ্র বর্তমানে এক ভয়ংকর লোমহর্ষক ধ্বংসাবশেষ। উপচে পড়া তেল, ল্যান্ডমাইন, অবিস্ফোরিত অস্ত্র-কারখানা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জঙ্গল চেচনিয়ার দৃশ্যপটকে বিষমিশ্রিত করেছে। অনানুষ্ঠানিক এক রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ হাজারেরও অধিক রুশ সেনা নিহত হয়েছে চেচনিয়ায়।

তবুও প্রেসিডেন্ট পুতিন নিয়ন্ত্রিত রাশিয়ান টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখা যায়— চেচনিয়ায় শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে। রুশ বাহিনির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের

BanglaBook.org

সংবাদ কদাচিৎ আলোচনায় আসে। কেবলমাত্র শোনা যায় দস্যু দমন ও সন্ত্রাসী পরিকল্পনা বানচালকারী 'তলস্তয়ান' সাফল্যের কথা। মনে হয় যেন চেচনিয়া আগ্রহভরে রাশিয়া ও প্রেসিডেন্ট পুতিনকে গ্রহণ করেছে। কেউ কেউ বিশ্বাস করে, যুদ্ধের শুরু থেকেই রাশিয়ার পক্ষ নেওয়া সাবেক বিদ্রোহী আখমাদ কাদিরভকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার জন্য চেচেনরা সমবেত হয়েছিল। বাস্তবে চেচনিয়ার সব পক্ষই কাদিরভকে ঘৃণা করত, ভয় পেত বা অবিশ্বাস করত। ২০০৪ সালের গ্রীষ্মকালে তাকে হত্যা করা হয়। যুক্তিসংগতভাবে যে কেউ স্বাভাবিকভাবেই ভাবতে পারেন, আখমাদ কাদিরভ নিশ্চয়ই তার ক্ষমতার সিংহভাগ তার ছেলে রমযানকে দিয়ে যান। মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা রমযান কাদিরভকে অভিযুক্ত করেন রিপাবলিকের অন্যতম প্রধান নিপীড়নকারী হিসেবে।

২০০৪ এবং ২০০৫-এর মাঝামাঝি রাশিয়ান মিডিয়া এমন একটা চিত্র দাঁড় করায়, দেখে মনে হবে রাশিয়ান শাসনের প্রতি চেচেনদের ভালোবাসা উপচে পড়ছে! চেচনিয়ায় রাশিয়া নিয়োজিত সরকার তাদের বিষণ্ণ ও বিদীর্ণ নাগরিকদের কেবল শান্তির প্রতিশ্রুতিই নয় বরং একই সাথে একটি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, ফুটবল স্টেডিয়াম এবং গুডারমেস শহরে জলজ চিত্ত-বিনোদনকেন্দ্রের ওয়াদা করেছিল। প্রধানমন্ত্রী সারজেই আব্রামভের ভাষায় যার নাম ছিল 'ডিজনিল্যান্ড'। নতুন বছরকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রেসিডেন্ট পুতিন রমযান কাদিরভকে চেচনিয়ার সর্বোচ্চ পদক—'দ্য সুপ্রীম ডেকোরেশন অব দ্য রাশিয়ান স্টেট' দ্বারা পুরস্কৃত করেন।

***

গ্রোজনিতে প্রথম ট্যাংক প্রবেশ করার দশ বছর পর আমি চেচনিয়া সফর করি। এর আগেও আমি অনেকবার সেখানে গিয়েছি। শেষ দশকে চেচনিয়ার রাজধানীকে আমার ভালোমতোই চেনার সুযোগ হয়েছে। আমি দেখেছি, ধীরে ধীরে কীভাবে শহরটা শেষ হয়ে গেল। তবুও আমি নিজেকে এমন একটি স্থানে আবিষ্কার করলাম, যা চিনতে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছিল আমার। গ্রোজনি অবশ্যই হতদরিদ্র ছিল না, বরং ১৯৯৪ সালে আমি গ্রোজনিকে প্রাক্তন সোভিয়েতের আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তা সত্ত্বেও সেই গ্রোজনির সাথে এই নিষ্ঠুর রণক্ষেত্রের কোনো মিল ছিল না।

Banglabook.org

গ্রোজনির অবস্থা হয়েছে সন্ধ্যার ধূসর আবছায়ার মতো—যেখানে যুদ্ধ ও শান্তির সংজ্ঞা অস্পষ্ট, সবাই সন্দেহভাজন এবং যোদ্ধারাও জানে না তাদের উদ্দেশ্য।

যদিও আমি এই শহরে আগে সফর করেছি, তবুও শহরের এমন শোচনীয় অবস্থা আমার বিস্ময় সামান্যই কমাতে পেরেছে। শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে-আগে যেখানে ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশাল বিশাল এপার্টমেন্ট, প্রধান সড়ক ও পার্ক-আজ সেখানে এক টুকরো পাথরও অবশিষ্ট নেই। বোমা আর গোলাবারুদের আঘাতে সব সেঁটে গিয়েছে, এরপর বুলডোজার দিয়ে সরানো হয়েছে। এক সময় যা ছিল শহরের প্রাণকেন্দ্র, আজ তা বিরান মরুভূমি। এই শূন্যভূমি থেকে ধ্বংসের ছাপ বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়: পরিত্যক্ত ফ্যাক্টরি থেকে বিস্তীর্ণ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, ভাঙাচোরা এপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে জট পাকানো বন্য ঝোপঝাড়; বোমা আর মাইনের ভয়ে সেখানে কেউ পা ফেলার সাহস পায় না।

স্তালিনগ্রাদের মতো যেসব সেন্টার আছে, কেবল সেসব জায়গাতেই আপনি একটু ভিড় দেখতে পাবেন। যুদ্ধ কখনোই চেচেনদের ব্যবসা থামিয়ে রাখতে পারেনি। উপরন্তু যেখানে কোনো দোকানই নেই, সেখানেও খোলা আকাশের নিচে হাট বসিয়ে একটুখানি জীবনের স্পন্দন পেতে চায় তারা। কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে সমস্ত মানুষও গ্রামের দিকে চলে যায়। তখন গ্রোজনি আবারও অন্ধকার, নিস্তব্ধ ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। আমার অনুমান অনুযায়ী-রাতে গাড়ি চালানোর সময় আলোকিত জানালাগুলো গুনে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি-বর্তমানে গ্রোজনিতে দেড় লাখের বেশি মানুষ বসবাস করে না। অথচ সাড়ে চার লাখ জনসংখ্যার গ্রোজনিই একসময় ছিল ককেশাসের অন্যতম প্রধান শহর।

মস্কোর সরকারি কর্মকর্তা এবং চেচনিয়ায় তাদের অধস্তনরা অবকাঠামো পুনর্গঠন কর্মসূচি প্রসঙ্গে আলোচনা করে। তবে বাস্তবতা হলো, এই প্রকল্পসমূহ কেবল ফান্ড নিয়ন্ত্রণকারীদের পকেট ভারি করার জন্য। এছাড়া গত দশ বছর ধরে আর কিছুই অর্জন করতে পারেনি তারা। গ্রোজনিতে পুনঃনির্মিত বিল্ডিংয়ের সংখ্যা এতো কম যে আঁতকে উঠতে হয়। আমি গুনে দেখলাম মাত্র কয়েক ডজন বিল্ডিং। কিছু ব্যতিক্রমও ছিল, তন্মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনির ব্যারাক ও অফিস, তেল-কারখানা-বিদ্যুৎ ও গ্যাস সাপ্লাইকারী প্রতিষ্ঠান। এগুলো অন্তত দুর্দশাগ্রস্ত চেচেনদের জীবিত রাখছে। গ্রোজনি শুধুমাত্র রাশিয়ান সেনাবাহিনির নাশকতার স্মৃতিস্তম্ভ নয়, বরং রাশিয়ান সরকারের শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অক্ষমতার নিদর্শন।

BanglaBook.org

এই বিরানভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় আমি দেখতে পেলাম, সাবেক প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস এবং প্যালেসের গোলাপ বাগান। পথিমধ্যে ছিল হোটেল কাভকায-একটি বিচিত্র অর্ধসোভিয়েত-অর্ধপ্রাচ্য ভবন-যেখানে আমি যুদ্ধের আগে একবার অবস্থান করেছিলাম। এদিকেই জাতীয় ব্যাংক, সংসদ ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় ছিল একসময়। আজ পিচের উভয়পাশের কাদা জানিয়ে দেয়, একসময় কোথায় ছিল সড়ক আর কোথায় ছিল চত্বর ও দালানকোঠা।

এক তরুণী আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। সে কি মনে রেখেছে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসের কথা? এটাই ছিল একসময় যোখার দুদায়েভ এবং মূল বিচ্ছিন্নতাবাদী সরকারের হেডকোয়ার্টার। একইসাথে এটা ছিল প্রথম যুদ্ধের মহাকাব্যিক লড়াইয়ের রণক্ষেত্র।

'আমার এসব ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই,' মেয়েটি বলল। এখন তার বয়স ষোলো বছর। অর্থাৎ যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ছয়।

কাছেই আমি একজন মহিলাকে পেলাম। চেচেন গৃহিণীদের মতো অভিব্যক্তিপূর্ণ এবং ধারণাতীত কাঠিন্যের অধিকারী। তিনি পানি সংগ্রহ করছিলেন। বোতল ও কলসিভর্তি একটা ট্রলি টেনে নিয়ে এসে ভাঙা পাইপ দিয়ে পূর্ণ করে আবার ট্রলি টেনে বাসায় নিয়ে যাওয়া। বাড়িতে নিয়ে এই পানি তিনি গরম করবেন। চেচনিয়ার কেবল কিছু অংশেই এখন প্রবাহমান পানি আছে। কল, বেসিন আর গোসলখানা হয়ে গেছে ফোন ও ডাস্টবিনের মতো হারানো সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন। অথচ গুডারমেসে জলজ চিত্তবিনোদন উদ্যানের পরিকল্পনা পানির অভাবে থেমে থাকেনি।

তবে এই মহিলার ছিল এক মহামূল্যবান সম্পদ—স্মৃতি। সে বলল, 'ওইখানে ছিল জুয়েলারির দোকান, এখানে ছিল সংগীত স্কুল, এখানে কলেজ, এখানে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং...' সে পুরোটা সময় শুধু ফাঁকা জায়গাতেই অঙ্গুলি নির্দেশ করল। ভাঙা পাইপ থেকে নির্গত পানি ওকেয়ান (সমুদ্র) রেস্টুরেন্ট এবং ফিশ শপের স্মৃতিচিহ্ন বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সে আরো বলল, 'আমার পরিষ্কার মনে আছে জায়গাটার কথা। ১৯৯৪ সালে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয় এখানে, মারা যায় দু'জন পথচারী। বিহ্বল জনসাধারণ এসে ভিড় জমায়, গ্রোজনিবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। তারা কেউই ভাবতে পারেনি সামনে কী অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। এটা যেন একটা স্বপ্ন ছিল।'

BanglaBook.org

২০০৪ সালের বক্সিং ডে-তে ভারত মহাসাগরের সুনামিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরগুলো এবং গ্রোজনির কথা ভাবুন—পার্থক্য হলো, একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কয়েক মিনিটের মধ্যে শহরগুলির যে দশা করেছে; সেই একই অবস্থা মানুষের অপচেষ্টা ও কু-পরিকল্পনার দরুন গ্রোজনির হয়েছে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে, তিলে তিলে।

***

২০০০ সালে গ্রোজনি দখল করা হলে দ্বিতীয় চেচেন যুদ্ধের বড় আকারের সংঘর্ষগুলো থেমে যায়। অপরদিকে বিক্ষিপ্ত হাজারো বিদ্রোহীরা পাহাড়ি গ্রামসমূহে আশ্রয় নেয়। তাদের রসদ ছিল অতিসামান্য। অতঃপর ইরাকে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সকল বৃহৎ অভিযান সমাপ্তির বিখ্যাত ঘোষণা দেন। অথচ তখন কেবল যুদ্ধটা অগণিত নতুন ধাপের প্রথম ধাপে উপনীত হচ্ছিল। এসব যুদ্ধের প্রতিটি ধাপ ছিল পূর্ববর্তী ধাপের চেয়ে বেশি অস্পষ্ট। ফলে আজ অবস্থা এমন হয়েছে, রাশিয়া, এমনকি চেচনিয়ার খুব কম লোকই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার প্রকৃত কারণ বলতে পারে।

পাহাড়ে এখনও যুদ্ধ হয়। ভোরবেলায় জঙ্গলের মধ্যে লং রেঞ্জ আর্টিলারি ছোঁড়ার শব্দ গ্রোজনি থেকেও শোনা যায়। যুদ্ধ অবশ্য মানুষের দৃষ্টির অগোচরেই হয়। নোঝাই ইয়ার্ট, ভেদেনো এবং শাতোই এলাকায় নতুন কমান্ডাররা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বহির্বিশ্বে তাদের অবশ্য কেউ চেনে না। ২০০৫ সালের এপ্রিলে চেচনিয়ার একমাত্র স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আসলান মাসখাদোভকে হত্যা করা হয়। এর আগ পর্যন্ত সে সক্রিয় ছিল। তার মৃত্যুর পর দায়িত্বে ছিল শামিল বাসায়েভ, অন্যতম প্রধান কমান্ডার। দীর্ঘদিন যাবত সে-ই সর্বাধিক দুর্ধর্ষ বলে পরিচিত। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৫ পর্যন্ত মাসখাদোভের পলায়নরত অবস্থায় বেঁচে থাকা আংশিকভাবে হলেও রাশিয়ান বাহিনির অকার্যকারিতা ও দুর্নীতি প্রমাণ করে। এছাড়াও সাথে ছিল চেচেনদের দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা, সাধারণ মানুষদের সমর্থন ও বিশাল নেটওয়ার্ক। এর মাধ্যমেই এতো ছোট জায়গায় একটা গেরিলা বাহিনি এতো লম্বা সময় কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পেরেছে।

সমভূমিতে বিদ্রোহীরা গুপ্তহত্যা এবং ছোটখাটো অ্যাম্বুশ চালায়। রাশিয়ান বাহিনি ও তাদের চেচেন মিত্ররাও সমানভাবে বিদ্রোহীদের সম্ভাব্য গোপন আস্তানায় আক্রমণ করে। বিদ্রোহীদের আত্মীয়স্বজনদের কিডন্যাপ করে নিয়ে

BanglaBook.org

যায়। তবে এগুলো হলো ছোটখাটো সংঘর্ষ। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই গেরিলা বাহিনি রাশিয়ান অফিসিয়ালদের গুলি করে হত্যা করে। কখনো কখনো পুলিশ ভর্তি জীপ গাড়িতে বোমা মারে বিদ্রোহীরা। অপরদিকে রাশিয়ান ও তাদের সহযোগীরা কাউকে বিদ্রোহী সন্দেহ হলেই গুলি করে মারে। গ্রোজনিতে আচমকা কেউ এলে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন গোলাগুলির শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাবে না। গ্রোজনিতে এখন কোনো বিমান হামলা হয় না, কোনো গুলিবর্ষণ বা রকেট লঞ্চার নিক্ষেপ হয় না। কয়েক বাড়ি ধরে বা কোনো রাস্তা জুড়ে সংঘর্ষ তো একেবারেই হয় না। যেখানে আগে রাত্রিবেলা গেরিলা যোদ্ধাদের আক্রমণের শব্দ ভেসে আসত, আজ তা নিশ্চুপ। বিদ্রোহীরা গা ঢাকা দিয়েছে। কেবলমাত্র রাশিয়ানদের থেকেই নয় বরং স্বদেশিদের মধ্যে যারা তাদের বিরুদ্ধে গেছে বা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের থেকেও। এক যোদ্ধার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তার ছদ্মবেশ ছিল একটা স্মার্ট ওভারকোট এবং পালিশ করা জুতো। সে আমাকে বলেছিল, রাস্তার ধারে বোমা ফেলে মিলিটারিকে বিধ্বস্ত করার পুরনো কৌশলও এখন অকার্যকর হয়ে গেছে। সিকিউরিটি ফোর্সের লোকজন আজকাল খুব তৎপর; ঘন ঘন গ্রেফতারের তোড়ে পালানো কঠিন হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া লোকটির ভাষায়, চেচেন বিদ্রোহীদের থেকেও রাশিয়ানদের আর্মড ক্যারিয়ার ও জীপের সংখ্যা বেশি। 'তারা দু'একটা আর্মড পার্সোনেল ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করে না। কিন্তু আমরা একটা অপারেশনে জনবল হারানোর ঝুঁকি নিতে পারি না।'

চেচেনদের ওয়েবসাইটে অবশ্য তাদের পুরনো হম্বিতম্বি বহাল তবিয়তেই আছে। কিন্তু ময়দানে ওরা আসলেই একদম দুর্বল হয়ে পড়েছে। রাশিয়ান সেনাবাহিনির বিশাল ফোর্স গেরিলাদের শুষে নিচ্ছে। মোটেও ঘুরে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। এলাকা দখল করে নিচ্ছে। মার্শাল ল'র নামে নির্যাতন চলে এখানে। আর আছে গুপ্তচর। পূর্বে এসব গুপ্তচররাই ছিল নির্যাতনের শিকার, এখন তারা দরিদ্র ও অসহায় সমাজের সাথে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ভাঙন ধরায়। ফলে বিদ্রোহীদের আর্থিক সাহায্যও বন্ধ হয়ে যায়। কৌশলগত দিক বিবেচনায় দেখা যায়, বছরের পর বছর অভিজ্ঞতা ও প্র্যাকটিসের কারণে রাশিয়ান বাহিনি অনেক উন্নতি করেছে। ওরা পূর্বতনদের মতো না। ওরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ। নিজেদের পদক্ষেপ এবং পরিনাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

তবে বিদ্রোহীরা ভেঙে পড়েছে এটা মনে করাও উচিত হবে না। যদি কেউ বলে

Banglabook.org

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, সে ভুল বলছে। এখনো বিদ্রোহীরা প্রায় প্রতিদিন রাশিয়ান সৈন্যদের হত্যা করে এবং নিজেরা মৃত্যুর সাথে লড়াই করে। প্রকৃত অবস্থা হলো, বিদ্রোহীদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব। যুদ্ধের তীব্রতা কমেছে মাত্র, তাই বলে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি।

প্রথম চেচেন যুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ দীর্ঘদিন ধরে অভিযোজিত হতে হতে আজকের এই অবস্থানে এসেছে। যোদ্ধাদের কাছে রাশিয়ান সৈন্যদের প্রতিহত করা এক ধরনের দায়িত্ব। আত্মসমর্পণের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই। রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ এবং সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আরেকটি দল গঠিত হয়েছে। এদের বেশিরভাগই চেচেন পুরুষ। যদিও প্রশিক্ষণের জন্য তাদের অল্প সংখ্যক যোদ্ধাই অস্ত্র হাতে পেয়েছে। অন্য আরেক দলে আছে সন্ত্রাসবাদীরা। এখানে বহু সংখ্যক মানুষ আছে যারা একাধারে দস্যু, গেরিলা যোদ্ধা ও সুবিধাবাদী। এসব পৃথক পৃথক দলগুলো কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু আসল কথা হলো, ওরা এখনো টিকে আছে এবং দু'পক্ষের কারোরই আর কোনো চাল দেয়া বাকি নেই। বিদ্রোহীরা যেমন রুশ সেনাদের বিতাড়িত করতে পারছে না, তেমনি রাশিয়ান বাহিনিও পারছে না বিদ্রোহীদের গুঁড়িয়ে দিতে।

উদ্ভট মনে হলেও এই অচলাবস্থা থেকে কারোরই বেরিয়ে আসার উপায় নেই। একজন সাধারণ ব্যক্তির কাছে হয়তো মনে হবে রাশিয়ার এতো এতো চমৎকার অস্ত্রশস্ত্র, হেলমেট পরিহিত বাহিনি, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট এবং অনুগত চেচেন মিলিশিয়া অপ্রতিরোধ্য গতিতে বিদ্রোহীদের ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। মনে হতে পারে, জয় তাদের নিশ্চিত। তবে একটু সূক্ষ্মভাবে তাকালেই ভিন্ন কিছু দেখা যায়। রাশিয়ান বাহিনির কাছে যুদ্ধ জয়ের চাইতে সমঝোতাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিদ্রোহীদের কাছে যুদ্ধ জীবনের একটা অংশ হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধ মানে ক্ষমতা। যুদ্ধ মানে যোদ্ধা হিসেবে কর্মসংস্থান। চেচনিয়া ও রাশিয়াতে এমনও মানুষ আছে যাদের কাছে শান্তি ও শৃঙ্খলাই বিপর্যয়স্বরূপ।

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, রুশ বাহিনি আর বিদ্রোহীদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। গল্পের বইয়ের দস্যুদের মতোই সেনারা ছদ্মবেশে গাড়িতে করে ঘুরে বেড়ায়। সন্ত্রাসীরা যেই মুখোশ পরে রুশ সেনারাও তাই। ওরা রাতবিরাতে মানুষের বাড়িতে হানা দেয়, লুণ্ঠন করে। বিচার ছাড়াই মানুষ মারে। মুক্তিপণের জন্য মানুষকে, এমনকি লাশকেও জিম্মি করে। চেচনিয়া ও পার্শ্ববর্তী

Banglabook.org

অঞ্চলসমূহেও চোরাচালান এবং কালো বাজারি চুক্তি করে ওরা। এটাকে শুধুমাত্র যুদ্ধ মনে করলে হবে না বরং এটা মাফিয়া গ্যাংস্টারদের টিকে থাকারও লড়াই। যেখানে তারা জীবনবাজি রেখে টাকা ও ক্ষমতার পেছনে দৌড়ায়।

চেচনিয়াতে যেকোনো কিছু, যে কাউকেই বেচাকেনা যায়। ধ্বংসাবশেষ থেকে ইট ও ধাতব লুট করা হয়, তেল চুরি করে পাচার করা হয় দক্ষিণ রাশিয়ায়। ক্ষতিপূরণের টাকা চুরি ও বলপ্রয়োগ করে আদায় করা হয়। মানুষ হত্যারও একটা মূল্য আছে। রাশিয়ানরা চেচেনদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রি করে। সংশয়বাদীদের জেনে রাখা উচিত, চেচেন বিদ্রোহীদের নিক্ষেপিত প্রতিটি গুলি ও গ্রেনেড রাশিয়ার তৈরি। চেচনিয়াতে অস্ত্রশস্ত্রের কোনো কারখানা নেই। চেচনিয়াকে রাশিয়া তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। অবশিষ্ট সীমান্ত জর্জিয়া দিয়ে ছোটখাটো গাড়ি ছাড়া আর কোনো কিছুই অতিক্রম করা সম্ভব নয়। শান্তিরও একটা মূল্য আছে। প্রো-রাশিয়ান চেচেন ফোর্সের একজন সিনিয়র অফিসার আমাকে বলেছিল, 'রাশিয়ানরা অনেকসময়ই পাহাড়ে বিদ্রোহীদের সাথে চুক্তি করে। ফলে দেখা যায় একটা অঞ্চলে যুদ্ধ চলছে অথচ আরেক অঞ্চলে নীরবতা। যদিও সেখানে গেরিলাদের উপস্থিতি বিদ্যমান।

এ ধরনের চুক্তির কারণে রাশিয়ান ফেডারেল ফোর্স এবং তাদের চেচেন মৈত্রী বাহিনির সম্পর্ক জটিলতার শীর্ষে পৌঁছে যায়। অধিকাংশ চেচেনই আগে গেরিলা ছিল। এখন রাশিয়ান বাহিনিতে যোগ দিয়েছে হয় কাজের অভাবে কিংবা বিদ্রোহীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আবার অনেকেই যোগ দিয়েছে তাদের ধান্দাকে বৈধ করার জন্য-বন্দুক বেচাকেনা, চেচনিয়ার সম্পদ পাচার ইত্যাদি। কালো ইউনিফর্মে মার্কবিহীন গাড়িতে করে তারা অপহরণ ও নির্যাতন করে বেড়ায়। অনিয়মিত ইউনিটদের কাজকর্মে চেচেনরা যেমন বিরক্ত, তেমনি রাশিয়ানরাও! অনেক চেচেন মিলিশিয়া আবার ডাবল এজেন্ট। চেচেনদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ের ফলাফল মিশ্র। নিশ্চিতভাবেই চেচেনদের বিরুদ্ধে চেচেন লেলিয়ে যুদ্ধ নিষ্পত্তি তো হলোই না বরং রক্তপাত দিন দিন বাড়ছে। দেখা দিচ্ছে আরো বহুকাল যুদ্ধ চলমান থাকার অনিশ্চয়তা। সবদিক থেকেই যাদের আর্থিক লাভ হচ্ছে তারা তো যুদ্ধকে স্বাগতম জানাবেই।

দেশপ্রেমিক রাশিয়ানদের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও দস্যুবৃত্তি বিদায় নেয়নি চেচনিয়া থেকে, আরো বেড়েছে, বৈচিত্র্যময় ও জাতীয়করণ হয়েছে।

BanglaBook.org

***

১৯৯৪ সালে এতো গুরুতর যুদ্ধের কথা কল্পনাও করেনি কেউ। বহির্বিশ্বের কেউই ভাবতে পারেনি মাত্র কয়েকশ সশস্ত্র গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার রাশিয়া সেনাবাহিনি নামাবে। ১১টি টাইম জোন জুড়ে থাকা এই রাষ্ট্রে চেচনিয়া একটি পিঁপড়ার মতোই ক্ষুদ্র। রাশিয়ান সশস্ত্র বাহিনির চেয়েও চেচনিয়ার সমগ্র জনসংখ্যা কম। অনেক আর্মি জেনারেল তথাকথিত দস্যুবৃত্তি দমনে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায়। একদল নিরস্ত্র চেচেন মহিলা একবার রাস্তা অবরোধ করলে এক জেনারেল তার বাহিনিকে থামতে বলে, ঘটনাটি বিখ্যাত। কয়েকদিনের জন্য মানুষের ধারণা ছিল মস্কো বা গ্রোজনির মাথায় অন্তত এতোটুকু বুদ্ধি আছে যে, তারা তাদের দেশের নাগরিক তথা বৃদ্ধ, শিশু বা সাধারণ মানুষের গায়ে বোমা ছুঁড়বে না।

গ্রোজনিতে রাস্তার ভিড়ে প্রথম যেদিন বোমা আঘাত করে সেদিন থেকে সব কিছুই সম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী ঘটনার তুলনায় সেদিনের বোমাবর্ষণ বরং স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। এরপর শুরু হয় স্রেফ হত্যাকাণ্ড, পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ নৈতিকতাই বিসর্জিত হয়। একেকটা বিস্ফোরণে মাঝে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যেত। অসম্ভবই বরং চেচনিয়ার স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। সেই থেকেই চেচনিয়া অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে।

১৯৯৪ সালের পর ১৯৯৯ সালে আবার চেচনিয়ার পেছনে ক্রেমলিনের লাগার মূল কারণ কী? দেশের এই দূরবর্তী কোণে কী এমন ছিল যে রাশিয়ার নেতারা একবার নয়, দুই বার সামরিক ও রাজনৈতিক বিচারে একই পথ বেছে নিল? উভয় ক্ষেত্রে দুটি উত্তর আছে—প্রথমটি জাতীয় নিরাপত্তা ও ভৌগোলিক উদ্বেগের সাথে সম্পর্কিত, অন্যটি ক্রেমলিনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সাথে।

চেচনিয়া ও পার্শ্ববর্তী ককেশাসে এরকম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে। ককেশাস গুটিকতক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আবাসস্থল। এশিয়া ও ইউরোপের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী অঞ্চল; বিশেষত ইরান, তুরস্ক ও রাশিয়া। যদিও চেচনিয়ায় প্রথম যুদ্ধ (১৯৯৪-৯৬) এবং দ্বিতীয় যুদ্ধ (শুরু হয়েছে ১৯৯৯ সালে) নিয়ে কথা বলা খুবই সাধারণ ব্যাপার। তবে আসল ঘটনা হলো, শুধু ১৯৯৪-৯৮ বা ১৯৯৯ নয়, রাশিয়ার সাথে চেচেনদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিগত দুই শতাব্দী ধরে চলছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এর বেশিরভাগ সুপ্ত ভৌগোলিক

BanglaBook.org

ইস্যুগুলো আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দক্ষিণ ককেশাসের স্বাধীনতার ফলে পাহাড়ের উত্তরাঞ্চল রাশিয়ার সবচেয়ে বিপন্ন সীমান্তে পরিণত হয়। উত্তরদিকে আন্তঃজাতিগত উত্তেজনা ও চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণায় অস্থিতিশীলতা আরো বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান অঞ্চলে কাস্পিয়ান সাগরের তেল নিয়ে মস্কো পশ্চিমা দেশসমূহের সাথে কূটনীতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। কারো কারো মতে, চেচেন দ্বন্দ্ব শুরু করার পেছনে কাস্পিয়ান থেকে পাইপলাইনের রুট নির্ধারণের তীব্র কূটনৈতিক লড়াইয়ের বিশেষ ভূমিকা ছিল। মূলত আজারবাইজান থেকে তেলের পাইপলাইন উত্তর ককেশাস দিয়ে বয়ে গেছে।

তেল রপ্তানির রুট সুরক্ষিত করার জন্য হলেও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছ থেকে চেচনিয়াকে আগলে রাখতে হয়েছিল রাশিয়াকে। তবে এই থিয়োরিতেও সবসময়ই একটা ধোঁয়াশা রয়েই গিয়েছিল। কারণ, অস্থিতিশীল চেচনিয়ার মধ্য দিয়ে রাশিয়ান পাইপলাইন নেওয়া সবচাইতে সহজ ছিল। উপরন্তু চেচনিয়াতেও ছোট হলেও একটি তেলের খনি ছিল। গ্রোজনির সেই তেল পরিশোধনাগারে ইচ্ছাকৃতভাবেই বোমা বর্ষণ করে রাশিয়া।

কারো মতে, যুদ্ধ শুরু করার আরেকটি কারণ হলো—মস্কোর ভয় ছিল যে, চেচেনদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বিপ্লব সমগ্র উত্তর ককেশাসে ছড়িয়ে পড়বে, এমনকি তাতারস্তান পর্যন্ত। তবে উত্তর ককেশাসের সাতটি ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র’র মাঝে কেবল চেচনিয়াই স্বাধীনতা চায়, তাতারস্তান স্বায়ত্তশাসনেই সন্তুষ্ট।

এসব নানাবিধ কারণে ১৯৯০ দশকের গোড়ার দিকেই দুশ্চিন্তা পেয়ে বসে ক্রেমলিনকে। অবশেষে ১৯৯৪ সালের শেষ দিকে বরিস ইয়েলসিনের ক্রেমলিন নিরাপত্তা কাউন্সিল এ অঞ্চলে সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৯৯ সালের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। রাশিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দক্ষিণ ককেশাস তখন স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু উত্তর চেচনিয়া চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহির্বিশ্বের চোখে পরিত্যাজ্য, চাকরিহীন, আঘাতপ্রাপ্ত ও সশস্ত্র চেচেনদের কাছে চেচনিয়া ছিল একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের স্বরূপ। চেচনিয়ার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আসলান মাসখাদোভ রাশিয়ার সাথে সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে চুক্তি করেন। এ সময় উদ্ভব ঘটে একটি চেচেন স্বাধীনতাকামী দলের। চেচনিয়া তখন পৃথিবীর ‘অপহরণ রাজধানী’ হিসাবে খবরের শিরোনাম হয়ে ওঠে। সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, সেবাসংস্থা কর্মী—যারা কোনো কারণে চেচনিয়া

BanglaBook.org

প্রজাতন্ত্রে ঢুকেছিল তাদের সবার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কয়েকজন বন্দীকে হত্যা করা হয় এ সময়।

১৯৯৯ সালের গ্রীষ্মকালে পরিস্থিতি হঠাৎ করেই খারাপের দিকে মোড় নেয়। যুদ্ধনেতা শামিল বাসায়েভ শত শত চেচেনকে দাগেস্তানে নিয়ে গিয়ে ওয়াহাবিদের সমর্থনে একটি দল গড়ে তোলে। রাশিয়ানরা ভীষণ ধাক্কা খায়। বরিস ইয়েলসিনের অধীনে থাকতে থাকতে দেশ কতোটা দুর্বল হয়ে গেছে, ভেবে পায় না রাশিয়ানরা।

তারপর সেপ্টেম্বরে কোনোরকম সতর্কবার্তা ছাড়াই মস্কো এবং বেশ কয়েকটি জায়গায় সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের ফলে ২৯৪ জন মৃত্যুবরণ করে। কেউই এই ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। ধরাও পড়েনি কেউ। কোনো নিরেট প্রমাণ নেই কারো বিরুদ্ধে। তবে দোষারোপ করার সময় অনায়াসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো-দায়ী চেচেন সন্ত্রাসীরা।

তবে এ ঘটনা মাথায় রাখলেও চেচনিয়ায় সৈন্য পাঠানোর যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। প্রথম যুদ্ধ মাত্র তিন বছর আগে শেষ হয়েছে। এই মুহূর্তে সামরিক বাহিনি দিয়ে সমস্যা সমাধান করা যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রথম যুদ্ধে রাশিয়ার অভিজ্ঞতা ভালো নয়। ফলে বিদেশে ভাবমূর্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। তিন বছর আগের যুদ্ধটা বরং সশস্ত্র আন্দোলনকে উসকে দেয় এবং ইসলামি বিপ্লবের আগুনকে প্রজ্বলিত করে। এসব শিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও ক্রেমলিন দ্বিতীয়বার আক্রমণ করতে মোটেও দ্বিধাবোধ করেনি। প্রথমবারের মতো আরেকটি ব্যর্থ যুদ্ধাভিযানই তাদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

কিন্তু কেন? সহজ উত্তর হলো, ক্রেমলিন ১৯৯৪ সালের ভুল থেকে ১৯৯৯-এর জন্য শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। জটিল এবং আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ অবশ্য রয়েছে। সেটা বুঝতে হলে ক্রেমলিনের রাজনীতিতে ঢুকতে হবে আপনাকে।

প্রথম যুদ্ধের কথা বিবেচনা করুন। ১৯৯৪ সালের শীতকাল। ইয়েলসিন একটি অশান্ত কর্মজীবনের সবচাইতে খারাপ সময় পার করছিলেন। বিভ্রান্ত রাশিয়ানরা আর তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারে বিশ্বাস করত না। এই তো, বছরখানেক আগেই ইয়েলসিন তার সংসদীয় বিরোধী দলের বিরুদ্ধে ট্যাংক নামিয়েছিলেন। লাখ লাখ মানুষ দারিদ্রের মুখে পতিত হয়েছে। অস্বাস্থ্য ও নিরাপদ পানির অভাব দেখা দিয়েছে। ক্ষমতা নামমাত্রই ইয়েলসিনের হাতে

BanglaBook.org

ছিল। এই সময় ক্রেমলিনের অভ্যন্তরে একটি পরিবর্তন ঘটে। ইয়েলসিনের সহযোগীরা তার কিছু অপেশাদার পরিষদের কাছে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

চেচনিয়ার জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ সমাধান করার জন্য এই নতুন দলটি চাপ দেয়; গত তিন বছর মস্কো যে ব্যাপারটা ক্রমাগত উপেক্ষা করে যাচ্ছিল। পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পাভেল গ্রাচেভ সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। সে ছিল দুর্নীতিতে ওস্তাদ। এই লোকগুলো ভেবেছিল তারা দারুণ একটা আইডিয়া দিয়েছে। চেচনিয়া আক্রমণ করে দেখিয়ে দেবে যে ক্রেমলিন এখনও দেশ নিয়ন্ত্রণ করে। নস্টালজিক দেশপ্রেমিক, যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন হারানোর জন্য ইয়েলসিনকে দায়ী করে, তাদের দেখিয়ে দেওয়া হবে যে, আর এক সেন্টিমিটার জায়গাও ছাড়বেন না ইয়েলসিন। ইয়েলসিনের দোসরদের চোখে এ যুদ্ধ ছিল অবশ্যম্ভাবী।

অবশ্য প্রত্যাশা অনুযায়ী কিছুই ঘটেনি। তাদের অভিযান একুশ মাসের মধ্যে গেরিলা সংঘর্ষে রূপ নেয় এবং তাতে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ১৯৯৬ সালে রাশিয়ানদের অপমানজনক হার হয় এবং চেচেনরা স্বাধীনতার স্বাদ পায়। তবুও প্রথম যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি মস্কোর রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিবর্গের যাদের গায়ে লাগেনি তারাই দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ তিন বছরের মাথায়ই শুরু হয় দ্বিতীয় আক্রমণ।

ইয়েলসিনের ক্রেমলিন ১৯৯৪ সালের চেয়েও বেশি সমস্যায় পড়ে এ সময়। ১৯৯৯ সালে ইয়েলসিন আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তিনি খুব কমই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতেন। তার পরিষদবর্গের লোকজন ছিল সবার বিরাগভাজন। সম্প্রতি রুবলের পতন ঘটলে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ব্যাংক সঞ্চয়ে ক্ষতির শিকার হয়—অর্থনীতির বাজারে দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ায় সবচেয়ে খারাপ সময় চলছিল। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে ন্যাটোর চাপে রাশিয়ার পুরনো বন্ধু যুগোস্লাভিয়ার কসোভো থেকে সার্ব বাহিনিকে বিতাড়িত করার মতো অপমান সহ্য করতে হয়ে। মস্কোর সংসদেও প্রথম চেচেন যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। নিউইয়র্ক ও জেনেভার তদন্তকারীরা আত্মসাৎ, গোপন ব্যাংক একাউন্ট ও লক্ষ লক্ষ কালো টাকার দুর্নীতি দেখতে পায়। ফলে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচন ক্রেমলিন ও তাদের সহযোগীদের হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। এছাড়াও ২০০০ সালের জুলাই মাসে ইয়েলসিনের পদে অন্য কাউকে বসানোর জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

BanglaBook.org

দেশের জনগণের ক্ষোভ ক্রমশ ইয়েলসিন তথা সমগ্র ক্রেমলিন কার্যালয়ের ওপর বাড়তে থাকে। বিগত এক দশক ধরে যাদের হাতে ছিল রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ তারাই ধ্বংসমুখে পতিত হয়। ইয়েলসিনের সবচেয়ে গুরুতর প্রতিপক্ষ ছিলেন মস্কোর মেয়র ইউরি লুজকভ। নির্বাচনে জয়লাভের সম্ভাবনা তারই বেশি। ইয়েলসিনের মাথায় প্রথমবারের মতো ধারণা আসে, ইউরি লুজকভ জিতলে তার লোকদের কারাগারে পচতে হতে পারে। ফলে পরবর্তী আগস্টেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতাশূন্য, ক্যারিশমাহীন ভ্লাদিমির পুতিনকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসানো হয় শুধু এটা বোঝানোর জন্য যে, ইয়েলসিনের এখন আর কোনো ক্ষমতা নেই। এরপরেই ঘটে দাগেস্তান এবং অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে চেচেন কর্তৃক বোমা হামলার ঘটনা।

এবার একজন প্রায় অপরিচিত প্রাক্তন এফএসবি বা সিক্রেট সার্ভিস প্রধান ভ্লাদিমির পুতিন হঠাৎ করেই সবার সামনে চলে আসেন। দাগেস্তানে সামরিক প্রতিক্রিয়ার দায়িত্ব নেন তিনি। দাগেস্তানে রুশ সামরিক বাহিনির কর্মকাণ্ডের সব দায়দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে আপোষহীন ভাষা ব্যবহার করে মার্শাল আর্ট এক্সপার্ট পুতিন সবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। রাশিয়ার সামরিক শক্তি, কঠোর ও আগ্রাসী ভাষা এবং ক্ষেত্রবিশেষে মেকি অভিনয় দিয়ে পুতিন জাতির মেজাজে খাপ খাইয়ে নেন। 'সন্ত্রাসীদের নর্দমার কীটের মতো নিঃশেষ করা হবে,' বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ভীত, ক্ষিপ্ত এবং হতাশ রাশিয়ানরা ভাবতে শুরু করে, চেচনিয়াতে আরো নির্মম একটি আক্রমণ করা প্রয়োজন। সেনাবাহিনির মধ্যেও ছিল প্রতিশোধের ক্ষুধা। ইয়েলসিনের রাশিয়ায় দারিদ্র্য, দুর্নীতিসহ আরো অনেক সমস্যা ছিল কিন্তু চেচনিয়াকে ভাবা হতো সর্বনিকৃষ্ট সমস্যা। চেচনিয়াকে আরোগ্য করতে পারলে বাকি সব আপনাআপনি ঠিক হয়ে যাবে- এমন ধারণা ছিল তাদের। যুগোস্লাভিয়ায় বোমা হামলার প্রতিবাদে রাশিয়াকে যেসব ন্যাটোভুক্ত দেশ সমর্থন করেছিল, আজ মস্কো যখন চেচনিয়ায় বোমা বর্ষণ করছে তখন তারা কোথায়?

সব মিলিয়ে ১৯৯৪ সালের থেকেও অনেক বেশি কারণ রয়েছে ১৯৯৯ সালের চেচনিয়া আক্রমণে। পুরো চেচনিয়া দখল করতে গেলে ভোগান্তি পোহাতে হবে, এর চাইতে বরং চেচনিয়াকে সীল করে দেওয়া হোক— অনেকের পরামর্শ এমন। কেউ কেউ পরামর্শ দেয় চেচনিয়াকে বিভক্ত করা

BanglaBook.org

হোক। সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য উত্তরাঞ্চল শাসন করবে রাশিয়া। আসলান মাসখাদোভ আলোচনায় বসার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু লাভ হয় না। শামিল বাসায়েভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি বলে মাসখাদোভকে কোনো দাম দেয় না রাশিয়া। রাশিয়ানরা কখনোই শামিল বাসায়েভ বা তার মতো ইসলামি আন্দোলনের নেতাদের সমর্থন করেনি। চেচনিয়ার সাধারণ মানুষ তখনো প্রথম যুদ্ধের ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয় যুদ্ধের ধকল সহ্য করবে কী করে? মস্কো মাসখাদোভ বা তার মতো কোনো তৃতীয় পক্ষের সাহায্যের আশা না করেই জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে যুদ্ধযাত্রা শুরু করে।

***

অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক ও দাগেস্তান হামলার পর পরই চেচনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হলে এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু হয়। মস্কোর মতামত ছিল, দাগেস্তান আক্রমণ এবং বোমাবর্ষণের ঘটনা সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। চেচনিয়া আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত কেবল একটি প্রতিক্রিয়া মাত্র। তবে এ ঘটনার অনেক আগেই চেচনিয়া আক্রমণ করার পরিকল্পনা শুরু করেছিল মস্কো। এ বক্তব্যটি প্রদান করেন সার্গেই স্টেপাসিন, গ্রীষ্মের শেষদিকে পুতিনের আচমকা নিয়োগের আগে দায়িত্বরত প্রধানমন্ত্রী। তার ভাষ্যমতে, গ্রীষ্মে চেচনিয়া আক্রমণের আসল পরিকল্পনাটি মার্চ মাসে দাগেস্তান বা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের বোমা হামলার অনেক আগেই তৈরি করা হয়। অন্য কথায়, দাগেস্তানে চেচেন হামলা রাশিয়ান আক্রমণকে শুধু কয়েক মাস বিলম্বিত করে মাত্র।

বাসায়েভের মতো চেচেন বিদ্রোহীরা কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। সম্ভবত এ কারণেই তারা দাগেস্তানে হামলা করে। অপরদিকে বাসায়েভের সামরিক বাহিনি ভালো করেই জানত যে, দাগেস্তানের পাহাড়ি অঞ্চল রাশিয়ান হেলিকপ্টার ও জেট বিমানের বিপরীতে প্রতিরক্ষার জন্য খুবই দুর্বল জায়গা। হতে পারে চেচনিয়া থেকে রাশিয়ান বাহিনির মনোযোগ সরিয়ে নিতেই চেচেনরা এই আক্রমণ করে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিজ ভূমিতে সুদীর্ঘ লড়াই শুরু করার আগে চেচেনরা কিছু সময় পেতে চেয়েছিল।

থিয়োরিগুলোর মাঝে সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে। হয়তো বাসায়েভ চেচনিয়া থেকে রুশ বাহিনিকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল, আবার একই সাথে

BanglaBook.org

দাগেস্তানে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করতেও চাইতে পারে। এদিকে গুজব আছে, রাশিয়ানরাই কৌশলে বাসায়েভকে ধোঁকা দিয়ে এ হামলা করিয়েছে। এমনকি এর জন্য আর্থিক সাহায্যও নাকি পায় ওরা। তাদের বলা হয়, দাগেস্তানে আক্রমণ করলে চেচেন যুদ্ধের ভিত্তি শক্ত হবে। কেননা ইতিপূর্বে রাশিয়ানরা দাগেস্তানের পাহাড়ি অঞ্চলে ইসলামি গোষ্ঠীর উপস্থিতির ব্যাপারে জানলেও তেমন পাত্তা দেয়নি। বাসায়েভ বেশ বড় আকারের কয়েকটি আক্রমণ করে এ সময়। অবশ্য এটাই প্রথম নয়। প্রথম চেচেন যুদ্ধের পর থেকেই চেচেন-দাগেস্তান সীমান্তে এ রকম যুদ্ধ চলছে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, রাশিয়ান পার্লামেন্ট স্পিকারের মতে, বাসায়েভের আক্রমণের আগে সীমান্তরক্ষীরা নিজেরাই সেনা প্রত্যাহার করে। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীও একই রকম বিস্ময়কর দাবি করে যে, রাশিয়ান সামরিক হেলিকপ্টারগুলো দাগেস্তান থেকে ফেরার সময় চেচেন গেরিলাদের আক্রমণ করার পরিবর্তে পথ দেখিয়ে এনেছিল।

অফিসিয়াল রিপোর্টে অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে নির্বিচারে বোমা ফেলার ঘটনাটিও ধামাচাপা দেওয়া হয়। অথচ এই হামলার কারণে বিল্ডিংগুলো যেভাবে তাসের ঘরের মতো একের পর এক বিস্ফোরিত হয়েছিল সেটা যথেষ্টই ভীতিপ্রদ। মূল কথা হলো, রাশিয়ার ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে নির্দোষ, ঘুমন্ত নাগরিকদের ওপরে বোমা হামলা করা হয়। হিস্টোরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে সবাই। মস্কোর মেয়র ইউরি লুজকভের নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষ জাতীয় টেলিভিশনে প্রচার করে, এর জন্য দায়ী চেচেনরা। মস্কোতে ককেশীয়দের প্রতি লোকেদের ঘৃণা ও অবিশ্বাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে। শহর থেকে ককেশীয়, মূলত চেচেনদের পিটিয়ে বের করে দেওয়া হয়। প্রায় রাতারাতি রাশিয়ান সমাজ ক্লান্তি ও উদাসীনতার ঝেড়ে ফেলে প্রকাশ্য বর্ণবাদ ও যুদ্ধের জ্বরে আক্রান্ত হয়।

তবুও পুলিশ কোনো বিশ্বাসযোগ্য চেচেন সন্দেহভাজন তৈরি করতে পারেনি এবং কৃতিত্ব দাবি করার জন্যও কেউ এগিয়ে আসেনি। ২০০৪ সালের বেসলান স্কুলে জিম্মির জন্য দায়ী বাসায়েভও-যে কিনা হামলার ব্যাপারে দায় স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে না-সেও পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। উপরন্তু সরকারি তদন্তেও তাই বেরিয়ে আসে। দেশের নেতৃস্থানীয় সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীদের হত্যাসহ রাশিয়াতে প্রধান অপরাধের তালিকা বেশ দীর্ঘ এবং দিনে দিনে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

BanglaBook.org

অথচ যেই পুলিশ দেশের দুর্নীতি রোধে কোনো ভূমিকা রাখেনি সেই একই পুলিশ কীভাবে এতো দ্রুত বুঝতে পারল এটা চেচেনদের কাজ? তাই পুলিশের ওপর কেউ-ই ভরসা রাখে না এখন।

এরপর রায়জান-এ একটা ঘটনা ঘটে। ফলে এতোদিন যেটা ছিল নিছক এক কন্সপিরেসি থিয়োরি, সেটার সমর্থন জোরদার হয়। থিয়োরিটি হলো, সিক্রেট সার্ভিস এফএসবি কোনো না কোনোভাবে এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত। তাদের উদ্দেশ্য একটাই, যুদ্ধ শুরু করার জন্য জনমত গড়ে তোলা।

রায়জান শহরের ঘটনাটি মোটামুটি এ রকম : একদিন সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি তার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ ফিরে বেইসমেন্টে বড় বড় কয়েকটা বস্তা দেখতে পায়। এরপর সে স্থানীয় পুলিশকে ফোন করে। পুলিশ আবিষ্কার করে, বস্তায় বিস্ফোরক আছে; পরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় বিস্ফোরিত হবার জন্য সাথে সেট করা ছিল একটা ডেটোনেটর। পরে জানা যায়, বস্তাগুলো ওখানে রেখেছিল এফএসবি। স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্তিকর ছিল ব্যাপারটা। কিন্তু এফএসবি ব্যাখ্যা দেয় যে, পুরো ব্যাপারটি ছিল আসলে একটা ভুল বোঝাবুঝি। তাদের মতে, বস্তাগুলো প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিকারক ছিল না। সিভিল ডিফেন্সের প্র্যাকটিসের জন্য বেইসমেন্টে রাখা হয়েছিল। অবশ্য স্থানীয় পুলিশ বারবার দাবি করেছিল, তারা যা পেয়েছিল সেগুলো মোটেও ডামি ছিল না, সত্যিকারের বিস্ফোরক ছিল। এরপর তদন্ত আর এগোতে পারেনি। লোকটা কি শুধুই একজন সচেতন নাগরিক ছিলেন? নাকি সিক্রেট সার্ভিসকে আরেকটা ম্যাসাকার করার দায় থেকে মুক্ত করেছিলেন? এর কোনো সন্তোষজনক উত্তর নেই।

প্রায়শই রাশিয়ায় সত্য কোনো অস্পষ্ট কোণে লুকিয়ে থাকে। হয়তো বোমা বিস্ফোরণের পেছনে দাগেস্তানি, এমনকি বাসায়েভের হাতও থাকতে পারে। রাশিয়ার সিভিলিয়ান অ্যাপার্টমেন্টে প্রথম বোমা হামলা হয়নি, কেবল দাগেস্তানের সামরিক আবাসস্থলে হয়েছে। এই কাজটা দাগেস্তানি বা চেচেন গোরিলাদের হয়ে থাকতে পারে। সেই অঞ্চলে তারাই রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছিল। আবার নিশ্চিতভাবে এটা ক্রেমলিন বা এফএসবির কাজও বলা যায় না। আমরা হয়তো সত্যটা কখনোই জানতে পারব না।

***

এই অসমঝোতা এবং আসন্ন যুদ্ধ ইয়েলসিন ও পুতিনকে কী কী রাজনৈতিক

BanglaBook.org

সুবিধা দিয়েছে সেসব অত্যন্ত স্পষ্ট।

পরিকল্পনামাফিক হোক কিংবা আচমকা- অ্যাপার্টমেন্ট বোমা হামলা তাদের একটা সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে অন্যান্য ইস্যু বাদ দিয়ে এই একটা ইস্যুর ওপর সবার মনোযোগ সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে ইয়েলসিন এবং মিত্ররা। এটাই তারা চাচ্ছিল। ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে ভ্লাদিমির পুতিন চেচনিয়ার এই ক্রমাগত সহিংসতার ঘটনায় একজন জাতীয় বীর হয়ে ওঠেন। তার জনপ্রিয়তা ১% থেকে ৫০%-এ উন্নীত হয়। অথচ তার হাত ছিল রক্তে রঞ্জিত। প্রতিদিন রাশিয়ার বিমান ও সেনাবাহিনি চেচনিয়ায় বোমা হামলা করে। প্রতিদিনই এর মাত্রা তীব্রতর হয়। ১৯৯৯ সালের নিউ ইয়ার ইভে হঠাৎ করে পদত্যাগের ঘোষণা দেন ইয়েলসিন। টাইমিংটা সঠিক ছিল; স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের পদটা পুতিনের হাতে চলে আসে। নির্বাচনের তারিখ চূড়ান্ত হয় মার্চ ২০০০। টানা তিন মাস নির্বাচনী প্রচারণা চলে। পুতিন প্রেসিডেন্ট হয়েই চেচনিয়া সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করেন। ফলে ইয়েলসিন এবং তার মিত্ররা নিশ্চিন্তে ঘুমানোর সুযোগ পায়।

কোনো সরকার রাজনৈতিক লাভের জন্য অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে বোমা হামলা করাতে পারে সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তবে সরকারের গল্পের ফাঁকফোকরের কারণে সম্ভাবনাটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। অ্যাপার্টমেন্ট বোম্বিং-এ এফএসবি জড়িত থাকার বিষয়টি কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। ইয়েলসিনের ক্রেমলিন ছিল অত্যন্ত হিংস্র। ১৯৯৩ সালে রাশিয়ান পার্লামেন্টে গোলাবর্ষণ বা প্রথম চেচেন যুদ্ধের কথা ভাবুন। রাশিয়ান সরকার কি চেচনিয়াতে নিরীহ মানুষের বসতবাড়িতে বোমা ফেলেনি? রাশিয়ান সরকার প্রথম চেচেন যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের ঘর, এমনকি গ্রোজনির অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকেও নিরীহ মানুষের ওপর বোমা হামলা করেছিল।

এখন কোনো বাধাই পুতিনের যুদ্ধকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। রাজনৈতিক ও সামরিক নিষেধাজ্ঞা অনেক দেশের সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দিয়েছে। ইরাক যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার সমাজ অনেকটাই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু পুতিনের আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে। পুতিনের কাছে একজন শাসক হওয়াটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিশাল সামরিক বাহিনি ও সাধারণ নাগরিকদের দুরাবস্থা, সন্ত্রাসবাদ, ইসলামি আন্দোলনের প্রতিরোধ ও আন্তর্জাতিক অরাজকতা- এগুলোর প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করেননি তিনি। ১৯৯৯ সালের ঘটনাসমূহের

BanglaBook.org

পরও পুতিন টিকে থাকেন ক্ষমতায়। তিনি ইয়েলসিনের দলকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন। এখন যুদ্ধই পুতিনকে নিয়ে যাচ্ছে একনায়কত্বের দিকে। যুদ্ধের ফলে মিডিয়ার স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে গেছে। শুরু হয়েছে সরকার নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার প্রচারণা, সেন্সরশিপ। চেচনিয়ার যুদ্ধই পুতিনকে তৈরি করেছে এবং এই যুদ্ধকে ব্যবহার করেই রাশিয়াকে নতুন করে ঢেলে সাজাচ্ছেন পুতিন।

***

আধুনিক চেচেন ট্র্যাজেডির দায় স্বাধীনতা নেতা যোখার দুদায়েভসহ বেশ কিছু অযোগ্য মানুষের ওপরও বর্তায়। তবুও সবচেয়ে বড় দোষ অবশ্যই বরিস ইয়েলসিনকে দিতে হবে। রাষ্ট্রপতি পুতিন দ্বিতীয়বার যুদ্ধ শুরু করেন ইয়েলসিনের বিভ্রান্ত নীতিগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। কিন্তু ইয়েলসিনের থেকেও বেশি নির্মমতা প্রদর্শন করেন।

রাষ্ট্রপতি পুতিন এই যুদ্ধ শেষ করতে চান না। কেজিবি প্রশিক্ষিত মস্তিষ্ক নিজের ব্যর্থতা দেখতে পায় না। চেচনিয়া বিষয়ে আলোচনা করতেও পছন্দ করেন না তিনি। প্রেস কনফারেন্সে তিনি চেচনিয়া বিষয়ক প্রশ্ন এড়িয়ে যান। তার মতে, চেচনিয়ার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং চেচনিয়া পুনর্গঠন চলছে। অন্য কিছু ভাবতে পারেন না তিনি। আপোষ তার ধাতে নেই। আর চেচনিয়ার ব্যাপারে তিনি বড্ড বেশি একরোখা। বিপ্লবীদের সাথে সমঝোতা করার কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি। গ্রোজনি সম্পর্কে তার হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য ছিল অস্বাভাবিক। এতো এতো ধ্বংসাযজ্ঞের নেপথ্য নায়কের মুখে অনেকটাই হাস্যকর।

সদিচ্ছার অভাবে একটা প্রাথমিক শান্তি চুক্তি নাগালের বাইরেই রয়ে যায়। আলাপ-আলোচনার জন্য সবসময় মাসখাদোভকে ডাকা হতো। তার হত্যার পরও অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। দ্বিতীয় যুদ্ধে কোনো যৌথ যুদ্ধবিরতি হয়নি। এমনকি সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের সাথে আলাপ-আলোচনার কোনো চেষ্টাও করা হয়নি। বছরের পর বছর ধরে ক্রেমলিন বলে আসছিল, সেখানে কথা বলার মতো কেউ নেই। অথচ তারা আসলান মাসখাদোভকে তাচ্ছিল্য ও পরে হত্যা করেছে।

BanglaBook.org

চেচেনরা অবশ্য অনেক আগ থেকেই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দিয়েছে। কী নিয়ে আলোচনা করবে তারা? এখন চেচেনদের টিকে থাকা

এবং মানবাধিকার পাওয়াটাই বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্মানের সাথে বেঁচে থাকা, বিচার, চিকিৎসা আর অর্থনৈতিক সাহায্যই এখন তাদের প্রধান চাহিদা। চেচেনদের মাঝে যারা বেঁচে আছে তাদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি দেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য সাহায্য দরকার। সম্মানের সাথে বেঁচে থাকাটাই অনেক চেচেনের জন্য সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। নিজেদের ভৌগোলিক অবস্থানের ব্যাপারে চেচেনরা বরাবরই অবগত। তাদের সাথে সমঝোতা করে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে ফেলাই যুক্তিযুক্ত হবে।

রাশিয়ার সাধারণ জনগণেরও একই চাহিদা। ওরাও চেচেনদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আগ্রহী নয়। সবাই নিজেদের নিরাপত্তাটুকুই চায়। এসব বোমা হামলা, অপহরণ কেউই চায় না। চেচনিয়ার সামান্য জায়গা নিয়ে অন্যান্য রাশিয়ানদের তেমন ভাবনা নেই। বরং শান্ত একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রে বসবাস করাটাই তাদের মুখ্য চাহিদা। দ্বিতীয় যুদ্ধ এসবের প্রতিশ্রুতি দিলেও পুতিন নির্মিত বহিরাবরণ ভেদ করে এই ফাঁকা বুলির অসারতা ঠিকই টের পাবেন আপনি। এই আবরণ ইয়েলসিনের শাসনের মতোই দুর্বল। পুতিন যা করছে তাতে শান্তি এলেও আসতে পারে, নতুবা বেজে উঠবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের দামামা।

***

মাসখাদোভের মৃত্যুতে দুই দলের আপোষ রফায় বিশাল একটা বাধা পড়ে। রাশিয়ান রাজনৈতিকদের অনেকেরই যুদ্ধে স্বার্থ জড়িত ছিল আর চেচেনদের মাঝে বেড়েই চলছে বিদ্রোহীর সংখ্যা। মস্কো তাদের সাথে কোনোভাবেই আপোষে আসতে নারাজ।

ক্রেমলিন দাবি করে, তারা চেচনিয়ায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, বিচ্ছিন্নতাবাদী বা জাতীয় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নয়। এই বক্তব্য ফাঁপা বেলুনের মতো, দীর্ঘ সময় ধরেই এটা পশ্চিমাদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তারা জানে, এটা একটা গৃহযুদ্ধ। তবে মস্কো কর্তৃক আরোপিত 'মিডিয়া ব্ল্যাকআউট' ধীরে ধীরে এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। আর ৯/১১-এর পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশসহ অনেকেই চেচনিয়ার ঘটনাকেও আল-কায়েদার কর্মসূচির অংশ বলে ভাবতে আরম্ভ করে।

BanglaBook.org

কিন্তু বাস্তবতা কী? চেচনিয়া ভাড়াটে সৈন্যদের অভয়ারণ্য নয়। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তের সাথে চেচনিয়ার অনেক পার্থক্য। বছরের

কিছু সময় জর্জিয়া সীমান্ত দিয়ে চেচনিয়ায় প্রবেশের সুযোগ থাকে। চেচনিয়া এমনিতেই ছোট্ট জায়গা আর বিদেশি মার্সেনারিদের ভেতরে প্রবেশের মতো পর্যাপ্ত ভৌগোলিক জ্ঞান নেই। আফগানিস্তান বা ইরাকে আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে চেচেনদের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ব্যাপারেও কোনো প্রমাণ নেই। অফিসিয়াল নথি অনুযায়ী, গুয়ান্তানামো বে'তে আটক করা আটজন রাশিয়ান নাগরিকের একজনও চেচেন নয়।

এখানকার ইসলামপন্থীরা বছরের পর বছর যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো কিছু দেখার সুযোগ পায়নি। তাদের নেতাদের বাইরের সাহায্যের জন্য শুধু অনুনয় বিনয়ই করতে দেখেছে তারা, সাহায্যের দেখা পায়নি কোনোকালে। চেচেনদের চারপাশে শুধু উৎপীড়ন আর নিরাশা। নৃশংসতা দেখতে দেখতে ওদের মাঝে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠেছে। চেচেনদের যুদ্ধের পেছনে প্রতিশোধ আর দেশপ্রেমের বড় ভূমিকা আছে। আল-কায়েদার কার্যক্রমের সাথে চেচেনদের বিদ্রোহের কোনো সম্পর্ক নেই।

সম্ভাবনা আছে, মাসখাদোভের মৃত্যুর পরে ইসলামপন্থী দলগুলো সশস্ত্র প্রতিরোধের ওপর জোর দেবে। ফলে রাশিয়া এবং বিশেষ করে চেচনিয়া পরিণত হবে রণক্ষেত্রে। ১৯৯৪ সালের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা আর সব সাধারণ চেচেনের মতোই এক সময় সোভিয়েত নাগরিক ছিল। রুশ ভাষা, সংস্কৃতি জানত তারা। এমনকি রুশ নাগরিক হিসেবে রুশ বাহিনির হয়ে আফগানিস্তানে নিজেদের মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধেও লড়েছে তারা। এখন সেসব নেতারা হয় মৃত নয়তো নির্বাসিত। এখন যারা তাদের জায়গা নিয়েছে তারা যুদ্ধের আগুনে গড়ে ওঠা কঠিন মানুষ। তাদের কাছে শেষ কথা বলতে কিছু নেই। ক্রেমলিন তো এটাই চেয়েছিল যেন ইসলামপন্থীদের মাঝে বিদ্রোহের বারুদ জ্বলে ওঠে এবং গোটা ব্যাপারটাকে একটা 'বৈধরূপ' দেয়া যায়।

সমস্যা শুধু চেচনিয়াতেই নয়, সমগ্র উত্তর ককেশাস জুড়েই একই অবস্থা। পুলিশের নৃশংসতা, দুর্নীতি, স্বাধীন বিচারব্যবস্থার অভাব, গণতন্ত্রের পতন উত্তর ককেশাসের সব জায়গাতেই আঘাত করেছে। ইঙ্গুশেটিয়ার প্রেসিডেন্ট রুসলান আউশেভকে পদত্যাগ করে পুতিনের লোককে ক্ষমতায় বসাতে হয়েছে। প্রতি সপ্তাহেই লেগে থাকে রুশ সেনা ও গেরিলাদের গুলি বিনিময়। বেসলান স্কুলের জিম্মিদের হত্যাযজ্ঞ উত্তর ওসেটিয়ান ও ইঙ্গুশদের মধ্যকার সম্পর্ককেও উত্তপ্ত করে তুলেছে। ফলে রাশিয়ার প্রতি ঐতিহ্যগতভাবে অনুগত ওসেটিয়ানদের

BanglaBook.org

আস্থা উঠে গেছে। কাবার্ডিনো-বালকারিয়ায় কর্তৃপক্ষ মুজাহিদদের নিয়ে এতোই উদ্বিগ্ন যে, একমাত্র মসজিদটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দাগেস্তানে রাজনীতি ও ব্যবসা আরো ভয়ংকর ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। কখনো কখনো রাশিয়ান ফেডারেল আইন কেবলমাত্র শো-অফে পরিণত হয়েছে, কাজের কাজ কিছু করছে না। চেচনিয়ার পর দাগেস্তানেই মুজাহিদদের সংখ্যাধিক্য। এটা এমন এক অঞ্চল যেখানে একদিকে ধর্মের প্রচার-প্রসার খুব দ্রুত ঘটেছে, অপরদিকে রাজনৈতিক নৈরাজ্যও চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছেছে।

বেসলানের ঘটনায়ও চেচনিয়াকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। চেচেন কর্তৃক স্কুল দখল করা এবং পরবর্তী উদ্ধার ব্যর্থতার লাইভ কাভারেজ দেখে মানুষ বুঝতে পেরেছে, পৃথিবীর কতো অধঃপতন হয়েছে। রাষ্ট্রপতি পুতিনের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ব্যাখ্যা কেউ মেনে নেয়নি। জিম্মিকারীদের মধ্যে অনেক আরব এমনকি আফ্রিকান থাকার রিপোর্টে গণ্ডগোল ছিল। বিগত ১০ বছরে চেচনিয়ার বিপর্যয় ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যকার যোগসূত্র দেখতে না পাওয়াই ছিল রাষ্ট্রপতি পুতিনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। জিম্মিকারীদের দাবি ছিল—চেচনিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। রাশিয়ার জনসাধারণের কাছ থেকে এটা গোপন রাখা হয়। চেচেন জিম্মিকারীদের কথাবার্তায় কোনো আক্রমণ ছিল না, সহজ একটা দাবি ছিল। অথচ পুতিন এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কী করেন? নির্বিচারে মানুষ হত্যা।

অনেক পর্যবেক্ষণকারী আজ দেখছে যে, চেচনিয়ার সাথে পুতিনের আচরণ অন্যান্য স্বৈরাচারী দেশনায়কের থেকে ভিন্ন কিছু নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী মিখাইল খোদোরোকোভস্কিকে আঘাত করা, মিডিয়ার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, ইউক্রেন ও বেলারুশের স্বৈরাচার আলেকজান্ডার লুকাশেনকোর নির্বাচনে ভোট চুরিতে সমর্থন- তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চেচনিয়া রাশিয়ার স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্রের ব্যত্যয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। চেচনিয়ার কারণেই বরিস ইয়েলসিন সাম্যবাদীদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করেন। এরপর রাশিয়ানরা এক্স-কেজিবি অফিসার ভ্লাদিমির পুতিনকে নির্বাচন করে। পুতিনের মতো একজন চরমপন্থী, জাতীয়তাবাদী ও বর্ণবাদী পর্দার আড়াল থেকে বের হয়ে মঞ্চে উপনীত হন।

রাশিয়ান জনগণ বিশ্বাস করতে চায় যে, চেচনিয়ার সাথে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। যা ঘটছে মিডিয়া তা লুকিয়ে রাখলে সেটা আরো সহজ হয়। অথচ

BanglaBook.org

গ্রোজনিসহ অনেক গ্রামের ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে চেচনিয়ায়। হাজার হাজার রুশ নাগরিক এবং সৈন্যদের কবরও রয়েছে সেখানে। অন্তত এতোটুকু তো স্বীকার করতে হবে। জনগণ বলে, তাদের একমাত্র আশা স্বাভাবিক একটা দেশে বসবাস করা। কিন্তু তাদের নাম ভাঙিয়ে আজ পর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে, সেটার মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত তাদের ইচ্ছেটা আজীবনই নাগালের বাইরে থেকে যাবে।

***

চেচনিয়ার সত্যিকার অবস্থা সাধারণ রাশিয়ান নাগরিক ও বিদেশিদের কাছে দুর্ভেদ্যই বটে। কেবল নামমাত্র কিছু বিদেশি সাংবাদিক সত্যটা জানে। রাশিয়ান দু'একজন বাদে সব সাংবাদিক যেন সরকারের মুখপাত্র। অভ্যন্তরীণ ওয়েবসাইটে সত্যি ঘটনা খুব কমই প্রকাশ হয়। সত্যি জানার একমাত্র উপায় হলো চেচনিয়ার ভেতর প্রবেশ করা এবং সাধারণ চেচেনদের সাথে কথা বলা। তবে এটা অনেক জটিল, সময় সাপেক্ষ ও ক্ষেত্র বিশেষে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়।

এরকম একটা মুহূর্তে চেচনিয়ার খবর জানার জন্য তলস্তয়ের বই খোলা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতো। তিনি এক শতাব্দী আগে রাশিয়া ও চেচনিয়া সম্পর্কে শিক্ষণীয় কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

পাঠকরা হয়তো হাজী মুরাতের বিখ্যাত ঘটনা পড়তে পারে, যেখানে রুশ বাহিনি চেচেন গ্রামকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল।

তলস্তয় বর্ণিত সকল সেনাই খারাপ নয়। তারা কেবল বিশ্বাস করে যে, স্থানীয়দের সাজা পেতে হবে। তাদের ভাবভঙ্গি ঔপনিবেশিকদের মতো, তারা কেবল ক্ষমতাই বোঝে। চেচেনদের সম্পর্কে রাশিয়ান চিন্তাধারা সম্পর্কে এটা একটা ধারণা দেয়।

উপন্যাসের একটা অংশের নায়ক হলো বাটলার। এক তরুণ, যার জন্য চেচেন যুদ্ধ হলো এডভেঞ্চার এবং সেন্ট পিটার্সবার্গে তার ঋণগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তি। এই ধ্বংসযজ্ঞে অংশ নেয়ায় তার অনুশোচনা ছিল না। সেনারা কুয়ো-মসজিদ ধ্বংস, বাচ্চা ছেলে থেকে গৃহপালিত পশু হত্যা, গাছের ফল বিনষ্ট, খড়ের গাদা ও ঘরে আগুন দেওয়া—কোনোকিছুই বাদ রাখেনি। রাশিয়ানদের কাছে এগুলো কোনো সন্ত্রাস নয়। তাদের কাজ হলো, গ্রামবাসীদের চেচেন নেতা ইমাম শামিলের আন্দোলনে যোগ দেওয়া হতে বিরত রাখা। তাদের কাজ

BanglaBook.org

হলো, চেচেনদেরকে পরাক্রমশালী রাশিয়ার সাথে যোগ দিতে বাধ্য করা।

গত এক দশকে এই একই দৃশ্য চেচেন গ্রাম ও শহরগুলিতে বারবার দেখা গিয়েছে। কেবল পার্থক্য, এখন ব্যবহার করা হয় কালাশনিকভ ও বিমান। মূল কাজ একই ছিল: চেচেনদের রাশিয়ার নাগরিক হতে প্ররোচিত করা।

চেচেন গ্রাম থেকে রুশ বাহিনি চলে যাওয়ার পর গ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়া কেমন হয় তা বর্তমান রাশিয়ান জনগণের জানা থাকা উচিত। নিচের ঘটনা পড়লে হয়তো তারা বুঝবে, কেন দশ বছর আগে ইয়েলসিন প্রথমবার সেনাবাহিনি প্রেরণ করার পরও 'কাজ' অসমাপ্ত রয়ে যায়।

রচনাংশটি পুরোটা উদ্ধৃত করাই যুক্তিযুক্ত:

গ্রামের মুরব্বিরা পরিস্থিতি আলোচনা করার জন্য চত্বরে দাঁড়িয়েছিল। কেউই রাশিয়ানদের প্রতি ঘৃণাসূচক কোনো শব্দ উচ্চারণ করছে না। এই অবস্থা বৃদ্ধ কিংবা তরুণ- সব চেচেনেরই। মূলত তারা ঘৃণার চাইতেও বেশি কিছু লালন করছিল ভেতরে ভেতরে। রাশিয়ানরা তাদের চোখে মানুষ না জানোয়ার, সেটা নিয়ে ভাবতেও তাদের অনীহা। তাদের ধ্বংসের জন্য এই পশুগুলো যে হিংস্রতা ও সংজ্ঞাহীন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিল সেটাই অনুভব করছে।

গ্রামবাসীর সামনে কেবল দুটো রাস্তা ছিল। এক, রাশিয়ানরা যা অনায়াসে ধংস করে দিয়ে গেছে, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আবারও সেসব গোছগাছের চেষ্টা করা এবং প্রতিটা মিনিট পুনরায় হামলার আশংকায় সিঁটিয়ে থাকা। অথবা ধর্মের বিধান মেনে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে তারা যে ঘৃণা ও অবজ্ঞা পুষে রাখে তা দেখানো।

সম্মিলিত মুনাজাতের পর ইমাম শামিলের কাছে সাহায্য চেয়ে দূত প্রেরণ করা হলো। এরপর সাথে সাথেই তারা কাজে লেগে গেল ধ্বংসপ্রাপ্ত সবকিছু মেরামতের লক্ষ্যে।

তিবলিসি, ২০০৫

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মুখবন্ধ

ডার্গো, চেচনিয়া

চেচেন হিরো, রাশিয়ার মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যান শামিল বাসায়েভ আমার সামনে বসে আছে। আমরা আছি ডার্গোর প্রান্তসীমায়, ককেশাস পাহাড়ের পাদদেশে বিস্মৃত একটি গ্রামে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে। মাথার উপর ঘূর্ণায়মান কয়েকটা যুদ্ধবিমান অবশ্য মাঝে মধ্যে আমাদেরকে যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাসায়েভের পরনে একটি জীর্ণ ক্যামোফ্লাজ স্যুট। পায়ে স্যান্ডেল। কোলের উপর সাইলেন্সার লাগানো একটি রাশিয়ান স্পেশাল ফোর্স রাইফেল। টিনের মগ থেকে সে কড়া মিষ্টি রঙ চা পান করছে। কাছেই বসে আছে কয়েকজন বডিগার্ড—লম্বা গড়ন, তামাটে বর্ণ, মুখভর্তি দাড়ি, যেন বাইবেলের কোনো চরিত্র। গ্রেনেড, কালাশনিকভ রাইফেলের গুলি আর লম্বা ককেশীয় খঞ্জর 'দ্য কিনঝাল'-এ তাদের বুক ভার হয়ে আছে।

বাসায়েভ কথা আরম্ভ করতেই নীরবতা নেমে এলো। তার মুখে ঘন দাড়ি, আশ্চর্য রকমের গভীর ও ছোট চোখ। এই মানুষটাই দুই সপ্তাহ আগে রাশিয়ার বুদেনভস্ক শহরের একটি হাসপাতালে ১৫০০ মানুষকে জিম্মি করে রাশিয়াকে যুদ্ধবিরতিতে বাধ্য করে আবার বহাল তবিয়তে ফিরেও আসে। এই সেই যোদ্ধা যে নিজের চারপাশে জলজ্যান্ত মানুষ দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেছিল, হাসপাতালকে পরিণত করেছিল একটি রণক্ষেত্রে। আবার এই লোকটিই পরাক্রমশালী রাশিয়ান বাহিনিকে বোকা বানিয়ে যুদ্ধ থামাতে বাধ্য করে। ডার্গোতে সেই ছিল রাজা।

'আমরা ওদের দেখিয়ে দিয়েছি', বলে হাসতে শুরু করল বাসায়েভ, তার সাথে অন্যরাও। বাসায়েভ যেন সেলিব্রিটি যোদ্ধার ভূমিকা পালন করছিল—কিছুটা ছেলেমানুষিপূর্ণ, অপরিণত। মুহূর্তে ভীষণ রক্তগরম রাজনৈতিক বিবৃতি,

পরমুহূর্তেই অনুভূতিশূন্য যুদ্ধের বয়ান।

বুদেনভস্ক প্রসঙ্গ ছেড়ে সে চলে গেল তার নামের মিতা, কিংবদন্তী ইমাম শামিলের সময়কালে। উনিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ান সেনাদের বিরুদ্ধে পঁচিশ বছর ধরে চলমান জিহাদে নেতৃত্ব দিয়েছেন এই মুজাহিদ। এরপর বাসায়েভ কমিউনিস্ট দমনের কথা বলল। সর্বাগ্রে সে স্মরণ করল সেই ঘটনার কথা যা গোটা চেচেন জাতিকেই যেন কাফনে মুড়ে দিয়েছিল : ১৯৪৪ সালে জোসেফ স্ট্যালিন কর্তৃক নারী, পুরুষ ও শিশুদের মধ্য-এশিয়ায় গণহত্যামূলক নির্বাসন। সেই হত্যাযজ্ঞে প্রতি তিনজনে একজনের বেশি মানুষ টিকে থাকতে পারেনি।

বাসায়েভ বলা শুরু করল, 'স্ট্যালিন আমাদের বিতাড়িত করলে রাশিয়ানরা দখল করে নেয় আমাদের শূন্য ঘরগুলো। ওরা আমাদের কবরস্থানের ফলকগুলো উঠিয়ে সেগুলো রাস্তাঘাট, ব্রিজ, শূকরের খোঁয়াড় বানানোর কাজে ব্যবহার করে,' তার কণ্ঠস্বর শান্ত কিন্তু ঘৃণায় ভরপুর। অবশ্য পূর্বপুরুষদেরকে যারা জীবিতদের মতোই গুরুত্ব দেয়, যারা কবরস্থান অতিক্রম করার সময় গাড়ির সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে সম্মান জানায়; তাদের জন্য এই ঘৃণা স্বাভাবিক। সোভিয়েতরা চেচেনদেরকে শুধুমাত্র অপমান ও লাঞ্ছিত করার জন্যই শত শত নয় বরং হাজার হাজার কবরের ফলক উঠিয়ে ফেলে। একসময় স্ট্যালিন মারা গেলে চেচেনরা তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসে। প্রথম সুযোগেই তারা কবরের ফলকগুলোকে পুনরায় একত্রিত করে। এরপর গ্রোজনির কেন্দ্রে নির্মাণ করে একটি স্মৃতিসৌধ। যার নাম 'গার্ডেন অব ডেথ' বা 'মৃতদের উদ্যান'। এভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তাদের আত্মসম্মানবোধ।

এরপর এই যুদ্ধ। নতুন রক্ত, নতুন রোষ। 'রাশিয়ানরা যখন গ্রোজনি আক্রমণ করে, তখন ওরা স্মৃতিসৌধ থেকে শহরের দিকে ট্যাংক দিয়ে গোলাবর্ষণ করে। আমাদের কবরস্থান থেকে ফলকগুলো উঠিয়ে নিয়ে খানকালায় অবস্থিত ওদের ক্যাম্পে টয়লেট তৈরির কাজে ব্যবহার করে,' বলতে লাগল বাসায়েভ।

হাসি-তামাশার সময় বাসায়েভ নিচের দিকে অনেক বেশি তাকাত কিন্তু এখন সে আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলছে। 'ওরা আমাদের সবাইকে নতজানু হতে বাধ্য করেছে, এককথায় ওরা আমাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু আমরা আর সহ্য করব না এই অপমান। আমাদের বাপ-দাদারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে মারা গেছে। আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে মৃত্যুবরণ করাকে অনেক গর্বের বিষয় মনে করি। এই লড়াই চালিয়ে

BanglaBook.org

যাওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের।’

ককেশাস পর্বতমালার সৌন্দর্যে মোহাবিষ্ট হয়ে অভিশপ্ত ইতিহাসকে ভুলে যাওয়া খুবই সহজ। শীতকালে পাহাড়ের চূড়াগুলো সাধারণত ঢাকা পড়ে যায় তবুও তাদের উপস্থিতি মনে রাজকীয় অনুভূতি এনে দেয়। সবাই আকাঙ্ক্ষা করে এক নজর দেখার। ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো একদিনের কথা। দু’সপ্তাহ পেরিয়েছে আমার নিউজ এজেন্সির জন্য আমি চেচনিয়ায় অবস্থান করছি। মাত্রাতিরিক্ত কাদা, রক্ত ও যুদ্ধের শীতলতায় অনুভূতিশূন্য হয়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি গাড়ি নিয়ে। বর্ডারের কাছে আসতেই দেখি আবদ্ধতার অনুভূতি জাগানিয়া ধূসর আকাশ অপ্রত্যাশিতভাবে খণ্ডিত হয়ে গেল এবং আমাদের দক্ষিণে, ককেশাস পর্বত থেকে লাভা নির্গত হলো। আমার চেচেন ড্রাইভার আঙুল দিয়ে কাযবেকের দিকে ইশারা করল। খাঁজকাটা উঁচু পর্বত, ককেশাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম চূড়া। আমি খুশিতে সজোরে হেসে উঠলাম। পাহাড়ের চূড়া অনন্ত শুভ্র ভাসমান তুষারে ঢেকে আছে। অথচ কী নির্ভার, উজ্জ্বলতম শুভ্রতা। এক মুহূর্তের জন্য আমি স্বস্তি অনুভব করলাম। একটা ঘোর কাজ করছিল আমার মাঝে, যেন কোনোকালেই যুদ্ধ হয়নি এখানে। কিন্তু এটা ছিল চেচনিয়ায় আমার কেবলমাত্র তৃতীয় সফর। তিক্ত শিক্ষা লাভ করাটা তখনো আমার বাকি ছিল। রাশিয়ান অধ্যুষিত ককেশাস হয়তো একটা বাগান হতে পারে, তবে সেটা বিষাক্ত বাগান।

ককেশাসের পাহাড়ি এলাকার সীমা গোটা কিউবার সমান, ১১০০ কিলোমিটার। কাস্পিয়ান সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলকে তরবারির মতো আড়াআড়িভাবে দ্বিখণ্ডিত করেছে এই পর্বতমালা। পাহাড়ের দক্ষিণে রয়েছে ট্রান্স-ককেশাস—সোভিয়েত থেকে সম্প্রতি স্বাধীন হওয়া আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং জর্জিয়ার সমন্বয়ে গঠিত। উত্তর ককেশীয় অঞ্চলে রয়েছে রাশিয়ার কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র। সম্ভবত এটাই পৃথিবীর সবচাইতে বেশি জাতিগত বৈচিত্র্যময় অঞ্চল।

স্বায়ত্তশাসিত দাগেস্তান বা ইঙ্গুশেটিয়ার কোনো গ্রাম দেখে আজকাল নির্ঝঞ্ঝাট মনে হতে পারে তবে উত্তর ককেশাস বরাবরই ছিল ভূ-রাজনৈতিক ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু। একদম আদিকাল থেকে মঙ্গোলীয় যুগ পর্যন্ত দু’হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এশীয় গোত্রগুলো ককেশাসকে ইউরোপ ও এশিয়ার সেতু হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এরপর ককেশাস পর্বতমালা নিয়ে শুরু হয় তৎকালীন রাশিয়া, পারস্য এবং অটোমান সাম্রাজ্যের মাঝে তীব্র প্রতিযোগিতা।

BanglaBook.org

বর্তমানে কাস্পিয়ান অয়েল রিজার্ভের প্রবেশদ্বারে অঞ্চলটির অবস্থান। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ও শেষ প্রবাহমান উৎস।

১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মকালে আমি প্রথম উত্তর ককেশাসে সফর করি। তখন চেচনিয়া একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিছু মানুষ সে সময় প্রজাতন্ত্রের বিচ্ছিন্নতাবাদী পদক্ষেপকে খুব গুরুত্বের সাথে নেয়। তবে কিছুদিন পরেই তা পরিণত হয় বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, অপরাধমূলক, কমেডি সিরিয়ালের কাহিনিতে—তবুও এই মুহূর্তে আমি অনুভব করতে লাগলাম যে, আমি ভিন্ন কোনো দেশে এসেছি। নিশ্চিতভাবেই সেইন্ট পিটার্সবার্গ বা সামারার দেশে নয়।

শীতকালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সবাই ভেবেছিল, রাশিয়ান বাহিনি খুব দ্রুত জনগণের উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহের ইতি টেনে দেবে। উপরন্তু দেখা গেল, প্রথম দিন থেকেই চেচেন যোদ্ধারা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অনেকের মতে, আফগানিস্তানে রাশিয়ানদের তিক্ত অভিজ্ঞতার চেয়েও তা ছিল মারাত্মক। জবাবে রাশিয়ানদের চার লাখ মানুষের শহর গ্রোজনিকে বোমা বিস্ফোরিত করে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেওয়া, এরপর প্রতিটি গ্রামে এর পুনরাবৃত্তি করা ছিল তীব্র মানসিক বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ।

সে সময় প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলসিন বলেছিলেন যে, তিনি কেবলমাত্র 'সাংবিধানিক সার্বভৌমতা রক্ষা' করছেন। কিন্তু গ্রোজনিতে একদিন অতিবাহিত করাই এটা বোঝার জন্য যথেষ্ট যে, ভেতরে ভেতরে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র চলছে। চেচনিয়াই সেই জায়গা যেখানে ইতিহাস অভিশপ্ত হয়েছে এবং প্রতিশোধের আগুন ঝলসে উঠেছে। একশ, এমনকি দু'শ বছর আগেও ঠিক একই জায়গায়, একই পদ্ধতিতে এবং একই স্লোগানে যুদ্ধ হয়েছে। চেচেনবাসীদের একটা প্রবাদ আছে, 'প্রতি পঞ্চাশ পর পর তারা আমাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা আমৃত্যু লড়ে যাব।' কথাটি এতোটাই চালু ছিল যে, সেটা একসময় কথার কথা মনে হতো। কিন্তু এটাই ছিল রহস্যময় সত্য। প্রতি পঞ্চাশ বছর!

উত্তর ককেশাসের বাকি অংশের কী অবস্থা? যদিও আদিজিয়া, আভারদের মতো ছোট মুসলিম জাতির ইতিহাস ও রাজনীতির সাথে চেচেনদের অনেক মিল আছে তবুও সেখানে কোনো সশস্ত্র, বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ হয়নি। ইঙ্গুশ, কারাচাই এবং বালকারবাসীদেরও একইভাবে গণহত্যামূলক নির্বাসিত করেছে স্ট্যালিন। এসব মানুষের কাহিনি রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে একেবারেই অজানা। আমি তাদের বর্তমানের সাথে অতীত ইতিহাসের তুলনা করতে চাই।

BanglaBook.org

তারাও কি নিজেদের ইতিহাসের চক্রে আবদ্ধ মনে করে, নাকি তাদের প্রজাতন্ত্র রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে? চেচনিয়া কি স্রেফ একটা বিপথগামী জাতি, একটা সাংঘাতিক ভুল?

দাগেস্তানের রাজধানী মাখাচকালার অবিশ্বাস্য জাতিগত মিশ্রণ থেকে কারাচাই-চেরকেশিয়ার পর্বতমালা, ইঙ্গুশেটিয়ার সুফিবাদী মুসলিম গোষ্ঠী এবং উত্তর ওসেটিয়ার বৃক্ষ দেবতা—সব জায়গায় চষে বেড়িয়েছি আমি। প্রথমদিকে আমার দৃষ্টি শুধু জাতিগত বৈচিত্র্য, অগুণতি উপজাতি, ভাষাগত শাখা-উপশাখা এবং অভ্যন্তরীণ সীমান্তের মধ্যে আটকে ছিল। তবুও যখন আমি একটা একটা করে টুকরো লুফে নিলাম, তখন একটা প্যাটার্ন পাওয়া গেল। উত্তর ককেশাস রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মতো নয়। বরং এটা ছিল একটা সাম্রাজ্যের ভারসাম্যহীন অবশিষ্টাংশ। নিশ্চিতভাবেই রাশিয়ান সম্রাটদের সময়কাল থেকে বর্তমান সময়ের চিত্র অনেক ভিন্ন। কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রগতিশীলতা কিছুমাত্র বদলায়নি। সর্বত্র ছোট ছোট জাতিগত দলসমূহ এখনো সাংস্কৃতিক লড়াই লড়ছে। এমনকি বেঁচে থাকার লড়াইও করছে তারা। আমার কাছে কেবল একটা শেষ প্রশ্নই ছিল : এই সংঘর্ষ কি কোনোকালে শেষ হবে? রাশিয়া আর উত্তর ককেশাস কি কখনো শান্তিপূর্ণ অবস্থানে আসবে?

আজ এখানে নব্যনির্মিত মসজিদসমূহের মিনারগুলো ছোট ছোট ছাদের উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। অথচ একসময় সোভিয়েতরা ভেবেছিল, তারা এখান থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রীষ্মের এই শান্ত সন্ধ্যায় মুয়াজ্জিনের বিষাদী সুর বিশ্বাসীদের নামাজের জন্য আহ্বান করে। খোদাই করা লাঠি হাতে শুভ্র দাড়িওয়ালা বৃদ্ধরা রাস্তায় নামে, পেছনে টুপি পরা বাচ্চাদের দল; এখন থেকেই ওরা বিশ্বাসের দীক্ষা নিচ্ছে। মসজিদের ভেতর নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা নামাজের স্থান। উজ্জ্বল পোশাক ও হিজাব পরিহিত মহিলারা সিজদায় পড়ে যায় জায়নামাজে। রাশিয়ান একটা শব্দও সেখানে উচ্চারিত হয় না। দাগেস্তান থেকে আদিজিয়া, কাবার্ডিনো, বালকারিয়া পর্যন্ত যেখানেই যাওয়া হোক না কেন, সর্বত্রই বিরাজ করে একই দৃশ্য। ম্যাপ আপনাকে বলবে, আপনি এখন রাশিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে আছেন কিন্তু এটা আসলে কাগুজে থিয়োরি। বাস্তবে আপনি রাশিয়াকে পেছনে ফেলেছেন অনেক আগেই এবং প্রবেশ করেছেন সুপ্রাচীন, দীর্ঘস্থায়ী ও ঘটনাবহুল 'আল্লাহ'স মাউন্টেন-এর জগতে।

BanglaBook.org

প্রথম পর্ব

গোলকধাঁধা

সে কেন বাড়ি ফেরার জন্য এতো কাতর? তার গ্রাম থেকে যে পাহাড় দেখা যায়,
সেটা তো দুর্গ থেকেও দেখা যায়—তবুও এই অসভ্যরা কেবল বাড়ি ফিরতে চায়!

'A Hero of Our Time'
মিখাইল লারমন্টভ।

অধ্যায় এক
মন্দ ভূমি

নুকোভো এয়ারপোর্ট, মস্কো

মস্কোর বাইরে অবস্থিত নুকোভো এয়ারপোর্টটি হচ্ছে উত্তর ককেশাসের প্রবেশদ্বার। গ্রোজনি, স্ট্যাভ্রোপোল, মাখাচকালা, ভ্লাদিকাভকায অঞ্চলের সমস্ত প্লেন এখান থেকে ছাড়ে। এয়ারপোর্টে মৌমাছির মতো বিক্রেতাদের আনাগোনা। প্যাসেঞ্জারদের সাথে আছে বিশাল বিশাল ব্যাগ। আরো আছে ভিক্ষুক, বেওয়ারিশ কুকুর ও ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। পুরুষ টয়লেটের দেয়ালে আঁকা চিত্রকর্মটিই সম্ভবত এয়ারপোর্টটিকে সুসজ্জিত করার একমাত্র প্রয়াস। স্ট্যান্ডআপের পাশে অংকিত চিত্রকর্মটি দেয়ালের অধিকাংশ অংশ জুড়ে আছে। পাহাড় আর আগ্নেয়গিরির পটভূমিতে গুটিকতক রাগান্বিত ডায়নোসরের ছবি, মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে ছোট একটি যাত্রীবাহী বিমান। প্যাসেঞ্জার উইন্ডোগুলো হলুদ রঙের। ছবিটি যেন বন্য পাহাড়ি জগতের এক ভঙ্গুর সভ্যতার প্রতিচ্ছবি। যেসব প্যাসেঞ্জাররা ককেশাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে, প্লেন ছাড়ার পূর্বে এটা কি তাদের জন্য এক প্রকার সতর্কবাণী?

চেচনিয়ায় আমি বেশ কয়েকবার সফর করেছি। সেই সুবাদে এয়ারপোর্টের গেটে দায়িত্বরত মহিলা আমাকে চেনে। প্রতিবারই আমাদের কথা হয়। এরাই প্রকৃত সোভিয়েত জাত, জীর্ণ বহির্গমন লাউঞ্জে বিদেশি নতুন যাত্রীরা পুরোদস্তর 'আতিথেয়তা' পায়। যেকোনো অনুরোধেই তারা বিরক্তি প্রকাশ করে, কেমন যেন অনুভূতিহীন। তবুও এসব মহিলাদের ভালো লাগে আমার। তাদের মাঝে মাতৃসুলভ আচরণ আছে। আমার গ্রোজনিতে যাওয়া নিয়ে তারা হইচই শুরু করে এবং 'আহা বেচারা(!)' বলে সহানুভূতি প্রকাশ করে। আমাকে তাদের

BanglaBook.org

টেলিফোন ব্যবহার করতে দেয়। আমি কখনো তাদের চকলেট বারের মতো কোনো ছোট্ট উপহার দিলে বড্ড খুশি হয়।

আমাদের কথাবার্তা রসিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সর্বোপরি আমরা কথা বলার সময় সযত্নে চেচনিয়ার আলোচনা এড়িয়ে চলি, তবুও আমার ছয় নাম্বার ট্রিপের সময় ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসল, চেচেনদের সম্পর্কে আমি কেমন ধারণা রাখি? একটা কথাও বলিনি আমি, বলতেও চাইনি আসলে। বলে কোনো লাভ নেই, যতোবার আমি মুখ খোলার চেষ্টা করেছি, আমার সোভিয়েত বন্ধুর মুখ থেকে গোলার মতো বিষবাক্য বিস্ফোরিত হচ্ছিল। যেন তারা দীর্ঘদিন চেচেনদের ওপর তাদের ক্ষোভ ঝাড়তে পারেনি, এবার সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করছে না।

সে বলল, 'তবে আমি একটা কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি, চেচেনরা অলস। ওরা শুধু চায় সম্মান, সুন্দর পোশাক, দামী গাড়ি আর গাদাগাদা বাচ্চা। চুরি আর ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই জানে না। চেচনিয়ার একমাত্র খেটে খাওয়া মানুষ হলো রাশিয়ানরা। চেচনিয়ার সব বসতবাড়ি রাশিয়ানদের হাতে গড়া। চেচেনরা শুধু চুরি করে। ওরা হলো টেরোরিস্ট, ওরা ক্রিমিনাল। চেচনিয়াতে সব মাফিয়াদের বসবাস। চেচেনদের মাঝে সহজ-সরল সাদাসিধে মানুষ একেবারে কম।

আমি সবসময় এয়ারপোর্ট দিয়ে ককেশীয় ক্রিমিনালদের আসা-যাওয়া করতে দেখি। ওরা কোনো কাজ করে না, তবুও ওরা আমাদের রাশিয়ানদের চাইতে বিলাসী জীবন কাটায়। এটা কীভাবে সম্ভব? আমরা কঠোর পরিশ্রম করি, আমরা রাশিয়ানরা। সারাজীবন আমরা খেটে খাই। আমরা কয়েক কোপেক (রুবলের একশ ভাগের এক ভাগ) মুদ্রা উপার্জনের জন্য কাজ করি, তা সত্ত্বেও আমাদের চেয়ে ককেশীয়দের লাইফস্টাইল ভালো। চেচেন, আর্মেনিয়ান, জর্জিয়ান ওরা সবাই একই রকম। সবকিছু আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়, আর নিজেরা কিছুই করে না। তুমি যদি দেখতে আগের দিনগুলোতে আমরা কীভাবে কমিউনিস্ট শাসিত রাশিয়ায় দিনাতিপাত করতাম! আমাদের শেলফে কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। কেন জানো? কারণ সব যেত ওই ককেশীয়দের পেটে।'

ভূপৃষ্ঠ থেকে উত্তর ককেশাস দেখতে রাশিয়ার অন্যান্য অ-জাতিগত অঞ্চলের মতোই, যেসব অঞ্চল রুশিকরণের মধ্য দিয়ে যুগের পর যুগ

BanglaBook.org

অতিবাহিত করেছে। প্রধান প্রধান শহরগুলো সব সোভিয়েতনির্মিত—প্রশস্ত, বৃক্ষঘেরা এভিনিউ, আঙ্গিনা বেষ্টিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ফ্ল্যাটের ব্লক, লেনিনের নামে নামকরণ করা জনমানবহীন চত্বর। প্রশাসনিক ভবনগুলো একেকটা দানবীয় আকৃতির। সেখানে রাশিয়ান ভাষাই হলো 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' (Lingua franca)[১]। স্কুল-কলেজসহ অন্যান্য সকল অফিসিয়াল স্থানে, জীবনযাত্রায় সোভিয়েতি ঠাঁটবাট ও ঘ্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু রুশিকরণ এখানেই শেষ; উত্তর ককেশাস গর্বের সাথে তার স্বকীয়তা বজায় রেখেছে।

অত্র অঞ্চলের মানচিত্রের গড়ন বড়ই উদ্ভট। উত্তর ককেশাসের ঢাল বেয়ে আছে সাতটি ছোট স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র : দাগেস্তান, চেচনিয়া, ইঙ্গুশেটিয়া, উত্তর ওসেটিয়া, কাবার্ডিনো-বালকারিয়া, কারাচাই-চেরকেশিয়া এবং আদিজিয়া। যদিও জর্জিয়ার অন্তর্গত দক্ষিণ ওসেটিয়া ও আবখাজিয়ার অবস্থান পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে, তবুও অঞ্চল দুটিকে উত্তর ককেশীয় জগতের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। অত্র অঞ্চলের ৫৩ লাখ মানুষের মাঝে ঠিক কতোগুলো গ্রুপ আছে তা কেউই বলতে পারে না। কেউ বলে ৪০টি, আবার কেউ বলে ১০০টি। শুধু দাগেস্তানের ১৮ লাখ মানুষের মাঝেই অফিসিয়ালি ৩৪টি ছোট জাতি আছে। তাদের এক জাতির কথ্য ভাষা অন্যদের কাছে বোধগম্য নয়। কিন্তু এসব তথ্য-উপাত্তও জটিলতার স্বরূপ বোঝাতে পুরোপুরি সক্ষম নয়। কারণ এক গ্রামে বসবাসকারীদের অনেক দলের মাঝে আছে আবার উপদল, তাদের মাঝে প্রচলিত আছে একাধিক উপভাষা। দাগেস্তানীয়দের সবচাইতে বড় গোষ্ঠী হচ্ছে আভার। তাদের জনসংখ্যা পাঁচ থেকে ছয় লাখ। কিন্তু তারাও মোট ১৪টি পৃথক শাখায় বিভক্ত, যাদের প্রত্যেকের আছে নিজস্ব নাম ও ভাষা।

কৃষ্ণ সাগর থেকে পূর্বে কাস্পিয়ান সাগরের দিকে গেলে করাতের মতো অনুভূত হয়। পূর্বদিকে আছে আদিজিয়া, কারাচাই-চেরকেশিয়া, কাবার্ডিনো-বালকারিয়া এবং উত্তর ওসেটিয়া। পূর্বাঞ্চল তুলনামূলক বেশি রুশ প্রভাবান্বিত। আদিজিয়ায় রুশদের অনুপাত সবচেয়ে বেশি- ৬৮%। ১৩০ বছর আগে রুশ আক্রমণের পর অধিকাংশ স্থানীয় লোকেরা আদিজিয়া ছেড়ে চলে যায়।

---

১. লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা (Lingua franca) : লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হলো ভিন্ন মাতৃভাষাবিশিষ্ট দু'জন মানুষের মধ্যে যোগাযোগের জন্যে ব্যবহৃত ভাষা। একে ব্রিজ ল্যাঙ্গুয়েজ বা সংযোগস্থাপনকারী ভাষাও বলা হয়। সাধারণত, দু'জন মানুষের মা   তৃভাষার চেয়ে ভিন্ন তৃতীয় একটি ভাষা 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। *-সম্পাদক*

BanglaBook.org

পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ রাশিয়ান। আরো পূর্বে ইঙ্গুশেটিয়া, চেচনিয়া এবং দাগেস্তানে উত্তর ককেশীয়দের আধিপত্য। এখানে দিনের পর দিন পার হয়ে যায় তবুও একজন রাশিয়ান চোখে পড়ে না। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের এ অঞ্চলেই বোধহয় মুসলিমদের সংখ্যা সবচাইতে বেশি।

কথিত আছে, আল্লাহ্ তাআলা যখন বিশ্বজগত সৃষ্টি করেন তখন সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন। কিন্তু তিনি এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতির সমাবেশ ঘটান। প্রাচীন পর্যটকরা যাকে বলে 'মাউন্টেন অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস'। প্লাইনি লিখেছেন, 'উত্তর ককেশাসে ব্যবসা করার জন্য প্রাচীন গ্রিকদের ৩০০ জন দোভাষীর প্রয়োজন হতো। পরবর্তী সময়ে আমরা রোমানরা ১৩০ জন দোভাষীর সহযোগিতায় সেখানে আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতাম।'

আজ এই পর্বতমালাই জীবন্ত ভাষা গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দাগেস্তানে এক গ্রামের ভাষা হয়তো আভার আবার পরের গ্রামের ভাষা দারঘিন, তারপরের গ্রামে লেযঘিন। এখানে তিনটি প্রধান ভাষা প্রচলিত : কারাচাই এবং বালকার টার্কিশ ভাষাগোষ্ঠীর; ইন্দো-ইউরোপিয়ানের মধ্যে রয়েছে ওসেটিয়ান, যা ফার্সি ভাষার সাথে সম্পর্কিত। আর আছে সত্যিকারের ককেশীয় আদিবাসীদের ভাষা। পৃথিবীর আর কোথাও যেই ককেশাস ভাষার অস্তিত্ব নেই, এখানে সেটাও দুটো শাখায় বিভক্ত। যেমন পূর্বাঞ্চলীয় চেচেন, ইঙ্গুশ ও কতিপয় দাগেস্তানি ভাষা এবং পশ্চিমস্থ আদিজিয়দের আদিজেই এবং বাকিদের চেরকেশ, কাবার্ডস ও আবখাজ উপভাষা।

মূল বিষয় হচ্ছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী রুশিকরণের মাধ্যমে এসব ভাষায় আমুল পরিবর্তন এসেছে। এক গ্রাম বা ছিটমহল থেকে ঘণ্টাখানেক সফর করলেই আগের গ্রামের ভাষাগুলো অচল হয়ে যায়। উত্তর ককেশীয়দের টিকে থাকার ব্যাকুলতা বোঝার জন্য এ ভাষা বৈচিত্র্যই যথেষ্ট। ১৯৮৯ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রত্যেক ক্ষুদ্র জাতি তাদের নিজ ভাষায় কথা বলে এবং অধিকাংশই মানুষই রুশ ভাষাকে ব্যবহার করে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে। এদের মধ্যে চেচেনরা নিজেদের ভাষার ব্যবহারে সবচেয়ে সৎ। চেচেনদের ৯৮ শতাংশ মানুষ কথা বলে নিজস্ব ভাষায়। ইঙ্গুশ, কাবার্ডিয়ান, আভার, আদিজেই, কারাচাই এবং অন্যান্যদের ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ অনর্গল কথা বলে নিজ

BanglaBook.org

ভাষায়। পাহাড়িদের মাঝে শুধু ওসেটিয়ানরাই খ্রিস্টান অধ্যুষিত। এ কারণেই রাশিয়ানদের আইনকানুনের সাথে তারা সহজে মানিয়ে নিতে পেরেছে। তবুও তাদের ৮৭ শতাংশ মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে ওসেটিয়ান ভাষায় কথা বলতে পারে। এসব পরিসংখ্যান দেখে হয়তো আশাব্যঞ্জক মনে হতে পারে তবে প্রকৃত সত্য হলো, অধিকাংশ উত্তর ককেশীয়রা কথা বলে তাদের নিজস্ব ভাষার বিকৃত রুশিকৃত রূপে। তা সত্ত্বেও ব্রিটেনের গ্যালিক ভাষার তুলনায় ককেশীয়দের পরিসংখ্যান অসাধারণ। দাগেস্তানবাসীরা সংখ্যায় মাত্র ২০,০০০ হলেও তারা এখনো তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে এবং পর্বতমালায় বসবাস করে, যা কোনো অলৌকিক ঘটনার চেয়ে কম নয়।

অতীতে জাতিসমূহকে ভাষা ও উপত্যকার সীমানার ওপর নির্ভর করে পৃথক করা হতো। যদিও তাদের সবার রক্তেই ছিল সংগ্রামী মনোভাব, লড়াই করার প্রবণতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সবাই একজোট হয়ে রাশিয়ান ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত। চামড়ার বুট, চেরকেসকা নামক গায়ে সেঁটে থাকা এক প্রকার দীর্ঘ জ্যাকেট এবং রোমশ ভেড়া বা লম্বা মেষশাবকের চামড়ার পাপাখা টুপি গোটা অঞ্চলজুড়েই দৃষ্টিগোচর হতো। সকল পুরুষের কাছে থাকত ভারী, ধারালো ছুরি 'কিনঝাল'। এগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল একটি ছোট তরবারি ও বড় খঞ্জরের মাঝামাঝি। সময়ের প্রবাহে এখানকার অধিকাংশ মানুষই এখন সুন্নি মুসলিম (দাগেস্তানের টাটস ও আজারিদের খুব অল্প সংখ্যক লোক শিয়া)। কেবল ওসেটিয়ানরাই মধ্য দারইয়ালের নিকটবর্তী পাহাড়ে বসবাস করে। তারা পালন করে খ্রিস্ট ধর্ম। অন্যভাবে বলা যায়, এতোগুলো জাতিকে আশ্রয় দেয়া পাহাড় পরিণত হয়েছে 'মেল্টিং পট'এ (বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরি পাত্রকে বলা হয়)। পাহাড়সমূহে বসবাসকারীদের রাশিয়ানরা বলে-গোর্টসি।

স্বয়ং এই পর্বতমালাই স্বায়ত্তশাসিত সাতটি রাজ্যকে গোর্টসি বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল দীর্ঘদিন। বর্তমানে অধিকাংশ জনগণ সমভূমিতে বসবাস করে। কেউ কৃষিকাজ করে আবার কেউ শহরে জীবিকা অন্বেষণে বের হয়। তবুও পাহাড়ের সাথে গোর্টসিদের একটা বন্ধন ঠিকই অনুভব করা যায়। একদল মেদবহুল মানুষ, যারা কখনোই অশ্বারোহণ বা পাহাড়ি কোনো গ্রামে গিয়ে থাকার কথা কল্পনা করতে পারে না তারাও পাহাড়ি অঞ্চলে তাদের আত্মীয়দের কথা গর্বভরে স্মরণ করে। এমনকি যেই আদিজিদের ১৯ শতকের পর রাশিয়ানরা

BanglaBook.org

পাহাড়ি অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করলে সমভূমিতে বসবাস শুরু করে, তারাও নিজেদের পাহাড়বাসী মনে করে। পরবর্তীতে তারা আর পাহাড়ে ফেরত যায়নি।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমতল ভূমির উচ্চতা গড়ে ৩৬০০ মিটার। ৫৬৪২ মিটার উঁচু মাউন্ট এলব্রুস শুধু ককেশাসের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ই নয় বরং এর উচ্চতা ইউরোপিয়ান আল্পসের সর্বোচ্চ পাহাড় মন্ট ব্লাংকের (৪৮১০ মিটার) চেয়েও বেশি। গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছোট ছোট টিলার সতেজতা, পাখিদের হট্টগোল ও পোকামাকড়ের শোঁ শোঁ শব্দে ভিন্ন এক অনুভূতি হয়। কোনো কোনো অংশে তখনো নেকড়ে, ভাল্লুক, বুনো শূকর, ঈগল, বাইসন ও বনবেড়ালের দেখা মেলে। একবার আদিজিয়ার এক খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠার পর আমি এক জোড়া বন্য ছাগলকে চমকে দিয়েছিলাম। বড়, সর্পিল শিং বিশিষ্ট কালো প্রাণিদুটো মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গিয়েছিল। দাগেস্তানের গাঢ় টিলাসমূহ বেয়ে উঠলে মনে হয়, এই বুঝি চাঁদে যাওয়ার পথ পেয়ে গিয়েছি! মনে হয় যেন কেবল বাতাসেরই প্রাণ আছে পাহাড়চূড়োয়। এমনকি এখানেও পাহাড় অন্তরে বিস্ময় জাগায়, মুগ্ধ করে। আবহাওয়ার পরিবর্তন পর্বতগাত্র বেষ্টিত প্রাচীরের মধ্য দিয়ে নিয়ে আসে উষ্ণ বাতাস। কেবল একটা নদীই কমনীয় ঝাউ গাছ ও ফলবাগিচাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট।

গোর্টসির সংস্কৃতি দেখে স্ববিরোধী মনে হয়। এখানকার মানুষের মাঝে এখনো চিরায়ত সম্মানবোধ টিকে আছে অথচ দস্যুবৃত্তিকেও বাহবা দেওয়া হয়। পরম আতিথেয়তাকে পবিত্র গণ্য করা হয় তবুও রক্তযুদ্ধ এড়িয়ে থাকা দায়। তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্বাধীনতা—প্রত্যেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি ও সকল উত্তর ককেশীয়দের জন্য। এখানে স্বাধীনতাকে মনে করা হয়, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার আর তা রক্ষা করার জন্য যেকোনো চরমপন্থা : খুন ও যুদ্ধ করতেও রাজি। অতীত হয়ে যাওয়া গণতন্ত্রের অস্তিত্বও এখানে শতাব্দী ধরে চলে আসছে। চেচেনরা নিজেদেরকে নেকড়ের মতো স্বাধীন ভাবতে পছন্দ করে। কোনো মনিবের হুকুমের দাস নয় তারা। কেবলমাত্র পরিবার ও গোত্রের প্রতি তাদের আনুগত্য।

পূর্বাঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত কিন্তু অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিবর্গ ও মোল্লারাই প্রায় সময় নেতা নির্বাচন করতেন। পশ্চিমের আদিজেই-সারকাসিয়ান গোত্রদ্বয়ে সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের অধীনে কঠোর শ্রেণিবিন্যাস ছিল তবে সেখানে ক্রীতদাসরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী মনিব পরিবর্তন করতে পারত

BanglaBook.org

এবং প্রায় সময়েই আরামে ও স্বাধীনভাবে চলাফেলা করত। উনবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ চলাকালে আদিজিয়ায় বসবাসরত ব্রিটিশ নাগরিক জেমস বেল থেকে জানা যায়, তখন ৩০টি ষাঁড় দিয়ে ক্রীতদাসরা তাদের স্বাধীনতা কিনে নিতে পারত। আর মনিবের মৃত্যু হলে তারা এমনিতেই স্বাধীন হয়ে যেত।

রাশিয়ানদের কাছে ককেশাস ছিল এক অনফ্যান্ট টেরিবল[২] (enfant terrible) সাম্রাজ্য। এলাকাটির সৌন্দর্য নজরকাড়া হলেও এলাকাবাসী ছিল সন্দেহভাজন। বিদেশাতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তি ও মস্কোর কুখ্যাত পুলিশ বাহিনির কাছে ককেশীয় মানেই হলো কালো চুল ও কালো চোখ; এ জাতির আর সমস্ত বৈচিত্র্য তারা নিমেষেই ভুলে যেত। অধিকাংশ রাশিয়ানের কাছে সমস্ত ককেশীয় মানেই ছদ্মবেশী 'কৃষ্ণাঙ্গ'। এর চেয়েও ভয়ানক বর্ণবাদী লেবেল হলো 'ককেশীয় বৈশিষ্ট্য।'

মস্কোতে সাধারণত অধিকাংশ ককেশীয় ফল বিক্রেতা। গাদাগাদা সবুজ, হলুদ ও লাল ফলের পেছনে বসে থাকে এরা। হরেক রকমের ফল হচ্ছে তাদের উচ্ছল শ্যামলিমা মাতৃভূমির উপহার। সবসময়ই এই 'ছদ্মবেশী'রা তাদের প্রতিযোগীদের চেয়ে এগিয়ে থাকে। কারণ তাদের দোকান সংখ্যা বেশি, ফলের ভ্যারাইটি বেশি এবং দামও কম। যার ফলে রাশিয়ানদের মাঝে অসন্তোষ দেখা যায়। ককেশীয় ব্যবসায়ীদের আর্থিক সমৃদ্ধি কমিউনিস্টদের অন্তরে গভীর সন্দেহের উদ্রেক করে, কমিউনিস্টদের মনে জল্পনাকল্পনা ও অর্থনৈতিক নাশকতা সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনার ইন্ধন যোগায়। মস্কোতে বিএমডব্লিউ আর মার্সিডিজে করে চষে বেড়ায় ককেশীয় ব্যবসায়ীরা। তাদের গোমড়া মুখ আর ধনসম্পদের প্রাচুর্য মস্কোবাসীদের জন্য সব রকম ভয়ের আভাস দিয়ে যায়। অবশ্য রাশিয়ানদের মাঝেও সোনার চেইন, কালো শার্ট, আকর্ষণীয় মেয়ে ও জার্মান গাড়িওয়ালা ব্যবসায়ী আছে। তবে কেবল ককেশীয়দেরই ভয়ের চোখে দেখা হয়। মানচিত্র যাই বলুক না কেন, রাশিয়ানদের দৃষ্টিতে ওরা সবসময়ই ভিনদেশি এলিয়েন বিশেষ। বর্ণবাদ দুই দলেই আছে। ককেশীয়রা হয়ত বিশ্বাসঘাতক, চোর। কিন্তু রাশিয়ানরা সব ভীতু আর বর্বর। একবার এক চেচেন বলছিল, 'রাশিয়ানরা কী? জিপসির চাইতে উন্নত কিছু তো নয়। নিজেদের বলতে কিছুই নেই। সবই তো অন্যদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। পুশকিন ছিল

২. অর্থাৎ, রাশিয়ানদের কাছে ককেশাস ছিল প্রথাবিরোধী, অদ্ভুত কিসিমের এক সাম্রাজ্য। *-সম্পাদক*

BanglaBook.org

আফ্রিকার, লারমন্টভ স্কটিশ আর শাসকশ্রেণির সবাই তো ফ্রেঞ্চে কথা বলত।'

উত্তর ককেশাসের টেলিভিশন নিউজে লাগাতার মানুষ জিম্মি, বোমা বিস্ফোরণ ও ধারণাতীত জাতিগত বৈষম্যের চিত্রের বাইরে যে গ্রহণযোগ্য ব্যাপারটি রাশিয়ানদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছায় তা হলো ককেশীয় লোকাচার। মাঝেমধ্যে বিভিন্ন টিভি শোতে পশমের হ্যাট, চেরকেস্ক ও কিনঝাল পরিহিত শিশুশিল্পীদের অভিনয় দেখা যায়। টিভিতে প্রতিবছর সম্প্রচারিত হয় সবার প্রিয় সোভিয়েত স্ল্যাপস্টিক কমেডি ফিল্ম 'ককেশিয়ান প্রিজনার'; সেখানে বাহারি পোশাক ও পাগলাটে ভঙ্গিতে ককেশীয়দের স্ত্রী হরণ ও আতিথেয়তার হাস্যকর রূপ দেওয়া হয়। উত্তর ককেশীয়দের সাথে রুশদের দ্বন্দ্ব নিয়ে নির্মিত অন্যতম সিরিয়াস সিনেমা বানানোর প্রচেষ্টা হলো 'ককেশিয়ান প্রিজনার' নামের আরেকটি ছবি। তলস্তয়ের গল্পের ছায়া অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত। এতে পাহাড়িদের জীবনযাত্রার ধাঁধা ফুটিয়ে তোলা হয়। দাগেস্তানের পর্বতমালার নয়নাভিরাম দৃশ্যে শুটিং করা হলেও 'ককেশিয়ান প্রিজনার' সেই পুরনো দস্যুবৃত্তি ও লোক কাহিনির বৃত্ত থেকে বেরোতে পারেনি। সিনেমাটি ১৯৯৭ সালে অস্কারের নমিনেশন পেয়েছিল। সিনেমাকে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করার জন্য লোকাল ভাষা ব্যবহার করা হয়, সাথে সাবটাইটেল হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয় রাশিয়ান ভাষা। অথচ দাগেস্তানিদের ভূমিকায় অভিনয় করে একদল জর্জিয়ান অভিনেতা। তবে খুব কম রাশিয়ান দর্শকই ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। ওদের কাছে তো অভিনেতারা স্রেফ কোনো বিদেশি ভাষায় কথা বলছিল।

রাশিয়ান ও ককেশীয়দের ঘৃণামিশ্রিত সম্পর্কে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে হতবুদ্ধিকর দীর্ঘ এক ভালোবাসার গল্প। উনবিংশ শতাব্দীতে রুশ সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডার তার সেনাবাহিনির বিরুদ্ধে চেচেনদের লড়াইয়ের স্পৃহা দেখে এতোটাই মুগ্ধ হন যে, তিনি তাদের বিজিত নেতা ইমাম শামিলকে তার নিজ বাসভবনে যথাযথ সম্মান ও আরামের সাথে বন্দী জীবন কাটানোর সুযোগ দেন। পরবর্তীতে শামিলের এক ছেলে রুশ প্রতিরক্ষা বাহিনির জেনারেল হয়। চেচনিয়ার বর্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা যোখার দুদায়েভ ইতোপূর্বে ছিলেন সোভিয়েত এয়ারফোর্সের একজন বিশ্বস্ত জেনারেল, পারমাণবিক বোমা ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার। আরেকজন চেচেন, রুসলান খাসবুলাতভ রাশিয়ান পার্লামেন্টের স্পিকার পদে নিযুক্ত হন। এমনকি স্বৈরাচারী স্ট্যালিনও ছিলেন জর্জিয়ান, অর্থাৎ একজন ককেশীয়।

BanglaBook.org

উনবিংশ শতাব্দীর মহান কবি ও লেখক লারমন্টভ, তলস্তয় এবং পুশকিন ককেশাসের পর্বতমালার বর্ণময়তা ও উদ্দাম গোত্রসমূহ দেখে অভিভূত হন। লারমন্টভের বয়স যখন ১০ বছর তখন ককেশীয়রা ছিল তার কাছে 'পবিত্র'। ১৮৪১ সালে, মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি একটি দ্বৈত লড়াইয়ে তার প্রিয় পর্বতমালার সন্নিকটস্থ পায়াগোরস্কে নিহত হন। 'A Hero of Our Time'র লেখক লারমন্টভের মতো একজন বিদ্রোহীর কাছে উত্তর ককেশীয়বাসী এবং তাদের রাশিয়া বিরোধি মনোভাব ছিল সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। তার কিছু কিছু রচনা, কবিতার পঙক্তিকে ন শকতামূলক মনে করা হয়।

বিদায়! ইতর রাশিয়া,
ক্রীতদাসের ভূমি, মনিবের দেশ,
এবং তোমাদের নীল পোশাক,
ও নাশকতাকারী দল।
হয়তো ককেশীয় চূড়ার বহুদূরে
আমি পাব শান্তির দেখা,
রুশ সম্রাটের চোখ-কান থেকে
হবে আমার শেষ রক্ষা।

লিও তলস্তয় পাহাড় ও পাহাড়বাসীদের দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তার 'দ্য কোসাকস' গল্পের চরিত্র, মস্কোর অধিবাসী ওলেনিন সারারাত ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে রাশিয়া থেকে চেচনিয়া আসে। এরপর ঘুম থেকে উঠে প্রথমবারের মতো ককেশাস দেখে মোহাবিষ্ট হয়ে যায়।

সেই সময়ও রাশিয়ানদের চোখে উত্তর ককেশীয়রা ছিল খুব বেশি হলে উচ্চবংশীয় বর্বর না-হয় দস্যু বা ডাকাত। ককেশাস এসব লেখকের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কাজের অনুপ্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তারা ছিল শাসকশ্রেণির চাকর, নতুন দেশের কর সংগ্রাহক। তারা এক হাতে কলম ধরত, আরেক হাতে তরবারি। যেসব লোকদের তারা শ্রদ্ধার চোখে দেখত তাদেরকেই তরবারি দিয়ে দমন করত। 'দ্য ডিসপিউট' কবিতায় লারমন্টভ ভবিষৎবাণী করেছেন, রাশিয়ার জয় এবং পাহাড়বাসীর পরাধীনতা অনিবার্য। রাশিয়ান সেনাবাহিনি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'ভয়াবহ, পূর্বদিকে সমবেত ঝড়ো মেঘের মতো

BanglaBook.org

তারা ধেয়ে আসছে'।

তলস্তয় ঔপনিবেশিক মিশনে বিশ্বাস করতেন। এমনকি ১৮৫১ সালের মিলিটারি অপারেশনে তিনি স্বেচ্ছায় অংশ নেন। পুশকিনও ছিলেন সেনাদলের সদস্য। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে জেনারেল ইয়ারমোলভের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'হে ককেশাসবাসী, বিনীত হও। কেননা ইয়ারমোলভ আসছেন।'

পাহাড়িদের সাথে বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি রুশ সরকারের পলিসিতেও দেখা যায়। পরিষ্কারভাবেই এতে হিতে বিপরীত হয়েছে। এসব অসংগতির চূড়া হলো—সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহ। সোভিয়েত সরকারের সর্বগ্রাসী স্বভাব অনুযায়ী মস্কো হয়তো উত্তর ককেশাসকে রাশিয়ান সুপারপাওয়ারের একটা অংশ হিসেবেই ঘোষণা করতে পারত। কিন্তু কমিউনিস্টরা তা না করে প্রত্যেক জাতিকে তাদের স্বতন্ত্র সরকার, প্রতীক, সীমান্ত ও রাজধানী রাখার সুবিধা দিয়েছে। এসব দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, প্রোপাগান্ডাকারীরা সবসময় যা বলত সেটাই সঠিক। অর্থাৎ, সাধারণভাবে সোভিয়েত পলিসি ও রাশিয়ান শাসনব্যবস্থা উদারমনা, তাই রাশিয়া সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েতরা ককেশাসে সাম্রাজ্য আইন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, যার পরবর্তী ফলাফল এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

এটা সত্য যে, মস্কো ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বতন্ত্র জাতিগত মর্যাদা ও ইতিহাস রচনার সুযোগ দিয়ে মহানুভবতা প্রদর্শন করেছে। কিন্তু এই মহানুভবতা কখনোই প্রতীকী অর্থের বেশি কিছু ছিল না। ছদ্মবেশ পরানোর জন্য যতোটুকু দরকার ছিল ঠিক ততটুকুই মহানুভবতা দেখাত তারা। কমিনিউস্ট পার্টি সবকিছু শোষণ করত, নন-রাশিয়ানদের ওপর কখনোই ১০০% আস্থা রাখা হতো না। উদাহরণস্বরূপ, সোভিয়েতরা সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে একটা অভিজাত শ্রেণি তৈরি করেছিল। এটা ছিল দাসত্বমূলক আধিপত্যবাদের ব্যতিক্রম। কিন্তু এটাই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। হ্যাঁ, যোখার দুদায়েভ সোভিয়েত জেনারেল হয়েছিলেন। তবে তিনিই ছিলেন প্রথম।

রাজ্যগুলোর নিজস্ব কোনো শাসন ব্যবস্থা ছিল না। একই সাথে তাদেরকে অর্ধ-বিদেশি গোষ্ঠী বিবেচনা করা হতো। অন্যভাবে বললে, তারা ছিল রুশ সম্রাটদের অধীনস্ত অধিকৃত অঞ্চলসমূহের অধিবাসী যাদেরকে সরাসরি মস্কো

BanglaBook.org

থেকে উপনিবেশ হিসেবে শাসন করা হতো। অঞ্চলসমূহকে গিলে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু হজম করা যায়নি। এই ক্ষুদ্র জাতিসমূহ পরস্পর একজোট হতে বাধ্য হয়েছিল এবং এরই ফলশ্রুতিতে তারা তাদের পরিচয় ও ভাষাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সংরক্ষণ করতে পেরেছে। এ কারণেই আজ এই স্বশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলোর অবস্থাকে বাহ্যিকভাবে রাশিয়ার উদার মনোভাব বলে দৃশ্যত হয়। এ ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায় হচ্ছে, ১৯৯১ সালে সোভিয়েতের পতন ঘটলেও মস্কোর সাথে আঞ্চলিকদের হিমশীতল সম্পর্ক বহাল ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর চেয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যার মাত্রা ছিল আরো অনেক বেশি। সেখানে কোনো গণতন্ত্রীকরণ ছিল না, জাতিগুলোকে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত করার কোনো পদক্ষেপ ছিল না। অতীতের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিরোধ ও দমন পীড়নকারী কমিউনিস্ট চক্র সুপ্ত কিন্তু একজোট হয়ে ছিল। তারা অপেক্ষা করছিল আরেকটি রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় দুই
বিদ্রোহী

হোটেল নার্ট নালচিকে অবস্থিত। নালচিক হলো কাবার্ডিনো-বালকারিয়ার রাজধানী; সোভিয়েতের অন্যতম আধুনিকতার স্বপ্ন যা শেষমেশ হাস্যরসে পরিণত হয়। বিশাল ট্যুরিজম প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। নার্ট মানেই হলো সেন্ট্রাল পার্ক ছাড়িয়ে ঝকঝকে-তকতকে কাচ ও কনক্রিটের দালান। আপনি এখানে এলে স্পষ্টই এর পরিকল্পনাকারীদের চিন্তাভাবনা শুনতে পাবেন, 'এটা পুরোপুরি পশ্চিমাদের মতো হবে।' কিন্তু গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা নীতির এক দশক পেরিয়ে গেলেও এখন হোটেল নার্ট পার করছে খুব খারাপ সময়। আর উন্নতির কোনো চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। কৃত্রিম কাঠ নির্মিত আবদ্ধ, জীর্ণ ওয়াল টু ওয়াল কার্পেটিং করা টেলিভিশনে সাজানো রুমগুলো ফাঁকা পড়ে আছে। কয়েক তলা তো এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যেন তাদের করুণ মৃত্যু হয়েছে। কমরেডদের উদরপূর্তির জন্য নির্মিত বেজমেন্টের বিশাল রেস্টুরেন্টের গলায় ঝুলছে তালা। হলরুমের সবগুলো লাইট ঠিকঠাক কাজ করে না। শূন্যতা রিসিপশনিস্টদের মনে ভয় ধরায়। তবুও আমি হোটেল নার্টে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিই কারণ- বাকি হোটেলগুলোর অবস্থাও না খুব একটা ভালো ছিল, আর না সেসব হোটেল ছিল তেলাপোকা মুক্ত। তবে একটি সহজাত কারণেও নার্ট আমাকে টানছিল। আমি মিথোলজিকাল দানব নার্টদের খোঁজ করছিলাম। যারা একসময় উত্তর ককেশাসে বিদ্রোহী, মহানায়ক এবং দস্যু বেশে চষে বেড়াত।

নার্ট ছাড়াও ককেশাস মিথ ও পৌরাণিক কাহিনিতে ভরপুর। কথিত আছে, গার্ডেন অব ইডেন ছিল আবখাজিয়ায় আর নূহ আলাইহিস সালাম-

BanglaBook.org

এর নৌকা মাউন্ট এলব্রুসে অবতরণ করেছিল।[৩] গ্রিক কল্পকাহিনি মতে, প্রাচীন গ্রিক দেবতা প্রমিথিউস প্রভুর কাছ থেকে আগুন চুরি করার পর তাকে ককেশাসের এলব্রুস বা কাযবেকে শেকল বন্দী করে রাখা হয় আর স্বর্ণনির্মিত ভেড়ার লোমের খোঁজে জেসন অবতরণ করে জর্জিয়ার উপকূলে। তবে নার্টরা স্বতন্ত্রভাবে ছিল ককেশীয় উপকথা। শুরুতে নার্টরা ছিল উত্তর ককেশীয়, গ্রিক পুরাকথার টাইটানদের ঘনিষ্ঠ পরিজন। নার্টদের উৎপত্তিস্থল অস্পষ্ট তবে বর্তমানে প্রত্যেক জাতিই নিজেদের নার্ট দাবি করে। সে হিসেবে তারা একই বংশের, তাদের পূর্বপুরুষরাও একই। নার্টরা বড় বড় মহাকাব্য, দোকানপাট আর নালচিক হোটেলের নামের মাঝে আজও বেঁচে আছে।

এক চক্ষুবিশিষ্ট এক নার্ট ছিল। চেচেন ও দাগেস্তানি পুরাকথায় যাকে 'সূর্য চোখ' বলা হতো। ওসেটিয়ান এক নার্ট ছিল যে বাস করত পানির নিচে অবস্থিত এক প্রাসাদে। আরেক নার্ট ছিল যে দুই পাহাড়চূড়ার রহস্য উদঘাটন করতে মাউন্ট এলব্রুসের আরোহণ করেছিল। কিছু নার্ট ছিল যারা সম্মান নিয়ে এসেছিল আবার কিছু নার্ট ছিল যারা ডেকে এনেছিল ধ্বংস। আদিজিয়ার অন্যতম সুপরিচিত পুরাকথায় রয়েছে, প্রভু এক দানবকে বিদ্রোহ করার দরুণ পাহাড়ের সাথে বেঁধে রাখে। একটা কুকুর, অন্য বর্ণনা মতে একটা নেকড়ের দল সেই দানবকে পাহারা দিত। প্রত্যেক বার সেই কুকুর যখন শেকল কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করত তখন আপনাআপনিই শেকল জোড়া লেগে আগের চাইতেও মোটা হয়ে যেত। আরেকটা গল্পে আছে, আদিজেই নার্টকে শেকলাবদ্ধ করে পাখি দ্বারা ঠোকরানোর শাস্তি দেয়া হয়েছিল। এখানেই নার্ট পুরাকথা ও গ্রিক মিথোলজির মধ্যে মিল। অনন্তকালের জন্য পাখির ঠোকরানোর মাধ্যমে প্রমিথিউসের কলিজা বের করে নেওয়ার গল্প উভয় মিথেই আছে। বিজ্ঞরা আজ তর্ক করে কোনটা আগে ঘটেছিল তা নিয়ে। এমনকি তারা এটাও বলে যে, আগের দিনের গ্রিকরা হয়তো উত্তর ককেশাস থেকেই বালকানে সফর করে।

নার্টদের শাস্তিপ্রদানের অন্য এক বর্ণনায় আছে, শেকলাবদ্ধ এক নার্ট ক্রোধে চিৎকার করে উঠলে শুরু হয় শিলাবৃষ্টি ও ঝড়। সে শেকলে আঘাত করলে বজ্রপাত তীরবেগে ছুটে আসে। ওদিকে বড় বড় পাথর পাহাড়ের পাশ

৩. নূহ আলাইহিস সালাম-এর নৌকা মাউন্ট এলব্রুসে অবতরণ করেছিল মতে কোনো বর্ণনা কুরআন-হাদিসে নেই। কুরআনে এসেছে যে, নবী নূহ আলাইহিস সালাম-এর নৌকা জুদি পাহাড়ে নোঙর করে। *-সম্পাদক*

BanglaBook.org

দিয়ে ভেঙে পড়ে। এলাকাবাসীও ভয় পেয়ে যায়, না জানি তাদের ওপর প্রভুর আযাব নেমে আসে। তাই তারা আর্তি জানায় যেন সেই নার্টকে মুক্ত না করা হয়। তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এই পুরাকথা থেকেই হয়ত 'আব্রেগ'এর জন্ম। আব্রেগ হলো ককেশীয় পাহাড়ে নির্বাসিত ডাকু, যাদের একই সঙ্গে ভয় এবং শ্রদ্ধা করা হতো।

যেসব মানুষ কোনো কারণে গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ে যেত তারা 'আব্রেগ' নামে পরিচিত। তারা বিপজ্জনক, হিংস্র, অনিষ্ট সৃষ্টিকারী হলেও সত্যিকারের আব্রেগদের শ্রদ্ধা করা হতো, নায়ক মনে করা হতো। হ্যাঁ, আব্রেগরা রক্তপিপাসু কিন্তু তারা দুর্দান্ত সাহসী। যদিও অধিকাংশ আব্রেগই ক্রিমিনাল তবে কোনো কোনো আব্রেগ নিজের বা পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে হত্যা করে এবং প্রতিশোধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য পালিয়ে যায়। রাশিয়ানরা আক্রমণ করলে অনেক বিদ্রোহী আব্রেগ পার্বত্য উপত্যকা ও জঙ্গল থেকে একাকী লড়াই চালিয়ে যায়। এর ফলেই তারা নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর আইডল ও স্বাধীনতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এরা দুর্ধর্ষ স্বভাবের হতে পারে, আবার প্রয়োজনে রবিনহুডের মতো হিরো বা জনগণের রক্ষকও হতে পারে। এরাই 'সম্মানিত ডাকাত' নামে পরিচিত!

জেলিম খান হলেন আব্রেগদের মাঝে সর্বাধিক বিখ্যাত, যিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চেচনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। বর্তমানে সার্জেন ইয়ার্টের বাইরে বুলেটের গুলি খোদাইকৃত তার একটি ভাস্কর্য আছে, সাথে আছে তার ঘোড়ার প্রতিকৃতি। ১৯৯৫ সালে রাশিয়ান কামান ও প্লেনের বোমাবর্ষণে ককেশাস পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত গ্রামটি ধুলোর সাথে মিশে যায়। স্থানীয় এক ঐতিহাসিক দাখা গাইসুলতান আমাকে বলেন, রাশিয়া কর্তৃক নিযুক্ত গ্রামসর্দারের সাথে একটি মেয়েকে ঘিরে জেলিম খানের ঝগড়া-বিবাদের সূচনা, পরবর্তীতে যা রক্তযুদ্ধে পরিণত হয়। এভাবেই জেলিম খানের আব্রেগ হিসেবে গড়ে ওঠার গল্প শুরু।

রাশিয়ানরা জেলিম খান ও তার পিতাকে গ্রেফতার করে গ্রোজনিতে নিয়ে যায়। বাকিরা যায় পালিয়ে। জেলিম খান কারাগার খনন করে পালাতে সক্ষম হন। এরপর থেকেই তিনি পাহাড়ে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন একজন আব্রেগ। তখন ছিল ১৯০১ সাল। প্রত্যেকেই তাকে চিনত। তিনি তার বন্ধুদের সাথে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থাকতে পারতেন। সবাই তাকে আশ্রয় দিত এবং তার দেখভাল করত। তিনি আক্রমণকারী রুশ সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই

BanglaBook.org

শুরু করেন। জেলিম খানের লোকবলের প্রয়োজন হলে তাকে সাহায্য করার মানুষের অভাব হতো না।

একদিন তিনি কিযলিয়ারে অবস্থিত রাশিয়ান দুর্গে এক কর্নেলের কাছে একটা চিরকুট প্রেরণ করে বলেন :

নারীদের মতো লুকিয়ে না থেকে আমার সাথে কিযলিয়ারে দেখা করো।

রাশিয়ানরা হেসে বলেছিল 'সে কীভাবে কিযলিয়ারের মতো একটা দুর্গে প্রবেশ করবে?'

জবাবে জেলিম খান ষাট জন লোক নিয়ে কোসাকের মতো পোশাক পরে সরাসরি কিযলিয়ারে ঢুকে ব্যাংক লুট করে। ব্যাংক থেকে বের হওয়ার পূর্বে জেলিম খান কর্নেলকে একটা নোট দিয়ে যায়। তাতে লেখা ছিল :

আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। কোথায় ছিলে তুমি?

এটা ১৯০৭ সালের কথা। তিনি পাহাড়ে ফিরে এসে জনসাধারণের মাঝে সমস্ত টাকা বিলিয়ে দেন। এর মধ্যে কিছু ইয়াতীমও ছিল। তার বয়স যখন চল্লিশের ঘরে তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার আত্মীয়দের দেখতে শালিতে গমন করেন। সেখানেই তার মাতৃসম্পর্কীয় এক আত্মীয় তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে টাকার বিনিময়ে শত্রুদের হাতে তাকে তুলে দেয়। অতঃপর শত্রুদের সাথে লড়াইরত অবস্থায় তিনি নিহত হন।

জেলিম খান ছিলেন একজন ক্ল্যাসিক মানুষ : অ্যান্টি-রাশিয়ান, সুদর্শন, দৃশ্যত অপরাজেয় এবং পরিশেষে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করা। তবে 'আবেগ'-কে সংজ্ঞায়িত করা সবসময় এতো সহজ নয়। আপনি বন্দুকের কোন পার্শ্বে আছেন, সম্ভবত তার ওপর নির্ভর করে আবেগ-কে সংজ্ঞায়িত করার সহজতা বা কাঠিন্য।

A Hero of Our Time বইয়ে লারমন্টভ বলেন, 'ককেশীয়দের (উত্তর ককেশীয়) রক্তের সাথে মিশে আছে চুরি করার প্রবণতা। সুযোগ পেলে তারা যা পায় তা-ই চুরি করে। এমনকি তাদের যেসব জিনিসের প্রয়োজন নেই তারা সেসবও চুরি করে।'

BanglaBook.org

এটা সত্য যে, উনিশ শতকে উত্তর ককেশাসে চুরির প্রকোপ ছিল। তবে এটা কোনো ছোটখাটো, সাধারণ চুরি না। এটা ছিল 'নাবেগ'। নাবেগ হচ্ছে অতর্কিতে আক্রমণ ও লুণ্ঠন। উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় রাশিয়ান বা প্রতিপক্ষ জাতিগোষ্ঠীর গ্রামে হামলা চালিয়ে গৃহপালিত পশু ও মানুষকে বন্দী করা হতো। এতে কেবল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রই পাওয়া যেত না বরং ব্যক্তিগত স্টকও বাড়ত। যেসব পরিবারের লোকেরা আক্রমণের সময় সাহসী ভূমিকা পালন করত এবং তোপের মুখ থেকে ঘোড়া, ভেড়া ও অন্যান্য সম্পদ সফলভাবে রক্ষা করতে পারত, সেই পরিবারকে সম্মান করা হতো। যেসব পরিবারে লড়াই করার মতো কোনো মানুষ ছিল না, তাদেরকে মনে করা হতো আত্মসম্মানহীন ও অরক্ষিত।

নার্ট ও একাকী নেকড়ের মতো উত্তর ককেশীয় বিদ্রোহীদের পুরাকথা ও সত্য কাহিনি তাদের নিজেদের মধ্যেই হারিয়ে যায়। শেষ সোভিয়েত বিরোধী চেচেন আব্রেগ ১৯৭৬ সালে মারা যায়। কথিত আছে, তিনি এক পাহাড়ে কয়েক দশক ধরে বাস করার পর একদিন পাহাড় থেকে নেমে আসেন এবং কোমসোমলস্কো গ্রামের কবরস্থানে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সে সময় তার বয়স সত্তরের ঘরে ছিল। তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, অসুস্থ। ওজন ছিল মাত্র আটত্রিশ কেজি। লোকেরা তাকে চিনতে পারলে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করে। সোভিয়েতরা এসে তাকে ঘিরে ফেলে এবং গুলি করে মেরে ফেলে। তবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে তিনিও কয়েকজন ঘৃণ্য কেজিবি কর্মকর্তা ও অন্যান্য সৈন্যদের হত্যা করতে সমর্থ হন। তলস্তয়ের 'দ্য কোসাক' বইয়ের নয় জন আব্রেগকে রাশিয়ান সেনারা যখন ঘিরে ফেলে, তখন তারাও এভাবেই আমৃত্যু লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয়।

'পালিয়ে যাওয়ার প্রলোভনকে এড়ানোর জন্য তারা সবাই জড় হয়েছিল। তাদের বন্দুক ছিল গুলি করার জন্য প্রস্তুত এবং তারা গাইছিল মৃত্যুর গান।'

তবে চেচনিয়ায় আব্রেগদের বিলুপ্ত হতে ঢের দেরি আছে। চেচনিয়া এমন একটি স্থান, ১৯৯০ এর দশকের প্রারম্ভে যেখানে দস্যুদের জন্য বিশৃঙ্খলা তুঙ্গে পৌঁছেছিল। তাদের একজন আলাউদি খামযাতভ। সে ছিল সুদর্শন, চতুর। ১৯৯৪ সালে যুদ্ধের শুরুর দিকে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে আরগুন শহরের প্রতিরক্ষার জন্য সে অস্ত্র ক্রয় করে। বাকি সব আব্রেগদের মতোই আলাউদি লড়াই করে জীবন অতিবাহিত করেছে এবং মারাও গিয়েছে এক রক্তযুদ্ধে। সেই

BanglaBook.org

রক্তযুদ্ধের শুরু হয়েছিল তার পিতার হত্যাকে কেন্দ্র করে।

রুসলান লাবাযানভ ছিল আরেকজন চেচেন যাকে আব্রেগ বলে বিবেচনা করা হতো। তার সাথে থাকত তার প্রাইভেট আর্মি। বি.এম.ডব্লিউ আর জাপানি জীপ গাড়িতে করে ঘুরে বেড়াত তারা। ১৯৯১ সালে যোখার দুদায়েভ চেচনিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তার সাথে লাবাযানভের সম্পর্কচ্ছেদ হয়। পরবর্তীতে লাবাযানভ রাশিয়ার সাথে হাত মেলায়। তার সম্পর্কে ন্যাক্কারজনক সত্য হলো- সে প্রকৃত আব্রেগ ছিল না বরং আব্রেগের ভূমিকায় অভিনয় করত। এমনকি উত্তর চেচনিয়ার তলস্তয় ইয়ার্টের দরিদ্র শ্রেণির মাঝে তার অর্থ বিতরণ করাও ছিল একটা নাটক। তার ঘরের আকৃতি ছিল একটি ছোটখাট প্রাসাদের মতো। সাথে ছিল একটি কনক্রিট টাওয়ার ও প্রতিরক্ষা প্রাচীর। ওখানে তার বিশ্বস্ত বডিগার্ডরা মেশিনগান হাতে পাহারা দিত। ১৯৯৫ সালে যখন আমাদের দেখা হয় তখন লাবাযানভের হাতে বড় বড় সোনার আংটি ও ব্রেসলেট। ডেস্কে দুটো পিস্তল, একটা কিনঝাল, একটা অটোমেটিক রাইফেল, একটা উযি সাব-মেশিনগান এবং একটা মেশিনগান রাখত। এছাড়াও তার ছিল হাই-ফাই গানবাজনা ও ভিডিও প্লেয়ারে ভরপুর একটি রুম, সাদা মেকআপে ভরপুর লিকলিকে দেহের অধিকারী স্ত্রী। এমনকি সমগ্র চেচনিয়ার মধ্যে কেবলমাত্র তার বাসায়ই এয়ার কন্ডিশনিং সুবিধা ছিল। আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে চেচনিয়ার কোন দল সমর্থন করে, সে জবাব দিল, 'দরিদ্রদের দলই আমার দল।'

মুক্তিযোদ্ধারা তাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করত। তলস্তয় ইয়ার্টে নিজ প্রাসাদে ১৯৯৬ সালে তাকে হত্যা করা হয়। তার নিজের লোকই তাকে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে।

নাবেগ থেকে ককেশীয়রা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার শুকরিয়া আদায় করতেই হয়। নাবেগ'র কারণেই উত্তর ককেশীয়রা ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর ও ক্ষিপ্র অশ্বারোহী বাহিনি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

শুধু নাবেগ-ই নয়, উত্তর ককেশাসে সবসময়ই একটি সামরিক সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল। বলশেভিক বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেকেই তাদের বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র রাখত। ছোটবেলা থেকেই ছেলেদের অস্ত্র চালনা শেখানো হতো। তারা অস্ত্রকে ভালোবাসত। উত্তর ককেশীয় লোকেরা অস্ত্র ছাড়া কোথাও যেত না। তাদের সর্বশেষ আকর্ষণ ছিল 'কিনঝাল'। কিনঝালের সম্মানে কবিতাও লেখা

BanglaBook.org

হতো। আজও তাদের পুরনো আবেগ টিকে আছে, যদিও তা সুপ্তাবস্থায়।

দাগেস্তানের পাহাড়ের উঁচুতে, গুনিব শহরের এক বৃদ্ধ লোক আমাকে তার বাসায় দুপুরের খাবারের দাওয়াত দিয়েছিল। ইমাম শামিল স্ট্রিটের এক গলিতে তার বাসা। সাইদপুতিনের বয়স ছিল ৭৭ বছর। সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন 'ওয়ার হিরো' এবং জন্মসূত্রে সোভিয়েত নাগরিক। তখনো তার মুখে টোভারিশ (কমরেড) শব্দটি শোনা যেত। তার কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ছিল একটি বিপর্যয়। অবাক করা বিষয় হলো, সোভিয়েত শাসনের ব্যাপারে তার তেমন কোনো নেতিবাচক মনোভাব ছিল না। ধর্মীয় নিপীড়ন, তার সহকর্মী পাহাড়ি মুসলিমদের নির্বাসন বা বলশেভিক বিপ্লবের পর উত্তর ককেশাসের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রতিরোধে সোভিয়েতের নিষ্ঠুর আক্রমণ—কোনো কিছু সম্পর্কেই তার কোনো অভিযোগ ছিল না। সে যতোটা না দাগেস্তানি ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল সোভিয়েতের অনুগত। যাওয়ার ঠিক আগে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কিনঝাল কোথায়?' আমি ভেবেছিলাম তার মতো একজন বয়স্ক মানুষের কাছে হয়তো কোনো আকর্ষণীয় দুর্লভ বস্তু থাকতে পারে। অবশেষে, অকস্মাৎ আমি বৃদ্ধের আবেগকে নাড়া দিতে সক্ষম হলাম। ককেশীয়রা তাদের অস্ত্রকে ভালোবাসে।

এবার সে আফসোসের সুরে বলল, 'ওহ, ওটা আর নেই!' সে আরো বলতে লাগল, 'সোভিয়েতরা ওটা নিয়ে গেছে। আমাদের সবকিছু নিয়ে গেছে ওরা; আমাদের জন্য কিনঝাল, রাইফেল, শটগান কোনো কিছুই রেখে যায়নি। এটা বড়ই দুঃখের বিষয়, কমরেড।'

সাইদপুতিন যাই বলুক না কেন, আজ দাগেস্তানে অস্ত্রের কোনো অভাব নেই। ব্ল্যাকমার্কেট হতে রাশিয়ান অস্ত্রাগারের যেকোনো অস্ত্রই আপনি চাইলে ক্রয় করতে পারবেন। পার্শ্ববর্তী চেচনিয়ায় সর্বশেষ যুদ্ধের পূর্বেও প্রত্যেক ঘরে ঘরে কোনো না কোনো অস্ত্র ছিল। গুটিকতক পুরুষ ছাড়া সবাই অস্ত্র চালনা ও পরিষ্কার করার পদ্ধতি জানত। প্রায়সময়ই একজন পিতা মেহমানদের সামনে তার ছেলেদের কারাতে দক্ষতা দেখিয়ে গর্ববোধ করতেন। একবার আমি এক লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম; একজন মুক্তিযোদ্ধা। সে ছুরি সংগ্রহ করত, এমনকি নিজেও ছুরি বানাত। সেসব ছুরি ভীষণ ভারি ও উজ্জ্বল। ছুরির ব্লেডে খোদাই করা থাকত কুরআনের আয়াত। তার প্রতিবেশী ছিল মার্শাল আর্ট বিশেষজ্ঞ। তার কাছে ছিল একটি দো-ধারি তরবারি। সেই তরবারি এতো তীক্ষ্ণ

BanglaBook.org

ছিল যে তা দিয়ে হাতের পশম কেটে ফেলা সম্ভব।

অতীতের লোকদের ছিল দ্রুতগামী ঘোড়া, তড়িৎ বেগে তারা ছুটে বেড়াত। রাশিয়ানরা কাবার্ড ঘোড়াগুলোকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঘোড়া মনে করত। আজ তাদের আছে গাড়ি। সামর্থ্য অনুযায়ী তারা যথাসম্ভব অধিক ও দ্রুতগামী গাড়ি ক্রয় করতে চায়। যতো দ্রুত তারা লাডা ও সোভিয়েতের তৈরি দেশলাই-বক্স আকৃতির অন্যান্য গাড়ি পরিত্যাগ করতে পারে, ততই ভালো। বলা যায়, অতীতের টোটেম কিনঝাল ও ঘোড়ার স্থান দখল করে নিয়েছে কালাশনিকভ এবং বিএমডব্লিউ।

চেচনিয়ায় আমি রোলস রয়েস, পোর্শে ও কালো আমেরিকান লিমোজিন দেখেছি। তবে সবচাইতে অবাক করেছে, আমেরিকান পুলিশের ডোরাকাটা, লাইট বিশিষ্ট অরিজিনাল গাড়ি। ঘুরে বেড়াচ্ছে গর্ত আর বিপথগামী গবাদি পশুর পথ ধরে। ইঙ্গুশেটিয়ার নেতার একটা আমেরিকান আর্মি হামভি জীপ আছে। আরেকটি বিস্ময়কর দৃশ্য ছিল, দাগেস্তানের বিভিন্ন জাতির নেতাদের গাড়ির শোভাযাত্রা। প্রায় বিশটি গাড়ি ভিন্ন ভিন্ন দাগেস্তানি জাতির প্রতিনিধিত্ব করছিল; ১৯৯৬ সালে জিম্মি সংকট নিয়ে আলোচনা করার জন্য চেচনিয়ায় এসেছিল তারা। মার্সিডিজ, বিএমডব্লিউ, ক্যাডিলাক ও জাপানি জীপের বহর হর্ন বাজিয়ে, লাইট জ্বালিয়ে কর্দমাক্ত খামারবাড়ি, গ্রামের ঘর অতিক্রম করছিল। গাড়ি পুরোপুরি থামার আগেই প্রত্যেক গাড়ি থেকে বোঁচা নাক-বিশিষ্ট বডিগার্ডরা সাবমেশিন গান হাতে নিয়ে বাইরে পা ফেলছিল। এরপর মেষশাবকের চামড়া নির্মিত হ্যাট ও দামি ওভারকোট পরিহিত প্রতিনিধিরা একে একে বের হচ্ছিল গাড়ি থেকে। উনিশ শতকের পূর্বপুরুষদের চাইতে এরা বেশি গোলগাল আর সম্পদশালী ছিল। সম্ভবত তাদের একে অপরকে চিনতে একটু সমস্যাই হতো।

দাগেস্তানের রাজধানী মাখাচকালার চব্বিশ বছর বয়সী এক ব্যবসায়ীর সাথে আমার আলাপের দু'মিনিটের মাথায়ই সে তার গাড়ির প্রসঙ্গ তুলল। বলল, 'মস্কোতে বিএমডব্লিউ সেভেন সিরিজের একটি গাড়ি আছে আমার, আর এখানে আমি সাথে রাখি একটা টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার।' বিএমডব্লিউ-এর বর্ণনায় বলেছিল, 'উমম... একেবারে আসল জিনিস!' দীর্ঘকায় এই তরুণের আঙুল, কবজি, ঘাড় সবকিছুতেই স্বর্ণের ছড়াছড়ি। তবে এতো কিছু বাদ দিয়েও তার গর্ব করার আরেকটি জিনিস আছে—পর্বতমালা। 'আমার

BanglaBook.org

পিতামাতা পাহাড়ের বহু উঁচুতে বসবাস করতেন। আপনি বিশ্বাস করবেন না, ওপরের প্রকৃতি কত্ত সুন্দর! সোভিয়েত সময়ে আমেরিকানরা এখানে এসে একটা প্রাণি শিকার করার জন্য হাজার হাজার ডলার ব্যয় করত। পাহাড়চূড়ায় প্রথম দিন আপনার মাথাব্যথা অনুভূত হবে কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গেলে নিজের মধ্যে অন্যরকম এক অনুভূতি কাজ করে। একবার আমার এক কিলোমিটার দূরে একটি গাড়ি থেমেছিল। আমি এতোদূর থেকেও সেই গাড়ির গ্যাসের গন্ধ পাচ্ছিলাম। তাহলে বুঝুন, পাহাড়চূড়ায় বাতাস কতো নির্মল! অবশ্য আমি সেখানে খুব কমই যাই। ঘর ছাড়ার পর মাত্র একবার গিয়েছি। ওখানে কিছুই করার নেই। সব বয়স্ক মানুষ। বয়স একশ বিশ বছর হওয়া পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করে।’

এমনকি অত্যাধুনিক পরিবেশেও ককেশীয়দের যোদ্ধা প্রবৃত্তি খুব ভালোমতোই কাজ করে। কারাচাই পর্বতের কারাচায়েভস্ক শহরে এক সন্ধ্যায় লোকাল গ্যারিসন থেকে বের হয়ে কয়েকজন রুশ সেনা আমাদের গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। আমার সাথে ছিল তিন জন কারাচাই লোক। এদের একজনের নাম ছিল মুরাদ, তেইশ বছর বয়সী কৃষক। সৈনিকরা বেরেট টুপি খুলে অফ ডিউটিতে যখন উদ্দেশ্যহীনভাবে মার্কেটে প্রবেশ করছিল, তখন সে বলল, ‘দেখ দেখ, ওরা যাচ্ছে। ওরা আজ রাতে মাতাল হয়ে যাবে। প্রতি রাতেই ওদের গুলির শব্দ কানে ভেসে আসে। আল্লাহর শোকর, ওরা এখনো আমাদের গুলি করেনি।’ এরপর ব্যঙ্গের সুরে বলল, ‘কিন্তু তুমি কি জানো, যদি ওরা গুলি করে তবে আমরা খুব সহজেই ওদের মতো ইতরদের কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নিতে পারব। আমাদের কাছে খুব বেশি অস্ত্র না থাকলেও ছুরি আছে, আর আমরা অনেক কাটাকাটির কাজ করি।’ আমি ভাবলাম, মুরাদ হয়তো বাগাড়ম্বর করছে। ককেশাসে এলে একথা আপনার প্রায়ই মনে হবে। আপনি অনেক বড় বড় কথা শুনবেন, অনেক যোদ্ধাদের দেখা পাবেন। কিন্তু পরে আমি নিজ চোখে মুরাদকে একটা বাগানে ছুরি ছুঁড়তে দেখেছি। দশ পা দূরে থেকেও সে একটি ছোট আপেল গাছকে প্রতিবার আঘাত করতে পেরেছিল। ছুরির ব্লেড গাছের কাণ্ডে কম্পন ধরিয়ে দিয়েছিল।

লারমন্টভ তার ‘ইসমাঈল বে’ কবিতায় ককেশাস সম্বন্ধে লিখেছেন :

‘ভালোর বদলায় ভালো দেয় তারা, মন্দের বদলায় খারাপ,
তাদের মাঝে ঘৃণা যেমন আছে, তেমনি ভালোবাসা অবাধ।’

BanglaBook.org

নেপোলিয়ানকে পরাজিত করার পর রুশ সাম্রাজ্যবাদী জেনারেলরা পোল্যান্ড থেকে প্যাসিফিক পর্যন্ত একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিল। তারা ভেবেছিল, তাদের শক্তির সামনে ককেশীয়রা ভয়ে জড়সড় হয়ে যাবে, ইতিহাসের সবচেয়ে হিংস্র গেরিলা যুদ্ধে যোগ দেবে না। ১৯৯৪ সালে চেচনিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেও সবাই ভেবেছিল, চেচেনদের প্রতিরোধ আন্দোলনের বড় বড় কথা ফাঁকা বুলি মাত্র। কিন্তু লড়াই আর অস্ত্রচালনা মুরাদের মতো লোকদের নখদর্পণে ছিল। এটা ছিল তাদের রক্তে, রক্তের একদম গভীরে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় তিন

গ্রামাঞ্চল

যেসব মহিলাদের সাথে আমাদের দেখা হতো, তারা কদাচিৎ মুখ ঢেকে রাখত। দেখতে সুন্দর ছিল। চোখের নিচে ছিল কাজলের দাগ; নখে লচে আভা। পরনে থাকত লাল, নীল ও হলুদ রঙের জাঁকাল পোশাক। পুরুষদের পোশাক-আশাক ছিল দৃঢ়, লড়াকু ভাবসম্পন্ন। সাথে থাকত অস্ত্র আর মেহেদি রাঙা লম্বা দাড়ি।

-লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্যার আর্থার থারলো কানিংহাম

ট্রাভেলস ইন দ্য ইস্টার্ন ককেশাস, ১৮৭১

আমরা আদিজিয়ার মধ্য দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। একটি রোডব্লকে পুলিশ আমাকে থামিয়ে আধা ঘন্টা ধরে জেরা করল। আমার অতি সাধারণ ট্যুরিস্ট ম্যাপটিও সন্ত্রাসী হামলার নীলনকশা সন্দেহে স্ক্যান করা হলো। আমার পাসপোর্ট এবং প্রেসকার্ড নিয়ে সৃষ্টি হলো বিভ্রান্তি। তারা বলল, লম্বা সময় ধরে এখানে আর কোনো বিদেশি আসেনি। সর্বশেষ এসেছিল একজন চাইনিজ লোক।

রোডব্লকটি উত্তর ককেশাস সীমান্তের প্রতীক বহন করছিল যেখানে রাশিয়াকরণের সমাপ্তি ঘটেছে এবং আদিবাসী জীবনের শুরু হয়েছে। প্রতিটি প্রধান শহরের বাইরে রোডব্লক আছে। কখনো কখনো আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ারও চেকপোস্টে পার্ক করা থাকে। এগুলো খুব একটা কাজে লাগে না তবুও এটাই রাশিয়ার কর্তৃত্বের অন্যতম প্রতীক। পুলিশদের মাঝে আছে জাতিগত রাশিয়ান ও ককেশীয়দের মিশ্রণ। তারা কংক্রিটের পিল বাক্সে বসে থাকে আর

BanglaBook.org

ড্রাইভারের ডকুমেন্ট চেক করার জন্য এগিয়ে আসে। পরনে সাধারণত থাকে ফ্ল্যাক জ্যাকেট, বহন করে কালাশনিকভ অটোমেটিক রাইফেল। আমলাতন্ত্র, বর্বরতা আর মস্তিষ্কবিকৃতির ফলে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে থাকে সবাই। সাথে অনিবার্য ঘুষ তো আছেই।

এরপর আসে গ্রামাঞ্চল। উত্তর ককেশাসের ভাষায় যাকে বলে আউল'স। রোডব্লক থাকুক বা না থাকুক, আউলে প্রবেশের সময় প্রতিবারই আপনি একটি মানসিক সীমানা অতিক্রম করবেন। এ যেন অন্য এক দেশ, এমন এক জায়গা যেখানে পূর্বপুরুষদের গুরুত্ব দেশের চাইতে এবং মসজিদের মূল্য পুলিশের চাইতে বেশি। এখানে আতিথেয়তা পাওয়া যায় বিনা প্রশ্নে।

কাস্পিয়ান সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত মূলত গ্রামীণ জীবনযাত্রার দেখা মেলে। উপনিবেশে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ থাকলেও তারা এখনো নিজেদেরকে গ্রামের অধিবাসী মনে করে। অধিকাংশ গ্রামেরই হতদরিদ্র অবস্থা। কাঁচা রাস্তা শীতকালে কাদার নদীতে পরিণত হয়। গ্যাস, এমনকি বিদ্যুৎ সরবরাহের তীব্র অভাব। রাস্তায় প্রাণির বিচরণ, নেই কোনো ড্রেনেজ ব্যবস্থা। এমনকি গ্রামের কল ছাড়া পানির সরবরাহও নেই।

প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো উত্তর ককেশাসের স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলোর অর্থনীতি ধ্বংসে পতিত। মস্কো থেকে প্রাপ্ত ভর্তুকির ওপরই মূলত নির্ভর করে আছে এই ভঙ্গুর অর্থনীতি। তবুও গ্রামাঞ্চলে একটা স্পষ্ট পরিবর্তনের ছাপ আছে, যা রাশিয়ায় নেই। রাশিয়ার যৌথ ফার্মগুলো দেউলিয়া, তাদের কর্মীরা মদ্যপান ও হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত। এদিকে উত্তর ককেশাসের গ্রামগুলো ক্রমবর্ধমান। তাদের অতীত অবস্থা ধীরে ধীরে নতুন ঘর ও গ্যাস লাইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। জনসংখ্যার পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ অঞ্চলে রাশিয়ান জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। জন্মের হার হ্রাস এবং রাশিয়ার অন্যান্য অংশে অভিবাসন এর প্রধান কারণ। আর পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর হার বেড়েই চলছে— ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত গড়ে ১৬.৩ শতাংশ বেড়েছে। তুলনামূলক বিচারে সামগ্রিক হার প্রতি পাঁচ বছরে বেড়েছে ৯.১ শতাংশ।

দরিদ্ররা ছোট ঘরে বাস করলেও সেটা ওদের জন্য পর্যাপ্ত। জঘন্য আবর্জনাবহুল বাসস্থান নেই বললেই চলে, এমনকি একেবারে হতদরিদ্ররাও তাতে বাস করে না। নব্য ধনীরা বেহিসেবি জীবনযাপন ভালোবাসে কিন্তু তারা তাদের গ্রাম ছেড়ে যায় না। তাদের পুরানো কুটিরের ওপরেই তারা দালান নির্মাণ

BanglaBook.org

করতে পছন্দ করে। তাদের বাড়ির উঠোনে প্রায়ই বিভিন্ন কাঠের শৈলী দেখা যায়। ভেতরে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক পৃথক কোয়ার্টার। দেয়ালে দামি কার্পেট ঝোলানো। সামর্থ্য অনুযায়ী সাজসজ্জায় অভিনব ছাপ মেলে। ককেশীয়রা শো-অফ করতে ভালোবাসে। তবে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবার টয়লেটেরই বেহাল দশা, দুর্গন্ধে টেকা দায়। আউটডোর সেন্ট্রি বক্সের ওপরেই এসব টয়লেট। ইঙ্গুশেটিয়ায় বিশাল এক প্রাসাদে ছিলাম আমি। প্রাসাদটিতে সান্টা বারবারা ও আরব্য রজনীতে বর্ণিত বিলাসিতার মিশ্রণ ছিল। সোনালি চিত্রকর্ম, ভার্নিশ করা কাঠের আসবাব, বেগুনী পর্দা ও সাদা ঝাড়বাতি। শুধু তাই নয়, টয়লেটটিও খুব বেশি দূরে ছিল না। তবে টয়লেটে ছিল না কোনো দরজা! পাঁচ মিটার দূরেই খাম্বার সাথে একটি ষাঁড় বাঁধা ছিল। আমি জীবনে খুব কম সময়ই এতোটা অসহায় বোধ করেছি!

বর্ধিত পরিবার এবং পারস্পরিক সাহায্যের ঐতিহ্য বিনামূল্যে শ্রম দিতে শেখায় ককেশীয়দের। এ কারণেই রাশিয়ান প্রতিপক্ষের চেয়ে তারা আলাদা। একজন ককেশীয় হয়তো ধনী নয় কিন্তু একটি সুন্দর ঘরে বসবাস করে। কারণ তার আত্মীয়রা তাকে ঘর তৈরি করতে সহায়তা করে। অবশ্য বিনিময়ে তারাও তার সাহায্য পায়। কৃষিখাতে পারিবারিক সাহায্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ গ্রীষ্মকাল ও উর্বর ভূমির বদৌলতেই উত্তর ককেশীয়রা প্রচুর শস্য ফলাতে পারে। অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বাজারে বিক্রি করে দেয় ওরা। একটি ককেশীয় পরিবারে চার পাঁচজন ছেলেমেয়ে থাকা অস্বাভাবিক কিছু না। আর খুব অল্প বয়সেই তারা কাজে লেগে যায়।

এমনকি শহরেও উত্তর ককেশীয়রা সবজি চাষ ও পশু পালন করে। ঘর তৈরি করা হয় খোলা জায়গার আশেপাশে। ফলে জীবিকার জন্য ছোট চাষাবাদের জমি, মৌচাক ও আঙুর গাছের সারি গড়ে তোলা যায়। রাশিয়ানদের জন্য তাদের ছোট পরিবারের সাহায্যে খুব বেশি ফসল ফলানো অসম্ভব। তাদের নিজ রান্নাঘরের জন্য হয়তো সেটা যথেষ্ট, কিন্তু বড় আকারের উৎপাদনের জন্য নয়। এক রাশিয়ান পরিবারের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল উত্তর ককেশাসের সীমান্তে অবস্থিত স্ট্যাভ্রোপোল অঞ্চলে। তারা মদ বানাত। মদে কয়েক চুমুক দেওয়ার পর আমি যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে এর উৎপাদনের কথা বললাম তখন তারা হাসল এবং মাথা নাড়তে থাকল। ওদিকে ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার পর কৃষি কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় আর তাদেরও সামর্থ্য নেই যে লোক

BanglaBook.org

ভাড়া করবে। তাই তারা শুধু নিজেদের পান করার জন্য মদ বানাত। ককেশীয় পরিবারের জন্য উল্টোটাই সত্যি। তারা ব্যবসায় পটু। ১৯৮০-র শেষ দিকে গর্ভাচেভের পেরেস্ত্রইকার অধীনে তাদের ব্যবসার অবস্থা ছিল রমরমা। একটি চেচেন পরিবারের সাথে আভতুরিতে আমার সাক্ষাৎ হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও তারা কাপড় সেলাইয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ কামাই করত। তাদের সাদামাটা ঘর রূপ নিয়েছিল একটা মিনি-ফ্যাক্টরিতে। বেশ কয়েকজন মহিলা সেলাই মেশিনের সামনে সারাদিন বসে থাকত এবং এক গাদা কাপড়কে গ্রীষ্মের পোশাকে রূপান্তরিত করত। আরেকজন আত্মীয় হয়তো মালামালগুলো ড্রাইভ করে দক্ষিণ রাশিয়ার কোনো ডিলারের কাছে বিক্রি করে বেশ ভালো একটা মুনাফা পেত।

নাতাশা একজন বুলগেরিয়ান মহিলা, যিনি দাগেস্তানের রাজধানী মাখাচকালায় এক দার্গিনকে বিয়ে করেন। তিনি বলেন, 'এখানে ছোট ব্যবসাগুলোর বিপ্লব সাধিত হয়েছে মক্কায় হজ্জ পালন করতে যাওয়া মুসলিমদের মাধ্যমে। তারা সৌদির বাজারের জৌলুস আবিষ্কার করে। কিন্তু সমস্যা হলো, এরপর অনেকে আল্লাহর ইবাদাত করতে যেত না সেখানে, ব্যবসা করতে যেত। তবে বিদেশ থেকে মাল এনে ব্যবসা করার এই আইডিয়াটা কিছু মানুষ কাজে লাগায়। তারা চীনে যাওয়া শুরু করে। আমাদের নারীদের জন্য এটা বিস্ময়করই বটে। এই নারীরাই চীনের সাথে ব্যবসা শুরু করে, এরপর তুরস্ক, পোল্যান্ড। এখন সবাই সংযুক্ত আরব আমিরাতে যায় ব্যবসার জন্য। লোকজন ব্যবসায়িক সফরে হাজার দশেক ডলার সাথে নেয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তা বিনিয়োগ করে। আমার এক বান্ধবী শীতকালে গ্রিসে গিয়ে ফার (পশমী কোট) কিনে প্রতি ফারে ১০০০ ডলার লাভ করে। এভাবে করে সে তার পুরো এপার্টমেন্ট নতুন করে সাজিয়েছে। এটাই আমাদের নারীরা! আমাদের পুরুষরা অবশ্য এতো সরল না, ওরা মস্কো গিয়ে মাফিয়া গ্রুপে যোগদান করে।'

রাশিয়ান অনুষঙ্গে মাফিয়া একটি অত্যন্ত ব্যাপক শব্দ। ককেশাসের এসব ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা হয়তো অর্গানাইজড ক্রাইম গ্রুপ থেকে অনেক দূরে থাকে—যারা রাশিয়ান শহরসমূহে কাজ করে। তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তারা অনেক সময় কর্তৃপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাফিয়াদের সাথে ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন করে। কখনো কখনো তারা যেসব আইন তাদের স্বাধীনতাকে কেড়ে নেয় সেসব অ্যান্টি-এন্টারপ্রাইজ আইন লঙ্ঘনকে উপভোগ করে।

BanglaBook.org

'ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ এমনভাবে হয়েছিল যে, পুত্ররাও তাদের পিতার আদেশ মানতে পারত না।' ১৮৮০-তে একজন ব্রিটিশ পর্যটক আদিজেই গোত্রসমূহ বা রাশিয়ানদের হাতে বিজিত হওয়ার পর তাদের অবশিষ্টাংশ পরিদর্শন করার পর লিখেছিলেন।

একজন আদিজেই আমাকে বলেছিল, কীভাবে সে তার শক্তিশালী রাশিয়ান নিভা জীপের সাহায্যে পুলিশ পোস্টবিহীন ধুলোমাখা পথ পাড়ি দিত এবং ছোট মালামাল বিক্রি করত। স্পষ্টতই সাধারণ ব্যবসায়ীর থেকে তার সুবিধার জায়গা ছিল অনিবন্ধিত হওয়া। ফলে সে ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারত। পুলিশকেও ঘুষ দিতে হতো না, কোনো জবাবদিহিতাও করতে হতো না যে, মাল কোথা থেকে এসেছে। সে ধনী ছিল না তবে তার রাশিয়ান প্রতিবেশীদের চেয়ে ভালো ছিল।

এমনকি চেচনিয়ায় যুদ্ধ চলাকালেও বাইরের বাজারে রমরমা অবস্থা। পূর্বাঞ্চলের কুরচালোই গ্রামের ওয়াল স্ট্রিট ছিল শনিবারের মার্কেট। সেখানে অডি, বিএমডব্লিউ থেকে শুরু করে যেকোনো রাশিয়ান গাড়ি, বস্তাভরা খাদ্যশস্য, ময়দা, বাদাম, ফল, মধু, খুচরা জিনিসপত্র, পাইপের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র একটি মাঠে ছড়িয়ে রাখা হতো। অশ্বারোহীরা বিভিন্ন ঘোড়ায় চড়ে পণ্য বাছাই করত। কাপড় ধোয়ার ডিটারজেন্ট বিক্রয়কারী মহিলাদের পাশেই পসরা সাজাতো রুক্ষ চেহারার আর্মস ডিলাররা। যদিও রাশিয়ান বাহিনি কয়েক কিলোমিটার দূরেই থাকত তবুও চেচেনরা একটি কালাশনিকভ রাইফেল ১০০ ডলারে এবং একটি অ্যান্টি-ট্যাংক গ্রেনেড লঞ্চার ২০০ ডলারে কিনতে পারত। এসব অস্ত্রশস্ত্র খোলামেলাই প্রদর্শন করা হতো। কোমরের বেল্টে শটগান গোঁজা চওড়া মুখো বিশাল দাড়িওয়ালা এক লোক দাবি করেছিল, সে আমাকে একটি ট্যাংকও যোগাড় করে দিতে পারবে। তার ভাষায়, 'আপনি যা চান তাই আমরা এনে দিতে পারি!'

এই অঞ্চলের সবচেয়ে অসাধারণ উদ্যোগী প্রকল্প ছিল সম্ভবত ইঙ্গুশেটিয়ায়। একটি ছোট গ্রামীণ প্রজাতন্ত্র যেখানে মাত্র ৩ লক্ষ আদি ইঙ্গুশ এবং হাতে গোনা কিছু রাশিয়ান বাস করে। সমুদ্র তীর হতে দূরে তারা একটি ট্যাক্স জোন তৈরি করেছিল। ফলে অঞ্চলটি রূপ নিয়েছিল ককেশাসের জার্সি আইল্যান্ডে। প্রকল্পটি দেখতে অদ্ভুত লাগলেও বেশ কয়েক বছর যাবত সেটা সচল ছিল। পাশাপাশি সমুদ্রতীর হতে দূরে বেশ কিছু উন্নয়ন ঘটে। রাজধানী নাযরানে হোটেল আসসা নির্মাণের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের সূচনা হয়েছিল। শ্রান্ত পর্যটকরা হয়তো ভাবত,

BanglaBook.org

তাদের দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছে। কিন্তু সত্যিই সেখানে ছিল একটি মডার্ন হোটেল। যার ফ্লোর ছিল মার্বেল নির্মিত, বাথরুমে গরম পানির ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্ন রুম, বার, বন্ধুসুলভ হোটেল স্টাফ, টেলিভিশন। এসব কিছুই উত্তর ককেশাসে নতুন ছিল। হোটেলটি ককেশাসের ঐতিহ্যবাহী একগুঁয়ে স্টাফ, ছোট সাইজের তোয়ালে, ময়লা বিছানা ও দুর্গন্ধযুক্ত বাথরুমকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিল।

যদিও ১৯৯৪ সালে রাশিয়ান সরকারই এই প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে তবুও উত্তর ককেশাসের অন্যান্য ব্যবসার মতোই এতে মিশে ছিল অস্পষ্টতা। ১৯৯৭ সালে নতুন রাশিয়া, আলাদা করে বললে মস্কো এই ট্যাক্স প্রকল্প বন্ধ করে দেয়। এরপর ইঙ্গুশেটিয়ার উন্নতির একমাত্র নমুনা ছিল নাযরানের একটি নতুন অলংকারের দোকান। সোভিয়েত আমলের একটি ক্ষয়প্রাপ্ত, শূন্য জেনারেল স্টোরের কাছেই ছিল এই জুয়েলারির দোকানটি। এর জানালা থেকে রাস্তার দিকে তাকালে জাপানিজ ও আমেরিকান জীপ চোখে পড়ত। কখনো কখনো রাশিয়ান লাডা গাড়িও দেখা যেত পথেঘাটে। অফিসিয়ালি এই দোকানটিই ছিল ইঙ্গুশেটিয়ার উন্নতির চিহ্ন। কিন্তু রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় সম্বন্ধে যদি আপনার জ্ঞান থাকে তবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, অবৈধ সোনা পাচারের কাজে ইঙ্গুশেটিয়ার অনেক বড় হাত আছে। এমনকি নাযরানকে তো 'রাশিয়ান সোনার খনি'ও বলা হতো। এখানকার তিনটি পরিবার টনকে টন সোনা রাশিয়ার অদূরে পূর্বদিকে পাচারের জন্য অভিযুক্ত ছিল। এভাবে খ্রিস্টান অধ্যুষিত উত্তর ওসেটিয়া ভদকার জন্য ও দাগেস্তান কাস্পিয়ান সমুদ্র থেকে উৎসারিত সামুদ্রিক মাছের ডিমের জন্য বিখ্যাত ছিল।

শুনতে অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু এখানে ভালোবাসার স্বাধীনতাও পাওয়া যায় তবে সমাজ ও পরিবারের বেঁধে দেয়া নিয়মের ভেতরে থেকে। ঐতিহ্যগতভাবে উত্তর ককেশাসের পরিবারসমূহ পিতৃতান্ত্রিক পিরামিডের মতো ছিল, যেখানে পরিবার, গোত্র ও উপজাতির নেতৃত্ব প্রদান করত কাউন্সিলের প্রবীণ পুরুষরা। প্রতিটি পরিবার এবং পুরো গ্রামেও এ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। সোভিয়েত বিপ্লবের ফলে সিস্টেমটি ভেঙে পড়ে। তবুও পূর্বাঞ্চলে এ ব্যবস্থার পরিবর্তিত রূপ এখনো দেখা যায়। দাগেস্তানে অধিকাংশ জাতিসমূহ তুখুম বা একান্নবর্তী পরিবারে বিভক্ত। বিভিন্ন তুখুমের মাঝে সাধারণত বিয়ে হতো না। প্রায়শই তারা একে অপরের সাথে দীর্ঘকালীন যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। তুখুম গ্রামের আইন পরিচালনা করত। বর্তমানেও তুখুম একটি ইউনিট হিসেবে কার্যকর

BanglaBook.org

আছে। তবে পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এদের কার্যপদ্ধতির মাত্রার ভিন্নতা ব্যাপক। চেচনিয়া ও ইঙ্গুশেটিয়ায় বড় বড় গোষ্ঠীগুলো তিয়েপ নামে পরিচিত। সেখানে তাদের ক্ষমতার দাপট দেখা যায়, তারা একই সাথে কয়েক গ্রামে কলকাঠি নাড়ে, এমনকি তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। প্রতিটি সদস্যই পরস্পর সম্পর্কিত এবং তারা বড়দের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এছাড়াও তারা প্রতিশোধ, আতিথেয়তা এবং বিয়ের আইন কানুন মানতে বাধ্য।

পশ্চিমে কারাচাই আর বালকারদের মাঝে আজও তুখুম ব্যবস্থা রয়ে গেছে। তবে তিনটি প্রজাতন্ত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আদিজেই-সারকাসিয়ান গোত্রগুলোর মাঝে সুবিন্যস্ত গোত্র ব্যবস্থা নেই। শতাব্দী পুরনো আদিজেইদের সামাজিক কাঠামো ছিল পুরোহিততান্ত্রিক ও অভিজাত। রাশিয়ান বিজয়ের পর সেটাও হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। অন্য সব জায়গার মতো যা অবশিষ্ট আছে, সেটা হলো পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

বড়দেরকে স্বাভাবিকভাবেই সম্মান করা হয়। গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শে মুরুব্বিরা এসে জড়ো হয়। তাদের মধ্যে কারো মুখে দাড়ি, কারো সাথে হাঁটার লাঠি। প্রায়ই তাদের মধ্যে তুলনামূলক কর্মক্ষম ষাট বছরের বৃদ্ধদেরও দেখা যায়। এখানে শ্রদ্ধা, জনপ্রিয়তা, শিক্ষা ও বয়স—এগুলোই একজনকে মুরব্বি হওয়ার অধিকার দেয়। তাদের মাঝে লম্বা ধূসর বা বাদামি আসট্রাখান ভেড়ার চামড়ার হ্যাট পরার অভ্যাস আছে। ককেশাসের বিখ্যাত পাপাখা হ্যাট বলে এগুলোকে। গ্রামের মুরুব্বিদের মাঝে প্রায়ই দ্বীনদার লোক; বিশেষত হাজী বা আরবী জানা লোক থাকে।

বসা অবস্থায় মুরুব্বিদের দেখলে উঠে দাঁড়ানোর প্রচলন এখানে। বড়দের সামনে সিগারেট বা মদ খাওয়া নিষিদ্ধ; এমনকি আপন বড় ভাইয়ের সামনেও না। আদিজিয়ায় যদি বড়রা অনুমতি দেয় বা বড়রা প্রথমে শুরু করে, তাহলে বাকিরা অংশ গ্রহণ করতে পারে।

চেচেন প্রবীণদের অনেক প্রভাব রয়েছে। প্রায়ই পরিবার বা গ্রামের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে তারা। যুদ্ধের সময় রাশিয়ান সৈন্যদের সাথেও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছে। কখনো কখনো তাদের গ্রাম যুদ্ধ করবে কিনা সেটাও নির্ধারণ করে দেয় মুরুব্বিরাই। মুরুব্বিদের নিজেদের গোত্রে বিয়ে করা, বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া, জানাযার নামায ও অন্যান্য ব্যাপারেও কর্তৃত্ব রয়েছে। কাবার্ডিনো-বালকারিয়ার কেন্দ্রীয়

BanglaBook.org

প্রজাতন্ত্রের অধিকাংশ পরিবারেই এমন দেখা যায়। অথচ জনজীবনে কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে মুরব্বিদের ভূমিকা সংকুচিত হয়ে আসে। তা সত্ত্বেও মুরব্বিরা মনে করে, তারা আঞ্চলিক ঐতিহ্য, পরিবার ও সমাজের নিয়মকানুন রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

পৌরুষ প্রদর্শন, ইসলামি অনুশাসন ও মুরব্বিদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানের সমন্বয়ে মেয়েদের জন্য ভিন্ন পরিস্থিতি তৈরি হয় এখানে। মেয়েদের চাদর পরতে বা পর্দা করতে বাধ্য করা, এমন নয়। তবে ছোটবেলা থেকেই শালীন পোশাক; উদাহরণস্বরূপ স্কার্ফ পরতে শেখানো হয় তাদের। পুরুষদের সেবা করাই তাদের ব্রত। উত্তর ককেশাসে অনেক পরিবার আছে যারা পুরোপুরি আঞ্চলিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে। সেসব পরিবারে মেয়েরা কখনো পুরুষদের সাথে একসাথে খেতে বসে না। আর বাসায় মেহমান এলে তারা কখন খায় সেটা তো ভেবে পাওয়াই মুশকিল। আর ঘুম বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনের কথা না হয় বাদই দিলাম। একবার আমি কারাচাই-চেরকেশিয়া নিবাসী এক লোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনাদের ঘরের মহিলারা কখন খাওয়া দাওয়া করে?' তখন সে মজা করে বলেছিল, 'আপনি কি মনে করেন, তারা সত্যিই খাওয়া দাওয়া করে?'

ভিন্নতা রাস্তাঘাটেও দেখা যায়। চেচেনের ডার্গোবাসী পাহাড়ি দু'জন মেয়ে যদি গ্রামের ঝর্ণায় আধা ডজন গেরিলাকে বুট পরিষ্কার করতে দেখে, তবে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পঞ্চাশ ইয়ার্ড দূরে সরে যাবে। যোদ্ধারা সরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা ঝর্ণার কাছে আসবে না। মেয়েরা রাস্তাঘাটে পুরুষদের দেখলে পাশ ফিরে তাকাত। তাদের মধ্যে ছিল বিনয় ও মেয়েলী আচরণ। কিন্তু তাদের কায়িক শক্তি ছিল প্রবল। গাভীর দুধ দোহন, বাগান কিংবা বাড়ি মেরামত, জ্বালানির জন্য কাঠ সংগ্রহ, বালতি ভরে পানি নিয়ে আসা—এগুলো ছিল মহিলাদের নিত্য দায়িত্ব। আমি কতোবার স্কার্ফ পরিহিত মহিলাদের এসব করতে দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। আর পুরুষদের মাঝে ছিল আরবীয় সংস্কৃতি। তবে তারা ধূমপান করত।

এসব কারণে বিয়ের সময় পুরুষের আভিজাত্য ও মেয়েদের ভোগান্তি দেখা যেত। জেমস বেলের মত অনুসারে, ১৯ শতাব্দীর আদিজেই গোত্রের পুরুষরা বিয়ের রাতে কিনঝাল দিয়ে কনের কোমরবন্ধনী কাটত। এ হলো রুক্ষতা ও ভালোবাসার এক অদ্ভুত সমাবেশ। চেচনিয়ায় ঐতিহ্যগতভাবে বরের বন্ধুরা

BanglaBook.org

কনেকে তার বাড়ি থেকে গাড়ি করে নিয়ে আসত। পথিমধ্যে তারা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ত, রাস্তাজুড়ে হর্ন বাজাত। দুর্লভ হলেও মাঝে-সাঝে কনেকে স্রেফ উঠিয়ে নিয়ে যায় বর। হয়তো বিয়ে সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনায় তাদের আগ্রহ থাকে না অথবা তাদের ভালোবাসাকে গ্রহণ করা হয় না। যখন মেয়েকে অপহরণ করা হয়, তখন বড়রা একটা সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। মাঝে-মধ্যে দেখা যায়, আত্মীয়রা সমঝোতার পরিবর্তে কব্জির জোরে মেয়েকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। ১৯৯৬ সালে এক চেচেন গেরিলা আমাকে বলেছিল, যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন পরই তার একজন তরুণ কমরেড আলি খান একটি মেয়েকে অপহরণের চেষ্টা করে। 'আমরা ড্রাইভ করে মেয়ের বাসা পর্যন্ত যাই। এরপর আলি খান গাড়ি থেকে বের হয়। মেয়েটি তাকে দেখে চিৎকার করে ওঠে। ফলে তারা অভিভাবকরা ঘর থেকে বের হয়ে আসে। আলি খান ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে। তাই এখন আমরা আলি খানকে নিয়ে খুব মজা নিই; যুদ্ধের সময় যে বান্দাকে কোনো কিছুই ভয় দেখাতে পারেনি, তাকে কিনা একটা মেয়ে ভয় দেখিয়ে দিল!'

হাজী ইয়ার্ট, চেচনিয়া

'সেবাস্টিয়ান, এদিকে এসো।'

ভেদেনোর কাছাকাছি এক পাহাড়ে ইসলামের বাড়ি। ওর বাড়ির বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু বিশালদেহী বলে উপস্থিতি টের পাচ্ছি।

'এদিকে এসো।'

আমি বাগানে প্রবেশ করলাম, দেখি ইসলাম সবজির বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

'এসো, সিগারেট ধরাই।'

'নাও, ধরাও।'

আমি অন্ধকারেই তাকে একটা সিগারেট দিলাম, সাবধানে আগুন ধরালাম। স্কুলের দিনগুলোর মতো একেবারে গোড়া পর্যন্ত টানলাম।

'আমি চাই না, আমার চাচা দেখুক। তার সামনে সিগারেট খাওয়া মোটেই ঠিক হবে না,' ইসলাম বলল। সে ছিল একজন পিতা, গৃহকর্তা ও অভিজ্ঞ চেচেন যোদ্ধা।

BanglaBook.org

আতিথেয়তা উত্তর ককেশাসের আরেকটি ধ্রুব বৈশিষ্ট্য। কাযবেক-কারাচাইভস্কের ইমাম পরিচয়ের দশ মিনিটের মধ্যেই মসজিদের পাশে তার বাড়িতে আমাকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানালেন। কয়েক ঘন্টা পর তিনি আমার সম্মানে একটি ভেড়া জবাই করে বাগানে খোলা আগুনে ঝলসালেন। মাথার ওপরে চাঁদ উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, চাঁদের পাশে একটা তারা। দেখতে একেবারে ইসলামের প্রতীকের মতো। দূরে পাহাড়ের কালো রেখা কেবল দৃশ্যমান। মেয়েরা পুরো সময় কোনো কথা বলেনি। খাওয়ার সময় আমাদের একের পর এক মাংস, জুস, আলু ভাজা, কুমড়ার সালাদ, চা ও দধি নির্মিত পানীয় 'আয়রান' পরিবেশন করে। 'আয়রান' এই অঞ্চলের বিশেষ পানীয়, বিশাল একটা গামলা থেকে পান করে সবাই।

আতিথেয়তা উদারতার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ—পাহাড়িদের মনোবিজ্ঞানে গেঁথে আছে কথাটি। অপরিচিতের জন্য দরজা খোলা মুসলিম গোর্টসি ভ্রাতৃত্বের অংশবিশেষ। আপনি তাদের মেহমান, কেননা সবাই আল্লাহর বান্দা। সবাই সমান। এক আদিজেই মহিলা আমাকে বলেছিল, তাদের কাছে মেহমান পবিত্র, পরিবারের একজন সন্তান। আর সন্তানকে অবশ্যই আদরযত্নে ও সুরক্ষিত রাখতে হবে।

আতিথেয়তা কখনো কখনো এতো ঘটা করে করা হয় যে তা রীতিমতো বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। চেচনিয়াতে চা পানের নাম করে এক ঘণ্টার ব্যবধানে তিনজনের বাড়িতে তিনবার লাঞ্চ করতে হয়েছে আমাকে। কেন? কারণ তিনজনের সাথেই আমার কথা বলা প্রয়োজন ছিল। এমনকি কারাচাই মোল্লা, যে আমাকে রাজকীয়ভাবে আপ্যায়ন করেছিল, সেও কখনো কখনো আমার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগ দিচ্ছিল। একবার সে নিজে সুগন্ধি মাখার পর তার ধারণা হয়, আমাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তাই নিষেধ সত্ত্বেও সে আমাকে প্রায় দেয়ালে ঠেকিয়ে গায়ে সুগন্ধি মেখে দিল!

আপনি কীভাবে এদের ঋণ শোধ করবেন? একজন মানুষ যখন সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে তার সময়, বিশ্বাস, ভালোবাসা, সেরা কামরা ও খাবার দেয়; এর বদলে আপনি তাকে কী ফেরত দিতে পারেন? টাকা? কোনোভাবেই নিতে রাজি হবে না ওরা, বরং রীতিমতো তেড়েফুঁড়ে মারতে আসবে। ১৮৭৫ সালে একটা অতিথিপরায়ণ গ্রাম ছেড়ে আসার পূর্বে 'দ্য ফ্রস্টি ককেশাস' গ্রন্থের রচয়িতা এফ.সি. গ্রোভ লিখেছেন, 'আমরা

BanglaBook.org

চেয়েছিলাম তাদেরকে কিছু বিনিময় দিতে। কিন্তু তারা ছিল অনেক মহান মানুষ। তাদের মতো আর কেউ আপ্যায়ন করেনি আমাদের। কিন্তু কীভাবে আমরা তাদের প্রতিদান দিতে পারি, সেটা ভেবে কূল পাইনি।' গ্রোভ যখন তার মেজবানকে টাকা ও সাথে কিছু গিফট দিতে চেয়েছিল তখন তাকে বলা হয়, 'টাকাটা না নেওয়াই বরং আমরা ভালো মনে করি। বন্ধুর কাছ থেকে টাকা নেওয়া আমাদের রীতি নয়।'

একবার ইঙ্গুশেটিয়ার একটা স্কুলে এক চেচেন রিফিউজি পরিবারের সাথে একাধিক রাত থাকতে হয়েছিল আমাকে। ওদের পুরো গ্রামটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। ফিরে আসার পূর্বে আমি ওদেরকে একশো ডলার সাধলাম বেশ কয়েকবার। কিন্তু ওরা কোনোভাবেই নিতে রাজি হলো না। 'এখানে এসব চলে না', মৌলভী বললেন। যুদ্ধে তার বাড়ি মাটির সাথে মিশে গেছে, আপন ভাই মারা গেছে হেলিকপ্টার রকেটে। শুধুমাত্র জান হাতে করে পরিবারের আর সবাইকে নিয়ে পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন তিনি। প্রতিদিনই তিনি আমার কাজ ও শোয়ার জায়গা এবং খাবারের জোগান দিতেন। চলে আসার আগে আমার ইচ্ছে ছিল একটি একশো ডলারের বিল কাগজে মুড়ে রেখে আসি। কাগজে লিখেছিলাম, 'এতে যদি আপনি অসন্তুষ্ট হন, আমার কিছুই করার নেই।' আমার ইচ্ছে ছিল, আসার আগে টেবিলের নিচে চিঠি আর টাকাটা গুঁজে দিয়ে চলে আসব যাতে পরে তারা খুঁজে পায়। কিন্তু সেখানে এতো মানুষ ছিল যে সেটা আর সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে আমার মনোঃকষ্টের সীমা নেই।

পাহাড়ের অলিখিত আইনসমূহের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী হলো—প্রতিশোধ। রাশিয়ার আইন এখানে অকার্যকর। এখানে ওদের সুপ্রাচীন আইন চলে। দাগেস্তান, চেচনিয়া ও ইঙ্গুশেটিয়া জুড়ে নিয়মিত ঘটে প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। চেচনিয়ায় যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ডাকাতদের হাতে নিহত ও লুট হওয়ার ঘটনা বেড়েছে। অনেক লোক ছিল ক্ষুধার্ত, অনেকে সশস্ত্র। অবশ্য আমি প্রতিশোধ চক্রের বাইরে ছিলাম। আমার কয়েকজন চেচেন বন্ধু ছিল যারা আমাকে মেহমান মনে করত। আগেই বলেছি, ওদের কাছে মেহমান একটি মর্যাদার বিষয়। আমি অপরিচিত কারো সাথে কোথাও গেলে আমার বন্ধুদের বাড়িতে ঘুরে যেতাম। বলতাম, কেবল ভালো বলার জন্যই এসেছি কিন্তু সবাই জানত আসলে আমি এসেছি নিরাপত্তার জন্য; আমার চেচেন বন্ধু আছে, সেটা জানানোর জন্য। নিশ্চিতভাবেই চেচনিয়ায় সবচেয়ে বেশি

BanglaBook.org

ভুক্তভোগী রাশিয়ানরা। একই কারণে চেচনিয়ার ভিক্ষুকরা সবাই জাতিগতভাবে রাশিয়ান। কেননা একটা ককেশাস পরিবার কোনো অবস্থাতেই তার স্বজনকে পথে নামতে দেবে না এবং তার পরিবারের সম্মান রক্ষা করবে।

একবার চেচনিয়ার পাহাড়ি অঞ্চল, ভেদেনোতে একটা বিচারসভা দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। এক লোক গাড়ি এক্সিডেন্টে আরেকজনকে মেরে ফেলেছে। এখন পুরো পরিবারসহ প্রতিশোধের তোপের মুখে পড়েছে। সেদিন সকালে মুরব্বিদের নেতৃত্বে পথে কয়েক'শ লোক জমায়েত হয়। তাদের মুখে দাড়ি, হাতে লাঠি এবং মাথায় আসট্রাখান হ্যাট। তরবারির মতো লাঠি নাড়িয়ে দু'আ করতে করতে সামনে এগোচ্ছিল। সে সময় ককেশাসের পাহাড় ছিল তুষার আচ্ছাদিত। গ্রামের প্রধান স্কয়ারে পৌঁছে তারা থেমে যায় এবং সব মুরুব্বিরা গোল হয়ে বসে। এরপর মাথায় হুড পরিয়ে অভিযুক্তকে গ্রামের গেরিলা কমান্ডার শারভানি বাসায়েভের সামনে নিয়ে আসা হয়। এরপর শুরু হয় সম্মিলিত মুনাজাত। হাত ওপরে তুলে ঠোঁট নাড়িয়ে প্রার্থনা করতে থাকে সবাই। এবার সিদ্ধান্ত দেওয়ার পালা। লোকটা নির্দোষ বলে রায় হলো। মুহূর্তেই সমস্ত দুশ্চিন্তা বিদায় নেয়। প্রতিশোধ নয়, মিলে যাওয়ার নির্দেশ আসে। সবাই আল্লাহর প্রশংসা করতে শুরু করে।

শালি, চেচনিয়া

আমরা দক্ষিণ চেচনিয়ার একটি বাগানে বসে তরমুজ ও চা খাচ্ছি। গ্রীষ্মকালে যুদ্ধ খানিক স্তিমিত হয়ে পড়েছে। বন্দুকগুলো এখন নিশ্চুপ। শহর অধিগ্রহণের পর বেশিরভাগ রুশ সেনা শহর ছেড়ে চলে গেছে। প্রায় ছয় মাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো শান্তি ফিরেছে শহরে। লোকেরা চাকরি-বাকরি খুঁজছে, ঘর মেরামত করছে, বিয়েশাদি করছে। আমার বন্ধু আরো চায়ের প্রস্তাব করে আমাকে। সে একজন সভ্য, শিক্ষিত মানুষ। কিন্তু রুশ সেনারা তার এক চাচাত ভাই এবং চাচাত ভাইয়ের দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। এখন তার মাঝে প্রতিশোধস্পৃহা। যতোদিন না প্রতিশোধ নেওয়া হবে, ততদিন যুদ্ধ চলবে।

'রাশিয়ানরা মে মাসেই চলে গিয়েছে। সব জায়গাতেই ওদের খুঁজেছি আমরা। এখানে, দক্ষিণ রাশিয়ার রাশিয়ান হেড কোয়ার্টারে। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনি। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নিলাম গোড়া থেকে আবার শুরু করব। আমরা

BanglaBook.org

জানতাম, কোন এলাকা থেকে তাদের উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই আমরা সেখানকার সেনাদের কিডন্যাপ করা শুরু করলাম। একে একে চারজন সৈন্যকে কিডন্যাপ করলাম। স্থানীয় যেসব চেচেন রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস এফএসবি-এর জন্য কাজ করত আমরা তাদের প্রত্যেককে ১০০০ ডলার দিলাম। আর রাশিয়ান সেনাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রেখে দিলাম।

আমরা একজনকে তিন দিন রাখলাম, আরেকজনকে এক সপ্তাহ। তারা কিছু না জানলে আমরা তাদের ফিরিয়ে দিতাম। যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার মতো আমরা তাদের ছেড়ে দিতাম। রাশিয়ানরা কোনো প্রশ্ন করত না। তাদের জন্য এটা বোনাস ছিল—তারা বলত পারত, এসব সেনাদেরকে 'যুদ্ধ' করে গেরিলাদের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। চাই-কী পুরস্কারও মিলে যেতে পারত।

এভাবে চতুর্থ জনের পালা এল। এই ছেলেটা সব সচক্ষে দেখেছে। যখন কিডন্যাপিং-এর ঘটনা ঘটে তখন সে ওখানে উপস্থিত ছিল। সে আমাদের সব বলেছে। আমার ভাই ও তার বন্ধুরা একটা নতুন গাড়িতে ছিল। পুরাতন মানসিক হাসপাতালের সামনে তাদের গাড়ি থামায় রাশিয়ানরা। তারপর গাড়িটাকে এক গর্তে ফেলে আর্মার্ড কারের সাহায্যে গুঁড়িয়ে দিয়ে মাটিচাপা দেয়া হয়। এরপর আমার কাজিন ও তার বন্ধুদের ইচ্ছেমতো পিটিয়ে গুলি করে ওরা। সবশেষে গর্ত ঢেকে দেওয়া হয়। এখন সেই কবরের ওপর দিয়ে রাস্তা হয়েছে। প্রতিদিন গাড়ি চলাচল করে।

এই সৈন্য আমাদেরকে জায়গাটায় নিয়ে যায়। অন্যথায় আমরা হয়তো কখনোই ধারণা করতে পারতাম না, এখানে কাউকে কবর দেওয়া হয়েছে। ওপর দিয়ে দিব্যি গাড়ি চলছে। আমরা গর্ত খুঁড়ে আমাদের ভাই ও আরো দুটো লাশ পেলাম।

আমি জানি না, চতুর্থ সৈন্যটা এসবে অংশগ্রহণ করেছিল কিনা। তার দাবি, সে করেনি। আমি তাকে দোষারোপ করি না। বাধ্যতামূলকভাবে নিযুক্ত সৈন্যরা পশুর মতো, এরা কিছুই জানে না। সে আমাদের বলে, তার অফিসাররা তাকে মৃতদেহকে গুলি করতে বাধ্য করে যেন সে জ্যান্ত মানুষকেও গুলি করতে অভ্যস্ত হয়। এসব সৈনিকদের দোষ নেই, অফিসাররা ওদের মানুষ বলেই গণ্য করে না। ওদের কোনো ডকুমেন্ট নেই; স্রেফ কুকুরের মতো একটা মেটাল ট্যাগ। এমনকি তাদেরকে বলাও হয় না যে তারা কোথায় যাচ্ছে; অথচ তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে চেচনিয়ায়।

এক লেফটেন্যান্ট এবং আরো দু'জন সেনা ছিল এই হত্যাকাণ্ডের হোতা। আমি আমার

BanglaBook.org

কন্টাক্টকে সেই লেফটেন্যান্টের খোঁজ বের করে দিতে বললাম। নইলে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে হলেও ওকে খুঁজে বের করে আনব আমি। আমি জানি, তারা কারা। আমার কাছে ওদের নাম আছে। ওরা টহলের দায়িত্বে ছিল আর আশেপাশে মানুষ কম থাকলেই লোকেদের গাড়ি থামিয়ে আর্মার্ড কারে তুলত, ছিনতাই করত, গাড়ি ভেঙে দিত, প্যানকেকের মতো পিষে ফেলত, গাড়ির পার্টস বিক্রি করত আর নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলত।

মৃত নয়, জীবিত অবস্থায় ওদেরকে আমার কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এর জন্য অনেক টাকা গুনতে হয়েছে আমাকে। আমি তাদের জীবিত চাই। আমি ওদের চোখে চোখ রেখে দেখতে চাই। ওরা এখান থেকে চলে গেলেও কোনো ব্যাপার না। আমাদের থেকে বেশি দূরে যেতে পারবে না।

আমরা ওদের খুন করব না। ওরা বাঁচবে। কিন্তু আমরা এমন কিছু করব যাতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওরা চেচনিয়াকে ভুলতে না পারে। তারা খেতে পারবে ঠিকই কিন্তু কখনোই নিজে নিজে খেতে পারবে না এবং পরিবারকেও খাওয়াতে পারবে না।

আমার কাজিন আর ওর দুই বন্ধু ছিল হীরের টুকরো। ওরা রাজনীতি বা কোনো খারাপ কাজে জড়িত ছিল না। সামান্য কিছু টাকার জন্য ওরা আমার ভাইদেরকে কুকুরের মতো গুলি করে মেরেছে।

আমরা একসাথে বড় হয়েছি। ওদেরকে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বলে ডাকতাম। যুদ্ধ শুরু হলে ওদের বাবা-মা ওদেরকে যোদ্ধাদের থেকে দূরে থাকতে বলত। তাই ওরা চলে গিয়েছিল। পরে যুদ্ধ শেষ হয়েছে ভেবেই ওরা ফিরে এসেছিল। আর ওদের কপালেই এই জুটল! ওদের বয়স ছিল বিশের কোঠায়। শামখান ছিল সবার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। গুলি করার পূর্বে ওর আঙুল কেটে দেয়া হয়, পাঁজরের হাড় ভেঙে ফেলা হয়। আরেকজনের মাথা ছিদ্র হয়ে যায়। অপরজনের পা ভেঙে দেয়।

রাশিয়ানরা কী ভেবেছে? সব এখানেই শেষ হয়ে যাবে? ওরা এই পাহাড় বা ওই পাহাড় দখল করতে পারে কিন্তু এরপর তারা নিজেদের দিগ্বিদিক দৌড়াতে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করবে। তারা কখনো শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না এখানে। কখনো না। তারা ভুলে গেছে, আমাদের শরীরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। এই আগুন খুবই ভয়ংকর। আমরা প্রতিশোধ নেব এবং বেঁচেও থাকব।

Banglabook.org

দ্বিতীয় পর্ব

স্বাধীনতার অনল

ছোট্ট যে ঘরটি আয়েশের ভারে নুয়ে পড়ত,
সেথায় আজ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ।

'Fire of Circassian liberties', লারমন্টভ।

অধ্যায় এক
টিলাবাসী মানুষের কথা

রাশিয়ানরা সবসময় ককেশাস বিজয়কে ইতিবাচক, জনগণের জন্য উপহার হিসেবে উপস্থাপন করে। ওদের দাবি, ওরা আমাদের এখানে সভ্যতার ছোঁয়া এনে দিয়েছে। অথচ আমাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতিই যে আমাদের সভ্যতার পরিচায়ক এটা বেমালুম ভুলে গেছে ওরা।

-আসলান টভ
আদিজিয়ার রাজধানী মাইকোপের ঐতিহাসিক জাদুঘরের প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিদ

আদিজিয়ার পাহাড়ি জঙ্গলে, খামিশকি গ্রামের পেছনে একটা প্রাগৈতিহাসিক সমাধি আছে। সমাধিটা অনেকটা বাসস্টপ আর স্টোন হেঞ্জের মতো। শ্যাওলার আস্তরণ পড়া ধূসর রঙা পাথুরে স্ল্যাবগুলো একটা আরেকটার গায়ে গা ঠেকিয়ে চারকোণা একটা দেয়ালে রূপ নিয়েছে। কবরের সামনের স্ল্যাবটা দুই মিটার উঁচু। দেড় মিটার উচ্চতায় পোর্টহোলের মতো গোলাকৃতির একটা ফুটো। পর্যটকদের ধারণা, পাথরগুলো প্রায় তিন-সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার। কিন্তু এখানকার স্থানীয় কিংবা রাশিয়ান, কেউই এই রহস্যময় সমাধি 'ডোলমেন'র ব্যাপারে কিছু জানে না।

ককেশীয়দের সবারই তাদের উৎপত্তি নিয়ে কোনো না কোনো থিয়োরি আছে। কিন্তু এদের মাঝে দুই একটা সম্ভাবনার সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায় শুধু। চেচেনদের মাঝে মিথের প্রচলন আছে, নেকড়ে মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম হয়েছে ওদের। ইমাম শামিলের মতে, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তার সাম্রাজ্যের

BanglaBook.org

সব অপরাধীদের এখানে নির্বাসনে পাঠাতো, সেখান থেকেই এই হরেক রকম জাতির উদ্ভব। ওসেটিয়ানরা নিজেদের সিথিয়ান এবং সারমাটিয়ানদের বংশধর মনে করে। কারো কারো দাবি অনুযায়ী, চেঙ্গিস খান বা তৈমুর লং-এর বংশধর তারা। ওদের দাবি কখনো কখনো হাস্যকর ঠেকে, যেমন: আমি এক মাতাল চেচেন থেকে শুনেছি যে, ওরা রোমান আর্মির বংশধর।

এই জট ছাড়ানোর কোনো উপায় নেই। এশিয়া আর ইউরোপের মেলবন্ধন গড়ে তুলেছে এই এলাকা। এ কারণে সময়ের পরিক্রমায় অনেক বিদেশি দখলদার এবং বণিক এসেছে এই অঞ্চলে। আসা-যাওয়ার এই প্রক্রিয়াটা চলেছে বারবার। এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ নিয়ে এরকম অদ্ভুত এক মিশ্রণের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মের ব্যাপারেই বলি; এখানে খ্রিস্ট ধর্ম এসেছে চতুর্থ শতাব্দীতে, আর দাগেস্তান থেকে ইসলাম বিস্তার লাভ শুরু করেছে ৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে।

মানুষের কাছে ডোলমেন সাক্ষাৎ এক রহস্য। ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মের অন্তত দুই হাজার বছর আগে এটা তৈরি করা হয়েছে। দেখে মনে হয় উত্তর ককেশাসে বেড়াতে আসা কোনো আগন্তুকের তৈরি। নির্মাণশৈলীতে ইউরোপীয় ধাঁচ থাকলেও কেউ এর নির্মাণপ্রক্রিয়া বা নির্মাণের কারণ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না। বরং উত্তর ককেশাস অঞ্চলের কুরগান নামক ভূ-অভ্যন্তরীণ টিলাগুলোর ব্যাপারে তারা এর চাইতে ভালো বলতে পারে।

কুরগান সংস্কার অনুযায়ী মৃতলোকদের তাদের ধনসম্পত্তি আর স্ত্রী-সহ কবর দেওয়া হতো। লাশ থাকত সোজা এবং হাঁটু ওপরের দিকে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সহস্রাব্দী পর্যন্ত চলে এসেছে এই রীতি। সবচাইতে বিখ্যাত কুরগানগুলোর একটা বর্তমান আদিজিয়ার রাজধানী মাইকোপে, যা খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ সালে স্থাপিত হয় এবং আবিষ্কৃত হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে। স্বর্ণ, রৌপ্য, দামী পাথর, জর্জিয়া বা মেসোপটেমিয়া থেকে আনা অস্ত্রশস্ত্রসহ আরো অনেক কিছুই পাওয়া যায় কুরগানটিতে। অনেক কুরগান বহু আগেই লুটপাট হয়ে গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা যেগুলো আবিষ্কার করতে পেরেছে সেগুলো থেকে উদ্ধারকৃত সম্পদগুলো এখন রাশিয়ার বিভিন্ন জাদুঘরের শোভাবর্ধন করছে। মাইকোপের গুপ্তধন সেইন্ট পিটার্সবার্গের হারমিটেজ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

BanglaBook.org

গ্রিক সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং এশিয়ান গোত্রের আগমনে উত্তর ককেশাসের

ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। কয়েকটি এশিয়ান জাতি এ সময় রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল জয় করে। ৮৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আগত ইন্দো-ইরানি ভাষাভাষী সিথিয়ানরা এদের মধ্যে সবচাইতে বড় ভূমিকা রাখে। এর কিছুকাল পরে গ্রিকরা ব্ল্যাক-সী'র কাছে ক্রিমিয়ান পেনিনসুলা দখল করে নেয়। দু'দলই স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মিশে যায়। সিথিয়ানদের পরে আসে সারমাটিয়ানরা। ওরা এসে সিথিয়ানদের সরিয়ে দেয়। দল দুটো একে অপরের আত্মীয় ছিল এবং দু'দলই সৌন্দর্য এবং রহস্যের পূজারী ছিল।

সিথিয়ান এবং সারমাটিয়ানদের কবরগুলো ভয়ংকর এবং দর্শনীয় ছিল। অভিজাত কোনো রাজা মারা গেলে তাকে স্বর্ণের পাহাড়, অস্ত্র, ঘোড়া, রক্ষিতা, খানসামা, রাঁধুনী এবং কয়েকজন পারিবারিক সদস্যসহ কুরগানে দাফন করা হতো। পরের বছর পঞ্চাশটি ঘোড়া এবং পঞ্চাশজন যুবককে মেরে মমি বানিয়ে কুরগানের আশেপাশে লটকে রাখা হতো যেন তারা তাদের রাজাকে পাহারা দিতে পারে।

প্রথম মিলেনিয়ামের দ্বিতীয়ার্ধ উত্তর ককেশাসের জন্য সুবর্ণ সময় ছিল। এ সময় গ্রিক, সিথিয়ান, সারমাটিয়ানরা স্থানীয়দের সাথে বসফোরান নামক রাজ্যের অধীনে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করত। ক্রিমিয়ান উপদ্বীপ থেকে ব্ল্যাক-সী'র উত্তর-পূর্ব উপকূল পর্যন্ত ছড়ানো রাজ্যটি একটি গ্রিক উপনিবেশ হিসেবে শাসিত হতো। ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে এটি পরিণত হয় একটি সম্পদশালী স্বাধীন রাষ্ট্রে। ৪৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্পার্টক নামের একজন থ্রাসিয়ান একটি নতুন রাজবংশের গোড়াপত্তন করে।

বসফোরান রাজ্য ছিল সংস্কৃতির একটি অসাধারণ সংমিশ্রণ। রাজ্যের ছিল একজন কেন্দ্রীয় রাজা কিন্তু সিথিয়ান ও মায়োটিয়ানরা নিজেদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখেছিল। তারা আজোভ এবং ব্ল্যাক-সী'র প্রায় সকল ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত। নিজেদের মুদ্রাও ছিল বসফোরানদের।

প্রথম শতাব্দীতে বসফোরান রোমান সাম্রাজ্যের বলয়ে ঢুকে পড়ে এবং চতুর্থ শতাব্দীতে হুনদের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, যুদ্ধ, আক্রমণের ফলে ধীরে ধীরে পতন শুরু হয়। আজ শুধু ব্ল্যাক-সী'র ধ্বংসাবশেষ বসফোরান রাজ্যের স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলছে। সারমাটিয়ানদের বংশধররা ওসেটিয়াতে টিকে আছে। ওসেটিয়ানদের ভাষা, সঙ্গীত এবং পৌত্তলিক ধর্ম প্রাচীন যুগের সারমাটিয়ানদেরই প্রতিচ্ছবি। প্রতীকীভাবে উত্তর ওসেটিয়ানরা আলানদের

BanglaBook.org

নামানুসারে তাদের প্রজাতন্ত্রের নাম রাখে আলানিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সময় আলান ছিল একটি বৃহৎ সারমাটিয়ান গোত্র। ইউরোপজুড়ে আলানদের পদচিহ্ন দেখা যায়, সেখানে তারা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফ্রান্সের কিছু শহর যেমন এলেনকোনেও তাদের চিহ্ন পাওয়া যেতে পারে। ৫০০০ এরও বেশি সারমাটিয়ান সেনা ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের মধ্যবর্তী হাড্রিয়ান ওয়াল পাহারা দেয়। তারা তৃতীয় শতাব্দীতে ল্যাংকশায়ারের রিবচেস্টার গ্রামে চলে যায়। রোমানদের বিরুদ্ধে সাঁজোয়া অশ্বারোহী বাহিনির প্রবর্তন ছাড়াও পরবর্তীকালের আরেকটি বিস্ময়ের সাথে তাদের সম্পর্ক আছে—দ্য ইউরোপিয়ান নাইট। সম্ভবত এই অভিজাত অশ্বারোহী বাহিনির সংস্কৃতিও উত্তর ককেশাস থেকে এসেছে। সাহসিকতা আজও পাহাড়িদের পরিচায়ক।

'টামগাস' (সিল/স্ট্যাম্প বিশেষ) নামক শত শত রহস্যময়ী হেরাল্ডিক ডিজাইনের মধ্যেও অতীতের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। জাঁকজমকহীন কিন্তু সুরুচিপূর্ণ ডিজাইনগুলো দেখে মনে হবে যেন স্প্যানিশ ষাঁড়ের গায়ে মালিকানা চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহৃত সিল। প্রথম শতাব্দীর টামগাসগুলো এখনো আদিজেই উপনাম নির্দেশ করে এবং কবরের এপিটাফে দেখা যায়। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু হলো—গ্রিক খঞ্জর। কোনো মিউজিয়ামে গিয়ে আড়াই হাজার বছর পুরনো ছুরি দেখলে বুঝে নেবেন, এটা কিনঝাল'র মরিচা ধরা পুর্বসূরি ব্যতীত ভিন্ন কিছু নয়।

বসফোরান রাজ্যের পতনের পরে এই অঞ্চল আরো কয়েকবার আক্রমণের শিকার হয়। ২৪০ খ্রিস্টাব্দে বাল্টিক গথ, ৩৭০ খ্রিস্টাব্দে এশীয় হুনরা আসে। এরপর আভার, খাজার এবং তুর্কিদের শাসন ৪র্থ থেকে ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

দশম থেকে ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত সারকাসিয়ানদের কর্তৃত্ব চলে। এরা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল খ্রিস্টান। স্বায়ত্তশাসিত সামন্ত রাজাদের রাজত্ব ব্ল্যাক-সী'র পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় সারকাসিয়ানরা সংগঠিত না থাকলেও ব্যবসায় ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। সারকাসিয়ান সৈন্যরা ১৩ থেকে ১৯ শতকের মিশর শাসনকারী মামলুক রাজবংশের গোড়াপত্তন করে। এমনকি আজও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির নিরাপত্তা বাহিনীতে অনেক সারকাসিয়ানের দেখা পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চেঙ্গিস খানের পাঠানো শক্তিশালী মঙ্গোলিয়ান

BanglaBook.org

বাহিনি মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ রাশিয়া, ইউরোপ এবং উত্তর ককেশাসের বেশিরভাগ অঞ্চল দখল করে নেয়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে তৈমুর লং এই অঞ্চল জয় করে। তৈমুর লংয়ের বিজয়ে অন্যান্যদের মতো মঙ্গোলিয়ানরাও এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। এরপর আরো একবার আক্রমণ হয় এই এলাকায়। তবে এবার পূর্ব দিক থেকে নয়, উত্তর থেকে। এবার আক্রমণ করে রাশিয়ানরা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় দুই
পবিত্র যুদ্ধ

এই ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সম্প্রদায়, পৃথিবীর এক প্রান্তে যাদের বেষ্টন করে আছে অর্ধবর্বর মুসলিম ও রাশিয়ান সেনা, তারা নিজেদের অনেক উন্নত মনে করে। তারা কেবল কোসাকদেরই মানুষ বলে মনে করে আর বাকিদের করে ঘৃণা।

কোসাকদের সম্পর্কে লিও তলস্তয়-এর বর্ণনা

প্রথম পর্যায়ে ১৬শ শতাব্দীতে কেটে যায় মধ্যযুগের ধুলোর আস্তরণ, এরপর ১৪৮০ সালে মঙ্গোলদের পরাজয়ের পর উত্তর ককেশাস নিজেকে আবিষ্কার করে—খ্রিস্টান রাশিয়া এবং মুসলিম অটোমান সাম্রাজ্য—এ দুটি পরাশক্তির মধ্যখানে।

১৫৫৬ সাল নাগাদ বিস্তৃত রাশিয়ান সাম্রাজ্য কাস্পিয়ান সাগরের আসট্রাখান বন্দর দখল করে নেয়। এর কিছুদিন পরে ভোলগা ছেড়ে তেরেক নদীর দিকে অগ্রসর হয়। ওসেটিয়ান, চেচেন এবং ইঙ্গুশদের এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল তেরেক নদী। ককেশাসের দক্ষিণে খ্রিস্টান জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া মস্কোর মিত্র ছিল। তারা পারস্যের মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার কাছে সাহায্য চায়। ব্ল্যাক-সী'তে এক খানের অধীনে ক্রিমিয়ান উপদ্বীপে বসবাসরত মঙ্গোলিয়ানরা ছিল তুরস্কের মিত্র।

উত্তর ককেশাসের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল দখল করে নেয় আদিজেই-সারকাসিয়ান উপজাতি। তুরস্ক এবং রাশিয়া উভয়েই তাদের আনুগত্য অর্জনের বিশেষ চেষ্টা করে, যেমন: ১৫৫৭ সালে কার্বাড গোত্রের সাথে শান্তি চুক্তি

BanglaBook.org

এবং ১৫৬১ সালে মস্কোর সম্রাট ইভানের সাথে কাবার্ড গোত্রপতি তেমরুকের মেয়ের বিয়ে। তবে ইতিহাসবিদরা এসব মিত্রতার যেসব অফিসিয়াল তারিখ নিবন্ধন করেছেন সেগুলোও সঠিক নয়। ১৬ শতকের শেষ এবং ১৮ শতকের শুরুর দিকে যখন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাশিয়া তাদের দেশ জয় করার ইচ্ছে পোষণ করছে তখন কাবার্ড এবং অন্যান্য আদিজেই-সারকাসিয়ান উপজাতি রাশিয়ার কাছ থেকে দূরে চলে যায় এবং অটোমান সাম্রাজ্যকে গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে ইসলাম এই অঞ্চলের প্রভাবশালী ধর্ম হয়ে ওঠে।

সবারই চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী ককেশাসের ওপর কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ। তুর্কিদের জন্য ককেশাস ছিল ব্ল্যাক-সী'র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রমবর্ধমান রাশিয়ান সাম্রাজ্যকে থামিয়ে রাখার একটি উপায়। মস্কোর জন্য ককেশাস জয়ের মানে ছিল ব্ল্যাক-সী থেকে শুরু করে পারস্য, তুরস্ক এমনকি ভারতের পথ পরিষ্কার হওয়া। সেই প্রাচীন আমল থেকেই ককেশাসের ইতিহাসের সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক পারস্যের। কিন্তু অটোমানদের সাথে শত্রুতা করে নিজেদের দুর্বল করে ফেলেছে পারসিকরা। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়াও ওদেরকে ক্রমশ দক্ষিণে ঠেলে দিয়েছে।

দক্ষিণে রাশিয়ানদের আগ্রাসনের মূলনায়ক ছিল কোসাক জাতি। কোসাকরা যেন একটা মানব উপনিবেশবাদী যন্ত্র, ওরা আগুনের জবাব আগুন দিয়ে দেয়। ককেশাসে তাদের উদ্ভব রহস্যজনক। কোসাকদের একাংশ দাবি করে যে, তাদের স্লাব পূর্বপুরুষরা সিথিয়ান, সারমাটিয়ান বা খাযারদের সংমিশ্রণে একটি নতুন জাতির উদ্ভব করে। মধ্যযুগে তারা ছিল রাশিয়ার ক্রীতদাসবৎ দায়বদ্ধ কৃষক। পরে তারা পালিয়ে লুণ্ঠনকারীদের দল গঠন করে; কোনো আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাশিয়ার দক্ষিণাংশে ঘুরে বেড়ায়। ধীরে ধীরে কোসাকরা ডন, ভোলগা ও নিইপার নদীবর্তী অঞ্চলে সংকুচিত হয়ে আসে। সেখানে তাদের নিজস্ব পরিচয় তৈরি হয়। তারা গ্রামীণ সামাজিক ও স্বাধীন জীবনযাপন ভালোবাসে। ১৬৫৪ সালে অধিকাংশ কোসাকই বিবেচনাযোগ্য স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে রাশিয়ার আনুগত্য করতে সম্মত হয়। এরপর ১৮শ শতাব্দীর শেষদিকে আগ্রাসী নিইপার গ্রুপ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে আসে। ককেশাসে তাদের প্রধানত দুটি দল ছিল—একটি দল পশ্চিমে কুবান নদীতীরে, আরেকটি দল বসতি গড়ে পূর্বাঞ্চলে তেরেক নদীর পার্শ্ববর্তী কালো ভূমি অঞ্চলে, যা ছিল সমৃদ্ধিশীল রাশিয়ান সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ কৃষি ভূমি।

BanglaBook.org

কোসাকরা অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন, কঠিন এবং পুরোপুরি যুদ্ধবাজ জাতি। কোসাকরা রাশিয়ানদের ক্রীতদাসবৎ দায়বদ্ধ কৃষক হিসেবে মুক্ত হলেও অঙ্গীকার করে যে, তাদের প্রতিটি পুরুষ সেনাবাহিনিতে ২৫ বছর সেবা দেবে। বেশ কিছু ক্ষেত্রেই কোসাকরা ছিল আমেরিকান কাউবয় (American cowboy)-এর প্রাথমিক ভার্সন। তারা ছিল দীপ্তিমান অশ্বারোহী ও স্বাধীনচেতা। তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বসতি স্থাপনকারী বৈশিষ্ট্য। মস্কোর সেনারা ছিল স্বদেশে ফেরার জন্য কাতর। এজন্য গ্যারিসন থেকে সেনা সরবরাহ করার পরিবর্তে মস্কো সবসময় কোসাকদের দিয়েই নতুন দেশ জয় করে আস্তানা গেঁড়ে বসত। কোসাকরা ছিল রাশিয়ার অস্ত্র বিশেষ; প্রত্যেক অভিযানেই জয় নিয়ে ফিরে আসত।

সম্রাট ও খ্রিস্টান ক্রুশের অনুগত হওয়া সত্ত্বেও কোসাকদের সাথে মুসলিমদের ভালোবাসা ও ঘৃণার মিশ্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

আলেকজান্ডার দ্যুমা-দ্য কাউন্ট অব মন্টে ক্রিস্টো, দ্য থ্রি মাসকিটিয়ার্স ও আরো বেম কিছু শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনির রচয়িতা-’দ্য অ্যাডভেঞ্চার ইন দ্য ককেশাস’-এ লিখেছেন, কোসাকরা দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ‘রিয়ারগার্ড’(পশ্চাতসারির সৈন্য) ঔপনিবেশিকরা আবাস গড়ে ডন নদীর তীরে আর ‘ফ্রন্টিয়ার’ (সম্মুখসারির সৈন্য) সীমান্তে বসতি স্থাপন করে।

‘ফ্রন্টিয়ার’ একজন কোসাকের জন্ম হতো শত্রুদের দৃষ্টিসীমানার ভেতর। একদম ছোটবেলা থেকেই লড়াই করতে হতো তাকে। শৈশব থেকেই এদের বিপদ-আপদের সাথে পরিচয়। বারো বছর বয়সে উপনীত হলে সেনাবাহিনিতে নিযুক্ত করা হতো। অপরদিকে ডন নদী তীরের কোসাকরা কৃষিকাজে সময় দিত। প্রশান্ত ও মহান নদীর তীরেই অতিবাহিত করত ছেলেবেলা।

তলস্তয় তার ‘দ্য কোসাক’ বইটিতে কোসাকদেরকে তেজস্বী ও সাহসী রূপে চিত্রায়ন করেন। উদ্ধত রাশিয়ানদের চেয়ে যারা অঞ্চলকে ভালোভাবে বুঝত। তা সত্ত্বেও কোসাকদের বিবেচনা করা হতো বহিরাগত হিসেবে। তারা অন্যের ঘরে লুণ্ঠন করত, এমনকি আজও মুসলিমদের সাথে তাদের শত্রুতার গভীরতা অনুভব করা যায়। তলস্তয়সহ উনিশ শতকের পর্যটক ও লেখকবৃন্দ বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছেন যে, বাহ্যিকভাবে কোসাকদের মাঝে ককেশীয়দের গুণাবলী থাকলেও তারা সবসময়ই এক ধাপ পিছিয়ে ছিল। তারা খুব ভালো অশ্বারোহী ছিল না, একদম সোজা গুলি ছুঁড়তে পারত না। সর্বোপরি

BanglaBook.org

তাদের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য ছিল; ককেশীয়রা তাদের মাতৃভূমি রক্ষার জন্য লড়াই করত আর কোসাকরা হামলা চালাত অন্যদের ভূমিতে।

সোভিয়েত শাসনের অধীনে কোসাকদের প্রচুর অবনতি ঘটেছে। তবুও তারা ইতিহাসে আগ্রহের জায়গাটি ধরে রেখেছে, একদিকে উত্তর ককেশাসে রাশিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে এবং অপরদিকে স্থানীয় মুসলিমদের সবচেয়ে ভালো বোঝার কারণে।

***

মোসকফের অহংকার চূর্ণ করার জন্য জন্ম
অধস্তন ধুলোর হোক ধ্বংস,
সে লড়েছে, সে জিতেছে, কাছে ও দূরে,
অভিশপ্ত সেই জাতি উত্তরাঞ্চলে।

-শাইখ মানসুর সম্পর্কে তাতার বাল্লাদ।

১৭৮৫ সালে মানসুর নামক এক চেচেন স্বপ্নে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেন। স্বপ্নে তাকে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই বিপ্লবী আসলে কে ছিলেন তা কেউ পুরোপুরি নিশ্চিত করে বলতে পারে না। কেউ কেউ বলে, তিনি ছিলেন সত্যিকারের স্বপ্নদর্শী। অন্যদের মতে একজম ইতালিয়ান অ্যাডভেঞ্চারার, খ্রিস্টধর্ম থেকে ইসলামে দীক্ষিত। এমনকি তার আসল নাম নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু মানসুরের উৎপত্তি আসলে এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়-অন্যসব সুফীদের মতোই তার জীবন শুরু যখন তার বয়স ছিল ত্রিশের কোঠায় এবং এর দশ বছর পর মারা যান- তবে তার সংক্ষিপ্ত জীবন ও অন্তিম মুহূর্তই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে।

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা হলো, তিনি চেচেন ছিলেন। তার আসল নাম ছিল উশুরমা, আবাস আল্ডি গ্রামে। একজন পরহেজগার লোক, আধ্যাত্মিক ইসলামি সুফী ঐতিহ্যের অনুসারী। নকশবন্দী তরিকতের অনুসারী; কেন্দ্রীয় এশিয়ার বুখারায় শতবর্ষ ধরে এর অনুশীলন ছিল কিন্তু উত্তর ককেশাসে তা ছিল একেবারেই আনকোরা। তাই উশুরমা কীভাবে নকশবন্দী হলেন তা এক রহস্য। নবীকে স্বপ্নে দেখার পর তিনি নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখেন মানসুর। আরবিতে মানসুর মানে হলো— বিজয়ী। সে সময় তাকে শাইখ উপাধি

BanglaBook.org

দেওয়া হয়। চেচেন যোদ্ধাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী জন্মসূত্রেই তিনি সৈনিক ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন অজ্ঞাতনামা জীবনীকার তার সম্বন্ধে লিখেছেন, 'এমনকি ঘুমের ঘোরেও সে পুরোপুরি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকত। এই অদ্ভুত অভ্যাসের ব্যাখ্যায় সে বলত, "একজন সম্মানিত চেচেনের পক্ষে লড়াইয়ের জন্য অপ্রস্তুত থাকা লজ্জাজনক।" তার মতে, একজন চেচেনের সর্বদা তৈরি থাকা উচিত। সত্যিকার চেচেন কখনো বিশ্রামের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না।'

শাইখ মানসুরের আবির্ভাবকালে রাশিয়ান আগ্রাসন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। ধীরগতিতে হলেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে সেই ধারা অব্যাহত থাকে। তবে রাশিয়ানরা বড়সড় ধাক্কাও খায়। ১৬০৫ সালে দশ হাজার রুশ সেনাকে ঘিরে ফেলে দাগেস্তানি পাহাড়বাসী। অতঃপর বেপরোয়াভাবে সবাইকে হত্যা করে। সে সময় তুর্কিদের সাথে দাগেস্তানিদের সখ্য ছিল। ফলে রুশ অভিযানের গতি থেমে যায় তবে একেবারে বন্ধ হয়ে যায় না। ১৭৬০-এর দিকে আগ্রাসনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এরকম বিপর্যয়ের পরও কি সম্রাট বরিস গোদুনভ জানত যে, ভবিষ্যতে এই বিষমভূমিতে আধুনিক সেনাবাহিনির সাথে আগ্রাসী গেরিলা যোদ্ধাদের অসংখ্যবার লড়াই হবে? সে কি কখনো ভেবেছিল, উত্তর ককেশাসের কর্তৃত্ব অর্জন করতে রাশিয়ার আরো আড়াইশ বছর লেগে যাবে?

১৭৭২ সালে পিটার দ্য গ্রেট দাগেস্তানের ডারবেন্ট দখল করে নেয়। এক বছর পরে আজারবাইজান উপকূলে বাকু শহর কব্জা করে। এক দশক পরে রাশিয়ানরা তাতার-মঙ্গোলিয়ানদের বংশধর এবং তাদের অটোমান রক্ষাকর্মীদের কাছ থেকে ক্রিমিয়ান উপদ্বীপ জয় করে নেয়, ফলে ব্ল্যাক-সী'র পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ১৭৮৪ সালে আরেকটি মাইলফলক ছিল ভ্লাদিকাভকাযের দুর্গ জয়। এর মাধ্যমে ককেশাস শাসন করা সহজ হয়ে যায় রাশিয়ানদের জন্য। স্থানীয় ওসেট ও কাবার্ডদের সাথে দুর্গ ও শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলিম উপজাতিগুলির মধ্যে একটি সংযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে দুর্গ এবং কোসাক বসতি দিয়ে সৃষ্ট রাশিয়ানদের দেয়াল আরো খানিকটা বিস্তার লাভ করে।

১৭৮৫ সালে মানসুরের ছয় বছরের অভিযানে সবচেয়ে বড় বিজয়টি আসে চেচনিয়ায় সুনঝা নদীর ওপর রাশিয়ান বাহিনীর সাথে সরাসরি সংঘর্ষে। রানী দ্বিতীয় ক্যাথরিনের সৈন্যরা আল্ডি গ্রাম আক্রমণ করে কিন্তু শেষকালে বনের মাঝে অতর্কিত অ্যাম্বুশের শিকার হয়। সব মিলিয়ে মারা যায় প্রায় ছয়শ

সৈন্য ও কর্মকর্তা। মানসুর উত্তর ককেশাসের বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে তিনি দাগেস্তান থেকে পশ্চিমে কুবান নদী পর্যন্ত বিশ হাজার সশস্ত্র লোক জোগাড় করতে সমর্থ হন। চেচনিয়া থেকে দাগেস্তান পর্যন্ত জিহাদ ছড়িয়ে দেন মানসুর শেখ। কিন্তু কিযলিয়ারে রাশিয়ান দুর্গ জয়ে ব্যর্থ হয়ে কাবার্ডিনো-বালকারিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হন তিনি। পরবর্তীতে রাশিয়া-তুরস্ক যুদ্ধের সময় আদিজেই-সারকাসিয়ানদের মাঝে জিহাদ ছড়িয়ে পড়ে।

মানসুরের ভাগ্য তেমন ভালো ছিল না। ব্ল্যাক-সী'র উপকূলে আনপা তুর্কি দুর্গে অবস্থানকালে রাশিয়ানরা দুর্গ আক্রমণ করে তাকে বন্দী করে। চুক্তি অনুসারে তুর্কিরা তাদের দুর্গটি কিছুকাল পরেই ফেরত পায় কিন্তু মানসুরকে রানী দ্বিতীয় ক্যাথরিনের কাছে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়।

খুব বেশি দিন বাঁচেননি মানসুর। চল্লিশের কোঠায় থাকতেই তার মৃত্যু হয়। কিন্তু মানসুরের আধ্যাত্মিক সুফী শিক্ষার উত্তরসূরি ও জিহাদ সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন ও অন্যদের মৃত্যুর পরও টিকে থাকে। তার প্রচারিত সুফী তরিকা উত্তর ককেশাসে স্থায়ী হয়ে যায়। এরপর ১৮৫০ সালে কুনতা হাজী নামের আরেক সুফী এই অঞ্চলের মানুষকে কাদিরিয়া তরিকার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। নকশবন্দী এবং কাদিরিয়া- দুই তরিকারই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যিকির। নকশবন্দীরা নীরবে নিভৃতে যিকির করে কিন্তু কাদিরিয়ারা যিকির করে জোরে জোরে, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। বৃত্তাকারে দৌড়ে, নেচে, লাফঝাঁপ করে ও ড্রাম বাজিয়ে। এটা নির্ভর করে নির্দিষ্ট দলের ওপর। যিকির কয়েক ঘণ্টা ব্যাপি চালু থাকে।

১৮৬০ সালের শেষ দিকে রাশিয়ানরা সুফী তরিকার শক্তি সম্পর্কে ধারণা পেলে যিকির নিষিদ্ধ ঘোষণা করার চেষ্টা করে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ সে সময় আরো মারাত্মক পদক্ষেপ নেয়। তারা আধ্যাত্মিক রাহবারদের ধরে ধরে গুলি করে মারে এবং মসজিদ বন্ধ করে দেয়। তা সত্ত্বেও দুটো তরিকাই শত প্রতিকূল পরিস্থিতি পাড়ি দিয়ে সোভিয়েত যুগ পর্যন্ত টিকে থাকে। এদের কোথাও দেখা না গেলেও দাগেস্তান, চেচনিয়া এবং ইঙ্গুশেটিয়ার আন্ডারগ্রাউন্ডে ঠিকই অস্তিত্ব রক্ষা করে ছিল পুরোটা সময়। যিকির এসব লোকের চারপাশে একটা পবিত্র ঢাল গড়ে তুলেছিল। নিজেদের ওপর তাদের আত্মবিশ্বাস ছিল। এসব ছোট ছোট দল সব জায়গায় সমবেত হয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ধর্মীয় পবিত্রতার দরুণ

BanglaBook.org

অনবরত যিকির করত। সুফীরা যিকিরের মাধ্যমে মানসিকভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতো। অনেকেই মৃত্যুর ভয় করত না। কারণ তারা আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করত। তাদের প্রশিক্ষণ তাদেরকে দলগতভাবে কাজ করার শিক্ষা দিয়েছিল, যুদ্ধের জন্য যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

গেখি, চেচনিয়া

পনেরো জন লোক বৃত্তাকারে বসা। ঐকতানের সাথে সবাই একযোগে জোরে, ধীরে ও বিষাদী হয়ে যিকির করছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য অন্য কোনো ইলাহ নেই। সবাই ছন্দে ছন্দে তালি দেয় আর কোরাসের মতো যিকিরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়, ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

একে অপরের এক ইঞ্চি দূরত্বে দাঁড়িয়ে তালি দিতে দিতে যিকির চালিয়ে যায়- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!' হঠাৎ করেই বৃত্তটি ধীরে ধীরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত ঘূর্ণনে ভাঙতে থাকে, তবে যিকির তখনো চলমান। সবাই একযোগে তাদের পা বাইরে থেকে ভেতরে নিয়ে আসে, সবার মধ্যেই একটা উন্মত্ততা। আবার আচমকাই পনেরো জন একই তালে থেমে যায় এবং পুনরায় ভেতরের দিকে মুখ ফেরায়। ক্রমান্বয়ে যিকিরের ধ্বনি জোরালো হতে থাকে।[৪]

---

৪. প্রসঙ্গ যিকির: যিকির জোরে বা আস্তে উভয়ভাবেই করার সুযোগ রয়েছে। তবে আস্তে যিকির করা উত্তম।

শর্ত সাপেক্ষে জোরে যিকির করাও জায়িয। এক্ষেত্রে ৪টি বিষয় সামনে আসে। যথা:

১. উঁচু আওয়াজে যিকির করা।
২. যিকিরের মজলিস কায়েম করা।
৩. সম্মিলিতভাবে যিকির করা।
৪. যিকিরের মাঝে অস্বাভাবিক আচরণ করা।

১. উঁচু আওয়াজে যিকির করা।

উঁচু আওয়াজে যিকির করতে চাইলে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।
(ক) অন্য কারো ইবাদাতে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না।
(খ) কারো ঘুমের ক্ষতি করা যাবে না।
(গ) লৌকিকতামুক্ত হতে হবে।
(ঘ) যিকিরকারীর নফসের আত্মশুদ্ধির নিয়ত থাকতে হবে।

BanglaBook.org

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর যুগে লোকেরা ফরয সলাত শেষে উচ্চস্বরে তাকবীর বলত। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "এভাবে উচ্চস্বরে তাকবীর বলা শুনে আমি বুঝতে পারতাম যে, লোকদের সালাত সমাপ্ত হয়েছে।" (সুনানু আবি দাউদ, ১০০৩)

২. যিকিরের মজলিস কায়েম করা।
মজলিস কায়েম করে যিকির করা জায়িয। হাদীসের মাঝে এর সপক্ষে প্রমাণ ও ফযিলত পাওয়া যায়।

- আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, উভয়ই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে জামাআত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে, ফেরেশতারা সেই জামাআতকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আল্লাহর রহমত। তাদের উপর সকীনা নাযিল হয়। আর আল্লাহ তাআলা নিজ মজলিসে (গর্ব করে) তাদের কথা বলেন। (সহীহ মুসলিম, ২৭০০; মুসনাদু আহমাদ, ১১৮৭৫)
- আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে সমস্ত লোক আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হয় এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তখন আসমান হতে এক ফেরেশতা ঘোষণা করে যে, তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের গুনাহকে নেকি দ্বারা পাল্টে দেওয়া হয়েছে।" (মুসনাদু আহমাদ, ১২৪৫৩; মাযমাউয যাওয়াঈদ, ১৬৭৬৪)
- আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা কিছু লোকের হাশর এমনভাবে করাবেন যে, তাদের চেহারায় নূর চমকাতে থাকবে, তারা মোতির মিম্বারে বসা থাকবে। অন্যান্য লোক তাদের দেখে ঈর্ষা করতে থাকবে। তারা নবীও হবে না, শহীদও হবে না।" কেউ একজন বলল যে, "হে আল্লাহর রাসূল, তাদের অবস্থা বলে দিন, যেন আমরা তাদের চিনতে পারি।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তারা ওই সমস্ত লোক যারা বিভিন্ন এলাকা ও বংশ হতে এক জায়গায় একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকিরে মগ্ন হতো।" মাযমাউয যাওয়াঈদ, ১৬৭৭০)
- আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যখন জান্নাতের বাগান দিয়ে পথ অতিক্রম করবে, তখন তাতে বিচরণ করো।" সাহাবীরা বললেন, "জান্নাতের বাগান কি?" তিনি বললেন, "যিকিরের হালাকাসমূহ।" (সুনানুত তিরমিযি, ৩৫১০; মুসনাদু আহমাদ, ১২৫২৩; মুসনাদুল বাযযার, ৬৯০৭)

সম্মিলিত যিকির
সম্মিলিত যিকির বলতে সকলে একই সুরে কোরাস করে যিকির করাকে বোঝানো হয়। এভাবে যিকির করার কোনো প্রমাণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের যুগ থেকে

পাওয়া যায় না। তাই এভাবে যিকির করাকে সুন্নাহ বা বিশেষ সওয়াবের কাজ মনে করলে তা বিদআত হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্মিলিতভাবে কোরাস করে যিকির করাকে অপছন্দ করে মজলিস থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ৪/৪৪০, কিতাবুন নাওয়াযিল, পৃ. ৪৫৫-৪৫৬)

যিকিরে অস্বাভাবিক আচরণ করা

ইচ্ছাকৃতভাবে যিকিরে অস্বাভিক আচরণ করা হারাম। তবে যদি যিকির করার সময় অনিচ্ছাকৃত কোনো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়, সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় কোনো অস্বাভাবিক আচরণ করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে মাযুর মনে করা হবে। তাকে ভর্ৎসনা করা যাবে না। (আওয়ারিফুল মাআরিফ, পৃ. ১১৮-১১৯; আল-ইতিসাম, ১/৩৫৬)

আল্লামা শাতিবী রহ. তার 'আল-ইতিসাম'গ্রন্থে আল্লামা আবু বকর আজুররি রহ. থেকে উদ্ধৃত করেন,

"অধিকাংশ মুর্খরা যে চিৎকার করে উঠে, লাফ দেয়, মাতাল-মাতাল ভাব করে, এ সবই শয়তানি কর্মকাণ্ড। শয়তান ওদের সাথে খেলা করে। এগুলো বিদআত ও ভ্রষ্টতা।" (আল-ইতিসাম, ১/৩৫৬) *-সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।*

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় তিন
দ্য লায়ন অব দাগেস্তান

ওহে মানুষ! উন্মুক্ত তরবারি হাতে,
আমাদের সাহায্যে এসো,
চিরবিদায় জানাও ঘুম ও বিশ্রামকে,
আমি তোমাদের ডাকছি আল্লাহর নামে।

-ইমাম শামিলের যুদ্ধবন্দনা

দাগেস্তানি পাহাড়ের গভীরে গিমরিতে সকল প্রাণের স্পন্দনই যেন পাথর ফুঁড়ে বের হয়। জমিনের মাটি এতোই শক্ত যে আভার জাতির লোকেরা এক ধরনের বিশেষ মাটি খুঁড়ে তোলা ও আগাছা দূর করার যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। যন্ত্রটি কেবল তাদের গ্রামেই পাওয়া যায়; হস্তনির্মিত ও হস্তচালিত। হ্যান্ডেলটি হাতে ধরে পা দিয়ে চেপে ব্যবহার করতে হয় যন্ত্রটি। ছোট পরিমণ্ডলের কারণে গিমরির আবহাওয়া অপ্রত্যাশিতভাবেই শান্ত প্রকৃতির। আশেপাশের সব জমিই পাথুরে, আশ্চর্য রকমের শুষ্ক। প্রাণের স্পন্দন এতোই বিরল যে, এই জমিনে কোনো ফসল ফলবে বলে মনে হয় না। বসতবাড়িগুলো দেখলে মনে হয় যেন মৌচাকের মতো একটা আরেকটার ওপর গাদা করে রাখা। এখানকার অধিবাসীরা খানিক মাটির দেখা পেলেই আরেকটু মাটি পাবার আশায় আশেপাশের পাথর সরিয়ে প্রশস্ততা বাড়ানোর চেষ্টা করে। গ্রামের চারপাশেই উপত্যকা, ছোট ছোট টিলা ও পাথরের পাহাড়। আর অদূরে যতোদূর চোখ যায়, দেখা যায় আরো শুষ্ক, রুক্ষ ও পাথুরে পাহাড়ের সারি।

১৭৯৬ সালে এখানে ইমাম শামিলের জন্ম হয়। তিনি মোটেও সুস্থ শিশু

BanglaBook.org

ছিলেন না। কিন্তু শামিল শুধু তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারই করেননি বরং তার দেশের মাটির মতোই কঠিন আর রুক্ষ হয়ে বেড়ে উঠেছেন, তারপর টানা ত্রিশ বছর জন্মভূমিকে রক্ষার জন্য যুদ্ধও করেছেন। পাঁচ লাখ রাশিয়ান সৈন্যর বিরুদ্ধে লড়েছেন; সুপারপাওয়ারের সাথে গেরিলা যুদ্ধের এরকম নজির খুব কমই আছে সারা পৃথিবীতে।

শামিলের কৈশোরকালে রাশিয়ানরা ককেশীয়দের সমভূমি থেকে পাহাড়ের দিকে তাড়াতে শুরু করে। ফলে কমে আসে ককেশীয়দের জমি। রাশিয়ানরা ব্ল্যাক-সী থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত একটা রেখার মতো তৈরির চেষ্টা করে। রাশিয়ার উপনিবেশবাদী অভিযান এই অঞ্চলের সামাজিক কাঠামো ভেঙে দেয়। মুসলিমদের মাঝে ওরা মদ্যপানের অভ্যাস গড়ে তোলে আর আদিবাসীদের ঠেলে দেয় পাহাড়ি অঞ্চলে। ১৮১৬ থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে রাশিয়ান জেনারেল ইয়ারমোলভের অভিযানে অবস্থা আরো খারাপ হয়। ভালুকের মতো ভারি চেহারার ধূসর চুলবিশিষ্ট এক লোক। মানুষের জীবনকে সে ছেলেখেলা মনে করত। নৃশংসতা ছিল তার নীতিমালা। ইয়ারমোলভ তার বাহিনিকে বিশাল এক দৈত্যের মুষ্টির মধ্যে থাকা পুতুলের মতো নিয়ন্ত্রণ করত। 'আমার প্রবল ইচ্ছা, আমার নামের ভয়েই প্রহরীরা সীমান্ত পাহারা দেবে... আমার কথা আদিবাসীদের জন্য মৃত্যুর চেয়েও অনিবার্য হবে। আমার কথাই হবে আইন।' এ কথাগুলো বলত ইয়ারমোলভ। এই দুঃস্বপ্নের মাঝে গ্রামবাসীর ভাগ্য ছিল হয় আত্মসমর্পণ করা অথবা নির্মূল হয়ে যাওয়া। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ফেলা হতো। ঘোড়ায় চড়ে কেউ রাশিয়ান দুর্গে আক্রমণ করতে আসলে কামান উত্তর ককেশীয়দের চূর্ণবিচূর্ণ করে দিত।

১৮১৮ সালে চেচনিয়ার নিম্নভূমিতে ইয়ারমোলভ একটা বিশাল দুর্গ নির্মাণ করে এবং নাম দেয় 'গ্রোজনি'। 'গ্রোজনি' মানে হলো ভয়প্রদর্শনকারী। ইয়ারমোলভের দৃষ্টিতে আদিবাসীরা ছিল বর্বর, যারা কেবল পেশীশক্তিই বুঝত। ইয়ারমোলভ আশা করেছিল, ১৮২০ সালের মধ্যে দাগেস্তান ও চেচনিয়ার বিদ্রোহ দমন করে ফেলবে। এরপর তার বাহিনি নিয়ে চলে যাবে পশ্চিমে কাবার্ডিয়া ও সারকাসিয়ায়। লোকটার শ্বাসপ্রশ্বাসের মাঝেও যেন অহংকার ছিল; 'মানবতার ক্ষেত্রে আমি প্রচুর পরিমাণে কঠোর। বিদ্রোহীদের একটা লাশ শত শত রাশিয়ানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।'

কুবান নদের দক্ষিণে আদিজেই-সারকাসিয়ান অঞ্চলেও অগ্নি ও তরবারির

BanglaBook.org

এই অভিযান ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৮৬ সালে ব্রিগেডিয়ার নোরিং তার রিপোর্টে লেখে, 'গতকাল ও আজকে আমরা আবাযা ও কালমাইকের শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে দিয়েছি এবং পদদলিত করেছি আমাদের ঘোড়ার খুর দিয়ে। মাস্টার ফার্স্ট মেজর ও অভিযানের সেনাপতি ইয়ানোভকে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সব জ্বালিয়ে দিতে বলেছি।'

এ সময় কিছু চেচেন এবং দাগেস্তানি গোত্র কোনো কিছুর পরোয়া না করে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে থাকে। পরিবার আর গোত্র ছাড়া আর কোনো কিছুর প্রতি মাথা নত করত না ওরা। উত্তর ককেশাসের এই অঞ্চলটা বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। বাইরের মিত্রশক্তি বা রাজনৈতিক বন্ধু ছিল না ওদের। নিজেদের মাঝে দুই একটা মিত্র গোত্র থাকলেও প্রায়শই ওরা একে অন্যের ভাষা বুঝত না। পশ্চিমে পাহাড়িদের সমাজব্যবস্থা ছিল ভিন্ন তবে রাশিয়ান আক্রমণ প্রতিহত করতে তারাও প্রস্তুত ছিল না। সারকাসিয়ান গোত্রগুলোর বেশ অর্থসম্পদ—স্বর্ণ, দাসদাসী ও গৃহপালিত পশু ছিল। বিশেষ করে আকর্ষণীয় কাবার্ডিয়ান ঘোড়ার কথা না বললেই নয়। তবে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে মিল ছিল। ক্রমশ ইসলাম ধর্মের প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছিল তবুও সারকাসিয়ানরা তাদের বিভিন্ন জায়গীরদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। অন্যদিকে কাবার্ডরা সবসময়ই রাশিয়ানদের সাথে চুক্তি করতে আগ্রহী ছিল। তবে ব্ল্যাক-সী'র নিকটবর্তী গোত্রসমূহ যেমন, শাপসুগস উত্তরাঞ্চলবাসীর যেকোনো প্রকার অনধিকার চর্চাকেই প্রতিহত করত। উসমানী সাম্রাজ্যের সাথে সারকাসিয়ানদের বাণিজ্য, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বন্ধন থাকলেও তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল সেই বন্ধন কতোটা দুর্বল।

এই শূন্যের মাঝে যে ব্যক্তি পা বাড়ান, তার নাম শামিল। তিনি মানসুরের মতো অপরিচিত ছিলেন না। ১৮৩৪ সালে শামিলকে দাগেস্তানের নেতা বা ইমাম ঘোষণা করা হয়। তার আগের দুই ইমামের বদৌলতে যুদ্ধের সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপোক্তই ছিল। প্রথম ইমাম ছিলেন শামিলের প্রতিবেশী বন্ধু গিমরির গাজী মুহাম্মাদ। ১৮২৯ সালে গাজী মুহাম্মাদ নকশবন্দী মুরিদদের একত্রিত করে একটা মুজাহিদ দল গঠন করেন। তিনি রাশিয়ানদের ওপর বিদ্যুৎগতিতে ধারাবাহিক আক্রমণ করেন। দ্রুতই যুদ্ধের কলাকৌশল বুঝে নেয় তার লোকেরা। তারা সকলেই ছিল অভিজ্ঞ তরবারি ও রাইফেল চালক এবং দক্ষ অশ্বারোহী। দেশকে তারা অন্তর দিয়ে জানত। নকশবন্দী মুরিদদের জিহাদের দীক্ষা দেওয়াই

BanglaBook.org

তাদের মুজাহিদ বানানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। তাদের বীরোচিত ভূমিকা মুরিদিজম নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

দাগেস্তানি পাহাড়ের কালো পর্বতগাত্রের পশ্চিমে ইঙ্গুশেটিয়া, উত্তরে কিযলিয়ার এবং কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বে ডেরবেন্ট দুর্গে গাজী মুহাম্মাদের মুজাহিদ বাহিনি রাশিয়ানদের ওপর আক্রমণ করে। অতিরঞ্জনের দুর্বলতার কারণে হয়তো আলেকজান্ডার দ্যুমা উত্তর ককেশাসের এক ভ্রমণে লিখেছেন- কিযলিয়ারের ধ্বংসযজ্ঞে ছয় হাজার মানুষের শিরচ্ছেদ করা হয়। ১৮৩১ সালের দিকে রাশিয়ানদের ছিল বিশ হাজার বেয়োনেট বাহিনি। তারা গাজী মুহাম্মাদকে শিকার করতে বের হয়। এক বছর পর রাশিয়ানরা গিমরির একটা বনভূমিতে গাজীর পঞ্চাশ জন মুজাহিদকে কোণঠাসা করে ফেলে। এদের মাঝে গাজী মুহাম্মাদও ছিলেন। মাত্র দু'জন এই মৃত্যুফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তন্মধ্যে একজন হলেন ইমাম শামিল।

রুশ সেনাদের মরণফাঁদ থেকে শামিলের পালিয়ে আসার ঘটনা এখনো বিখ্যাত। কথিত আছে, তিনি বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে প্রথম সারির সৈন্যদের মাথার ওপর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যান। এরপর বেয়োনোটের খোঁচায় রক্তাক্ত শরীর নিয়েই রাতের আঁধারে হারিয়ে যান দৃষ্টিসীমার আড়ালে। আজও গিমরিতে গেলে জায়গাটা দেখা যায়; ইমাম শামিল যেখানে লাফ দিয়ে পড়েছিলেন সেখানে একটা চিহ্নও আছে। তার পালানোর ঘটনাটা রীতিমতো অবিশ্বাস্য ও রহস্যজনক।

শামিল নেতৃত্ব হাতে নেয়ার আগে দুই বছর দলটাকে পরিচালনা করেন দ্বিতীয় ইমাম হামযা বেক। তার পরই দলের তৃতীয় ইমাম হিসেবে অভিষিক্ত হন ইমাম শামিল। তবে স্বাধীনতার পথে শামিলের এই লাফই কিংবদন্তী চালু করে, লোকেরা সম্মান করতে শুরু করে। তাকে দেওয়া হয় 'দ্য লায়ন অফ দাগেস্তান' উপাধি।

গিমরি, দাগেস্তান

গিমরির কোনো কিছুই খুব বেশি পুরনো নয়—শামিল এবং পরবর্তীতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শহরটি ধ্বংস হয়ে যায়। তবে পাথুরে নির্মিত জায়গাটি দেখতে বহু প্রাচীন মনে হয়। রাস্তাগুলি আবদ্ধ, খাড়া ও খুব সরু। ঘরগুলোও ছোট এবং পরস্পরের সাথে লাগোয়া, সমতল ছাদ। জায়গাটা এমন

BanglaBook.org

যেন কেউ চাইলেই ঘরের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে রাস্তা দিয়ে চলা কারো হাত ধরতে পারে। বাইর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই ঘরের ভেতরে কতো জায়গা। ভেতরে ছোট আঙ্গিনা, বেজমেন্ট, রুমের ভেতর রুম, বারান্দা ও খোলা ছাদ। সমতল ছাদের ওপর আছে আঙুরের বাগান। কোনো কোনো ঘরে আছে আবদ্ধ বারান্দা।

আমার নোটবুকে গিমরিকে মনে রাখতে আমি কেবল চারটি শব্দ লিখেছি। তখন নোট করার মতো পর্যাপ্ত সময় ছিল না আমার কাছে। শব্দ চারটি হলো: ফোয়ারা, রক্ত, মদ নেই। কীভাবে যেন এই চারটি শব্দই গিমরির দুনিয়াবিমুখতা নির্দেশ করে।

ফোয়ারা: এখানে এলাকার মহিলা এসে পানি সংগ্রহ ও গল্পগুজব করে। তরুণী থেকে বৃদ্ধা- সবাই সমবেত হয়। অধিকাংশের মাথায়ই থাকে কালো স্কার্ফ। সূর্যের আলোতে চকমক করে পানি নির্গমনের নল। তরুণীদের কেউ কেউ অবাক করা সুন্দরী। আমাকে হেঁটে যেতে দেখে তারা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ওদিকে বৃদ্ধারা কথা থামিয়ে আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

রক্ত: প্রধান চত্বরে তারা ভেড়া জবাই করে আর সরু রাস্তা দিয়ে ছোট নদীতে প্রবাহিত হয় সেই ভেড়ার রক্ত। এরকম একটা বর্ণহীন পরিবেশে উজ্জ্বল লাল রক্ত প্রাণবন্ত ভাব নিয়ে আসে।

মদ নেই: প্রাচীরযুক্ত গিমরি উপত্যকায় প্রবেশ করলেই পথিমধ্যে নির্দেশনা বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়।

> *ওহে ভ্রমণকারী! আপনি 'ইমামদের ভূমি' গিমরি গ্রামে প্রবেশ করছেন। ইমামদের বংশধারার পবিত্রতা রক্ষার জন্য আমরা অনুরোধ করছি, আপনারা যেন কোনো প্রকার মদ এই পবিত্র ভূমিতে নিয়ে না আসেন।*

BanglaBook.org

শামিলের আসল বাড়িটা বহু আগেই হারিয়ে গেছে। ঠিক একই জায়গায় তৈরি হয়েছে আরেকটি বাড়ি। আঙ্গিনার দেয়াল ও বিশাল কাঠের দরজা দ্বারা বাড়িটি রাস্তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে রাখা হয়েছে। ভেতরটা আবদ্ধ। আবার কোথাও কোথাও অপ্রত্যাশিতভাবে অল্পটুকুন খোলা জায়গা; আমি সেখানে বসে সূর্যস্নান করতে করতে চারপাশের পর্বতমালা দেখি। শামিলের এক

দূরবর্তী বংশধর খুসেইন খাযিমাগোমেদভ আমার জন্য চা নিয়ে আসে। আমরা রাশিয়ার সাথে ককেশীয়দের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করি। সে বলে, 'ওরা আমাদের বন্ধুত্ব কিনতে পারবে না। আপনি কখনো কারো উদ্দীপনা কিনতে পারবেন না। ওরা কেবল আমাদের নেতাদেরই কিনে নিতে পারে। সেটা তো ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে।'

গিমরিতে মাত্র কয়েকটি গাড়ি আছে। তাছাড়া এখানকার রাস্তাটা এমনিতেও বেশ সরু। মাঝেমধ্যে গাধা-গরু চলাফেরা করে; সাথে থাকে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে আবৃতা বৃদ্ধা মহিলা অথবা ঘনকালো চোখ ও চুলবিশিষ্ট শিশুরা। রাস্তার ঠিক অপর পাশেই মসজিদ। মসজিদের মিনার থেকে সমগ্র গ্রামের আঙ্গিনা দেখা যায়। সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবীর দ্বার খুলে যায়। প্রত্যেক জায়গাই কোনো না কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কোণায় গরুর খামার, এদিকে মুরগী, ওদিকে সবজি ও কাপড় শুকানোর স্থান।

প্রথম ইমাম গাজী মুহাম্মাদের কবর গ্রামের এক প্রান্তে। একটা সাধারণ কুঁড়েঘরের মধ্যে তার সমাধি, লোকজনের জন্য সেটা দরগা হিসেবে কাজ করে। সুফি সাধকদের জন্য একটি তীর্থস্থান। গিরিখাতে তার মৃত্যুস্থানের মতো এখানেও শত শত রঙিন রুমাল সাজানো আছে। কবরস্থানের মাঝে সোনালি ঘাসগুলো শান্তিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠেছে, বিপরীতে উড়তে থাকে লাল, সাদা ও সবুজ রঙের রুমালগুলো।

গ্রামটির একটি ভয়ংকর অতীত রয়েছে তবে সত্তর বছর ধরে এখানে কোনো যুদ্ধ হয়নি। আর এখন কমিউনিস্টরাও চলে গেছে, ফলে মসজিদ উন্মুক্ত। পুরনো অনেক ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে গেছে। আমি কালো পর্বতগাত্রের আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম খাঁজকাটা নদীটি উপত্যকাকে কেটে ফেলেছে। আমি বিস্ময়ের সাথে খুসেইনকে বললাম, 'রাশিয়ান অফিসারদের আঁকা উনিশ শতকের রোমান্টিক চিত্রকর্মের সাথে দেখছি সত্যিই বাস্তবের মিল আছে!'

তবে প্রশংসাটা ভালোভাবে নেওয়া হলো না। সে বলল, 'রাখো রাশিয়ান অফিসারদের কথা! শামিলের সময়ে তারা তিনবার গিমরি ধ্বংস করেছে। আমরা নিজেরাও জানি না, ওরা কতোবার আমাদের শস্য ধ্বংস করেছে আমাদের না খাইয়ে রাখার জন্য।'

এরকম একটা মুহূর্তে অতীতকে ভুলে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

BanglaBook.org

***

শামিলের শাসন এখনও উত্তর ককেশীয়রা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে। পূর্ববর্তী নেতাদের মতো তিনি কেবল রাশিয়ানদের বশ্যতা অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হননি বরং নেপোলিয়নকে পরাজিতকারী সেনাবাহিনিকে প্রায় তিন দশক ঠেকিয়ে রাখেন। সাধারণ কোনো সামরিক প্রতিভা নয়, তিনি একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন। যিনি ইসলাম এবং কঠোর নীতি ব্যবহার করে উপজাতিতে বিভক্ত মুসলিম পাহাড়িদের এক জোট করতে সক্ষম হন। তার বিপ্লবী দলের কেউ-ই আজ জীবিত নেই কিন্তু তার সেই গোর্টসি সংস্কৃতি বেঁচে আছে সব ককেশীয়দের মনোজগতে। এটাই শামিলের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য।

শামিল ইসলামি শারীয়াহ আইনের প্রবর্তন করেন। ফলাফল যাই হোক না কেন, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শিক্ষাটাও তার কাছ থেকেই পাওয়া। ভীতি প্রদর্শন কিংবা প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনিই সব পাহাড়ি গোষ্ঠীর সমর্থন পেতে সক্ষম হন। প্রয়োজনে শামিল হয়ে উঠতেন ভয়ংকর নিষ্ঠুর। প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকদের শিরচ্ছেদ বা গুপ্তঘাতকদের লাশ ছিন্নভিন্ন করতেও দ্বিধা করতেন না। এর ফলে সামান্য অসন্তোষ দেখা দেয়। রাশিয়ানরা এই অসন্তোষকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। পরিকল্পনা সফলও হয়; ১৮৫১ সালে শামিলের অন্যতম প্রধান সেনাপতি হাজী মুরাত দলত্যাগ করে। রাশিয়ার দাঙ্গা-হাঙ্গামার তুলনায় শামিলের শাসন ছিল একদম হালকা। রাশিয়ানরা পরিবার আর গ্রাম প্রতিশোধের কারণে ধ্বংস করেনি বরং এটাই ছিল ওদের নীতি।

শামিল একজন উদ্ভাবনী ও উদ্যমী শাসক ছিলেন। ট্যাক্স এবং জরিমানা ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি যুদ্ধকালীন সমস্যার সমাধান এবং সম্পূর্ণ জাতিকে সামরিকীকরণের উপায় বের করেন তিনি। বিচ্ছিন্ন হাজার হাজার দক্ষ যোদ্ধাদের একত্র করেন, প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজন করে পুরুষকে সেনাবাহিনিতে নেওয়ার ব্যবস্থা নেন । প্রতি দশ বাড়ি থেকে একজন এলিট এবং বাকি নয় বাড়ি থেকে সাধারণ সেনা সংগ্রহ করা হতো।

একের পর এক রাশিয়ান জেনারেলকে তাড়াতে সক্ষম হন শামিল। পদাতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে শামিলের বাহিনি ছিল অপ্রতিরোধ্য। ১৯ শতকের অন্যতম সফল রাশিয়ান জেনারেল ভেলিয়ামিনোভ লিখেছেন: আদিবাসীরা আমাদের সাধারণ সৈন্য ও কোসাকদের চেয়ে বহুদিক থেকে অনন্য। তাদের

BanglaBook.org

সবার জন্ম ঘোড়ার পিঠে। ছোটবেলা থেকেই তারা ঘোড়ায় চড়তে জানে। সামরিক কর্মকাণ্ডে সফলতা লাভ করা প্রত্যেক আদিবাসীর জন্যই অপরিহার্য। সামরিক যোগ্যতা ছাড়া দেশবাসীর কাছ থেকে বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা কোনোটাই তারা পায় না বরং সবার হাসির পাত্রে পরিণত হতে হয়।

শামিলের বাহিনিতে একচেটিয়া অশ্বারোহী বা পদাতিক সৈন্য থাকলেও ভারি অস্ত্র ছিল সামান্যই। রাশিয়ান সেনাবাহিনির প্রধান অস্ত্র কামান শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হতো। উত্তর ককেশীয়রা যতোদিন নিজেদের এলাকায় ছিল ততদিন তারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করেছে। দাগেস্তানের পাহাড় আর চেচনিয়ার বন জঙ্গল তাদের অনুকূলে সুবিধা দিয়েছে সবসময়। এই পাহাড়, জঙ্গল সব তাদের হাতের তালুর মতো চেনা। এখানে বিদেশি হামলাকারীরা হালে বিশেষ পানি পেত না। শামিল বলতেন, 'আমি স্রেফ একজন পাহাড়ি মানুষ। কিন্তু পাহাড় ও জঙ্গল আমাকে অনেক ক্ষমতাধর শাসকদের চেয়েও শক্তিশালী বানিয়ে দেয়। আমার অবশ্যই গিরিখাতকে মুকুট পরানো উচিত, কারণ দাগেস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অনেক অবদান।'

অ্যাম্বুশ আর ঝটিকা আক্রমণ ছিল ককেশীয়দের প্রধান যুদ্ধ কৌশল। সাব্রে এবং কিনঝাল হাতে ককেশীয়রা দারুণ হিংস্র হয়। সেরা রাশিয়ান সৈন্যদেরও পেরে ওঠা কঠিন। গিমরির একটা জাদুঘরে দুটো এন্টিক সাব্রে সংরক্ষিত আছে! আলেকজান্ডার দ্যুমা লিখেছেন: কোনো কোনো পাহাড়ির কাছে আজও ক্রুসেডারদের তরবারি পাওয়া যায়। অনেকেই লাল ক্রুশ সম্বলিত কোট পরিধান করে। অথচ তারা জানেও না যে, এটা জেরুজালেম বা কনস্ট্যান্টিনোপলের সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন। তারা কেবল জানত তরবারির ধার এখনো প্রখর।

রাশিয়ানরা ককেশাসের যতো গভীরের দিকে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে, নিজেদের ততো বেশি বিপদের ভেতর আবিষ্কার করেছে। কাউন্ট ভরন্তসভ ইমাম শামিলকে ধরার জন্য ডার্গোতে যে বার আক্রমণ করে সে সময় রাশিয়ানরা সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ভরন্তসভের সাথে প্রথমে ছিল একুশ হাজার সৈন্য। অপরদিকে পাহাড়ের পাদদেশে বিদ্রোহীদের তেমন কোনো ঘাঁটি ছিল না। ১৮৪৫ সালের ১৮ই জুলাই চেচনিয়ার নব্য ভাইসরয় কাউন্ট ভরন্তসভ সাড়ে এগারো হাজার সৈন্য নিয়ে ডার্গো গ্রাম দখল করে। সেইন্ট পিটার্সবার্গে বসে তারা ভেবেছিল, ডার্গো বড় কোনো সামরিক ঘাঁটি হবে। অথচ ডার্গো ছিল দুর্দশাগ্রস্ত একটি ছোট্ট গ্রাম।

BanglaBook.org

অভিযান সফল হওয়ায় সম্রাট নিকোলাস দ্বিতীয়ের কাছ থেকে বেশ প্রশংসাও পায় ভরন্তসভ। তবে শামিল কিন্তু হারেননি। কেবল কৌশলগত কারণে পশ্চাদপসরণ করেছেন। ছোবল মারার আগে সাপের মাথা পিছিয়ে নেয়ার মতো। এরপর, যখন রাশিয়ানদের আর পিছিয়ে আসার সুযোগ ছিল না, তাদের অবস্থানগুলো চিহ্নিত হলো- শামিল তার ফাঁদ গুটিয়ে আনলেন।

ডার্গোতে অবস্থানরত রাশিয়ানদের রসদে ঘাটতি পড়ার পরেই শুরু হলো শামিলের রক্তগঙ্গা। রসদ নেওয়ার জন্য রাশিয়ান আর্মির একটা অংশ গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। রসদ আসার অপেক্ষা করছিল ওরা। অতর্কিত অ্যাম্বুশে ওই দলের ৫৫৬ জন মারা যায় এবং ৮৫৮ জন্য আহত হয়। গ্রামের বাকি সৈন্যরা খাদ্য ও গোলাবারুদের অভাবে লেজ গোটাতে বাধ্য হয়। কিন্তু দুঃস্বপ্নের শেষ হয়নি তখনো। আহত যোদ্ধাদের কারণে রাশিয়ানদের গতি শ্লথ হয়ে আসে। এই সময় ইমাম শামিল একের পর এক অ্যাম্বুশের মাধ্যমে ক্রমেই কাবু করে ফেলে রাশিয়ান বাহিনিকে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ মারা যায়। তল্পি-তল্পা যা ছিল ওজন কমানোর জন্য ফেলে যেতে বাধ্য হয়। কামান এসে পড়ে দাগেস্তানিদের হাতে। যতোদিনে রি-ইনফোর্সমেন্টের দেখা পায় রাশিয়ান বাহিনি ততদিনে ওদের ৯৮৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এদের মাঝে তিনজন জেনারেলও ছিল। ২৭৫৩ জন আহত আর ১৭৯ জনের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর প্রাপ্তির খাতা তো শূন্যই।

ওডেসার ব্রিটিশ উপদেষ্টা জেমস ইয়েমেস তার প্রতিবেদনে দু'পক্ষের নৈতিক পার্থক্য সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ইয়েমেস লেখেন, 'রাশিয়ান সেনারা আগে যেখানে নতুন সেনাপতির চরিত্রের কারণে প্রাণবন্ত থাকত আজ তারাই ভুগছে মারাত্মক হতাশার মধ্যে। অপরদিকে শামিল ও ককেশাসের স্বাধীন গোত্রসমূহ এতোটা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর যে তারা সন্ধিস্থাপনের কথা চিন্তায়ই আনত না।'

BanglaBook.org

***

সারকাসিয়ার যুবকরা এগিয়ে চলো যুদ্ধপানে,
সাহসী যুবকরা সর্বদা যুদ্ধ ভালোবাসে।
যদি তুমি মারা যাও, তবে তুমি শহীদ,
আর যদি বেঁচে থাকো তবুও গৌরব তোমার।

-১৯ শতকের সারকাসিয়ান যুদ্ধবন্দনা

পশ্চিমে ব্ল্যাক-সী'র কাছে সারকাসিয়ান বা আদিজেইরা ইমাম শামিলের দলে যোগ দেয়নি। উসমানীয়রা খ্রিস্ট এবং প্যাগান ধর্মের পরিবর্তে ইসলাম প্রচলনের খুব চেষ্টা করে এদিকে। তবে এখানকার অধিবাসীরা মুরিদ হওয়া বা নকশবন্দী সুফিয়ানার ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী ছিল না। মতপার্থক্য থাকলেও আলাদাভাবে একই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল ওরা।

সারকাসিয়ানদের লড়াইয়ের সবচেয়ে বড় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণগুলির অন্যতম হলো জেমস বেলের বর্ণনা। পেছনে পেছনে মুষ্টিমেয় ব্রিটিশরা বিদ্রোহীদের যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করলেও সমস্ত প্রমাণ নির্দেশ করে যে, লন্ডন তাদের খুব কম সাহায্যই করেছিল। ১৮৩৭, ১৮৩৮, ১৮৩৯ সালে সারকাসিয়ায় বসবাসরত জেমস বেল সেখানকার পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন, পনেরোশ জনের একটা যোদ্ধার দল রাশিয়ান অধিকৃত অঞ্চলে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। যথারীতি গুপ্তচরদের ভয়ে সতর্কতাস্বরূপ আক্রমণের মূল টার্গেট একদম শেষ মুহূর্তে ঘোষণা করা হয়েছিল। বেল লিখেছেন, 'ঘটনাটি ছিল একইভাবে কাব্যিক, উত্তেজনাপূর্ণ এবং সুরম্য। অসংখ্য পুরুষ ও বালক ঘোড়া এবং তাদের নিজ নিজ গোত্রপ্রধানদের পতাকাগুলি নিয়ে হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

ককেশাসের এই প্রান্তে যুদ্ধ'র একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে, যুদ্ধের বেশিরভাগ লড়াই ব্ল্যাক-সী'র উপকূলে সংঘটিত হয়েছে যার ফলে রাশিয়ান নৌ জাহাজগুলি থেকে এখানে বোমাবর্ষণ করা হতো। শামিলের লোকেরা যেমন দুর্গের কামানের মুখোমুখি হয়েছে, ঠিক তেমনি সারকাসিয়ানরাও জাহাজের তোপের মুখে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবে ক্লোজ কোয়ার্টার ফাইটিং (close-quarter fighting) এ তারা খুবই কার্যকর ও মারাত্মক ছিল।

জাহাজগুলি বেশ কিছু সময়ের জন্য কামান চালিয়েছিল। প্রায় তিন

BanglaBook.org

হাজার লোকের দুটি ব্যাটালিয়ন উপসাগরের এক কোণে অবতরণ করে। আকস্মিক আক্রমণ সারকাসিয়ানদের সমবেত হওয়ার কোনো সুযোগ দেয়নি। তবে আশেপাশে প্রায় এক হাজার যোদ্ধা উপত্যকার আড়ালে রয়ে গিয়েছিল। রাশিয়ান পদাতিক বাহিনি গ্রোভের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা আড়ালে থাকে। এরপর শুরু হয় অত্যন্ত সংঘাতমূলক এক লড়াই। রাশিয়ানরা গ্রামের দিকে অর্ধেকের বেশি পথ যেতে পারেনি। নিঃসন্দেহে গ্রাম ধ্বংস করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

সারকাসিয়ান এবং শামিলের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ হতো। তারা একে অপরকে তাদের সর্বশেষ সফলতার সংবাদ জানিয়ে উৎসাহ প্রদান করত কিন্তু উপজাতি দুটি কখনোই ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। যুদ্ধের গুরুতর অঞ্চলে-কাবার্ডা এবং আধুনিক ওসিটিয়ার অনেকাংশ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য শামিলের বড় একটি সাহসী প্রচেষ্টা ১৮৪৬ সালে রাশিয়ানদের চতুরতা ও কাবার্ডদের দ্বিধার কারণে ব্যর্থ হয়। হামলার পর বোঝা যায়, কাবার্ডা অভিযানটি স্পষ্টভাবে শামিলের জন্য চ্যালেঞ্জ। কারণ শামিল ছিলেন দূরপাল্লার আক্রমণাত্মক হামলার জন্য বিখ্যাত; বিস্ময়করভাবে পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তার লড়াইয়ের গল্প প্রজন্মের পর প্রজন্ম চালু ছিল। কিন্তু কাবার্ডা অভিযান ছিল একটি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ। আক্রমণকারী বিশাল রাশিয়ান বাহিনির রসদ ছিল প্রায় অফুরন্ত। অতএব, এক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

শামিলের অভিযান ব্যর্থ হবার পর পর্যায়ক্রমে এই অঞ্চলে পাঁচ লক্ষ রাশিয়ান সেনা নিযুক্ত করা হয়। সাধারণ মানুষজন সমভূমির দিকে জড়ো হতে বাধ্য হয়। অতি উৎসাহী স্থানীয় নেতাদের ওপর ক্ষমতার ভার ন্যস্ত করা হয়। বনভূমি ছিল শামিল বাহিনির অস্ত্রবিশেষ। এ কারণে বন উজাড়ের সিদ্ধান্ত নেয় রাশিয়ানরা। গাছগুলো কখনো কামানের গোলায় কখনো-বা কুড়োলের সাহায্যে কেটে সাফ করতে থাকে রাশিয়ান বাহিনি।

পাহাড়িদের একমাত্র আশা ছিল বিদেশি হস্তক্ষেপ। রাশিয়ানদের বছরের পর বছর ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা তাদের আছে কিন্তু বিতাড়িত করার ক্ষমতা নেই। তুর্কি বা ব্রিটেন সাহায্য করলে সেটা সম্ভব ছিল। তাদের আশার পেছনে কারণ ছিল। গ্রিকরা যেরকম স্বাধীনতার ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছিল, শামিলও রাশিয়ার সবচেয়ে বড় সুপার পাওয়ার শত্রু ব্রিটেনের কাছে সেটা প্রত্যাশা করেছিলেন।

BanglaBook.org

এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে ককেশাসের আলাদা মূল্য ছিল। ব্রিটেনের সবচাইতে সমৃদ্ধ উপনিবেশ ভারতবর্ষ নিয়েও আশংকায় ছিল ব্রিটেন। ককেশাস নিয়ন্ত্রণে আসলে রাশিয়া ওদিকে হাত বাড়াতে পারে। এ কারণে ইমাম শামিলকে রাশিয়ানদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য সাহায্য করা ব্রিটেনের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রাশিয়ার সাথে স্নায়ুযুদ্ধে কখনো ব্রিটেন বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি। রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে লেখা ইমাম শামিলের সাহায্যের আবেদনের জবাবও আসেনি কোনোকালে। শামিলের চিঠিতে লেখা ছিল:

> *হে সম্মানিত রাণি, অনেক বছর ধরে আমরা আমাদের আক্রমণকারী রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছি। প্রতি বছরই আমাদের নতুন করে আত্মরক্ষা করতে হয় প্রতিপক্ষের নতুন নতুন সেনা হামলার। ওরা আমাদের গ্রাম দখল করে নেয়। আমাদের প্রতিপক্ষ খুবই একরোখা। অপরদিকে প্রতি বছর শীতে আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য জঙ্গলে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হই। সেখানে না আছে খাদ্য, না আশ্রয়; লড়াই করতে হয় তীব্র শীতের সাথে। এরপরও আমরা টিকে আছি শুধু আল্লাহ'র-ই ইচ্ছায়। আমরা আপনার সাহায্য কামনা করছি।*

তবে সারকাসিয়ানদের পক্ষে সাহায্য পাওয়া ছিল সহজ। কারণ এই যুদ্ধ ইতোমধ্যেই মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল ব্ল্যাক-সী'র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তুর্কি আর রাশিয়ার দ্বন্দ্বের সাথে। ওদিকে ইউরোপীয় শক্তিগুলো রাশিয়ার হাতে অটোমান এম্পায়ার যেন শেষ না হয়ে যায় তার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে ছিল। লন্ডন, প্যারিস, ইস্তাম্বুল ও মস্কোর কৌশলবিদরা কুবান নদী, ককেশাস পাদদেশ এবং ব্ল্যাক'সী'র উপকূলে সারকাসিয়ানদের প্রতিরোধ আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ করছিল।

সবচেয়ে বড় সুযোগ ছিল ক্রিমিয়ান যুদ্ধে; ১৮৫৫ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তুরস্ক যখন সেভাস্টপোলের ক্রিমিয়ান বন্দর থেকে রাশিয়ানদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। তুর্কি সামরিক কমান্ডার ওমর পাশা রাশিয়াকে আরো উত্তরে ঠেলে দিয়ে ককেশাস দখল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার বিশাল সেনাবাহিনি এবং উত্তর ককেশাসের নেতাদের সমন্বয়হীনতার কারণে তুর্কিরা গতি হারিয়ে ফেলে এবং ১৮৫৬ সালে এ অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। শুধুমাত্র

BanglaBook.org

ব্রিটিশ সাহায্যই এই অভিযানকে টিকিয়ে রাখতে পারত। কিন্তু এতো মূল্য দিয়ে অখ্যাত ক্রিমিয়ান জয় করে লন্ডনের খুব একটা লাভ হতো না। তাই সচেতনভাবেই তুর্কিদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকে তারা।

ক্রিমিয়ান যুদ্ধের নিষ্পত্তি নিয়ে প্যারিসের ১৮৫৬ সালের চুক্তি উত্তর ককেশীয়দের কফিনে শেষ পেরেক বসায়। ব্ল্যাক-সী থেকে সৈন্য প্রত্যাহার ও নৌ অভিযান বন্ধ করা হলেও রাশিয়াকে ক্রিমিয়ান উপদ্বীপ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তুরস্ককে দাবি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। ফলে সারকাসিয়ানরাও একা হয়ে পড়ে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে ক্রিমিয়া থেকেই তাদের ওপর চড়াও হয় রাশিয়ানরা। রাশিয়া তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে উত্তর ককেশীয়দের ওপর। ধ্বংস খুব নিকটেই ছিল।

১৮৫৯ সালে প্রিন্স ব্যারিটিনিস্কির নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার সৈন্য পাঠানো হয় ইমাম শামিলকে শেষ করার জন্য। দাগেস্তানের সিংহ শামিলকে গুনিবে কোণঠাসা করে ফেলা হয়। শেষ পর্যন্ত চারশ সৈন্য টিকে ছিল তার সাথে। বাকিরা হয় মারা পড়ে নয়তো পালিয়ে যায়। অবরুদ্ধ অবস্থায় দুটো অপশন ছিল তার সামনে; হয় আত্মসমর্পণ নয়তো তার প্রতিটি সাথীর মৃত্যু। শামিল আত্মসমর্পণ করেন। কথিত আছে, তার কিছু সঙ্গী পালিয়ে গিয়ে আরো এক বছর পর্যন্ত লড়াইটা চালিয়ে যায় কিন্তু শামিলের দীর্ঘ সিকি শতাব্দীর বর্ণাঢ্য আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে সেদিন গুনিবে-ই। এরই মাধ্যমে শেষ হয় ঐতিহাসিক মুরিদি আন্দোলনেরও।

ব্যারাটিনিস্কিকে ভরন্তসভের পরিবর্তে ককেশাসের ভাইসরয় হিসাবে পাঠানো হয়। সে ছিল একজন প্রতিভাধর জেনারেল। ইয়ারমোলভের মতো মুসলিম গ্রামগুলো পুড়িয়ে দেওয়ার বদলে সে ঘুষ প্রদান করে। পাহাড় ঘেরাও ও জঙ্গল ধ্বংস করার সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি সে বাস্তবায়িত করেছিল। ছিল চরম কৌশলী। কৌশল অবলম্বন করেই গুনিব অঞ্চলের পর্বতগাত্রে শামিলকে পাকড়াও করে সে।

শামিলের আত্মসমর্পণ নিয়ে উত্তর ককেশাসে উত্তপ্ত বিতর্ক চলতে থাকে। শামিল তার বাঁকানো সাব্রে সমর্পণ করার পর তাকে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গিয়ে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে তার। কালুগায় একটি বাড়িতে সম্মানজনকভাবে গৃহবন্দী করে রাখা হয় তাকে। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সাথে তার সখ্যতা হয়। ধর্মীয় শিক্ষার মাঝে ডুবে থাকতেন তিনি। পরবর্তীতে

BanglaBook.org

তার এক ছেলে হয় রাশিয়ার জেনারেল, আরেকজন তুরস্কের। শামিলের এক নাতি দাগেস্তানে ফিরে ১৯২০ সালে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

ইমাম শামিল ১৮৭১ সালে মদীনাতে মৃত্যুবরণ করেন। সম্রাট তার মক্কায় হজ্জ করার দীর্ঘদিনের আশা বাস্তবায়নের অনুমতি দিয়েছিল অবশেষে। তার সমাপ্তিটা একটু অদ্ভুতভাবে হয়। একজন মুজাহিদ পরিণত হন নিভৃতচারী আবেদে। তাকে যারা চিনত তাদের কাছে ইমাম শামিলের শেষ দিনগুলো তেমন বিস্ময়কর মনে হবে না। তাকে কাছ থেকে যারা দেখেছে তারা জানত, তিনি বরাবরই শান্তিপ্রিয় ছিলেন।

১৮৩৯ সালে সংঘটিত হয় শামিলের সবচেয়ে ভয়ানক যুদ্ধগুলোর একটি। দাগেস্তানের আখুলগো অবরোধ করার সময় রাশিয়ান সৈন্যরা শামিলের সাত বছরের ছেলে জামাল-উদ্দিনকে অপহরণ করে। ছেলেটিকে সেন্ট পিটার্সবার্গে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সম্রাট প্রথম নিকোলাস তাকে বড় করে তোলে। সে পুরোদস্তুর রুশ বনে নিজের শিকড় ভুলে যায়। তবে শামিল তার ছেলেকে ভুলে যাননি এবং অপহরণের জন্য রাশিয়ানদের ক্ষমাও করেননি। ১৮৫৪ সালে তার লোকেরা জর্জিয়ার রাজকুমারী অ্যানেট চেভচাভাদজেকে জিম্মি করে এবং রাজকুমারীর মুক্তির বিনিময়ে শামিল তার পুত্রকে ফিরে পেতে সক্ষম হন। শামিলের মতো কঠিন মানুষও পুত্রকে পেয়ে কাঁদতে শুরু করেন। কিন্তু ট্রাজেডি তখনও শেষ হয়নি। সম্রাটের দরবারে বেড়ে ওঠার কারণে পার্বত্য রুক্ষ জীবনে টিকে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ছেলেটি। ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই সে মৃত্যুবরণ করে।

মুক্তির পর রাজকুমারী চেভচাভাদজে শামিলের চরিত্রের বর্ণনা দেয়। সে শামিলের প্রশংসা করে বলে, 'শামিল ছিলেন সৎ, দুনিয়াবিমুখ ও জ্ঞানী মানুষ। তিনি বেড়াল খুব ভালোবাসতেন।

'কেউ কেউ বলে, শামিলের আত্মসমর্পণ করা উচিত হয়নি। শেষপর্যন্ত লড়ে যাওয়া উচিত ছিল।' কথাগুলো তার বংশধর খুসসেইন খাযিমাগোমেদভের।

তবে আমি মনে করি, তিনি সুবিবেচকের মতো কাজ করেছেন। তিনি চাইলেই বলতে পারতেন, 'চলো সবাই মিলে মৃত্যুবরণ করি,' কিন্তু তা করেননি। তিনি অন্যদের জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবনকে কুরবান করে দিয়েছেন। তিনি জানতেন, আত্মসমর্পণ করলে তারা তার শিরচ্ছেদ করবে বা ফাঁসি দেবে, আর আত্মসমর্পণ না করলে গ্রামের অবস্থা কী ঘটবে, সেটাও

BanglaBook.org

জানতেন। লোকে বলে, তিনি ভয় পেয়েছিলেন। এটা হাস্যকর। শামিলই সেই লোক, যিনি সবরকম ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন এবং ডজনখানেক বার আহত হয়েছেন। বস্তুত, তিনি তার মর্যাদা দেখিয়েছেন। একজন মুজাহিদই নন বরং সত্যিকারের নেতা ছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, লোকেরা যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে।

শামিলের শেষ মানে সারকাসিয়ানদেরও সমাপ্তি। শামিল যতোদিন টিকে ছিলেন ততদিন তাদের প্রতিরোধও কায়েম ছিল। তবে সেই প্রতিরোধ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৩০ সালের দিকে একজন বৃদ্ধ গোত্রপতি জেমস বেলকে বলেছিল, 'রাশিয়ানরা এই দেশ জয় করতে পারবে না। জাহাজ আর কামানের সাহায্যে ওরা হয়তো উপকূলে আরো কিছু জায়গা দখল করতে পারবে-তর্কের খাতিরে যদিও মেনে নেই ওরা পুরাটাই দখল করে নেবে-তাতেও কোনো পার্থক্য হবে না। ওরা এই পাহাড় দখল করে নিলে আমরা তুষারাবৃত পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।'

সারকাসিয়ানরা তাদের কথা রেখেছে। শামিলের পরাজয়ের পর পুরো পাঁচ বছর ধরে লড়াই চালিয়ে যায় তারা। এরপর ১৮৬৪ সালের মে মাসে আবিগা পাহাড়ে চার দিনের শেষ প্রতিরোধের পর তাদেরও পরাজয় ঘটে।

দাগেস্তানের জমির মতো রুক্ষ নয় সারকাসিয়ানদের জমি, বরং অত্যন্ত উর্বর। কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত। তাদের আরো ছিল আইডিলিক ও কৌশলগত ব্ল্যাক-সী উপকূল। এরকম একটা ফার্স্ট ক্লাস এলাকা দখলের ক্ষেত্রে অধিবাসীরাই ছিল রাশিয়ানদের একমাত্র বাধা। ফলে সামরিক প্রতিরোধ যখন ব্যর্থ হয় তখন রাশিয়ানরা জাতিগত নিধন শুরু করে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সাধারণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করেও রুশ সেনারা কোনো কূলকিনারা না পেয়ে বেপরোয়া হয়ে লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগে মেতে ওঠে। পরিণামে পর্বতমালার শক্তিশালী দুর্গ আদিবাসী শূন্য হয়ে যায়।

'পর্বতবাসীদের প্রতিরোধ ভেঙে দাও। পাহাড়ের খোলা ময়দানে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে কোসাক ও রাশিয়ানদের অধিকৃত জমিতে বন্দি করো' - বারিয়াতিনিস্কি ১৮৬০ সালে লিখেছেন। আনুমানিক চার থেকে পাঁচ লাখ সারকাসিয়ান ভয়ে উপকূলে গিয়ে জাহাজে উঠে তুরস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। নিজেদের বাড়িঘর সব ছেড়ে পালায় তারা। রোগে ও অনাহারে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। বিজিত সারকাসিয়ান নেতার ঘটনাও প্রসিদ্ধ। তিনি আত্মসমর্পণের লজ্জা

BanglaBook.org

সইবার বদলে তার ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

জায়গাটা একেবারে খালি করে ফেলা হয়। স্থানীয়দের সরিয়ে সেখানে স্থাপন করা হয় কোসাকদের বসতি। স্থানান্তরের সময় অনেক মানুষই রোগে ভুগে মারা যায়। এদের অধিকাংশই বাপ দাদার ভিটে ছেড়ে তুরস্কে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়। যেসব আদিজেই তখনো রয়ে যায়, তাদের হয় কতল করা হয় নয়তো সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়। সারকাসিয়ানরা এখন তিনটি প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত—আদিজিয়া, কারাচাই-চেরকেশিয়া ও কাবার্ডিনো-বালকারিয়া। নিজভূমে সারকাসিয়ানদের অবস্থা হয়েছে আমেরিকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের মতো। উত্তর ককেশাসে এককালে আদিজিদের ভিড় ছিল। এখন সেখানে কোনো আদিজি নেই। কেবলমাত্র হাতেগোনা কয়েকজন শাপসুগস আছে। আর উবিখের উপকূলীয় সোচির বসতি বিত্তশালী রাশিয়ানদের গ্রীষ্মকালের আমোদ-প্রোমোদের স্থানে পরিণত হয়। এমনকি স্বয়ং আদিজিয়া প্রজাতন্ত্রেই বসফোরান রাজ্যের মায়েওটিয়ান বংশোদ্ভূত আদিজিরা সংখ্যালঘু, বাকি সবাই স্লাভ। জর্জিয়ার অভ্যন্তরে পাহাড়ের দক্ষিণ উপকূলে নির্বাসনের ফলে আবখায জাতিও সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। আদিজিয়ার রাজধানী মাইকোপের এক ডাক্তার আমাকে বলে, 'আমেরিকানরা রেড ইন্ডিয়ানদের যেমন তাদের ভূমিতেই নির্বাসিত করেছে, এখানে ওরাও আমাদের সাথে এমনই আচরণ করে।'

সারকাসিয়ানদের পাশাপাশি, অনেক চেচেন, ইঙ্গুশ, দাগেস্তানি এবং মুসলিম ওসেটিয়ানদের বাড়িঘর ছাড়তে হয়। ঠিক কতো সংখ্যক উত্তর ককেশীয়দের বাড়ি ছাড়া হতে হয়েছে, সে তথ্য অজানা। গোনার কথা ভাবেই বা কে? ধারণা করা হয় বারো লাখের মতো হবে সংখ্যাটা। এখন নির্বাসিত সারকাসিয়ান ও উত্তর ককেশীয়দের মোট সংখ্যা হবে ১.২ লাখ থেকে ৩.৫ লাখের মাঝামাঝি। তারা এখন তুরস্ক, জর্ডান, সিরিয়া, ইসরাঈল, এমনকি আমেরিকাতেও বসবাস করছে। পুরো জাতি বাতাসের মতো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু সে সময় কেউ জানত না, আদিজেইদের জাতিগত নিধনের ট্র্যাজেডি সেখানেই শেষ নয়। ৮০ বছর পর তাদের ওপর আরো বড় আকারে জাতিগত নির্মূলের ছুরি চলবে। তবে এবার কোনো রুশ সম্রাট নয়, জোসেফ স্ট্যালিন নামক এক ব্যক্তি শুরু করবে এই নিপীড়ন।

BanglaBook.org

নভোসভবোদনায়া, আদিজিয়া

খামযাতভ কাযানোভ বলতে লাগল, 'আজ ওরা দাবি করে, এগুলো সবসময়ই রাশিয়ার জমি ছিল। বেশি দিন আগের কথা না, ওরা সোচির তথাকথিত ১৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করতে চেয়েছিল। অথচ আমাদের লোকেরা সহস্রাব্দ ধরে সেখানে বসবাস করছে।' খামযাতভ কাযানোভ হলেন একজন আদিজেই। পেশায় ইতিহাসের অধ্যাপক। মাথায় সাদা চুল। তিনি আমাকে নভোসভবোদনায়ায় কোসাকের গ্রামে নিয়ে যান। ককেশাস পাহাড়ের একদম গহীনে গ্রামটি অবস্থিত।

আমরা হেঁটে হেঁটে একটি গির্জার ধ্বংসাবশেষের দিকে গেলাম। এটাই সেই জায়গা যেখানে ১৮৬১ সালে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার সারকাসিয়ান চিফের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে আত্মসমর্পণের শেষ সুযোগ দিয়েছিল। তারা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তিন বছরের মাঝে ধ্বংস হয়ে যায়। কোসাকরা যখন এখানে বসতি গড়ে তখন তারা সম্রাটের সম্মানে এই গির্জা নির্মাণ করে। অথচ আজ এটা বড্ড নিঃসঙ্গ এক জায়গা। বিশাল বিশাল খিলান ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কোনো দেয়াল নেই। সামনে শুধু ঘাস আর ঘাস। আগে এখানে সম্রাটের একটা ভাস্কর্য ছিল; কমিউনিস্ট বিপ্লবের সময় সেটাও ধ্বংস হয়ে যায়।

'আমার কেবল একটাই আশা, ওরা স্বীকার করবে যে, এসব কিছুর জন্য ওদেরকে আমাদের সাথে লড়তে হয়েছে। ওরা আমাদের কাছ থেকে এসব কেড়ে নিয়েছে। এখানেই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান।' খাযানোভ বলল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় চার
বিশ্বাসঘাতকতা

‘হে ইউরোপবাসী! নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়তে শেখো! পাহাড়বাসী ককেশীয়দের বীরত্ব থেকে শিক্ষা নাও।”

-দ্য কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো

১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসকে সিহাংসন থেকে উচ্ছেদ করে। রাশিয়া জুড়ে গৃহযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে উত্তর ককেশাসের লোকেরা ভাবতে থাকে, তাদের স্বাধীনতার সুযোগ এসে গেছে। ইমাম শামিলের আদর্শিক সৈনিক অনেকেই জীবিত ছিল তখনো। উনবিংশ শতাব্দীর আক্রমণের পর থেকেই এই অঞ্চলে বিদ্রোহের ধারা অব্যাহত ছিল। ১৮৭৭-৭৮ সালের অটোমান-রাশিয়ান যুদ্ধের সময় তুর্কি সেনাদের সাথে মিলিত হয়ে এই এলাকার বেশিরভাগ অঞ্চলই বিদ্রোহে যোগ দেয়। লেনিনের স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং ঘৃণ্য জার শাসনের অবসান ঘটানোর আহবানে পাহাড়িদের কপাল পোড়ে।

কেন্দ্রীয় ক্ষমতা পতনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে উত্তর ককেশাসকে একটি একক ও স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। মানসুর ও শামিলের মতো জাতীয়তাবাদী নেতারা মনে করতেন যে, ক্ষুদ্র জাতিসমূহের মাঝে ঐক্য বজায় রাখাই তাদের বিজয়ের একমাত্র আশা। এছাড়াও এ সময়ে সাধারণ গোষ্ঠী বন্ধন ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। আজকের দাগেস্তান, চেচনিয়া, ইঙ্গুশেটিয়া, উত্তর ওসেটিয়া এবং কাবার্ডিনো বালকারিয়া একত্রিত হয়ে অক্টোবরে বলশেভিক বিজয়ের আগে ১৯১৭ সালের মে মাসে ‘ইউনাইটেড

BanglaBook.org

হাইল্যান্ডারস অর্গানাইজেশন' গঠন করে। কেবল পশ্চিমের আদিজিয়া-সারকাসিয়ান উপজাতি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সংস্থাটি অক্টোবরে কোসাক গ্রুপের সাথে মিলিত হয়, তবে সে সময় বিপ্লবের কারণে এর কার্যক্রম স্থগিত ছিল। ডিসেম্বর মাসে একজন প্রতিনিধি ঘোষণা করে অস্থায়ী তেরেক-দাগেস্তান সরকার গঠন করা হয়। কিন্তু ছয় সপ্তাহের মধ্যেই সেই সরকার ভেঙে পড়ে। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে একই অঞ্চলের কর্তৃত্বের দাবিতে প্রতিষ্ঠিত হয় আরেকটি কমিউনিস্ট তেরেক প্রজাতন্ত্র।

রাশিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য জাতীয়তাবাদীদের সবচেয়ে কার্যকর প্রচেষ্টা ছিল ১৯১৮ সালের মে মাসে উত্তর ককেশাসের পাহাড়ি প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি এবং রেড-হোয়াইট গৃহযুদ্ধের অরাজকতা। ইউনাইটেড হাইল্যান্ডার্সের স্থলাভিষিক্ত নতুন নেতা তখন উত্তর ককেশাসের পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ দাবি করে। মে মাসের ১১ তারিখে এটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তুরস্কের সাথে বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করে। বলশেভিক সৈন্যদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে ব্রিটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলি সমর্থন দেয়।

পাহাড়ি রিপাবলিকান নেতাদের ধারণামতে, উত্তর ককেশাস এর আগে কখনই স্বাধীনতার এতো কাছাকাছি ছিল না। এমনকি তখন উত্তর ককেশাস এবং তিনটি দক্ষিণ ট্রান্সককেশাস রাজ্য—আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং জর্জিয়া একত্রিত করে সমগ্র ককেশাসকে একত্রিত করার একটি পরিকল্পনা চলছিল। মাউন্টেন রিপাবলিকের পর স্বাধীনতা ঘোষণা করে আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং জর্জিয়া।

কিন্তু মাউন্টেন রিপাবলিক আরেকটি বিভ্রম ছাড়া ভিন্ন কিছু ছিল না। সেটা খুব দ্রুতই প্রমাণিত হয়। স্বাধীনতার ঘোষণায় পাহাড়ি ও স্থানীয় কোসাকদের মধ্যে যুদ্ধের ঝড় ওঠে। পুরাতন শত্রুদের বন্ধুত্বের খোলস খসে পড়ে যায়। মাউন্টেন রিপাবলিক সরকার হোয়াইট আর্মি জেনারেল অ্যান্টন ডেনিকিনকে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সমর্থন করবে কিনা তা নিয়ে বিভক্তি দেখা দেয়। রেডদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলে ডেনিকিন মাউন্টেন রিপাবলিককে স্বাধীনতা দেবে এমন আভাস দেয়। কিন্তু অপরদিকে কোসাকদের সহায়তায় সে এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। ইঙ্গুশরা সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধে নিদারুণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে কিন্তু মাউন্টেন রিপাবলিক যখন সাহায্য জোরদার করতে ব্যর্থ হয় তখন ভেঙে পড়ে তাদের প্রতিরোধ। একই ভাগ্য

Banglabook.org

বরণ করতে হয় চেচনিয়া আর দাগেস্তানকে। ১৯১৯ সালের মে মাসে ভেঙে পড়ে প্রজাতন্ত্র, নেতারা সব পালিয়ে যায়।

যেকোনো মূল্যে উত্তর ককেশীয় আমিরাতকে রাশিয়া থেকে বের করে আনার জন্য ক্ষণস্থায়ী আরো একটি ইসলামি কনফেডারেশনের উত্থান ঘটে। নেতৃত্ব দেন ৯০ বছর বয়সী নকশবন্দী চেচেন নেতা শেখ উজুন হাজী। তিনি ১৯১৯ সালে মাউন্টেন রিপাবলিকের অনুরূপ অঞ্চল নিয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠন করেন যা তুরস্কের সাথে সংযুক্ত শরীয়াহ্ আইন দ্বারা বিশেষভাবে পরিচালিত একটি ইসলামি রাষ্ট্রের মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বলশেভিকরা সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে এ সময়। ওরা প্রতিশ্রুতি দেয়, ডেনিকিনকে পরাজিত করতে সাহায্যের জন্য ফিরতি সম্মান হিসাবে পাহাড়িদের স্বায়ত্ত্বশাসন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হবে। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারিতেই রেড আর্মি ও উত্তর ককেশাসের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীরা যৌথভাবে এই অঞ্চল থেকে হোয়াইট আর্মিকে বিতাড়িত করে। কিন্তু উত্তর ককেশাসের আকাঙ্খার সাথে আবার বিশ্বাসঘাতকতা হয়। কমিউনিস্টরা আবারো উত্তর ও দক্ষিণে সমগ্র ককেশাস দখলের ব্যাপারে মনস্থির করে। আমিরাত এবং মাউন্টেন রিপাবলিকের অবশিষ্টাংশকে নিষিদ্ধ করা হয়। রেডদের বহিষ্কার করতে সাহায্যকারী অনেক লোককে দেওয়া হয় মৃত্যুদন্ড বা জেল।

স্বাধীনতার স্বপ্ন এতোদিনে মরে যায়। রাশিয়ানদের ইসলাম বিরোধী শাসনের অধীনে টিকে থাকার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নেয় চেচেন আর দাগেস্তানিরা। তবে একটা দল গাজওয়া তথা পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯২০-এর দশকের বিদ্রোহটি অন্যান্য উত্তর ককেশাসের বিদ্রোহের মতোই আত্মঘাতী ছিল। বিদ্রোহীরা কেবল কিছু রাইফেল, তলোয়ার আর চল্লিশটি মেশিনগানসহ দশ হাজার সেনা নিয়ে বাহিনি গঠন করে। এই বাহিনিটি চল্লিশ হাজার ভারি সোভিয়েত সেনার সাথে তীব্র যুদ্ধে মুখোমুখি হয়। ওরা ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, এমনকি যুদ্ধবিমান নিয়ে আসে। কিন্তু দাগেস্তানি এবং চেচেনরা পায় তাদের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন। সূফী আধ্যাত্মিকতার দরুণ তাদের মাঝে তীব্র সাহসিকতা ও জীবন উৎসর্গ করার মনোভাব দেখা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। সোভিয়েতরা বেসামরিক সমর্থকদের নির্বাসিত বা হত্যা করে এবং যুদ্ধে জিতে যায়। কিন্তু প্রতিরোধ ছিল মহাকাব্যিক। দক্ষিণ দাগেস্তানে গিডাটলের চূড়ান্ত যুদ্ধে উত্তর ককেশাসের

Banglabook.org

আসল রূপ দেখিয়ে দেয় বিপ্লবীরা। চারটি মেশিনগান নিয়ে ৩০০ জনেরও কম সংখ্যক বিদ্রোহী ছয় ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট ও চারটি ক্যাভিলারি স্কোয়াড্রনের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত সবাই শাহাদাত বরণ করে।

***

স্ট্যালিন, তোমার জন্য দীর্ঘজীবন!
তোমার জন্য এটাই আমাদের আশা ও স্বপন।
... ককেশাস, ফিরে এসেছে তারুণ্য তোমার,
এসেছে তোমার কাছে, অধিবাসীরা গায় গান:
স্ট্যালিনের নাম তারার মতো উজ্জ্বল!
তুমি, আমাদের ভাই, আমাদের পিতা,
দিয়েছো আমাদের আনন্দ-উল্লাস,
খুলেছো খুশির দরজা।
স্ট্যালিন, তোমার জন্য দীর্ঘজীবন!
তোমার জন্য এটাই আমাদের আশা ও স্বপন।

-স্ট্যালিনের চেচেন গীত, চেচেন-ইঙ্গুশ লোকগীতি, ১৯৪০

কমিউনিজম বিদ্যুৎ, সাক্ষরতা, হাসপাতাল ও সড়কপথ নিয়ে এসেছে; এমনকি উঁচু পার্বত্য অঞ্চলেও। যেখানে মানুষ আগে মধ্যযুগীয় অবস্থায় বসবাস করত। প্রত্যেক কমরেডকে বেতন, থাকার জায়গা, ছুটির দিন এবং সমাজে একটি সম্মানজনক অবস্থান দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট স্বপ্ন নির্মাতারা প্রত্যাশা ছাপিয়ে যায়। উত্তর ককেশাসকে কেবল স্বর্গ ঘোষণাই করা হয় না বরং স্বর্গে পরিণতও করা হয়। সোভিয়েত জনগোষ্ঠীর জন্য একটি প্রধান পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটকদের জন্য নানান সুবিধা। কোম্পানির স্পন্সরকৃত ট্যুর প্যাকেজ পার্টিতে ফ্যাক্টরি কর্মীরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগমন করে। একসময় যা ছিল তীব্র সংঘর্ষের জায়গা, সেই ককেশাসই পরিণত হয় সূর্য, খাবার পানীয়, স্কিয়িং, জঙ্গলে ভ্রমণ ও বহুতল ভবন বিশিষ্ট পর্যটন হোটেলের ভূমিতে।

সোভিয়েত শাসন একটি নমনীয় নীতির সাথে শুরু হয়, ফলে একত্রিত হয় অধিকাংশ পাহাড়বাসী। একটি সোভিয়েত মাউন্টেন রিপাবলিক গঠন করে

BanglaBook.org

তাতে শরীয়াহ্ আইন ও স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ১৯২১ থেকে ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি সময়কালে মস্কো ধীরে ধীরে প্রতিটি গ্রুপকে ছোট, আরো নিয়ন্ত্রণযোগ্য ইউনিটে বিভক্ত করে—হয় একটি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র (Soviet Socialist Autonomous Republic-ASSR) অথবা একটি নিম্নস্তরের স্বায়ত্ত্বশাসিত অঞ্চলে (Autonomous Region-AO)।

ASSR এবং AO কেবলমাত্র নামেই আলাদা। উভয়কেই সরাসরি মস্কোর কাছে রিপোর্ট করতে হয়। কিন্তু ASSR-এ ছিল রুশদের আধিপত্য, অপরদিকে AO-এর কোনো মূল্যই ছিল না। তারা ছিল সংখ্যালঘু জাতি স্ট্যাভ্রোপোল বা ক্রাসনোদারের অধীনস্ত। তাদের নিজস্ব বিষয়ে রাশিয়ার তেমন কিছু বলার ছিল না। সোভিয়েত মাস্টারমাইন্ডরা অভ্যন্তরীণ সীমানারেখা বারবার বিভক্ত করার ফলে ASSR এবং AO পুনঃ পুনঃ দুর্বিপাকের মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করে। ১৯৩৬ সালের মানচিত্রের চূড়ান্ত নকশাটিতে একে অপরের সাথে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর সম্পর্কহীন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। এভাবেই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাদের পুরনো সাম্রাজ্যবাদী নীতি 'ডিভাইড এন্ড রুল' নিশ্চিত করে।

রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হওয়া আভার এবং চেচেনরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। আভাররা দাগেস্তান ASSR এবং চেচেনরা চেচেন-ইঙ্গুশেটিয়া ASSR-এ যোগ দেয়। উত্তর ওসেটিয়ানদের নিজস্ব ASSR দেওয়া হয়েছিল কিন্তু দক্ষিণ ওসেটিয়ানদের তাদের থেকে পৃথক করে জর্জিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অধীনস্ত জেলারূপে রাখা হয়। সারকাসিয়ান জনগণের কপাল আরো খারাপ। মূল আদিজেইদের ক্রাসনোদার অঞ্চলের একটি AO-এর অধীনে নেওয়া হয়। চেরকেশদের তুর্কিভাষী কারাচাইদের সাথে স্ট্যাভ্রোপোল অঞ্চলের অধীনস্ত কারাচাই-চেরকেশিয়া নামক একটি AO-এ ঢোকানো হয়। কাবার্ডদের তুর্কি ভাষাভাষী বালকারদের সাথে রাখা হয় কাবার্ডিনো-বালকারিয়ার অধীনে। ফলে শুধুমাত্র সারকাসিয়ান গোষ্ঠীই নয় বরং কারাচাই এবং বালকাররাও বিভক্ত হয়ে যায়।

উত্তর ককেশীয়রা ভেবেছিল, জার সিস্টেমের পতন হলে তারা স্বাধীনতা পাবে। পরিবর্তে তাদের কপালে জোটে কমিউনিস্টদের নাস্তিকতা, রাশিয়ান ভাষা, রাশিয়ান কর্মকর্তা এবং নৃশংস ভূমি আগ্রাসন। মসজিদগুলো বন্ধ বা ধ্বংস

BanglaBook.org

করে দেয়া হয়। আলেমদের গ্রেফতার বা গুলি করে মেরে ফেলা হয়। এমনকি ১৯২০ এর যুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদানের আগ পর্যন্ত প্রতিটি প্রজন্ম ও অঞ্চলে বিদ্রোহ সংগঠিত হয় । ১৯২৭ সালে দাগেস্তানে ধর্মীয় নির্যাতন এবং ১৯২৯-৩০ সালে দাগেস্তান থেকে কারাচাই পর্যন্ত ভূমি অধিগ্রহণের ফলশ্রুতিতে চেচনিয়ায় নিয়মিত সেনাবাহিনিগুলোর বিরুদ্ধে বড় ধরনের যুদ্ধের ঘটনা ঘটে। ১৯৩৭ সালের জুলাইয়ের এক রাতেই চেচনিয়া-ইঙ্গুশেটিয়ার চোদ্দ হাজার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তবুও 'প্রতিক্রিয়াশীল' মুসলিমরা প্রতিরোধ বজায় রাখে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় পাঁচ
শাস্তি

যা যা ঘটেছিল, তার সবটাই আমি বলতে পারব না তোমাদের।
তোমাদের বইয়ে এতো জায়গাও হবে না।
শুধু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, এর পুনরাবৃত্তি যেন না হয় আর।

-স্ট্যালিনের ১৯৪৩ সালের নির্বাসন স্মরণ করে এক কারাচাই অধিবাসীর বক্তব্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর ককেশাসকে ফের ইতিহাসের ঘূর্ণিপাকে এনে ফেলে। বাকু অয়েল রিসোর্সের অভিলাষে ১৯৪২-৪৩ সালে জার্মানি ককেশাসের অনেকাংশ দখল করে নেয়। যদিও ট্রান্সককেশাস পর্যন্ত পৌঁছানোর ভাগ্য হয়নি জার্মানদের। নাৎসিরা বিদায় নেওয়ার পর এই অঞ্চল থেকে মানুষের দৃষ্টি সরে যায়। সবাই ভাবতে থাকে এখন নিশ্চয়ই স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে ওখানে। আদতে ওটা ছিল ককেশীয়দের দুর্ভোগের কেবল শুরু। কোনো প্রমাণ ছাড়াই স্ট্যালিন ককেশীয়দের ওপর নাৎসিদের সহায়তা করার অভিযোগ আনে।

মাত্র কয়েকদিনের মাঝেই সিক্রেট পুলিশ চেচেন, কারাচাই, ইঙ্গুশ ও বালকার জাতির প্রত্যেকটি মানুষকে ক্যাটল ট্রেনে ভরে মধ্য-এশিয়ার অনুর্বর ভূমিতে নিয়ে যায়। স্ট্যালিন এসব ব্যাপারে আগে থেকেই অভিজ্ঞ। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, ডেথ মার্চ, নির্বাসন ও সংশোধনের নামে মানুষ মারা তার কাছে ছেলেখেলা। কিন্তু এটা তো গণহত্যা! একেবারে পুরো একটা জাতিকে হাওয়ায় মিলিয়ে দেওয়া। মানুষকে কেবল জাতিগত পার্থক্যের কারণে

BanglaBook.org

মেরে ফেলা। অথচ এ সম্বন্ধে কেউই জানত না!

১৯৩৯ সালের সোভিয়েত সমীক্ষা অনুযায়ী ৬১৮০০০ ককেশীয়দের নির্বাসিত করা হয়। ১৯৪৩ এর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ৭৬০০০ কারাচাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৪০৮,০০০ চেচেন, ৯২,০০০ ইঙ্গুশ এবং পরের মাসেই আরো ৪৩,০০০ বালকার একই ভাগ্যবরণ করে। অজানা সংখ্যক আভার, আদিজেই ও মুসলিম ওসেটিয়ানদেরও সমূলে উৎপাটন করা হয়। রবার্ট কনকোয়েস্ট তার 'ন্যাশন কিলার' বইয়ে মন্তব্য করেন, সংখ্যাটা আরো বেশি হওয়ার কথা। আদমশুমারীর এতো বছর পর জনসংখ্যা নিশ্চয়ই বেড়েছিল।

অন্যান্য রাজ্যেও গ্রিক, কালমিক, ভোলগা, জার্মান, ক্রিমিয়ান উপদ্বীপের তাতার এমনকি দূরবর্তী মধ্য-এশিয়া ও সাইবেরিয়ার মেসখেটিয়ার লোকজনকেও উৎখাত করা হয়। বাল্টিক, ইউক্রেনিয়ান এবং আরো কিছু জাতিকে এরকম গণহারে না হলেও তাদের অনেক মানুষকেই নির্বাসনে পাঠানো হয়। একযুগ পরে ১৯৫৬ সালে নিকিতা ক্রুশ্চেভ এই গণনির্বাসনের ব্যাপারে প্রথমবারের মতো জানতে পারেন। এক বছর পর তিনি এদেরকে দেশে ফেরার অনুমতি দেন। এসব লোক তো ভেবেছিল, মাতৃভূমিকে তারা আর কখনোই দেখতে পাবে না।

কারাচাইভস্ক, কারাচাই-চেরকেশিয়া

মুখিদিন, বয়স ৬৮ বছর। সে ছিল সোভিয়েত আর্মির ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টের এক কারাচাই সেনা। যুদ্ধে বেঁচে ফিরে সে বীরোচিত সংবর্ধনা পাবে কি, বাড়ি ফিরে দেখে তার পরিবার, তার পরিচিত মানুষজন সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

জীবনের ওই সময়টুকু সে কতোটা ক্ষোভ, দুঃখ বুকে পুষে রেখেছিল, সেটা কোনোদিন কাউকে বলতে পারেনি। অবশ্য কেউ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলে তো! পুরনো এক স্যুট জ্যাকেট আর নামাজের টুপি পরে সে রীতিমতো কাঁপছিল আমার সামনে।

যতোটুকু অর্থোদ্ধার করতে পারলাম তার কথায়, তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জোর করে একটা লেবার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। কারাচাইরা সবাই কোথায় হাওয়া হয়ে গেল সে ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে কাজাখস্তানে তার পরিবারকে খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়।

BanglaBook.org

'ক্ষুধায় মারা গেছে আমার বাবা। আমার চার ভাগ্নে-ভাগ্নিও মারা গেছে একইভাবে,' ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে আহাজারি করে উঠল সে।

নির্বাসনের সময় পাহাড়িদের সৈন্যরা ঘিরে রেখেছিল। সৈন্যরা এর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই গ্রামবাসীদের সাথে থাকতে শুরু করেছিল তাদেরই ঘরে। গ্রামবাসীদের প্রস্তুত হতে পনেরো মিনিট থেকে দু'ঘন্টার মতো সময় দেওয়া হয়েছিল। বহন করে যা নিতে পারে কেবল সেসব নেওয়ারই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। গ্রাম থেকে শহরের ট্রেন স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যেতে ব্যবহার করা হয়েছিল ট্রাক। আমেরিকান স্ট্যুডবেকার ট্রাকে তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা এমন একটা ঘটনা যা ওদের সবারই মনে আছে। তাউকাউ মাকায়েভ মুখে একটা ব্যঙ্গাত্মক হাসি নিয়ে বলল, 'ওরা আমাদের এসব আমেরিকান ট্রাকে ভরতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের সরু রাস্তায় এসব গাড়ি ঢুকতে পারে না।' তাউকাউ ছিল একজন বালকার। সে বলতে লাগল, 'সবকিছু খুব ভালোমতোই পরিকল্পনা করা ছিল। কোনো সুযোগই হাতছাড়া করা হয়নি। ওরা আমাদেরকে কেবল পনেরো মিনিট সময় দিয়েছে মাল-সামানা নেওয়ার জন্য। অথচ আমরা জানতামই না যে কী হতে যাচ্ছে। ওরা যখন আমাদের ট্রেনে ভরা শুরু করল তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা দূরে কোথাও যাচ্ছি।'

নিষ্ঠুর সাইবেরিয়ান শীতের মধ্য দিয়ে ট্রেন যাত্রায় কয়েক দিনের মাঝেই দুর্বলরা মারা যায়। পাহারাদাররা লাশ দেখলে দরজা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিত। 'আমার মনে আছে, ট্রেন পনেরো মিনিটের জন্য থামত এবং আমরা বরফের মাঝে আগুন পোহাবার চেষ্টা করতাম। একবার এক মহিলা ট্রেনে মারা গেল এবং তার ছেলে তাকে রেললাইনের পাশেই কবর দেওয়ার চেষ্টা করল। মাটি বরফে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে সে একটা গর্ত খুঁজে পায় এবং কোনো রকমে আবৃত করে সেখানেই মায়ের লাশ রেখে দেয়।' তাউকাউ বলল।

এভাবে কতো মানুষ মারা গিয়েছে সেটা বের করা অসম্ভব। সেখানে কোনো সাংবাদিক ছিল না, ছিল না কোনো মানবাধিকার কর্মী, কোনো স্বাধীন আদালত। নির্ভরযোগ্য অনুমান হলো কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ মানুষ-বিশেষ করে বয়স্ক ও বাচ্চা যারা ঠান্ডা ও ক্ষুধা সহ্য করতে পারেনি-তারা মারা যায়। শত শত বা সম্ভবত হাজার হাজার মানুষকে গুলি করা হয়। সঠিক সংখ্যাটা কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না। ১৯২৬-৩৯ এর মধ্যে তেরো বছরে চেচেনরা ২৮ শতাংশ, বালকাররা ২৮ শতাংশ, কারাচাইরা ৩৭ শতাংশ, ইঙ্গুশরা ২৪

BanglaBook.org

শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তেরো বছরের জোরপূর্বক নির্বাসনের পরে বৃদ্ধির হার তুলনা করলে দেখা যায়, চেচেনরা তেরো বছরে বেড়েছে ২.৫ শতাংশ; বালকারদের কোনো বৃদ্ধিই ঘটেনি। কারাচাইরা ৮ শতাংশ এবং ইঙ্গুশরা ১৫ শতাংশ বেড়েছে। তৈরি হয়েছে বিধ্বস্ত, খোজা জাতি।

ক্ষতটা অত্যন্ত গভীর, শুধুমাত্র ট্রেনে যাত্রা করা প্রজন্ম এবং নির্বাসনে জন্ম নেওয়া প্রজন্মই সেটা মনে রেখেছে তা নয়, তাদের বংশধররাও নির্বাসনের কথা ভুলতে পারেনি কখনো। কারণ বর্ণভেদে তাদেরকেও শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। চেচেন, ইঙ্গুশ, কারাচাই ও বালকারদের জাতীয় পরিচয়ে পরিণত হয় নির্বাসন। ইহুদি হলোকাস্টে জীবিতদের মতোই এটা এমন এক ঘটনা যা ব্যক্তিজীবন ও জাতিকে একসাথে আঘাত করে। সবাই এর ভুক্তভোগী। কোনো ব্যতিক্রম নেই। এমনকি যারা পরে জন্ম নিয়েছে তারাও এই ট্র্যাজেডিকে ভুলতে পারে না কখনো। তাদের পিতামাতা, আত্মীয়, গ্রাম ও সমগ্র এলাকাবাসী দুর্ভোগ সহ্য করেছে। তাদের অপরাধ কেবল এটাই, তারা ভিন্ন জাতির মানুষ!

তামারা হলেন একজন চেচেন বৃদ্ধা। গভীর কালো চোখ বিশিষ্ট, মাথায় লাল স্কার্ফ। গল্পটা আমাকে আবার বলতেই তার চোখ ভিজে উঠল। যদিও সেনারা যখন তাকে কাজাখস্তানে প্রেরণ করে তখন তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর। তিনি প্রতিনিয়তই ভয়ে থাকতেন যে, আবার এরকম কিছু ঘটবে; তার জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।

'প্রথমে সৈন্যরা আমাদের ঘরে থাকতে আসত, আমরা তাদের মেহমান মনে করতাম। তারা সংখ্যায় ছিল অনেক। আমাদের সাথে খেত, সব জিনিসপত্র ঘরে রাখত। আমাদের ঘরে ত্রিশ জনের মতো সৈন্য এক মাসেরও বেশি সময় অবস্থান করেছিল।

একদিন আমাদেরকে বলা হলো, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিং আছে। ঘরের সকল পুরুষকে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার তিন বোন ছিল। আমাদেরকে একসাথে ট্রেনের বগিতে তোলা হলো। আমার ভাইয়ের জন্ম ট্রেনেই হয়। সেদিন এতো ঠাণ্ডা পড়েছিল! ট্রেনটা ছিল ক্যাটল ট্রেন; কোনো জানালা ছিল না, কেবল অন্ধকার। ওরা আমাদের একটা কিছুও বলেনি। বলেনি, আমরা কোথাও যাচ্ছিলাম! ট্রেনে আমরা এক বগি থেকে আরেক বগিতে চিৎকার করে ডাকতাম, যদি কোনো আত্মীয়কে পেয়ে যাই সেই আশায়। হে আল্লাহ! আমি আজও সেই ঘটনা এক ঘণ্টার বেশি সময় ভুলে থাকতে পারি না।

BanglaBook.org

সোফিয়া মাখাদেলোভা, একশ তিন বছর বয়সী এক কারাচাই পাহাড়ি মহিলা। ওরা যখন তাকে নিতে আসে তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। 'সেদিন ছিল খুব সকাল। অন্যান্য ঘরের মতোই আমাদের ঘরে যেসব সেনারা থাকত তারা সেদিন হঠাৎ করে জানায়, আমাদের হাতে কেবল দু'ঘণ্টা সময় আছে। সফরের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কোনো ধারণাই ছিল না, আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অথবা তারা কী চাচ্ছে।

ট্রেন স্টেশনে নিয়ে আমাদেরকে মালবাহী ট্রেনে তোলা হয়। সেদিন খুব ঠাণ্ডা ও কুচকুচে অন্ধকার ছিল। সবাই চিৎকার করে কান্না করছিল। কেউ কিছু দেখতে পারছিল না, বসার জন্য কোনো সিটও পাচ্ছিল না। সেখানে এক রুশ মহিলা ছিল যে এক কারাচাইকে বিয়ে করেছিল। তাকেও আমাদের সাথে ধাক্কা দিয়ে প্রবেশ করানো হয়। সে-ই আমাদের বলেছিল, 'চিন্তা কোরো না, আমরা মধ্য-এশিয়ায় যাচ্ছি। জায়গাটা খুব সুন্দর। আমরা ভালোই থাকব।' তখনই প্রথমবার আমরা জায়গাটার নাম শুনেছিলাম।

এভাবে বিশ দিন চলে গেল। আমার নিকটে ছিল এক বৃদ্ধ ও একটা ছেলে। ঠাণ্ডায় তারা দু'জনই মারা যায়। আমরা তাদেরকে আমাদের মাঝে গোপনে রেখে দেই যাতে গার্ডরা তাদেরকে ট্রেন থেকে ছুঁড়ে না ফেলে। তারা ময়লা-আবর্জনার মতো মানুষের লাশ ফেলে দিচ্ছিল। আমরা চাচ্ছিলাম তাদেরকে পরে সুযোগ বুঝে কবর দিতে।'

বেশিরভাগ নির্বাসন কাজাখিস্তান বা কিরগিজিস্তানে দেওয়া হয়। উত্তর ককেশীয়দের নির্দিষ্ট অঞ্চলে গৃহবন্দীর জীবন কাটাতে বাধ্য করা হয়। বিশেষ অনুমতি ছাড়া গ্রাম থেকে বের হওয়া নিষেধ ছিল তাদের জন্য। এমনকি নিজেদের ভাষায় কথা বলার অনুমতিও ছিল না। ধীরে ধীরে নির্বাসীরা কালেকটিভ ফার্ম, লেবার ক্যাম্প বা কারখানায় কাজ করতে শুরু করে। শূন্য থেকে জীবন শুরু করে আবার।

'আমরা কাজাখিস্তানে ভেড়ার মতো বসবাস করেছি। পুরো পরিবার একটা রুমে,' এক কারাচাই মহিলা আমাকে চা ও আয়রান দধির দাওয়াতে বলল, 'তবে কাজাখরা যখন দেখল, আমরা দস্যু না, পরিশ্রমী মানুষ; তখন ওরা আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসল। তারা দেখেছে খামারে আমরা কতো পরিশ্রম করেছি। কীভাবে আমরা একটু একটু করে আমাদের ঘর বানিয়েছি। কাজাখরা আমাদের সাহায্য করত। আমি একজন কাজাখকে বিয়ে করেছি।

BanglaBook.org

মুসলিমদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে ভালো।' সে হাসিমুখে বলল।

নির্বাসিতরা যাওয়ার সময় পেছনে রেখে গিয়েছিল শূন্য ভূমি এবং নির্জন গ্রাম। মানচিত্র থেকে নির্বাসিতদের প্রজাতন্ত্রের নাম সরিয়ে ফেলা হয়, এমনকি ওদের কবরস্থান ও মসজিদসহ সংস্কৃতির সব প্রমাণও ধ্বংস করে ফেলা হয়। হাজার হাজার রাশিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, জর্জিয়ান এবং উত্তর ককেশীয়দের মধ্য থেকে আভার, লাক এবং ওসেটিয়ানদের জোরপূর্বক নির্বাসিতদের বাড়িগুলিতে স্থানান্তরিত করা হয়।

সেই সময় পৃথিবীর কেউ সেটা লক্ষ্য করেনি এবং কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষ চুপ করে ছিল। ইঙ্গুশ এবং চেচেন নির্বাসনের ঘটনা ১৯৪৬ সালে স্বীকার করলেও অন্যান্য জাতিগুলো একেবারে লাপাত্তা হয়ে যায় কোনো রকম চিহ্ন না রেখেই- জর্জ অরওয়েলের আনপারসন বইয়ের মতো। ১৯৪৮ সালের সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়ায় কাবার্ডিনো-বালকারিয়া হয়ে যায় কাবার্ডিন। চেচনিয়া-ইঙ্গুশেটিয়া হয়ে যায় গ্রোজনি প্রদেশ। আর কারাচাইর তো কোনো উল্লেখই নেই। এছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

আর্টিকেল ১:

চুক্তিভিত্তিক পক্ষ নিশ্চিত করেছে যে, গণহত্যা শান্তির সময় বা যুদ্ধ চলাকালে—যখনই সংঘটিত হোক না কেন, আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সেটা অপরাধ। গণহত্যা প্রতিরোধ ও এসব অপকর্মের শাস্তি কার্যকর করার জন্য আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আর্টিকেল ২:

বর্তমান অবস্থায় গণহত্যা মানে হলো কোনো জাতীয়, নৃতাত্ত্বিক, বর্ণবাদী বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত কাজগুলো করা। যেমন:

(ক) গ্রুপের সদস্যদের হত্যা করা;

(খ) গ্রুপের সদস্যদের গুরুতর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা;

(গ) ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রুপের কোনো সদস্যকে এমনভাবে আঘাত করা যে, ব্যক্তি শারীরিকভাবে পুরোপুরি বা আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়;

(ঘ) গ্রুপের মধ্যে জন্ম প্রতিরোধ ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া;

BanglaBook.org

(ঙ) জোরপূর্বক এক গ্রুপের বাচ্চাদের আরেক গ্রুপে পাঠিয়ে দেওয়া।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের কনভেশনে গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি সম্পর্কিত আর্টিকেল থেকে; যা ১৯৫০ সালে কার্যকর হয়েছিল এবং ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর অনুমোদন দিয়েছিল।

উত্তর ককেশীয়দের নির্বাসনে পাঠানোর কারণটি আজও এক রহস্য হয়ে আছে। ঠিক কী করেছিল ককেশীয়রা যে তাদেরকে নির্বাসনে পাঠাতে হলো?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের মূল টার্গেট ছিল আজারবাইজানের তেল ইন্ডাস্ট্রি। তেলের লোভে জার্মানরা অঞ্চলটি দখল করে নেয়। জার্মানরা স্থানীয় ককেশীয়দের সাহায্য নিয়ে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের ওপর চড়াও হয় বলে ধারণা করা হয়। অবশ্য ককেশীয়দের সাথে রাশিয়ানদের কোনোকালেই সদ্ভাব ছিল না। আবার ঘটনাটা মিথ্যা বলেও উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ককেশীয়দের দাবি, জার্মানরা এই এলাকায় খুব অল্প কিছু সময় ছিল। সে সময় এই এলাকায় জার্মান গুপ্তচরদের ছড়াছড়ি। কিছু জার্মান প্যারাট্রুপার ককেশাস পাহাড়ে অবতরণ করে। আল্লাহই জানেন, ওরা ওখানে কী করছিল। সম্ভবত ট্রেনিং জাতীয় কিছু হবে। ককেশীয়রা ওদের দেখে ভীত হয়ে ওদেরকে মেরে ফেলে। মারার পরে মৃতদের পোশাক পরে নেয় এবং সেগুলো পরেই পরবর্তীতে রাশিয়ানদের ওপর চড়াও হয়। সত্যি কথা বলতে কি, জার্মান সেনারা উত্তর ককেশাসে পা-ও দেয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উত্তর ককেশাস রাশিয়ার হয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে রেড আর্মি থেকে শুধু চেচনিয়া-ইঙ্গুশেটিয়াই মোট ছাপ্পান্নটি স্বর্ণপদক জয় করে। বেলারুশের ব্রেস্ট দুর্গ রক্ষার সময় চেচেন এবং ইঙ্গুশরা কতোটা সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিল, সেটা রাশিয়ানরা এখনো মনে রেখেছে। তাছাড়া যুদ্ধের সময় নাৎসিরা গ্রোজনি এবং নালচিকেও বোমাবর্ষণ করে।

ককেশীয়দের নির্বাসনে পাঠানো নিয়ে অনেক থিয়োরি রয়েছে। হয়তো স্বাধীনচেতা চেচেনদের নির্মূল করে দিতে চেয়েছিল। হয়তো বালকার, কারাচাইদের বিশ্বাস করতে পারেনি ওরা তুর্কি বংশোদ্ভুত বলে। হয়তো নিজে ওসেটিয়ান হওয়ায় রাশিয়ার ক্ষুদ্র মানব বলে ডাকা জাতিসত্তাগুলোর একজন ভাবতে ভালো লাগত না তার। এ কারণেই জাতিসত্তাগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিতে

BanglaBook.org

চেয়েছিল সে। তবে মূল কারণটা কখনোই জানা হবে না, কেন ককেশীয়দের এরকম শাস্তি দিয়েছিল জোসেফ স্ট্যালিন।

গ্রোজনি, চেচনিয়া

'তখন পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম।' নাতাশা বলল। তার বয়স সত্তর বছর, এক কোসাক পরিবারের সদস্য। সে তিন জেনারেশন ধরে চেচনিয়ায় বাস করছে; অনেক কিছুই দেখেছে। চেচেনদের নির্বাসনের কথাও তার মনে আছে। সেটা ছিল যুদ্ধের পূর্বে। উনিশ শতকের পর থেকে অবস্থা আর খুব একটা বদলায়নি।

'চেচেন মহিলারা সে সময় লম্বা পোশাক ও মাথায় স্কার্ফ পরত। পুরুষদের পরনে থাকত চেরকেস্কের ঢিলেঢালা একটা পোশাক যার মাঝে বুলেট রাখার পকেটও ছিল। নির্বাসনের আগ পর্যন্ত তারা সর্বদা কিনঝাল সাথে রাখত। আর হ্যাঁ, তাদের কিনঝাল সবসময় থাকত পলিশ করা। এছাড়াও তাদের ছিল অনেক সুন্দর সুন্দর পাপাখা হ্যাট। সে সময় গ্রোজনিতে কেবল রাশিয়ানরা বাস করত। চেচেনরা পাহাড় থেকে নেমে এসে গ্রোজনিতে মাখন ও ডিম বিক্রি করত। আহ! কী সুস্বাদু ছিল সেই মাখন। আরো নিয়ে আসত বস্তাভর্তি বাদাম। এসব লোক রাশিয়ান পুরুষদের মতো নয়। তাদের স্ত্রীরা পেছন পেছন চলত এবং তাদের সবসময় মান্য করত। একজন বৃদ্ধ লোকের কথা আমার মনে আছে, নাম ইয়ারমোলোভকা। তার বয়স ছিল বিরানব্বই বছর এবং তার তিন জন স্ত্রী ছিল। দু'পাশে দু'জন আর সবচেয়ে সুন্দরী তরুণী বউটি পেছন পেছন থাকত।

তাদের কিছুই করার ছিল না। কী করতে পারত? আজকের দিনে চেচেন বিদ্রোহীরা নিজেদের সুপারম্যান মনে করে। কিন্তু সেই সময় কোনো গেরিলা ছিল না। স্রেফ কিছু ডাকাত ছিল। তাদের কাছে কেবল কিছু শিকার করার বন্দুক ছিল। সেনাবাহিনির বিরুদ্ধে সেসব কী কাজে আসত? তারা আর্মির বিরুদ্ধে কী-ই-বা করতে পারত? আপনি জানেন, বেরিয়া চিফ কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, "ওদেরকে কাজাখিস্তানে প্রেরণ করা যথেষ্ট নয়, তাদের কাস্পিয়ান সাগরের ঠিক মধ্যখানে ফেলে দেওয়া উচিত।"

এসব কিছুই ঘটেছে কয়েকজন আবেগের জন্য, কয়েকজন দস্যু। তখন সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত প্রতিরোধ ছিল না। কেবলমাত্র কিছু দস্যু ছিল যারা সেনাদের দিকে গুলি ছুঁড়ত আর চিৎকার করে বলত, তারা জার্মানদের সাহায্যে সব রাশিয়ানদের মেরে ফেলবে। বেশিরভাগ মানুষ তখন

BanglaBook.org

নির্মল জীবনযাপন করত। গরু ও মুরগী পালত। কিছু খারাপ লোকের কারণে পুরো জাতির ওপর দুর্ভোগ নেমে আসল।'

১৯৫৩ সালের মার্চে স্ট্যালিন মারা যায়। কিন্তু ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আগ পর্যন্ত ক্রুশ্চেভ তাকে নিন্দা করেনি। এরপর কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের একটি বক্তব্যে ক্রুশ্চেভ তাকে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করে।

১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভের বক্তব্য অফিসিয়াল নীরবতাকে ভেঙে দিলেও নির্বাসিত জনগণকে মুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লেগে যায় আরো এক বছর। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারিতে উত্তর ককেশীয় জনগণের পুনর্বাসনের নির্দেশ জারি করা হয়। নির্বাসিতরা প্রায় পনেরো বছর ধরে যা কিছু তৈরি করেছিল, সেগুলি নিয়েই প্রত্যাবর্তন শুরু করে। একটি সম্পূর্ণ প্রজন্ম নির্বাসনে জন্মগ্রহণ করে এবং কাজাখিস্তান বা কিরগিজিস্তানে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু তরুণরা সবসময় সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করত, যেদিন তারা তাদের অদেখা বাড়িতে ফিরে আসতে পারবে। আরেক প্রজন্ম বয়স্ক হয়ে যায়, তবুও তারা নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে আকুল। প্রত্যাবর্তনের সময় কেউ কেউ প্রবাসে কবর দেয়া তাদের মৃত স্বজনদের লাশও মাটি খুঁড়ে সাথে নিয়ে যায়- এক ইঙ্গুশ মহিলার মুখে আমি এমনটিই শুনেছি।

উত্তর ককেশীয়ারা ফিরে এসে আবিষ্কার করে, তাদের প্রিয় পাহাড়ে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাদের ঘরগুলো দখল করা হয়েছে, মসজিদ ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে এবং গ্রামের কবরগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে পাহাড়িদের সংস্কৃতি ধ্বংস করার পলিসি অনুসারে কবরের ফলকগুলি বিল্ডিং নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়। কারাচাইয়ের কাম্মেনোমোস্ত গ্রামের মাঠজুড়ে পড়ে ছিল সমাধি ফলকগুলো। কারাচাইদের ফিরে আসতে অনেক বেশি দেরি হয়ে যায়। কবরগুলো চিহ্নিত করে নতুনভাবে ফলক বসানোর সময়ও অতিবাহিত হয়ে যায়। ভুলে যাওয়া মৃতরা আজও ককেশীয়দের তাড়া করে বেড়ায়।

'আমরা ঘরে ফিরে দেখি, সবগুলো মসজিদ ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। আমরা আমাদের পুরনো বাড়িতে ফিরে গেলাম। সেখানে রাশিয়ানরা বসবাস করছিল,' তামারা বলল, 'তারা আমাদের ঘর থেকে বের হতে অস্বীকৃতি জানায়। বলে, "আমরা তোমাদের ভয় করি না, যাও এখান থেকে," আমাদের কাছে কিছু ডলার ছিল। তাই দিয়ে আমরা অন্যত্র বাড়ি কিনেছিলাম।'

BanglaBook.org

'নির্বাসনের সময় আমার পিতার পরিবারের নয়জন লোক গিয়েছিল, কেবলমাত্র আমার আব্বাই বেঁচে ফিরেছে। তার পিতামাতা, বোন, ভাই, সবাই মারা যায়। আমরা এসে দেখি, আমাদের ঘর পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কেবল মাত্র দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ঘর পুনর্নির্মাণ শুরু করি। আমরা এখনো সেই বাড়িতেই বসবাস করি, যদিও তার গঠন পরিবর্তিত হয়েছে,' মাকোমেদ গর্ব করে বলল। সে ছিল একজন বালকার। 'গ্রামের অন্যান্য ঘরে রাশিয়ান, কাবার্ড ও কিছু জর্জিয়ানরা বসবাস করে। বেশিরভাগ মানুষের কোনো উপায় ছিল না; জমানো টাকা দিয়ে নিজেদের পুরনো বাড়িই কিনতে হয়েছে তাদের। আমার খালা অবশ্য খুব রেগে গিয়েছিলেন। তিনি ঘরের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা যদি ঘর থেকে বের না হও তবে আমি আগামীকাল তোমাদের খুন করব, শরীর থেকে মাথা আলাদা করে নেব!" ওরা চলে যায়। আমাদের অনেকেই এরকম আল্টিমেটাম দিয়েছে-"তোমরা জানো, আমরা কিন্তু যুদ্ধবাজ মানুষ।"'

উত্তর ককেশীয়রা রসিকতা করে বলে, তারা ভালো ঘর নির্মাণ করতে পারে কারণ রাশিয়ানরা তাদের বাড়িগুলি ক'দিন পর পরই ধ্বংস করে দেয়। এর মধ্যে সত্যতা রয়েছে। কাযির ঝামাল, পচাত্তর বছরের বালকার বৃদ্ধ, 'পাহাড়ি শিকারি' হিসেবে বিখ্যাত। বালকারের ভেরখনি থেকে যখন তাকে নির্বাসিত করা হয় তখন তার বয়স ছিল উনিশ বছর। কাজাখিস্তানে তার দেশের লোকেরা নিজেরা নিজেদের ঘর বানাত। ফিরে এসে তারা উপত্যকার সামান্য নিচে নতুন করে তাদের গ্রামকে গড়ে তুলেছিল।

'গ্রামটি অপূর্ব ছিল,' ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামের মূল ভিত্তির নিকটে আমাকে নিয়ে গিয়ে কাযির বললেন। ছেলেবেলায় তিনি যেসব ঘরে বেড়ে উঠেছিলেন আঙুল দিয়ে সেসব ঘরের ধ্বংসাবশেষ আমাকে দেখালেন। 'রাস্তা ছিল সরু আর সবগুলো ঘর একটা আরেকটার খুব কাছে কাছে। একবার এক রাশিয়ান ইঞ্জিনিয়ার আমাদের গ্রামে এসে এটা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। কৌতুক করে সবাই বলতে লাগল, সে আমাদের সবগুলো ঘরকে গাদা করে থাকতে দেখে ভেবেছে, পুরো এলাকাটা মিলেই একটা বিশাল ঘর! সে বলেছিল, "এমনকি মস্কোতেও আমাদের এতো ফ্লোরবিশিষ্ট বিল্ডিং নেই।"'

স্ট্যালিনের কৃতকর্মের খানিকটা কেবল ক্রুশ্চেভের ভাষণে বলা হয়েছিল। গণহত্যার অপরাধীদের কখনোই শাস্তি দেওয়া হয়নি। আর প্রকাশ্যে নিন্দাজ্ঞাপনের বিপরীতেও অজুহাত দাঁড় করানো হতো। ক্রুশ্চেভের বক্তব্য

BanglaBook.org

অনুসারে, 'স্ট্যালিন নিশ্চিত ছিলেন, শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য এটা প্রয়োজনীয় ছিল।' তার মতে, নির্বাসন করা কোনো স্বৈরাচারী শাসকের কাজ নয়। বরং স্ট্যালিনের বিবেচনায় পার্টির স্বার্থরক্ষায় এমনটা করা উচিত ছিল। ক্রুশ্চেভ দুঃখ করে বলেছিল, 'স্ট্যালিন তো কমিউনিস্ট ও কমসোমলদেরও নির্বাসিত করেছিল।'

উত্তর ককেশাসে রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী নীতির তেমন কোনো পরিবর্তন করেনি ক্রুশ্চেভ। নির্বাসন যেন কোনো ঘটনাই ছিল না তার কাছে। নির্বাসনে মৃতদের সম্মানে কোনো স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করেনি সে। হোটেল তুরবাযেসে ছুটি কাটাতে আগত সোভিয়েতদের জন্য প্রিন্ট করা গাইডবুকেও নির্বাসন নিয়ে কিছুই লেখা হয়নি। নির্বাসিতরা নীরবে তাদের ব্যথা বুকে রেখে দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের এক বছর পর ১৯৯২ সালে কারাচাই-চেরকেশিয়া নিয়ে একটা গাইড বুক প্রকাশিত হয়। ওখানেও কারাচাই ধ্বংসের কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

আরো দূরবর্তী ইতিহাসসমূহ তো কেবল অস্বীকারই করা হয় না বরং রাজনৈতিক এজেন্ডা পূরণের জন্য বিকৃতও করা হয়। শামিলের মৃত্যুর পরপর তারা প্রথমে তাকে রুশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণের নায়ক হিসেবে, এর কিছুদিন পরে 'রুশ সম্রাটদের চেয়ে খুব একটা ভালো নয়' বলে এবং পরিশেষে নির্বাসনের পর সরাসরি তাকে প্রতিক্রিয়াশীল ও ডাকাত বলে অভিহিত করে।

ক্রুশ্চেভ ও ব্রেজনেভের শাসনামলে ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ভাষাগত বৈষম্য তীব্ররূপ ধারণ করে। রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। রাশিয়ান সিরিলিক বর্ণমালাকে আদর্শ বর্ণমালা করা হয়। ফলে দাগেস্তানের ওদিকে আরবী শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৮-৫৯ সালে মাতৃভাষায় লেখাপড়া করার অধিকার উঠিয়ে নেওয়া হয়। ১৯৬১ থেকে ১৯৮২ সালের মাঝে স্কুলে একত্রিশটি ভাষার ব্যবহার বাদ দেওয়া হয়। এদের মাঝে ছিল আদিজি, বালকার, কারাচাই, চেচেন এবং ইঙ্গুশ ভাষাও।

উত্তর ককেশাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ দশক বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই কেটেছে। তখন যুদ্ধের কোনো দামামা বাজেনি তাই সোভিয়েতরাও বিশ্বাস করতে শুরু করে, তাদের রুশিকরণের ফলে সুখী জাতিগত পরিবার তৈরির স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। কিন্তু এই নীরবতা ছিল মেকি। এই নতুন দুনিয়ার খোলসের নিচে পুরনো আবেগ ও ভয়াবহতা গভীরভাবে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

BanglaBook.org

গ্রোজনি

রাশিয়ার ট্যাংকসমূহ যখন প্রথমবার গ্রোজনিতে এসেছিল তখন এক চেচেন যোদ্ধা আমাকে পোস্টকার্ডের একটি ছোট্ট প্যাকেট দেয়। চেচেন যুদ্ধের ছয় মাস পর আমি সেটা দেখছিলাম।

'আপনি এগুলো সাথে রাখুন, যেন আপনার মনে থাকে আমাদের শহর কতো সুন্দর ছিল,' ছদ্মবেশী বুক পকেট থেকে সতেরোটি বিবর্ণ ছবি বের করতে করতে সেই গেরিলা যোদ্ধা বলেছিল।

পোস্টকার্ডগুলো ১৯৮৮ সালেই প্রিন্ট করা হয়েছে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু চেচনিয়ায় ছয় মাস যুদ্ধের পর আর তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই। লেলিনের ভাস্কর্যকে চেচেনরা টেনে নামিয়ে ফেলল, সারকাস রাশিয়ান বিমান বাহিনির বোমা হামলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, বোমা বিস্ফোরণে ধংস হলো সংসদ ভবন, সুনঝা নদীর ব্রিজের কেবল বাকি থাকল কংক্রিটের স্ল্যাব ও লোহার রড, তেল ইন্সটিটিউট আগুনে জ্বলেপুড়ে গেল, মিনুতকা ট্র্যাফিক চত্বর বোমা ও শেল হামলায় কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হলো। সবশেষে চেচেনরা আশ্রয় নিয়েছিল চেরেনোরচ শহরতলিতে, হাজার হাজার রাশিয়ান কামানের গোলায় সেই অঞ্চলও লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

গ্রোজনিতে স্বাগতম, সোভিয়েত পোস্টকার্ডের প্রচারলিপিতে লেখা। প্রতি বছর গ্রোজনি সমৃদ্ধ হয় এবং উন্নতি করে। আবাসিক এলাকার মধ্য দিয়ে প্রশস্ত রাজপথ চলে যায়। আধুনিক বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মিত হয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় পর্ব

জিগ'স পাজলের টুকরোগুলো

রাশিয়া এই ধকল সামলে উঠতে পারবে না।
সেখানে স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করা মানুষ একটু বেশিই।

-আলমির আব্রেগোভ
মাইকোপের আদিজেই ঐতিহাসিক জাদুঘরের পরিচালক

অধ্যায় এক
নতুন সীমান্ত

উরালবাসী আর ককেশীয়রা তাদের অগণিত কাঁচামাল, সাইবেরিয়ার সমৃদ্ধ বনজসম্পদ আর ইউক্রেনের অনিঃশেষ শস্যক্ষেত্র নিয়ে যদি সোভিয়েত ন্যাশলাশিস্ট পার্টির অধীনে জার্মান নেতৃত্বে পরিচালিত হতো তবে তারা উন্নতির জোয়ারে ভেসে যেতো।

-ডেভিড টুটায়েফ, দ্য সোভিয়েত ককেশাস

কখনো মস্কো বেড়াতে গেলে মাতরিওশকা পুতুলের দেখা মেলে। রুশসাম্রাজ্য অনেকটা ওই পুতুলের মতো। প্রত্যেকবার একটি করে স্তর সরানো হলে নিচে হুবুহু একই রকম দেখতে আকারে খানিক ছোট আরেকটি পুতুল পাওয়া যায়। জার সাম্রাজ্যের পতনের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলে ইস্তোনিয়া থেকে কিরগিজিস্তান পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের চোদ্দটি প্রাক্তন উপনিবেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এরপরও মাতরিওশকা পুতুলের মতো রুশ সাম্রাজ্য রয়েই যায়। উননব্বইটি প্রদেশ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র নিয়ে গঠিত হয় রাশিয়ান ফেডারেশন।

সোভিয়েত আমলে অনেকটা হঠাৎ করেই উত্তর ককেশাস রাশিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পরিণত হয়। ককেশাসের সাথে সীমান্ত রক্ষা করে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, ন্যাটোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মুসলিম অধ্যুষিত তুরস্ক ও ইরান। মস্কোর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ট্রান্সককেশাস। দক্ষিণ থেকে তুর্কি এবং ইসলামের বিস্তারলাভের ফলে প্রভাব হারানোর অপমান রাশিয়ার আরো

BanglaBook.org

বেড়ে গেছে। ১৯৯২ সালে আঙ্কারায় একটি তুর্কিফোন শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যাতে তুরস্কের উদ্দেশ্য ছিল একশ বিশ মিলিয়ন তুর্কি ভাষাভাষী মুসলিম বলয়ের মধ্যে পুনঃসম্পর্ক নির্মাণ করা। এর মধ্যে আজারবাইজান থেকে আলমাতি পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাসকারী আজারি জাতিও রয়েছে।

ট্রান্সককেশাসের ক্ষতি মস্কোর জন্য গুরুতর একটা অর্থনৈতিক আঘাত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন রাশিয়ার সীমানার বাইরেও অনেক উৎপাদনকাজ বন্ধ করে দেয়। আজারবাইজানের তেল উত্তোলন যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রকল্প এবং জর্জিয়ার সুখোই-২৫ যুদ্ধবিমান কারখানা এর মাঝে অন্যতম। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে কাস্পিয়ান সাগরের তেলের খনি হাতছাড়া হওয়ার ফলে। কাস্পিয়ান তেলখনি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় সম্পদ। খনিটি এখন আজারবাইজান উপকূলে পড়েছে। বাকু সরকার এর ওপর জোর দাবি করছে। কাস্পিয়ান সাগরের অন্য পাশে নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র কাযাখিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানেও বিশাল তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস খনি রয়েছে।

প্রথমদিকে নিয়ম নীতির কোনো বালাই ছিল না। নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মস্কো তার সৈন্য বা কূটনীতিকদেরকে ব্যবহার করত। ১৯৯৩ সালের দিকে অনিয়ম আর উদ্ভট কিছু কৌশলের কারণে মস্কোর বৈদেশিক নীতি কঠোর ও আগ্রাসী হয়ে ওঠে। রাশিয়ার নিজেকে বড় হনু মনে করার পুরাতন বদ অভ্যাসের কারণেই মস্কো সমর্থিত গণতান্ত্রিক সংস্কারকরা নব্যসাম্রাজ্যবাদী এবং বাস্তবপন্থী সমর্থক দ্বারা গঠিত পুরনো সেই শাসন ব্যবস্থাকেই বলবৎ রাখে। রাতারাতি মস্কো ইস্তোনিয়া থেকে কিরগিজিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এক অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে আত্মবিশ্বাস সংকটের মাঝেও কিন্তু রুশদের পুরনো সেই সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন বেঁচে ছিল। ক্রেমলিন টাওয়ারের চূড়ার লাল তারা এখনো একইভাবে সরকারি ভবনে পতপত করে উড়তে থাকা নতুন ডাবল সোনার শিরস্ত্রাণযুক্ত ঈগলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সে বছর ক্রেমলিন ট্রান্সককেশাসে ওদের হারানো কর্তৃত্বের অংশবিশেষ পুনরুদ্ধার করে। রাশিয়া থেকে বেরিয়ে আসা তিনটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রই রাশিয়ার প্রভাবিত কমনওয়েলথে স্বাক্ষর করে। জর্জিয়া অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং রাশিয়ান সমর্থিত আবখায ও দক্ষিণ ওসেটিয়ার সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধের পর দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে জর্জিয়ার নেতা সাবেক সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী

BanglaBook.org

এডওয়ার্ড শেভার্দনাদজের মস্কোর কাছে সাহায্যের আবেদন করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ১৯৯৩ সালে নিয়মভঙ্গের সন্দেহে আজারবাইজানের জাতীয়তাবাদী প্রেসিডেন্ট আবুলফাজ এলচিবের পরিবর্তে অস্থায়ীভাবে গেদার আলিয়েভকে ক্ষমতায় বসানোর ক্ষেত্রে রাশিয়াকে হস্তক্ষেপ করতে দেখা যায়। আজারবাইজানের সাথে নাগার্নো-কারাবাখে বসবাসরত আর্মেনিয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ১৯৮৮-১৯৯৪ সালের যুদ্ধেও রাশিয়া দালালের ভূমিকা পালন করে। ১৯৯২ সালে মস্কো কৌশলে তুরস্ককে এসব থেকে সরিয়ে রাখে। এ সময় রাশিয়া অঞ্চলের তৃতীয় ক্ষমতাশীল দেশ ইরানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে। ফলে কাস্পিয়ান অঞ্চলে মার্কিন প্রভাব অনেকাংশেই কমে যায়।

এই ক্ষমতার লড়াইয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল তেল, প্রচুর পরিমাণে তেল। আনুমানিক পঁচিশ থেকে একশ বিলিয়ন ব্যারেলের মতো পুনরুদ্ধারযোগ্য রিজার্ভ রয়েছে। অবশ্যই অঞ্চলটি বিশ্বশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যত উৎস। পশ্চিমা তেল দানবরা তাদের অর্থ ও প্রযুক্তি নিয়ে নব্বইয়ের দশক থেকে সোভিয়েতের অবকাঠামোকে পরিবর্তন করার সুযোগ খুঁজছে।

রাশিয়া আজারবাইজানের উপকূলীয় তেলক্ষেত্রগুলোর সার্বভৌমত্বের দাবির বিরোধিতা করে বলে, কাস্পিয়ান একটা হ্রদ, সমুদ্র নয়; তাই উপকূলের পাঁচটি দেশই সম্পদ ভাগ করে নেবে। আজারবাইজান আইনের নয় ছয় মারপ্যাচ জানত। তারা তাদের কাজ চালিয়ে যায় এবং মস্কো তা নিয়ে তর্জন গর্জন ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

অবশেষে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪-এ নয়টি বড় অয়েল প্লেয়ারের একটি কনসোর্টিয়াম ৩.৮ বিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের তিনটি আজারি তেল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং তেল উত্তোলনের জন্য আট বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করে। আজারবাইজান ইন্টারন্যাশনাল অপারেটিং কোম্পানি (AIOC) নামক কনসার্টিয়ামটিতে মার্কিন সংস্থাগুলি এক তৃতীয়াংশেরও বেশি লাভ পেত। ওরা প্রত্যাশা করে ১৯৯৭ সাল নাগাদ কম আয়তনের 'প্রাথমিক' তেল আহরণ করবে তারপর ৭০,০০,০০ ব্যারেল পর্যন্ত 'প্রধান' তেল ২০১০ সালের মধ্যে আহরণ করে শেষ করবে। এমন সময় আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট পদে এলচিবের পরিবর্তে আলিয়েভকে বসানোর ব্যাপারে কলকাঠি নাড়ে মস্কো। এলচিবে ছিল খাস তুর্কি-সমর্থক। আলিয়েভ নাগার্নো-কারাবাখ যুদ্ধের কারণে ব্যস্ত থাকে এদিকে রাশিয়ার 'লুকঅয়েল' কোম্পানি যথাযথভাবে এআইওসি-

BanglaBook.org

তে ১০ শতাংশ ভাগ পায়। শীঘ্রই কনসোর্টিয়ামটি বারো সদস্যে উন্নীত হয়। যার প্রধান শেয়ার হোল্ডার ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম ও আমোকো যথাক্রমে ১৭.১ এবং ১৭ শতাংশের মালিক। স্পিয়ানের আশপাশ ও কিছু উপকূলীয় ক্ষেত্রে এআইওসি এবং নতুন কিছু কনসোর্টিয়াম আরো কয়েকটি চুক্তি করে ১৯৯৬-১৯৯৭ সালের মাঝে।

তেলের দৌড়ে টিকে থাকা এবং ট্রান্স-ককেশাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য রাশিয়ার একমাত্র সম্বল ছিল আজারবাইজান থেকে বিশ্ব বাজারে তেল পরিবহনের নির্ভরযোগ্য পাইপলাইন। কৌশলে এগিয়ে থাকার দারুণ একটা সুযোগ ছিল রাশিয়ার সামনে। উত্তর কাজাখিস্তানে থেকে তেল সরবরাহের সবচেয়ে ভালো রুট ছিল টেনগিয ফিল্ড। এই পাইপলাইন উত্তর ককেশাস ও দক্ষিণ রাশিয়ার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে গিয়ে ব্ল্যাক-সী'র সাথে সংযুক্ত করেছে রাশিয়ার নভোরসিস্ককে। শিঘ্রই এক শক্ত প্রতিযোগিতা শুরু হলো। ওদিকে জর্জিয়া চাইছে তাদের বর্তমান পাইপলাইনকে আরো উন্নত করে বাকু থেকে ব্ল্যাক-সী'র সুসপা অয়েল টার্মিনাল পর্যন্ত সংযুক্ত করতে। আরেকটা অপশন ছিল, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান হয়ে ইরান ও তুর্কির মধ্য দিয়ে পাইপলাইন নেয়া। রাশিয়ান অপশনের চাইতে বাকি দুটো অপশনে পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য কম হলেও সেগুলোতে ছিল অন্য ত্রুটি। জর্জিয়ায় আবখাজিয়াদের যুদ্ধ চলছে, নাগোর্নো-কারাবাখ যুদ্ধ চলছে আজারবাইজানে, ওদিকে আমেরিকার অর্থনৈতিক নীতি ইরানকে সমর্থন করে না।

১৯৯৫ সালে পাইপলাইন রুট বিতর্ক আপোষের সাথে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। রাশিয়ার নভোরসিস্ক এবং সুসপা বন্দর থেকে জর্জিয়া জুড়ে লাইনটি 'প্রাথমিক' তেলের জন্য ব্যবহৃত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। ওদিকে অয়েলম্যানরা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়, তারা লংটার্মের জন্য জর্জিয়ার মধ্য দিয়ে তেলের বড় প্রবাহের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী তুরস্কের দক্ষিণ উপকূলের চেহান পাইপলাইনের তুলনায়। এতে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীলতা থেকে আজারবাইজান মুক্ত হতে পারে। এছাড়াও টেনগিযকে সরাসরি বাকুর সাথে সংযুক্ত করার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাও ছিল। তাহলে মধ্য-এশিয়াও রাশিয়াকে কোণঠাসা করতে ফেলতে পারত।

BanglaBook.org

যা-হোক, রাশিয়াকে বাইপাস করে আঁকা পাইপলাইন বোর্ড পর্যায়ে থাকা অবস্থাতেই মস্কো কঠোর রূপ দেখানো শুরু করে। গেদার আলিয়েভকে

অপসারণ করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা চালায় রাশিয়া। সে সত্তর বছর বয়সে প্রেসিডেন্ট হয়েছিল, ফলে যখন মারা যাবে তখন দেশের কী হবে সে সম্পর্কে গুরুতর সব প্রশ্ন ওঠে। আলিয়েভের মৃত্যুর ফলে আজারবাইজানের অভ্যন্তরে নাগোর্নো-কারাবাখ বা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার নতুন ঝড় উঠতে পারে। তাতে বরং মস্কোকে আবার একটি অজুহাত দেওয়া হবে। স্পষ্টতই, যতোদিন তেল রপ্তানি রুটের কূটনৈতিক যুদ্ধ শেষ হবে না, ততদিন ককেশাসকে যুদ্ধের ভয়ে ভীত থাকতেই হবে।

সব মনোযোগ পাহাড়ের উত্তরেই নিবদ্ধ হলো। পাইপলাইনের কারণে মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকায় উত্তর ককেশাসে প্রথমে ভাঙনের ঘর্ঘর শব্দ শোনা যাচ্ছিল, এরপরই শুরু হয়েছিল ভাঙন। ১৯৯১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে চেচনিয়া মস্কোকে অবাক করে দেয়। ১৯৯২ সালে একটা সরু ভূমির জন্য উত্তর ওসেটিয়া ও ইঙ্গুশরা লড়াই করে। এরপর আরো ডজনখানেক লোক বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন চায়, ফলে স্ট্যালিনের ম্যাপ হয়ে যায় ছিন্ন ভিন্ন। পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। রাশিয়া যদি উত্তর ককেশাসের নিয়ন্ত্রক হতে না পারে তাহলে ট্রান্সককেশাসের ওপর রাশিয়ার প্রভাব ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। উত্তর ককেশাসশ মাতরিওশকো পুতুলের একটা স্তর, যা রাশিয়া কোনোভাবেই হাতছাড়া করতে চায় না।

পিয়াটিগোর্স্ক, স্ট্যাভ্রোপোল অঞ্চল

উত্তর ককেশাসে আপনি কেবল 'তেল পাইপলাইন' বললেই সবাই বুঝে নেবে আপনি কী বলতে চান। অনেক মানুষই কখনো দেখেনি বা জানে না, ঠিক কোথায় আছে পাইপলাইন। তবে কোন পাইপলাইনের কথা বলা হচ্ছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না কারো। পাহাড়ের মতো বাকু-নোভোরোসিস্ক পাইপলাইনেরও নিজস্ব উপস্থিতি রয়েছে এবং চেচনিয়ার যুদ্ধের কথা উঠলে পাইপলাইনের কথাও ওঠে।

পাইপলাইনটা দেখার জন্য আমি খুবই উৎসুক ছিলাম। চেচনিয়ায় থাকা অবস্থায় অনেকবার চিন্তা করেছি। লাদা ট্যাক্সি আমাকে প্যাটিগর্স্কের স্পা শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলের দিকে নিয়ে যায়। এখানে স্ট্যাভ্রোপোলের কালো মাটিতে কুয়াশা ও তুষারের রাজত্ব। পাইপলাইনের কোন চিহ্নই দেখতে না পেয়ে দশমবারের মতো মানচিত্রটি পরীক্ষা করে দেখি আমি। তখনই আমরা

BanglaBook.org

হঠাৎ একটা ট্র্যাকের মুখোমুখি হলাম; লাল এবং কালো কালিতে লেখা সাদা সাইনবোর্ডটি দেখা গেল:

অ্যাটেনশন! তেল পাইপলাইন। সংরক্ষিত অঞ্চল।

'থামো!' এটাই সেই পাইপলাইন। আমার পায়ের নিচেই আছে একই সাথে ককেশাসের আশীর্বাদ এবং অভিশাপ এই পাইপলাইন।

কাছাকাছিই একটি নির্জন খামার দেখা গেল। কয়েকটা ক্ষুধার্ত কুকুর এবং কিছু মরিচা পড়া সরঞ্জাম ছাড়া ফার্মটিকে একেবারেই পরিত্যক্ত দেখায়। একটি একরুমের কেবিনে একজন বৃদ্ধ মানুষকে খুঁজে পেলাম। চেচনিয়ার যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ মারা যাওয়ার কারণ যেই পাইপলাইন সেই পাইপলাইনের প্রায় ওপরে মাত্র একজন মানুষ বাস করে। আমি ধারণা করেছিলাম, বৃদ্ধলোকটা নিগুঢ় সত্যটা জানেন। আমরা যখন তার কেবিনে কথা বলছিলাম, প্রায় দুশ কিলোমিটার পূর্বে তখন যুদ্ধের দামামা বাজছে। আমি তার মতামত জিজ্ঞাসা করলাম।

প্রথমে তিনি এমন ভাব করলেন যেন পাইপলাইনের পাশেই যে তিনি বাস করছেন সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, একদমই বুঝতে পারছেন না, কেন একজন বিদেশি হঠাৎ এখানে থেমেছে।

'আমি রাজনীতি সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমি কোন সংবাদপত্রের খবর হতে চাই না।' লোকটি বললেন। কিন্তু আমি তাকে চাপাচাপি করতে থাকি। তার নিশ্চয়ই এসব নিয়ে কোনো অভিমত থাকার কথা।

হ্যাঁ, ছিল। 'প্রথমে স্ট্যালিন তাদের শেষ মানুষটাকে পর্যন্ত বিতাড়ন করেছিল। তারপর ক্রুশ্চেভ সবাইকে ফিরিয়ে আনে। আর এখন দেখো কী অবস্থা!'

BanglaBook.org

অধ্যায় দুই
প্রার্থনারত

হে আল্লাহ! রক্ষা করো আমাদের বিপথগামিতা হতে,
ওহে, সহযোদ্ধারা লড়াই করো আল্লাহর পথে।

- ইমাম শামিলের যুদ্ধবন্দনা

১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে উত্তর ককেশাস জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ, জেনারেল এবং গেরিলাদের সমর্থক হয়ে ওঠে। আদর্শবাদী ও যোদ্ধাদের অনেক আগে থেকেই সাধারণ জনগণের মধ্যেও একটি বিপ্লব চলছিল– যারা একসময় সোভিয়েত নাগরিক ছিল তারা প্রথমবারের মতো আয়নায় তাদের সত্যিকারের পরিচয় আবিষ্কার করছিল। কারো কারো বেলায় নিজেকে চেনার অনুভূতিটা আনন্দদায়ক একটা বিস্ময় ছিল। আবার কারো কারো আয়নায় অস্পষ্টতা থাকলেও ধীরে ধীরে তার মধ্যে দিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তারা কল্পনা করে নেয়। এই মানুষগুলোর কাছ থেকে প্রক্রিয়াটি তাদের সম্প্রদায়ে, তারপর সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার হচ্ছিল। এজন্যই তো রাশিয়ার সাথে তাদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম।

উত্তর ককেশাসে এই পুনর্জন্ম সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হতো মসজিদে। আগে কয়েকটি পুরানো মসজিদ ছিল এখানে। খ্রিস্টান গির্জার পাশাপাশি সোভিয়েতরা অধিকাংশ মসজিদই ধ্বংস করেছিল কিন্তু ১৯৮৭ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি মিখাইল গর্বাচেভের গ্লাসনস্ত-এর অধীনে নতুন উত্থান ঘটে। ১৯৯০-এর দশকে নতুন মসজিদগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের ময়লা রাস্তায় লাল ইটের

Banglabook.org

মিনার তোলা হয়। সূর্যালোকে পালিশ করা ইস্পাতের গম্বুজ চকচক করে ওঠে। কাস্পিয়ান সমুদ্রের ওদিকে মাখাচকালার বাইরে দাগেস্তানের প্রধান বিমানবন্দরে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তুরস্কের সাহায্যে মাখাচকালাতেই আরেকটি মসজিদ নির্মাণাধীন ছিল। দক্ষিণ পশ্চিম চেচনিয়ায় ছিল আমার প্রিয় মসজিদ। প্রধান ভবন ও ইটের তৈরি সুন্দর একটা হল পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছিল, মিনার এবং সিঁড়ির কাজ যুদ্ধের কারণে থামাতে হয়। বাঁকানো সিঁড়ি শূন্য আকাশের পানে উঠে ছিল।

মসজিদের পাশাপাশি একটা মাদ্রাসা বা ইসলামিক স্কুল ছিল। মক্কায় অনেক হাজীই হজ্জ করতে যেতো। প্রথমে মস্কো থেকে তারপর উত্তর ককেশাস এয়ারহাব থেকে সরাসরি ফ্লাইটে। সংবাদপত্রগুলিতে আগে ইসলাম-বিরোধী ও নাস্তিক্যবাদের প্রচারণা চলত শুধু। এখন মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাঠানো রাশিয়ান ভাষায় কুরআনের অনুবাদ নিয়মিত ডেলিভারি হয় উত্তর ককেশাসের বিমানবন্দরগুলোর মাধ্যমে। সেগুলোতে লেখা থাকত, 'চলো, ইসলামকে জানি।' সৌজন্যের জায়গায় লেখা থাকত, 'তোমাদের বিশ্বাসী ভাইদের পক্ষ থেকে।'

এই অঞ্চলের অনেক লোক ইসলাম সম্পর্কে এতোটাই অজ্ঞ ছিল যে একে পুনঃআবিষ্কারের চেয়ে বরং পুনরুজ্জীবন পাওয়া বলা যেতে পারে। এখনকার মধ্যবয়স্করা একটা নাস্তিক রাষ্ট্রে বড় হয়ে উঠেছে। আদিজিয়ায় অনেক জায়গাতেই এরকম অবস্থা ছিল। যেখানে সাড়ে বারো লাখের মতো স্থানীয় মানুষ স্ট্যাভ্রোপোলের একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হিসাবে কমিউনিস্ট শাসনকাল কাটিয়ে দিয়েছে। তাদের বেশিরভাগই নিজেদের পরিচয় ও সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলেছে। 'কমিউনিস্ট বিপ্লবের আগে আমাদের মধ্যে অনেকেই ধর্মে বিশ্বাস করত,' আদিজিয়ার একটি গ্রামের মোল্লা মোহাম্মদ খাফিতসেভ বললেন। তিনি নিজে স্বশিক্ষায়-শিক্ষিত ছিলেন। '১৯৯১ সাল পর্যন্ত আমাদেরকে নিজস্ব বিশ্বাস পালন করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এখান থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে একটি বড় মসজিদসহ গ্রামে আরো চারটা মসজিদ ছিল। প্রথমে প্রধান মসজিদটি একটি স্কুলে পরিণত করা হয় এবং দশ বছর আগে সরকার এর ওপর হানা দেয়। পচাত্তর বছর ধরে আমাদের কোন ধর্ম ছিল না। একটি মসজিদ বাকি ছিল, কিন্তু কেউ যেতো না। কিন্তু এখন নামাজের অভ্যাস ফিরে আসছে, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে।

BanglaBook.org

আদিদিজিয়ার রাজধানী মাইকোপের মুফতি, ইসলামিক স্কলার সাগিদ খুয়াকা’র জন্ম সিরিয়ায়। তিনি আদিজেই ভাষা জানতেন। উনিশ শতক থেকে বংশ পরম্পরা ধরে সবাই এ ভাষা শিখে আসছে তবে তার বংশের কেউ রাশিয়ান ভাষা জানে না। ‘আমি সিরিয়া থেকে এখানে এসেছি ১৯৯০ সালে। আমি মনে করি, এটাই আমার মাতৃভূমি,’ মুফতি সাগিদ খুয়াকা বললেন, ‘সেখানে বসবাস করা সহজ। কিন্তু এটাই আমাদের দেশ, এখানেই আমাদের অন্তর জুড়ে আছে।’

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসে আদিদিজিয়ার ইসলামি জ্ঞানের অবস্থা দেখে সে ধাক্কা খেয়েছে কিনা। বললেন, ‘জনগণ তাদের হারিয়ে ফেলা বিশ্বাসে ফিরতে চায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এখন কেউ মারা গেলে কাফন-দাফন ইত্যাদি ইসলামি রীতি মেনে করা হয় কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ঈমানে পুরোপুরি অবিচলতা আসবে না। মানুষের ইসলাম গ্রহণ বা ইসলামের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো সময় বা অর্থ নেই। অন্যান্য বিষয় নিয়েই বরং বেশি চিন্তা করতে হয়।’

মসজিদ নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়। তবুও সাগিদ গত ছয় বছরে গ্রামে সাতটা মসজিদ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

কারাচাইদের মধ্যেও একই সমস্যা ছিল; নির্বাসনের সময় তাদের সংস্কৃতি খুব বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের মধ্যে এখনও অনেকের বিশ্বাস হয় না যে তারা অবাধে নামাজ পড়তে পারে। বৃদ্ধরা সিক্রেট পুলিশকে ভয় পেত। কারাচাইভস্ক শহরের মোল্লা কাজবেক শামতায়েভ বলেন, ‘মসজিদগুলি ১৯৯২ সালের দিকে পুনরায় চালু হওয়া শুরু করে। তরুণদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম-কর্মে আগ্রহী হয়ে উঠেছে তবে বড়রা এখনো ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি; নামাজ পড়তে দেখলেই আগে পুলিশ তাদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতো। তাই বয়স্করা সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে ইবাদাত করত। বেশিদিন আগের কথা না, দামেস্কের এক শাইখ আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন। তবুও বয়স্ক লোকেরা তার ব্যাপারে সন্দেহ করেছিল—সে কি সত্যিকার শাইখ নাকি কমিউনিস্ট? কেউ কি তাকে চর হিসেবে পাঠিয়েছে?

বেশিরভাগ মানুষের কাছেই ইসলামের মূল্য তেমন একটা ছিল না। সোভিয়েত বিপ্লবের পর ওরা আমাদের সব কিতাবাদি, কুরআন, পাণ্ডুলিপি জড়ো করে পুড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, “দেখ, তোমাদের আর কোনো জ্ঞান বাকি

BanglaBook.org

নেই," এরপর তারা আমাদের মধ্যকার আলেম ব্যক্তিদের গুলি করে মেরে ফেলে। ফলে আমাদের মাঝে জ্ঞানী (আলেম) কোনো ব্যক্তি ছিল না। তারা আমাদের কাছ থেকে শরিয়াহ আইনকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।'

তা সত্ত্বেও কয়েকজন তরুণ ইসলামকে ধরে রেখেছিল। ইসলামি পুনর্জাগরণের গভীরতা টের পাওয়া যাচ্ছিল। কারাচাই-চেরকেস্কের রাজধানী চেরকেশে একটি ইসলামিক ইনস্টিটিউট খোলা হয়েছিল। প্রতি বছর অনেক তরুণ হজ্জ করতে মক্কা গমন করত। কারাচাইভস্কের একটি পুরানো মসজিদে যতো মানুষকে প্রার্থনা করতে দেখলাম তাদের সবাই হয় পড়ন্ত কিশোর বা উঠতি যুবক।

কাজবেক বয়সে একেবারে তরুণ এবং স্বশিক্ষায়-শিক্ষিত। বলল, 'আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমার দাদীকে নামাজ পড়তে দেখতাম এবং ভয় পেতাম যে কেউ বুঝি তাকে দেখে ফেলবে। সেই ঘটনাই আমাকে বদলে দেয়। আমি একজন নাস্তিক হিসেবে বড় হয়েছি কিন্তু সেই মুহূর্তটা আমার ভেতরে দাগ কেটে গিয়েছিল। একদিন আমি অসুস্থ হয়ে কয়েক মাস হাসপাতালে ছিলাম। আমার পাশের বেডেই একজন মরণাপন্ন বৃদ্ধ রোগী ছিলেন। একদিন আমি তাকে আরবিতে কিছু লিখতে এবং প্রার্থনা করতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কী করছেন? তিনি আমাকে জবাব দিলেন, 'আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি,' এরপর তিনি আমাকে প্রার্থনা করার নিয়ম মনে রাখতে বললেন। বললেন, এই প্রার্থনা আমাকে সকল শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে। আমি সেই দুটি আয়াত মনে করে রাখি এবং ধীরে ধীরে আরবি শিখতে শুরু করি। কয়েক বছর আগে অনুমোদন পেলে আমি কুরআনের একটি রাশিয়ান অনুবাদ সংগ্রহ করি।'

প্রতিবেশী প্রজাতন্ত্র কাবার্ডিনো-বালকারিয়াতেও একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। 'তরুণরা তুরস্কে যাচ্ছে কুরআন শিখতে,' বললেন নাসর নামের একজন মধ্যবয়সী লোক। তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারতেন, ইসলামের এই নব জাগরণ তার জন্য অনেক দেরিতে এসেছে। 'আমার বয়স চুয়াল্লিশ এবং আমি কুরআন পড়তে জানি না। আমি তা শিখিওনি। আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি কিন্তু কীভাবে নামাজ পড়তে হয়, জানি না। আমার শতকরা নব্বই ভাগ বন্ধুরাই নামাজ পড়তে পারে না। এটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, সোভিয়েতে আর কী হবে বলে আশা করো? আমি আমার দাদীকে প্রার্থনা করতে দেখেছিলাম। কিন্তু

Banglabook.org

স্কুলে আমাদের তুর্কি বা আরবি ছিল না। সমাজেও কোন ধর্ম ছিল না। এখন এই অল্পবয়সী যারা তুরস্ক যাচ্ছে এবং ইসলামি জ্ঞান ফিরিয়ে আনছে তাদের সংখ্যা বাড়ছে। পুরাতন দিনগুলিতে মোল্লারা হতো পঞ্চাশ ষাট বছরের বুড়োরা, এখন মোল্লা হবে পাঁচিশ বছর বয়সী তরুণরা।'

অতীতে এই অঞ্চলের পূর্ব অংশ তথা চেচনিয়া, দাগেস্তান এবং ইঙ্গুশেটিয়ায় সুফি তরিকা এবং ব্রাদারহুড সবচাইতে প্রভাবশালী ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের অর্ধেক- কাবার্ডিনো-বালকারিয়া, কারাচাই-চেরকেশিয়া এবং আদিজিয়া– এসব এলাকায় ইসলাম কখনোই তেমন গভীর ছিল না। কমিউনিস্ট প্রভাবে আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে পূর্ব দিকের প্রজাতন্ত্রগুলিতে ইসলাম জাতীয় জীবনের একটা অংশ ছিল। অনেক নারীই তাদের মাথা ঢেকে রাখে, পুরুষরা টুপি পরে থাকে। নামাজের সময় হলে রাস্তা কিংবা যেকোন জায়গায় দাঁড়িয়ে পুরুষদের নামাজ পড়ার দৃশ্য দেখা মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না।

ইসলামি পুনরুজ্জীবনের শক্তি ও গতি ছিল বিস্ময়কর। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দূরে থাকার কারণে রীতিনীতি বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। নির্বাসনের সময়ও ধর্ম পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যেহেতু উত্তর ককেশাসে ইসলাম জাতিগত পরিচয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশ্বাস হারানো মানে সবকিছু হারানো; আর বিশ্বাস টিকে থাকলে জাতি টিকে থাকবে। 'আমরা সবাই মুসলিম ছিলাম এবং নামাজের সময় আমরা একে অপরকে সাহায্য করতাম,' নির্বাসনের পরে বেঁচে থাকা একজন বৃদ্ধ বালকার বলেছিলেন। 'আমরা সব জানালা দরজা বন্ধ করে গোপনে নামাজ পড়তাম। আমাদের কয়েকজন মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কিন্তু বেশিরভাগ লোকই তাদের ঐতিহ্য ও বিশ্বাস সমুন্নত রেখেছিল।'

চেচেন ও ইঙ্গুশরা সুফি ভ্রাতৃত্বের ভেতরে প্রবেশ করার মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। এই গোপন সংগঠনই এক সময় রুশ সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং ষাটের শুরুর দিকে নির্বাসিতরা তাদেব মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

এইসব 'অন্যায়'-এর কারণে সোভিয়েত পরিকল্পনাবিদরা হতাশ হয়ে পড়ে। উত্তর ককেশীয়রা, যাদের সোভিয়েত নাগরিকের মডেল হওয়ার কথা ছিল, তারা অন্যান্য ধর্মের মধ্যে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়।

রবার্ট কনকোয়েস্ট তার 'দ্য ন্যাশন কিলারস' বইয়ে ১৯৭৩ সালে

'সোভিয়েতস্কি দাগেস্তান' পত্রিকায় ছাপা একটি মন্তব্য উল্লেখ করেন: একজন মুমিন কেবল আল্লাহর কাছেই জবাবদিহি করবে। এই সরকারের কাছে নয়। কেননা সোভিয়েত সরকার আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলে না বরং তাতে হস্তক্ষেপ করে। তাই এই আইন মান্য করা যাবে না।

দাগেস্তান ও চেচনিয়ার মুজাহিদরা এ কথাগুলোতে অবিচল ছিল, তারা এই বাণী সকলের নিকট পৌঁছে দেয়।

একাধিক ধর্মীয় যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও উত্তর ককেশাসের মানুষ ঐতিহ্যগতভাবে অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিল। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের শক্তি এবং কখনও কখনও চরমপন্থা এই পরমতসহিষ্ণুতাকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। ১৯৯৭ সালে বুয়েনাকস্ক শহরে দু'জন সুবিধাভোগী স্থানীয় ধর্ম পরিবর্তনকারীকে শহরের মেইন স্কয়্যারে ক্ষিপ্ত মুসলিম জনতা পুড়িয়ে মারে। আরেকটি ইস্যু ছিল ওয়াহাবিজম, সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। ওয়াহাবিরা চেচনিয়ায় যুদ্ধের সময় প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। তখন তারা শরণার্থীদের আর্থিক সহায়তা করেছিল। যুদ্ধের পর ওয়াহাবিরা চলে যায়নি। ১৯৯৭ সালে চেচনিয়ায় ওয়াহাবিদেরকে সুফি মোল্লা হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং দাগেস্তানের পর্বতমালার একটি গ্রাম কারা-মাখিতে শতাধিক ওয়াহাবি এবং স্থানীয় ধর্মমতের সমর্থকদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়।

সুরখোখি, ইঙ্গুশেটিয়া

সুফিরা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে। জার কর্তৃপক্ষ তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং তারা সোভিয়েতদের শিকারে পরিণত হয়। সোভিয়েতরা এখনও তাদের শত্রু হিসাবে দেখে। চেচনিয়ায় বেশিরভাগ প্রতিরোধের পিছনে রয়েছে এই সুফিরা। কোন যুদ্ধ বাধলেই সুফিরা কাজে নেমে পড়ে।

ইঙ্গুশেটিয়ায় ব্যাপারটা ভিন্ন। এখানে সুফিদের কদর বোঝা যায়। তারা সর্বত্রই আছে কিন্তু কোথাও তাদের দেখা পাওয়া দুষ্কর। তাদের ব্যাপারে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলে এমন সব বিভ্রান্তিকর উত্তর পাবেন যে আর কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হবে না। এটি সুফিদের সৃষ্ট দেয়াল যা এতোকাল কেজিবিকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এই দেয়ালই সেন্ট্রাল এশিয়ায় নির্বাসনকালে বিশ্বাসীদের টিকিয়ে রেখেছিল। এটা হচ্ছে উত্তর ককেশীয়দের রক্ষাপ্রাচীর, জাতির বাহ্যিক ধ্বংসের পরেও যা বেঁচে থাকে।

ইঙ্গুশেটিয়ার সুপরিচিত সুফি গ্রুপ হচ্ছে 'বাটাল হাজী'। বাটাল হাজী হচ্ছে বিশুদ্ধ এবং সবচাইতে আক্রমণাত্মক তরিকার সুফি। তাদের নেতৃত্বে রয়েছে সুরখোখী গ্রামের বেলখোরয়েভ পরিবার। তাদের একটি ভয়ঙ্কর খ্যাতি আছে। বাটাল, ১৮৬৭ সালে যিনি বাটাল হাজী প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি হজ্জ করতে মক্কা গিয়েছিলেন; একারণেই তার নামের শেষে হাজী। অবিশ্বাসী রাশিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। পরিবারের অন্য সবাইও একই কাজ করেছিল। তার কয়েক ডজন পারিবারিক সদস্য রাশিয়ান বা সোভিয়েতদের হাতে মারা যান।

সুরখোখি গ্রামটা পাহাড়ের তলদেশে ইটের তৈরি ঘরবাড়ির একটা গোলকধাঁধা। জায়গাটা দেখতে খুব শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ। আমার ইঙ্গুশ ড্রাইভার এবং আমি একজন গ্রামবাসীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বেলখোরয়েভরা কোথায় থাকে?'

'ওই ওখানে', বলে গোলকধাঁধার একটি ধুলোমলিন রাস্তা দেখিয়ে দিল তারা। সেখানে পৌঁছে আবার জিজ্ঞেস করতে হলো আমাদের। 'ওই দিকে' বলে ছোট আরেকটা রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া হলো। রাস্তায় প্রবেশ করেও ঠিক বুঝতে পারলাম না আমরা পৌঁছেছি কিনা। ভয় ভয় করতে লাগল আমার। সেই একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাঝে- তারা কি সঠিক নির্দেশনা জানে না? নাকি কথা বলতে ইচ্ছুক না? আবার একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বেলখোরয়েভরা কোথায় থাকে?' জবাবে এবার আমাদের অপেক্ষা করতে বলা হলো।

ছোট একটি টাক মাথা ছেলে হাজির হলো এ সময়। 'এইদিকে আসুন', বলে নোংরা গলিতে ঢুকে পড়ল ছেলেটা। গাড়ি নিয়ে ধীরে ধীরে ছেলেটাকে অনুসরণ করলাম আমরা। জায়গামতো আমি জুতো খুলে ভেতরে প্রবেশ করলাম। একজন মহিলা আমাকে একটা উঁচু ছাদওয়ালা রুমে বসতে দিল। দেয়াল থেকে দুটো গালিচা ঝুলছে তার একটিতে মক্কার ছবি আঁকা।

বাটাল হাজী সম্প্রদায়ের নেতা আখমেদ বেলখোরয়েভ রুমে ঢুকেই মেজবানের ভূমিকা পালন করলেন। আমি চা পান করতে চাই কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর জানতে চাইলেন, আমি কীভাবে তাকে খুঁজে পেলাম। তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না যে আমি সুফিবাদের ওপর লেখা একটি পশ্চিমা বই থেকে তার নামটি পেয়েছি। আমার কাছে বইটা নেই বলে আমি আমার কথা প্রমাণ করতে পারছি না।

BanglaBook.org

বেলখোরয়েভ বেশ বয়স্ক কিন্তু এখনো শক্তিশালী। তিনি নির্দিষ্ট কিছু আওতার মাঝে কথা বললেন। আমার খুব কম প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন কিন্তু কথা অনেক বললেন। আমি তাতে বাধা দেইনি। তিনি আমেরিকান, ইহুদি, রাশিয়ান এবং বিশেষ করে ওসেটিয়ানদেরকে অপছন্দ করেন। তার দৃষ্টিতে এরা সবাই বিশ্বাসঘাতক। নিজের ইঙ্গুশ পরিচয়ে দারুণ গর্বিত। 'আমরা পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছিলাম', তিনি আমাকে নোট নিতে দেখে এবার আগ্রহী হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমি পরের দিন আসতে পারব কিনা। আমি লক্ষ্য করলাম, তার টুপির পিছন থেকে একটি ডকের পাতা বেরিয়ে রয়েছে, ব্যথা হলে এখানকার মানুষ এটা ব্যবহার করে। 'আমার মাথা ব্যথা করছে', তিনি বললেন।

পরের দিন বেলখোরয়েভ অপেক্ষা করছিলেন। স্থির হয়ে বসামাত্রই তিনি আমাকে তার পবিত্র পূর্বপুরুষ বাটাল হাজী সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন। তার একটা ছবিও দেখালেন।

'যখন তারা আমাদেরকে দমন করতে শুরু করে, তখন আমাদের ধর্ম আমাদের শক্তিশালী করে তোলে। ধর্ম আমাদের সবাইকে একটা বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। কাজাখিস্তানে আমরা যদি জানতাম যে একটি গ্রাম ক্ষুধার্ত আছে, আমরা রাতেরবেলা পাহারাদারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে খাবার দিয়ে আসতাম। আল্লাহ আমাদের শক্তি দান করেছেন।

কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে, যদি অবিশ্বাসীরা তোমাদের দেশে এসে তোমাদের আপন লোকদের ধ্বংস করে দেয়, তবে তোমাকে অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। চেচনিয়ায় এটাই ঘটেছে। আমাদের নির্বাসনের সময় রাশিয়ানরা বুলডোজার নিয়ে এসে আমাদের সমস্ত কবরস্থান এবং পুরোনো দিনের স্মৃতি ধ্বংস করে দেয়। তারা আমাদের সংস্কৃতি আমাদের থেকে দূর করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা ফিরে এসেছি এবং সবকিছু পুনঃনির্মাণ করেছি। এখন তারা আবার চেচনিয়াকে ধ্বংস করছে। কিন্তু চেচেন ও ইঙ্গুশদেরকে দমিয়ে রাখা যাবে না। আমরা সবসময় প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ি।

এই বাড়ির বাইরেই বাটাল হাজী টানা তিন দিন যাবত জার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। তখন থেকে আজ অবধি তার অন্তত চল্লিশজন পুত্র ও ভাই মারা গেছে। কমিউনিস্টরা আমার বাবাকে মেরে ফেলে এবং নরিলস্কের তুন্দ্রায় সাড়ে ছয় বছর কারাগারে বন্দী করে রাখে আমাকে,' তিনি বললেন। আর্টিক সার্কেলের উপরিস্থ 'নরিলস্ক'-এর আলাদা করে বর্ণনা দেওয়ার দরকার

BanglaBook.org

নেই। নামটা খোদ রাশিয়ানদের কাছেই নরকের সমার্থক শব্দ। 'ওরা আমাকে শীতকালের মাঝামাঝি সময় উনত্রিশ দিন একটা কংক্রিট ফ্লোরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার জন্য ফেলে চলে যায়। কিন্তু আমি বেঁচে ছিলাম। একবার আমরা বেশ কয়েকজন ইঙ্গুশ একসাথে জেলে ছিলাম। সেখানে আমরা মজলিস কায়েম করে যিকির করেছি। আমি গার্ডকে কেবল বলেছিলাম দূরে থাকতে। এটা আমাদের ব্যাপার, এখানে কোনো বাধা দেওয়া যাবে না।

'১৯৭৪ সালে আমি মক্কায় হজ্জ করতে যাই। আমিই চেচেন এবং ইঙ্গুশদের মধ্যে প্রথম হাজী। ১৯৭৫ সালে আমি সোভিয়েতদেরকে প্রতিটি অঞ্চলে একটা করে মসজিদ খুলতে রাজি করাই। তারপর ধীরে ধীরে আমরা প্রতিটি গ্রামে মাদ্রাসা খোলা শুরু করি। ইসলামের পুনর্জন্ম আমার হাতে হয়নি, এখানে ইসলাম সবসময়ই ছিল। গোপনে, তবে সব সময়ই ছিল।'

বেলখোরয়েভ তিন বিয়ে করেছেন। তার প্রথম দুই স্ত্রী সন্তানহীনা, তৃতীয়জন ছয় সন্তানের জননী। বাটাল হাজীরা সহজে হাল ছাড়ে না!

তিনি আমাকে তাদের মসজিদ দেখালেন। মসজিদের একটা মিনার বাটাল হাজীর সময়কার। বাকি কাজগুলো তার অধীনে করা হয়েছে; মসজিদের কার্পেট, বিভিন্ন রঙ, ফ্লোরের রেখা, ওপরে বাচ্চাদের জন্য নামাযের স্থান, বারান্দা, পঞ্চাশ মিটার চওড়া পলিশ করা খোদাইকৃত কাঠ ইত্যাদি। মসজিদের আঙ্গিনায় ছিল একটা মাদ্রাসা। সাদা কাপড় পরিহিত শিশুরা এক তরুণের কাছ থেকে আরবি শিখছিল। আমাদের প্রবেশ করতে দেখে তারা সবাই দাঁড়িয়ে গেল।

সুরখোখির বাইরে পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত একটি কবরস্থানে গেলাম আমরা। প্রবেশদ্বারে ছোট্ট একটা নব্য নির্মিত মসজিদ। মসজিদের দরজা ছোট একটি পাথর দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বাটাল হাজীকে কবরস্থানের শেষ প্রান্তে কবর দেওয়া হয়েছে। পাশেই তার স্ত্রী এবং তিন ছেলের কবর।

গ্রামটি ত্যাগ করার সময় রাস্তার পাশে খোদাইকৃত পাথরের স্তূপের কাছে এসে আমরা থামলাম। নির্বাসনের সময় ইঙ্গুশদের যেসব ফলক গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, এগুলো তার অংশবিশেষ। আমি বেলখোরয়েভকে জিজ্ঞেস করলাম, বাটাল হাজীর কবরও একইভাবে অবজ্ঞা করা হয়েছে কিনা।

'কেউ-ই তার কবরের ফলক নষ্ট করতে পারে না। যেই-ই এমনটা করার চেষ্টা করেছে সে মাথায় আঘাত পেয়েছে, তার পরিবার অসুস্থ হয়ে

BanglaBook.org

যেতো,' তিনি বললেন।

উত্তর ওসেটিয়া স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলোর মাঝে সবচেয়ে বেশি রুশিকরণের শিকার। ওসেটিইয়ানদের পৌত্তলিক ঐতিহ্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় উপাদান হলো 'ওয়েস্টারঝি' এবং রাজধানী ভ্লাদিকভাকাজ থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তার তরুবীথিকা। ওয়েস্টারঝি ওসেটিয়ানদের দেবতা, একটি রহস্যময় চরিত্র। ইন্দো-ইরানীয় সূর্য, তারা, যুদ্ধ দেবতা ও ককেশাসের প্রাচীন নার্ট বীরদের উপাসনার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ওসেটিইয়ানদের পুরোপুরি খ্রিস্টান বানানোর জন্য রাশিয়ান অর্থোডক্স গির্জার পাদ্রীরা ওসেটিয়ানদের দেব-দেবীদের খ্রিস্টান সেইন্টদের সাথে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু নিজেদের দেব-দেবীদের পরিত্যাগ না করে ওরা তাদের দেব-দেবীকেই খ্রিস্টধর্মের সেইন্টদের জায়গায় প্রতিস্থাপন করে নেয়। ওয়েস্টারঝি'র পারিবর্তিত রূপ ছিল সেইন্ট জর্জ এবং ফলন ও বজ্রের দেবী ওয়াসিলাকে সেইন্ট ইলিয়ার স্থানে বসানো হয়।

ভ্লাদিকাভকায, উত্তর ওসেটিয়া

ভ্লাদিকাভকাবে একটি রাশিয়ান অর্থোডক্স গির্জায় থেমে কোনো পাদ্রী আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম আমি। কালো পোসাক পরিহিত নীল চোখের এক স্বর্ণকেশী পাদ্রী আবির্ভূত হলো। সেইন্ট জর্জের সঙ্গে ওয়েস্টারঝি'র প্রচলিত নিয়ম বহির্ভূত জোট সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞেসা করলাম।

পাদ্রী সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণাত্মকভাবে আমলাতান্ত্রিক জবাব দিল। আমি এমনটি প্রত্যাশা করিনি।

'প্রচলিত অনেক কথা চালু আছে, কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। আমাদের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। আমাদের মতে তার কাছে প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ। কারণ তার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই,' সে বললো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ওসেটিয়ানরা ওয়েস্টারঝি'র পরিবর্তে সেইন্ট জর্জকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল কেন?

'সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন অনেক বিশ্বাস রয়েছে, তাদের সবগুলোই যৌক্তিক নয়। এরকম অনেক অদ্ভুত বিশ্বাস আর উন্মাদনা দেখা যায়। আমরা সেন্ট জর্জের উপাসনা করি,' পাদ্রী বলল, 'সাদা ঘোড়ায় বসা সেই লোকের নয়। আমাদের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় তিন
পুনর্জাগরণ ও পুনর্বাসন

কাঁটাভরা ঝোঁপটায় তিনটা শাখা মাথা ফুঁড়ে উঁকি দিয়েছিল। একটা ভেঙে পড়ে আছে, একটা আহত হাতের মতো জীর্ণ। আরেকটায় দুটো ফুল ধরেছে। একটা লাল ফুলে এখন কালো ছোপ, আরেকটা কর্দমাক্ত। তবু যেন শাখাটার যুদ্ধাহত সেনানীর মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা, যে যোদ্ধা হারতে শেখেনি, যে যোদ্ধা মাথা নোয়াতে জানে না, আত্মসমর্পণ করার কথা মাথায়ও আনে না।

-হাজী মুরাত, লিও তলস্তয়

ধর্ম নিষিদ্ধ করার পরও প্রচুর মসজিদ গড়ে ওঠে উত্তর ককেশাসে। স্থানীয় জাতি গোষ্ঠীগুলিও তাদের আলাদা পরিচয় দাবি করে একের পর এক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সোভিয়েত জাতীয়তা রাতারাতি সংকটের মুখে পড়ে যায়। সংখ্যালঘু পাহাড়ি ইহুদি এবং গ্রীকদের পুনর্মিলনের যাত্রাটা দেখার মতো ছিল। পাহাড়ী ইহুদি বা তাতস সবচেয়ে ছোট গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি। মাত্র আঠারো হাজার জনসংখ্যা। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে ওরা ওদের ইহুদীত্ব এবং হাজার বছর আগে পারস্য থেকে আমদানি করা ফারসি ভাষাকে ধরে রেখেছে। সংস্কৃতি ও ধর্মের ওপর সোভিয়েত বিধি-নিষেধের অবসান ঘটায় কাবার্ডিনো-বালকারিয়ার নালচিক এবং দাগেস্তানের ডারবেন্টের চারপাশে অবস্থিত তাতস'রা আবার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং সংবাদপত্র চালু করার স্বাধীনতা পায়। কিন্তু তাদের সত্যিকারের পুনরুদ্ধারেজর জন্য আরো অনেক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

একই পথ অবলম্বন করে এই অঞ্চলের গ্রীক এবং পন্টিকরা- প্রায় তিন হাজার বছর আগে আনাতোলিয়া (বর্তমান তুর্কী), ক্রিমিয়ান উপদ্বীপ এবং ককেশাসের উপকূলে বসতি স্থাপন করে গ্রিকদের এই বংশধররা। এরা ছিল মূলত ব্যবসায়ী, সৈনিক এবং সেটলার, যাদের তৈরি ধ্বংসপ্রাপ্ত থিয়েটার, মন্দির এবং দুর্গ এখনও ব্ল্যাক-সী’র চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

দাগেস্তানের দুই মিলিয়ন মানুষ মোট চৌত্রিশটি জাতিতে বিভক্ত—অননুমোদিত সূত্রে সংখ্যাটা একশ ছাড়িয়ে যাবে। ‘পাহাড়িদের ভূমি’র মধ্যে রয়েছে আজারি তেল, ট্রেন ও সড়ক পথ। এর রাজধানী মাখাচকালা হচ্ছে কাস্পিয়ান পোর্টের কাছে। প্রধান জাতিগোষ্ঠীগুলোর মাঝে শুধু রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক বিদ্বেষই ছিল না, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং কখনও কখনও আধা সামরিক বাহিনি নিয়ে জাতীয় ফ্রন্ট ছিল। সবচাইতে বড় গ্রুপ আভারদের ছিল ইমাম শামিলের নামে একটা ন্যাশনাল ফ্রন্ট ছিল, রাশিয়ান রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের দশ হাজার সশস্ত্র সমর্থক ছিল।

অন্য সব জায়গার মতই স্ট্যালিনের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রভাব দাগেস্তানেও পড়ে। ১৯৪৪ সালে যখন দাগেস্তানে বসবাসরত চেচেনরা বেরিয়ে এসে তাদের দেশে গিয়ে স্বজাতিদের সাথে মিলিত হয় তখন অন্যান্য গোষ্ঠী, বিশেষত ল্যাকদেরকে তাদের পাহাড়ি এলাকা থেকে নামিয়ে বসবাসের জন্য সমতলে চেচেনদের খালি গ্রামগুলি দেওয়া হয়। ল্যাকদের সামনে আর কোন পথ খোলা রাখা হয়নি। ক্রেমলিন জাতিগুলোকে জুয়ার টেবিলে চিপস সরানোর মতো করে এদিক ওদিকে সরিয়ে দেয়।

১৯৯২ সালে দাগেস্তানি সরকারের সাতান্ন হাজার স্থানীয় চেচেনকে দাগেস্তানি-চেচেন সীমান্তের কাছে তাদের এলাকায় ফিরিয়ে দেওয়া এবং চেচেনদের রেখে যাওয়া সমভূমির আবাসস্থলগুলোয় ল্যাকদের পুনঃস্থাপন করার সিদ্ধান্ত তৃতীয় আরেক পক্ষ, কুমিকদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। তুর্কী ভাষাভাষী কুমিকরা এই জমিকে নিজেদের মনে করত। কয়েক বছর ধরে কুমিক প্রভাব অব্যাহতভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। প্রথমত আভারদের আগমনে এবং এখন ল্যাকদের।

১৯৮৯ সালে গঠিত তেংলিক নামক জাতীয় কুমিক ফ্রন্ট কাস্পিয়ান সমুদ্রের ওপর একটি পৃথক কুমিক স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্র দাবি করে এবং ল্যাকদের প্রতিরোধের জন্য শক্তি ব্যবহার করার হুমকি দেয়। এতে কুমিক ও আভারদের

BanglaBook.org

মধ্যকার সম্পর্ক খারাপের দিকে মোড় নেয়।

দাগেস্তানের দক্ষিণপ্রান্তে আরো বিস্ফোরক একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেখানে দাগেস্তান এবং আজারবাইজানের লেজঘিন জাতি অদ্ভুত এক সমস্যায় পড়েছে। অফিসিয়ালি মোট ৪,৬৬,০০০ লেজঘিন রয়েছে, আনঅফিসিয়াল পরিসংখ্যান অনুযায়ী এক মিলিয়নেরও বেশি হতে পারে। এরা দাগেস্তানের সর্বদক্ষিণ এবং আজারবাইজানের উত্তর-পূর্ব দিকে বসবাস করে। যখন USSR ভেঙে পড়ে তখন রাশিয়া ও স্বাধীন আজারবাইজানের মধ্যে একটি নতুন সীমা সৃষ্টি হয়। হঠাৎ করেই লেজঘিনদের একে অন্যের মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ, বাণিজ্য বা অন্যান্য যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। রাশিয়ান ক্রসিংকে 'গোল্ডেন ব্রিজ' বলে ডাকা শুরু হয় এ সময়, সীমান্তে ঘুষ গ্রহণ ও চোরাচালান এতোই প্রচণ্ড ছিল। আজারবাইজানের ১,৭৫,০০০ (অফিসিয়ালি) লেজঘিনের সমস্যা আরো বেড়েছে। ওরা মূলত সুন্নি মুসলিম কিন্তু বর্তমানে আজারি শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে হচ্ছে।

লেজঘিন জাতীয় ফ্রন্ট সীমান্তের উভয় পাশের লেজঘিনদের নিয়ে একটা স্ব-শাসিত অঞ্চল দাবী করে যা রাশিয়ার স্বায়ত্তশাসিত ক্ষুদ্র-প্রজাতন্ত্র হিসাবে থাকবে। লেজঘিনদের দাবি কেবলমাত্র দাগেস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে হুমকির মুখে ফেলেনি, সার্বভৌম আজারবাইজানও দৃঢ়ভাবে এর বিরোধিতা করেছিল। মস্কো সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অস্ত্র ও নিষিদ্ধ চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চিন্তিত। এই সমস্যারও আর সমাধান হয়নি।

দাগেস্তানের স্থিতিশীলতায় মস্কোর বাগড়া বসানোর আরেকটি কারণ ছিল এর বৈরী সীমানা। চেচেনরা রাশিয়ায় প্রবেশের রুট হিসেবে দাগেস্তানকে ব্যবহার করে এবং তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেয় দাগেস্তানিদের মাঝে। দক্ষিণে লেজঘিনদের সমস্যাটাও বিশাল এক মাথাব্যথার কারণ। যতোদিন দাগেস্তানি এবং আজারি দুই দলে ভাগ হয়ে থাকবে ততদিন লেজঘিনরা আলাদা স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্রের দাবী জানাতেই থাকবে।

দাগেস্তানের পলিসি সম্বন্ধে রাশিয়ান জেনারেল লেভ রোখলিন বলেন, 'দেখে মনে হয় যেন কোনো বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যেই এ সবকিছু করা হচ্ছে। দাগেস্তান যে এখনো ভেঙে-চুরে যায়নি এটাই তো বিস্ময়কর।'

দাগেস্তানিদের ঘড়ি টিক টিক করছে।

BanglaBOOK.org

***

কারো মুক্তিপণ আদায় করা ব্যতীত খুব কম রাতই অতিবাহিত হয় এখানে।

-আলেকজান্ডার দ্যুমা, খাসাভইয়ুর্ট, দাগেস্তান, ১৮৫৮

যেকোন বাস্তববাদীই বুঝতে পারে, বিভক্তি দাগেস্তানের জন্য দুর্যোগ নিয়ে আসতে পারে। পাশের দুটো প্রজাতন্ত্র কারাচাই-চেরকেশিয়া এবং কাবার্ডিনো-বালকারিয়ায় সম্পর্কহীন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ শান্তিপূর্ণভাবেই সহাবস্থান করছে।

প্রায় দেড় লক্ষ কারাচাই, যারা কারাচাই-চেরকেশিয়ার দক্ষিণে পাহাড়ি অঞ্চল বাস করত তারা সীমান্ত পুনর্বিন্যাসের দাবি করে। সীমানা পুনর্বিন্যাস এবং অন্যান্য সংস্কারের প্রথমদিকের দাবিদারদের মধ্যে তারা অন্যতম। গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার পঞ্চাশ বছর পর শেষ পর্যন্ত ১৯৯০-এর দশকে তাদের কারাচাইভস্কের নির্বাসন স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়।

১৯৯১ সালে মস্কো কারাচাই-চেরকেশিয়াকে স্ট্যাভ্রোপোল অঞ্চল থেকে বের করে এনে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র হিসেবে অনুমোদন দেয়। নিজস্ব বাজেট, স্থানীয় আইন, সংবিধান ও সরকার চালানোর ক্ষমতা দেওয়া হয় তাদের। ১৯৮৮ সালে কারাচাইরা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত এলাকা গঠনের জন্য আন্দোলন শুরু করে।

কারাচাই-চেরকেশিয়ার জনসংখ্যা ৪১৫০০০। রাশিয়ান এবং কোসাকরা রাজধানী চেরকেশের আশেপাশে বসবাস করে এবং অধিকাংশ সরকারি পোস্ট দখল করে রেখেছে। চেরকেশরা মূল প্রজাতন্ত্রের অধীনে এবং রাশিয়ান ও কোসাকরা বাকি অংশ নিয়ে দক্ষিণ রাশিয়ার ক্রাসনোদা অঞ্চলের অধীনে যাওয়ার পরিকল্পনা আঁটতে থাকে।

মার্চ ১৯৯২ সালে ৭৯ শতাংশ ভোটার একক প্রজাতন্ত্রে থাকার পক্ষে ভোট দেয়। মস্কোর মদদপুষ্ট কারাচাই-চেরকেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সাময়িকভাবে দুর্যোগ মোকাবেলায় সমর্থ হয়।

পূর্বে কাবার্ডিনো-বালকারিয়াতেও স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র গঠন করতে না পেরে আশি হাজার বালকার অসহায় হয়ে পড়ে। ৩৯১,০০০ কাবার্ডদের মাঝে বালকারদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পতিত হয়। নির্বাসনের সময় বালকারদের যে জমি কাবার্ডরা দখল করে নিয়েছে সেটা ফেরত দেওয়ার জন্য জোর দাবী জানায় বালকাররা।

BanglaBook.org

বালকাররা যখন ১৯৪৪ সালের ম্যাপ দেখিয়ে তাদের পূর্বে অধিকৃত জমি ফেরত চায় তখন কাবার্ডরা ১৮৬৩ সালের ম্যাপ এনে দেখায়। তখন বালকাররা পাহাড়ের ওপর বাস করত। সমভূমিতে তাদের কোন বসতিই ছিল না। উত্তর ককেশীয়দের এই অভ্যাস। অতীতের যেটুকু যখন প্রয়োজন শুধু সেটাকেই ব্যবহার করবে। ১৯৯১ সালে বালকারিয়া এবং কাবার্ডিনো আলাদা করার ব্যাপারে গণভোট হয় এবং অধিকাংশ বালকারই বিভক্তির পক্ষে ভোট দেয়।

কিন্তু বেশ কিছু স্থানীয় কারণে কাবার্ডিনো আর বালকারিয়ার বিভক্তি সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। তাদের মধ্যকার জাতীয়তাবাদী মনোভাবও বিদায় নেয়। ১৯৯৪ সালে আবার আরেকটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এবার অধিকাংশ ভোটই দুই রাজ্যকে একসাথে রাখার পক্ষে পরে। ১৯৯৬ সালে বালকার কংগ্রেস আবার বালকারিয়াকে আলাদা করার একটা চেষ্টা চালায়। কিন্তু ততদিনে বালকারদের জৌলুস কমে এসেছে। প্রজাতন্ত্রের মোট জনগণের মাত্র ১১ শতাংশ ছিল বালকার। ৪৯ শতাংশ কাবার্ড আর ৩২ শতাংশ রাশিয়ান।

***

আদিজিরাও পুনর্বাসনের জন্য লড়াই করে। তবে ওদের অবস্থা ছিল সবচাইতে নাজুক। জার আগ্রাসনের পর থেকে ওরা ভিনদেশিদের সাথে মিলে মিশে থাকছে। ফলে ওদের নিজস্বতার অনেকখানিই হারিয়ে ফেলেছে সময়ের স্রোতে। আদিজিদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সারকাসিয়ান গোষ্ঠীকে আদিজিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে সোভিয়েতরা। আর বিদেশিদের সাথে সমঝোতা করে চলতে চলতে এখন ওদের অস্তিত্বই সংকটের মুখে। তাদের নিজস্ব স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে আদিজি আছে ১২৫০০০, জনসংখ্যার মাত্র ২২ শতাংশ। বাকিরা সবাই স্লাভ। প্রতি দশজন লোকের মধ্যে প্রায় সাতজনই রাশিয়ান ভাষাভাষী।

১৯৯১ সালে আদিজিয়াকে পূর্ণাঙ্গ প্রজাতন্ত্রে উন্নীত করা হয়। সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও আদিজিয়ার মূল অধিবাসী রাশিয়ানরা ব্যাপারটা মেনে নিতে চায় না। তাদের প্রবল বিরোধ সত্ত্বেও ১৯৯৫ সালে আদিজিয়া নিজস্ব সংবিধানের অনুমতি পায়।

ভোটার আসনগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যাতে পার্লামেন্টের ৪৫ শতাংশ সিট আদিজিরা পায়। দুই তৃতীয়াংশ রাশিয়ান নাগরিক হওয়ার পরও রাশিয়ানদের আদিজিয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়া সম্ভব নয়। অদ্ভুত এক আইন আছে

BanglaBook.org

আদিজিয়ায়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হলে সেই ব্যক্তিকে অতি অবশ্যই রাশিয়ান এবং আদিজি- উভয় ভাষাই জানতে হবে। অধিকাংশ আদিজিই দুই ভাষায় কথা বলে কিন্তু কোন রাশিয়ানই দুই ভাষায় কথা বলে না। পারতপক্ষে আদিজির মতো দাঁতভাঙা কঠিন ভাষা কেউ শিখতেও চায় না, রাশিয়ানরা তো আরো নয়। এ কারণে আদিজিয়ার প্রেসিডেন্ট খুব স্বাভাবিকভাবে কোনো আদিজি হন। অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে রাশিয়ানদের হাতেই সব ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে। মূল নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা রাশিয়ান হয় সাধারণত। কিন্তু আদিজিয়ার পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানে আদিজিদের ওপর অধিকাংশ ভার ন্যস্ত।

বুদেনভস্ক, স্ট্যাভ্রোপোল অঞ্চল

কোসাকরা নীল-লাল চাদর ও পশমের টুপি পরে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে দুটি লাইনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছে 'লাইউবা!', যার মোটামুটি অর্থ 'হুররে'। প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলসিন ১৯৯৬ সালে কমিউনিস্ট জেন্নাদির বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে বুদেনভস্ক সফর করেন। ইয়েলসিন তার জিল লিমোজিন থেকে নেমে সরাসরি তাদের দিকে চলে গেলেন।

সভাটি ভালোমতোই অনুষ্ঠিত হলো। ইয়েলসিনকে উন্নত বংশের একটি ঘোড়া উপহার দেওয়া হয়। বিনিময়ে সে দেয় একটি তোষামোদি বক্তব্য।

'তোমরা চেচেনদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছো,' ইয়েলসিন উল্লাসের সুরে বলেন, 'তারা বুঝতে পেরেছে, কোসাকদের সাথে ঝামেলা করা উচিত নয়!' ইয়েলসিন কোসাকদের বলে যে, তারাই 'রাশিয়ার দুর্গ' এবং তিনি তাদের জীবন সংস্কারের অঙ্গীকার করেন। এরপর বলেন, তিনি কোসাকের স্কুলের জন্য কয়েক বিলিয়ন রুবল পাঠিয়ে দেবেন। কোসাকরা আবার উল্লাসধ্বণি করে ওঠে। ইয়েলসিন তার লিমুজিনে উঠে চলে যায়।

গত কয়েক বছরের অশান্তি রাশিয়ানদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের শক্তিমত্তাও অনেক কমে গেছে এখন। সোভিয়েত আমলেও প্রবল পরাক্রমশালী ছিল রাশিয়ানরা। আর এখন পুচকে জাতিগুলোও স্বায়ত্তশাসন চেয়ে বেড়াচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সবজায়গাতেই দারিদ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে। নিজেদের বাড়িতেই নিজেদের পরবাসী মনে হচ্ছে ওদের। চেচনিয়া থেকে হাজারো রাশিয়ান ফিরে আসছে।

কোসাকদের অবস্থা বেশ করুণ। আগের সেই জৌলুস আর নেই। এখন ওদের

BanglaBook.org

দিন কাটে পুরোনো ইউনিফর্ম, ফটোগ্রাফ, বাপ দাদাদের মেডেল দেখে আর তলোয়ার শান দিতে দিতে। কোসাকরা এখন দুটো সমস্যায় ভুগছে। প্রথমত মস্কোর সাহায্য সত্ত্বেও শোষিত হচ্ছে। দ্বিতীয় সমস্যাটা বেশ জটিল। এতোকাল ওরা রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করেছে। রাশিয়ানরা যে জায়গা দখল করেছে, সেখানেই বসবাস শুরু করত ওরা। নিজেদের কোন বাসস্থান ছিল না। ওরা আসলে কোথাও দীর্ঘদিন টিকতেও পারে না। ওদের অভ্যাসই শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কোথাও থিতু হওয়ার স্বভাব নেই। রাশিয়ান সাম্রাজ্যের পতন ঘটায় ওরা পড়েছে বিপদে। এখন ওরা পেশা সংকটে ভুগছে। অবশ্য কোসাক নেতারা আর্মিতে ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছে।

আদিজেই জনগণের অন্যতম অভীষ্ট দাবি-সারকাসিয়ান জাতির ক্ষতিগ্রস্তদের স্মরণদিবস হিসেবে ২১ মে'কে মস্কো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবে- কোসাকদের বিরোধিতার কারণে যা মঞ্জুর করা হয়নি।

আদিজির একজন সরকারি কর্মকর্তা আমাকে বলেছিল, 'কোসাকরা রেগে গেল কিনা এ নিয়ে মস্কো সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। আমাদের (আদিজিই) রাষ্ট্রপতি কোসাকদের জনসম্মুখে তাদের ইউনিফর্ম পরতে না করে দিয়েছেন যেন আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক শান্ত থাকে। অন্যথায় আদিজিরা রাস্তায় তাদের চেরকেস্ক ও কিনঝাল পরে বের হতে পারত। অবশ্য তিনি খানিকটা রসিকতা করে বলেছিলেন, তবে বিরোধ এড়াতে এরকম পদক্ষেপ অবশ্যই জরুরি।'

ইয়েলসিন যেদিন বুদেনভস্কে সফর করেন সেদিন সন্ধ্যায় আমি স্থানীয় কোসাকদের সাথে তাদের হেডকোয়ার্টারে বসেছিলাম। সেখানে ফ্যাসিবাদী চেহারার কালো ইউনিফর্ম পরিহিত একজন প্রবীণ লোক ছিল। এছাড়াও ছিল সেনাবাহিনির ছদ্মবেশ ও জিনস পরা কয়েকজন তরুণ। বাকিরা ছিল সাধারণ পোশাকে পরিহিত মধ্যবয়সী পুরুষ। অদ্ভুতভাবে বেশ কয়েকজন কোসাক আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ছিল। দেয়ালে ঝুলন্ত ছিল একটি বিশাল রাশিয়ান ত্রিবর্ণ পতাকা।

আলেকজান্ডার মায়েভস্কি। আটত্রিশ বছর বয়স, কোসাকদের নির্বাচিত চিফ। তিনি বললেন, 'রাশিয়ানদের একটা প্রফেশনাল আর্মি দরকার, যাদের সাথে কেউ বাকবিতণ্ডা করার আস্পর্ধা দেখাবে না। আর কোসাকদের থাকা উচিত সমস্ত পরিবর্তনের অগ্রভাগে।'

আমি তাকে বললাম, 'চেচনিয়ার যুদ্ধ, ইঙ্গুশ ও ওসেটিয়ানদের যুদ্ধ এবং আরো

BanglaBook.org

অন্যান্য বিরোধের কারণে উত্তর ককেশাস ইতোমধ্যেই বিপর্যস্ত হয়েছে। এখন তো নতুন আরেকটা সামরিক বাহিনির প্রয়োজন মনে হয় না।'

সে বলল, 'আমরা কেবল নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধরে রাখতে চাই।'

'হ্যাঁ, তবে এর অর্থ কী দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নয়?'

'না, আমরা কেবল আমাদের সম্মান ফিরে পেতে চাই। আমাদের সবারই একই চাওয়া। আমরা সবাই মিলেমিশেই থাকতে চাই। এমন তো নয়, আমরা কেবল দশ বছর ধরে ককেশাসে আছি। বরং আমরা শত শত বছর ধরে এখানে বসবাস করছি। এখানে একটা শৃঙ্খলা দরকার। এসব কিছুই চেচনিয়া ও অন্যান্যদের শৃঙ্খলার অভাবে হয়েছে।'

পিয়াটিগোর্স্ক

পিয়াটিগোর্স্কের অধিবাসীরা পুরনো বিবর্ণ কোট পরিধান করে। সেখানে আছে প্রশস্ত পথ, শতাব্দী প্রাচীন দালানকোঠা, খোলামেলা ছাদ আর দেয়ালে কাচের গ্লাস। তবে ভেতরে অনেকগুলো বিল্ডিংয়ে সোভিয়েতের ছাপ আছে। দেয়ালে বাদামি ওয়ালপেপার। এখানে করার মতো তেমন কিছুই নেই। মারশুক পাহাড় জুড়ে বিস্তৃত সেই বিখ্যাত পুরনো স্পা এখন প্রায় জনমানবহীন। লাল দরজা, লাল গালিচা, ঝাড়বাতি ও সাদা টেবিলের রেস্তোঁরাগুলোতে নেই কোনো কাস্টমার। চেচনিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমি লোকেদের পিয়াটিগোর্স্কে আসতে নিষেধ করেছি। দেখে মনে হয় বহু আগ থেকেই শহরটি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া শুরু করেছে। অবশ্য তারা এখনো তাদের এলাকার পানি ভালোবাসে। তাদের এলাকায় এক প্রকার বিশেষ কল আছে যেখান থেকে আপনি ফ্রিতে আপনার বোতলে পানি ভরে নিতে পারবেন।

লারমন্টভ তার সেনাবাহিনির বন্ধুদের সাথে যে ছোট্ট কুটির ও আঙ্গিনায় থাকতেন, তা আজও বিদ্যমান। এই ঘরে বসেই লারমন্টভ 'A Hero of Our Time' বইটি লিখেছিলেন। মারশুক পাহাড়ে একটি স্মারকস্তম্ভ তার মৃত্যুর স্থানকে চিহ্নিত করে রেখেছে। এই পাহাড়ে তিনি দ্বৈত লড়াইয়ে ছাব্বিশ বছর বয়সে নিহত হন। বর্তমানে সদ্য বিবাহিতদের কাছে জায়গাটা বিখ্যাত। এখানে নবদম্পতিরা ছবি তুলতে আসে।

সবকিছুই বদলেছে এমন নয়। দেড়শ বছর আগে লারমন্টভ যখন এখানে থাকত তখনো রাশিয়া চেচনিয়া ও ককেশাসের অন্যান্য অঞ্চল শাসন করতে

BanglaBook.org

চাইত, আজও পিয়াটিগোর্স্কে রাশিয়ান অফিসারের পদচারণা। গেরিলাদের অনুপ্রবেশ রুখতে শহরে বাইরে ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পুলিশ বাহিনি।

এই শহরে নাকি অনেক ভূতও আছে! আমরা কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে পিয়াটিগোর্স্কে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, আচমকা এক ঘোড়সওয়ার আমাদের সামনে, মেইন রোডে চলে আসল। ড্রাইভার ব্রেক চেপে ধরে। পরক্ষণেই আমাদের বাম দিকের পাথুরে গ্রামাঞ্চলে অদৃশ্য হয়ে গেল অবয়বটা। আমি তখন ভাবছিলাম, আমরা যা দেখেছি তা কি সত্যি নাকি কল্পনা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় চার
ঐক্যের স্বপ্ন

১৯৯৬ সালে নালচিকে যখন মুসা শানিবভের সাথে দেখা করি তখন তার চেহারা ভীতিকর রকমের বুড়োটে হয়ে গেছে। সে জানত, সে ব্যর্থ। অথচ মাত্র কয়েক বছর আগে সে সব হাইল্যান্ডারদের একটি রাজনৈতিক ছত্রছায়ার অধীনে নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখত। বলশেভিক বিপ্লবের সময় শেখ মানসুরের কাছ থেকে উত্তর ককেশাসের নেতারা এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পেয়েছে। ছোট জাতিসত্তাগুলো একত্রিত হলে সংখ্যাটা বিশাল আকার ধারণ করবে। রাশিয়ার সাধ্য কি তাদের মোকাবেলা করে!

শানিবভ যখন 'কনফেডারেশন অফ পিপলস অফ দ্য ককেশাস' গঠন করে তখন তার সাথে এই অঞ্চলের জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন ছিল। শুরুটা অনাড়ম্বরভাবে হলেও চোদ্দটি জাতি তাদের সাথে যোগ দেয়। ১৯৯৪ সালের দিকে অন্যান্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতো এটাও ব্যর্থ হয়। ককেশীয়দের একত্রিত হবার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন অধরাই রয়ে যায়।

আমরা যখন সাক্ষাৎ করি তখন শানিবভের বয়স ঊনষাট চলছে। খবরের পাতার শিরোনাম থেকে তার নাম অদৃশ্য হওয়ার এতোদিন পর একজন সাংবাদিক দেখতে পেয়ে খুব খুশি সে। আমরা তার অফিস ভবনের একটি কক্ষে বসে কথা বললাম।

সংস্থাটি ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে আবখাজিয়ার রাজধানী সুখুমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল নাম ছিল, অ্যাসেম্বলি অফ মাউন্টেন পিপলস অফ ককেশাস। চেচেন, ইঙ্গুশ, আদিজি, কাবার্ড, চেরকেস, আবজিন, শাপসুগ, আবখাজ ও আভারদের প্রতিনিধিরা সবাই তাতে সাক্ষর করে এবং শানিবভ

BanglaBook.org

ছিল কনফেডারেশনের চেয়্যারম্যান।

আবখাজরা জর্জিয়াতে সংখ্যালঘু ছিল। ওরা জর্জিয়া থেকে বেরিয়ে এসে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র গঠনের দাবী জানায়। কিন্তু জর্জিয়া সেটা মেনে নেয়নি। সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা রাজ্য দিতে অস্বীকৃতি জানায় জর্জিয়ান সরকার। আবখাজ আর জর্জিয়ানদের মাঝে বিরোধ চলতেই থাকে। এদিকে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধেও সমান তালে লড়ে যায় কনফেডারেশন। উত্তর ওসেটিয়ান আর দাগেস্তানি গোত্রকেও দলে টানতে সক্ষম হয় ওরা। কনফেডারেশন স্বাধীন নর্থ ককেশীয় রিপাবলিকের ঘোষণা দেয়। তাদের ইচ্ছে ছিল দেশটাকে ফেডারেশন হিসেবে রাখার। তাতে সবগুলো রাজ্যই স্টেটের সম্মান পাবে এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ থাকবে।

১৯৯১ সালের শেষদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আবখাজিয়ার পরিস্থিতি ঠান্ডা হয়ে আসে। দক্ষিণ ওসেটিয়ান, যারা জর্জিয়ার অধীনতা থেকে বেরিয়ে এসে উত্তর ওসেটিয়ার সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে চেয়েছিল তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয় জর্জিয়ান সরকার। এরপর ১৯৯২ সালের আগস্টে জর্জিয়ার নতুন নেতা, সাবেক সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড শেভার্দনাদজে তার সেনাবাহিনি নিয়ে আবখাজিয়া আক্রমণ করে রাজধানী সুখুমির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আবখাজরা আরো উত্তরে, রাশিয়া সীমান্তের দিকে সরে আসতে বাধ্য হয়। রাশিয়ান মিলিটারির সাহায্যে আবখাজরা জর্জিয়ানদের সাথে বর্বর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্রচুর মানুষ মারা যায় এই যুদ্ধে।

এই যুদ্ধের জন্যই অপেক্ষা করছিল মুসা শানিবভ। দক্ষিণ ওসেটিয়ানদের বেলায় পাহাড় পার হয়ে যুদ্ধ করার অনুমতি পায়নি শানিবভরা। এবার রাশিয়ান সরকার আর তাদের বাধা দেওয়ার সাহস করল না। জর্জিয়ায় ঢুকে আবখাজদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শানিবভের বাহিনি।

উত্তর ককেশাস থেকে কতোজন যোদ্ধা অংশগ্রহণ করে সেটা সঠিকভাবে জানা না গেলেও সংখ্যাটা আনুমানিক পাঁচশ থেকে এক হাজারের মতো হবে। যুদ্ধের তেরো মাস পর ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে আবখাজরা সুখুমি ঘিরে ফেলে আবার নিজেদের শহরের দখল ফেরত নেয় জর্জিয়ানদের কাছ থেকে। প্রায় আড়াই লাখ জর্জিয়ান সুখুমি ছেড়ে মূল জর্জিয়ার দিকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ককেশীয়দের দৃষ্টিতে এটা ছিল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিজয়। এতে তাদের

মিলিত শক্তির কী ফল হতে পারে সে ব্যাপারে ককেশীয়দের মাঝে উঁচু ধারণার সঞ্চার হয়।

রাশিয়ার ভূমিকা ছিল অস্পষ্ট। রাশিয়ানরা তখনো ককেশাস নিয়ে সেভাবে মাথাব্যথা করা শুরু করেনি। আবখাজিয়ার ব্যাপারে মোটামুটি নিরপেক্ষ ছিল। রাশিয়ান প্লেনগুলো যখন আবখাজদের পক্ষ থেকে জর্জিয়ানদের ওপর বোমাবর্ষণ করছিল তখন জর্জিয়ায় অবস্থানকারী রাশিয়ান সৈন্যরা আবার জর্জিয়ানদের যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছিল। এমনও হয়েছে, জর্জিয়ানদের সাহায্যকারী রাশিয়ানরা আবখাজদের সাথে লড়ার সময় নিজেদের রাশিয়ান জাতভাইদের খতম করেছে। মস্কো সরকার তাদের অংশগ্রহণের কথা সরাসরি অস্বীকার করে।

কনফেডারেশনের সাথে মস্কোর কি সম্পর্ক ছিল সেটাও অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। রেগুলার রাশিয়ান আর্মির পাশাপাশি রাশিয়ান মার্সেনারি সৈন্যও আবখাজদের পক্ষে যুদ্ধ করে উত্তর ককেশীয়দের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। যুদ্ধে রাশিয়ার সিক্রেট সার্ভিসও নাকি আবখাজদের সহায়তা করে- জর্জিয়ানদের সেরকমই অভিযোগ।

ককেশাসের অনেকের বিশ্বাস, কনফেডারেশন আসলে রাশিয়ানদেরই সৃষ্টি, রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস এটি পরিচালনা করে। জর্জিয়ান প্রেসিডেন্ট দাবী করেন, রাশিয়া তাদের ওপর আক্রমণ করেছে। আর আবখাজিয়া যুদ্ধের জন্য চেচেন যোদ্ধা শামিল বাসায়েভকে নাকি ট্রেনিং দিয়েছে স্বয়ং রাশিয়ার মেইন ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরেট। যাই হোক, কনফেডারেশনের মূল লক্ষ্য ছিল উত্তর ককেশাসের স্বাধীনতা। তারা চেচনিয়ার স্বাধীনতাকামী নেতা যোখার দুদায়েভের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বাসায়েভের যেই ব্যাটেলিয়ন আবখাজিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ানদের হয়ে লড়েছে, বছর দুয়েক পরে সেই যোদ্ধারাই চেচনিয়াতে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে।

আবখাজিয়ার যুদ্ধ এবং এর আগের দক্ষিণ ওসেটিয়ার নির্বাসনের ঘটনায় লাভ হয় রাশিয়ার। দক্ষিণ ওসেটিয়ায় ওসেটিয়ানদের সাথে বৈরী আচরণের কারণে জর্জিয়ানরা কখনোই আর দক্ষিণ ওসেটিয়ার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়নি। আবখাজিয়ার যুদ্ধে পরাজয় জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট শেভার্দনাদজেকে দুরবস্থায় পতিত করে। ওদিকে জর্জিয়ার পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট গামসাখুরদিয়া শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে। ফলে জর্জিয়ার রাশিয়ার কাছে হাঁটু না গেড়ে আর উপায় ছিল

BanglaBook.org

না। জর্জিয়া রাশিয়ার কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটসের সদস্য হতে বাধ্য হয়।

এভাবে রাশিয়া জর্জিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সমর্থ হয়। ট্রান্সককেশাসকে বিভিন্ন কারণে রাশিয়ার কব্জায় রাখা চাই। ককেশাসকে বিচ্ছিন্ন হতে দিতে না চাইলে উত্তর ককেশাসের সাথে সীমান্ত রক্ষাকারী দেশগুলোকে হাতে রাখতেই হবে। তাছাড়া বাইরে থেকে তুর্কির করাল থাবা থেকে বাঁচার জন্যও এদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এ কারণে জর্জিয়াকে করায়ত্ত করা রাশিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়।

নিজেদের মধ্যকার বিরোধের জন্য কনফেডারেশন ভেঙে যায়। আদিজি আর চেচেনরা একমত ছিল না। বালকার আর কারাচাইরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। সত্যি বলতে আদিজিরা যোগই দিতে চায়নি। চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট যোখার দুদায়েভের প্রভাব ক্রমাগত বেড়ে চলাতে সবাই খুশি ছিল না।

কনফেডারেশন যতোটা না যুদ্ধ-সংঘটন ছিল তার চাইতে বেশি ছিল স্থানীয় শান্তি রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। ওসেটিয়ান-ইঙ্গুশ যুদ্ধেও এদের করার কিছু ছিল না। এই এলাকার একমাত্র শক্তি হয়ে দাঁড়ায় রাশিয়ানরা। ১৯৯৪ সালে যখন রাশিয়া চেচনিয়ার ওপর চড়াও হয় ততদিনে এই এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

নালচিক, কাবার্ডিনো-বালকারিয়া

শানিবভকে ইউরি বলা হতো। পুরোপুরি রাশিয়ান। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে প্রবেশের পরে তার প্রথম নামটি বদলে মুসলিম 'মুসা' রাখা হয়েছিল। নালচিকে তার অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে আমি যখন তাকে ছবি তোলার কথা বললাম, তখন সে ঘুরে এসে দাঁড়াল যেন ব্যাকগ্রাউন্ডে ফুটপাতের গাছগুলি দেখা যায়, তার সোভিয়েত হাউজিং বিল্ডিংয়ের প্রবেশদ্বার নয়। আমি আপত্তি করলাম না।

কনফেডারেশন একটা ব্যর্থতা ছিল। আর এখন শানিবভের ভূমিকাও উপেক্ষিত। আমি আশ্চর্য হই, এখনো সে রাজনীতির সংস্পর্শে আছে দেখে। তবে সে এখন হতাশায় নিমজ্জিত, ক্রোধে ভরপুর। আমরা যতো বেশি কথা বলি ততই তার দৃষ্টিভঙ্গির রহস্য উন্মোচন হয়।

'ওরা যখন চেচেনদের সাথে বোঝাপড়া শেষ করবে-এতে খুব লম্বা সময় লাগবে-এরপর তারা সামনে এগিয়ে দাগেস্তান ও ইঙ্গুশেটিয়াকে নিয়ে ভাববে।

BanglaBook.org

ওসেটিয়ানদের দমন করা হবে। ককেশাসের অনেক লোক কেবল রাশিয়ার সাথে একটা সমঝোতায় পৌঁছতে চায়। তবে রাশিয়া সমঝোতায় থামবে না—তাদের লক্ষ্য ককেশাসকে ধ্বংস করা।

এই মুহূর্তে চেচনিয়ায় ইয়েলসিন তার দুই মিলিয়ন সৈন্যকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করছে। নির্বাচনে হেরে গেলে তাদের সবাইকে মাঠে নামাবে সে। রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ হতে চলেছে, এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। শিগগিরই এই সমস্ত পশ্চিমা দেশগুলি যারা চেচনিয়া ধ্বংস হওয়ার সময় চুপচাপ ছিল, তারাও পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাক্ষস রাশিয়ান সেনাবাহিনির মুখোমুখি হবে। এটা জার্মানি না, এটা আরো ভয়াবহ—পারমাণবিক অস্ত্রধারী হিটলার।’

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় পাঁচ
প্রথম রক্তপাত

ককেশাসে একটা জিনিসের কোনো ক্ষমা নেই, সেটা হলো রক্ত।

-আনাতোলি ইসায়েঙ্কো

ভ্লাদিকাভকায বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক

উত্তর ওসেটিয়ানরা অন্যদের চাইতে স্বতন্ত্র। স্থানীয় ভাষা বা তুর্কি উপভাষা ব্যবহার না করে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া ফারসি উপভাষায় কথা বলে ওরা। ওসেটিয়ানরা রাশিয়ানদের বিজয়ে সাহায্য করার ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল। ওরা বেশির ভাগই খ্রিস্টান। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তাদের প্রতিবেশীদের ইসলাম গ্রহণের ফলে ওসেটিয়রা স্বাভাবিকভাবেই অর্থোডক্স রাশিয়ার অনুরক্ত হয়ে পড়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলে উত্তর ওসেটিয়ানরা নিজেদের পরিচয় অনুসন্ধান করতে শুরু করে। তখন তারা ককেশাসে তাদের বিশেষ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। পাহাড়ের ওপাশে দক্ষিণ ওসেটিয়ার যুদ্ধে শরণার্থীদের বন্যা বয়ে যায়, আনুমানিক এক লাখ রিফিউজি পালিয়ে আসে উত্তর ওসেটিয়ায়। প্রিগোরদনি নামে পরিচিত ভ্লাদিকাভকাযের পূর্বে একটি এলাকা নিয়ে ইঙ্গুশদের সাথে বিরোধ ছিল ওসেটিয়ানদের। নির্বাসনের আগে এই অঞ্চলটি ইঙ্গুশদের ছিল এবং ইঙ্গুশরা তাদের জায়গাটা ফেরত চাচ্ছিল। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল, এবার হাইল্যান্ডার হাইল্যান্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। ওসেটিয়ানদের সাথে তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের ঐতিহাসিক

BanglaBook.org

বিভক্তি আরো বিস্তৃত হবে।

উত্তর ককেশাসের অন্যান্য জনগণের তুলনায় আরো নগরায়িত ওসেটিয়ানরা প্রায়শই নিজেদের অন্য গোষ্ঠিদের চেয়ে উঁচু জাত মনে করত। এই অঞ্চলের একাংশের সাথে ইসলামের গভীর সম্পর্ক নিয়ে অনেকে আতঙ্কের সাথে তাকাত। তারা মনে করত, দাগেস্তান থেকে ইঙ্গুশেটিয়া পর্যন্ত গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজগুলি সেকেলে। এমনকি সেখানকার উত্তর ওসেটিয়ানরা তাদের দক্ষিণ ওসেটিয়ান ভাইদের চেয়ে নিজেদেরকে এক ধাপ ওপরে বিবেচনা করত।

ভ্লাদিকাভকাযে বহির্বিশ্বের একটা ছাপ আছে। লম্বা সুন্দর সুন্দর মেয়েরা স্টাইলিশ জামাকাপড় পরিধান করে। নারী-পুরুষ রেস্টুরেন্টে একসঙ্গে খায়। এমন অনেক কিছু আছে যা আপনি ককেশাসের অন্য কোথাও পাবেন না। গ্রীষ্মকালে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তেরেক নদীর কাছে একটি পুকুরে বাথস্যুট পরে গোসল করতে যায়। সেখানে স্বল্পবস্ত্রা কিছু মেয়েও চোখে পড়ে আমার। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন রাশিয়ায় আছি।

অতীত ও জাতীয়তার সাথে আবেগের দিক দিয়ে উত্তর ওসেটিয়ানরা তাদের প্রতিবেশীদের থেকে কোনো অংশে আলাদা নয়। নিশ্চিতভাবেই এগুলো ছিল ট্যাক্সি ড্রাইভার বুগির প্রিয় টপিক। তার মুড ভালো ছিল। ভ্লাদিকাভকাযের বাইরে যাওয়ার দরুণ কেবল ভালো টাকা কামাচ্ছিল তা-ই নয় বরং ওসেটিয়ানদের সম্বন্ধে তার তত্ত্ব শোনানোর মতো শ্রোতা পাওয়া ছিল বিশাল ব্যাপার।

একজন অপেশাদার কুস্তিগীর বুগি, এমনভাবে চিৎকার করে কথা বলতে লাগল যেন আমরা খোলা ছাদ বিশিষ্ট গাড়িতে তীব্র স্পিডে যাচ্ছি, যেন আমরা তার ভলগা ট্যাক্সিতে নেই। 'আপনি জানেন আমরা সংখ্যায় এতো কম কেন? কারণ আমরা সারা দুনিয়া জুড়ে লড়াই করেছি। আমাদেরকে আলান বলা হয়। ভাড়াটে সৈনিকদের মতো আমরা সবকিছুর সাথে, সব জায়গায় লড়েছি! আমরা শক্তিশালী।'

বুগি বলতে থাকল, 'আপনি জানেন, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ওসেটিয়ান কে? স্ট্যালিন। সে জর্জিয়ান নয়! সে ছিল ওসেটিয়ান। যারা বলে স্ট্যালিন খারাপ ছিল, তাদের কারো কথা বিশ্বাস করবেন না। সে একজন মহান নেতা ছিল। তার মৃত্যুতে সব বয়সের মানুষ কেঁদেছিল। আমরা এরকম বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রতি

শতাব্দীতে একবার পাই।'

আমি নির্বাসন ও নিপীড়নের কথা বললাম। কিন্তু বুগি কিছুই শুনছিল না। সে বলেই চলছিল, 'স্ট্যালিন আসলে চালাক ছিল। সে বাল্টিক এবং ওইসব বিশ্বাসঘাতকদের নিজ ভাষায় চিঠি লিখতে দেয়নি, কারণ সে জানত এগুলো কোন দিকে মোড় নেবে। সে ঠিকই করেছিল। বাল্টিকরা স্বাধীনতা লাভ করার পরপরই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে।'

এক রাতে ভ্লাদিকাভকাযের একটি আউটডোর ক্যাফেতে ভ্লাদিকাভকায বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আনাতোলি ইসায়েঙ্কোর সাথে পরিচয় হয় আমার। বুগি যেখানে শেষ করেছিল সেখান থেকেই আলোচনা শুরু হলো। ওসেটিয়ার প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে অনেক বকবক হলো তার সাথে। আমরা সারমাটিয়ান, ইউরোপে সামরিক অভিযান ও আগেকার সিথিয়ানদের সম্পর্কে দীর্ঘ সময় কথা বললাম।

আনাতোলি একজন আধা কোসাক, আধা ওসেটিয়ান। বেশ চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি তিনি। বললেন, 'ওসেটিয়রা বিশ্বাস করে তারা উচ্চবংশীয়। তারা ইঙ্গুশ এবং চেচেনদের মতো জমি নিয়ে এতো ভাবে না। তাদের কাছে ভূমির প্রয়োজন নগণ্য- তারচাইতে বরং মন, বন্ধুবান্ধব এবং সংস্কারকে বেশি মূল্যায়ন করে।'

প্রথম প্রথম এসব কথা উদ্ভট লাগত, এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ইঙ্গুশেটিয়া সীমান্ত জুড়ে প্রচুর জমি ছিল। স্ট্যালিন যখন ইঙ্গুশদের নির্বাসনে পাঠায় তখন তারা শুধু বাড়ি ফিরে আসার কথা চিন্তা করত। যদিও বাড়ির আর অস্তিত্ব ছিল না, তাদের বসতি ভিন্ন জাতিকে দিয়ে দেওয়া হয়। নির্বাসিতরা জানত কোথায় তাদের পূর্বপুরুষদের কবর দেওয়া হয়েছিল। তাদের কাছে নিজেদের পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ছিল সুতরাং প্রিগোরদনি এখন সীমান্তের ওপারে এবং ওসেটিয়ানদের দখলে- এটা জানার পর ইঙ্গুশরা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

নির্বাসনের পর সোভিয়েত শাসনের অধীনে ইঙ্গুশরা চেচেনদের সাথে একটি যৌথ প্রজাতন্ত্র ভাগ করে নেয়। যখন চেচেনরা ১৯৯১ সালে রাশিয়া থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, ইঙ্গুশরা সিদ্ধান্ত নেয় তারা চেচনিয়াকে অনুসরণ করবে না। তার পরিবর্তে রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র হিসেবে মস্কোর আশীর্বাদ পায়। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরেও আইনি অস্তিত্ব ছাড়া ইঙ্গুশ প্রজাতন্ত্রের কোন শহর বা আর কিছু ছিল না। নাজরান নামে একটি বড়সড় গ্রাম ছিল রাজধানী এবং রাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রাক্তন সোভিয়েত সেনা

BanglaBook.org

কর্মকর্তা রুসলান আউশেভ। ২৭০০০০ ইঙ্গুশদের জন্য উত্তর ওসেটিয়ার সীমান্তে প্রিগোরদনির নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করা এখন আগের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। মস্কোর প্রতি অনুগত থাকাটা ছিল ইঙ্গুশদের জন্য ভালো পদক্ষেপ। রাষ্ট্রপতি ইয়েলসিন অনুগ্রহ ভরে তাতে সাড়াও দিয়েছিল। ১৯৯১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারণা চলাকালীন সময় ইঙ্গুশদেরকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বছরের শেষ নাগাদ তাদের সমস্যাগুলি সমাধান করা হবে। এদিকে অনুমতি নিয়ে বা না নিয়ে ইঙ্গুশরা তাদের জমি দাবি করছিল। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯২ সাল নাগাদ ত্রিশ হাজার ইঙ্গুশ প্রিগোরদনিতে ফিরে আসে, যদিও আসল সংখ্যাটা ষাট হাজারের কাছাকাছি ছিল। কিছু ইঙ্গুশ ভ্লাদিকাভকাযের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ওপরও নিজেদের দাবী জানায়, অফিসিয়ালি যেন ইঙ্গুশেটিয়ায় তাদের পুরোনো জমি ফেরত আসে। ১৯২৪ সালের দিকে ভ্লাদিকাভকাযের এই অংশটা ইঙ্গুশদের ছিল। অবশ্য ১৯৩৪ সালের ম্যাপেই সেটার আর উল্লেখ পাওয়া যায় না। নির্বাসনের আগেই ভ্লাদিকাভকাযকে সম্পূর্ণরূপে উত্তর ওসেটিয়ার মাঝে ফেলা হয়।

১৯৯১ সালে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ওসেটিয়ানরা প্রিগোরদনিতে ইঙ্গুশদের হয়রানি শুরু করে এবং সীমান্ত জুড়ে উদ্বাস্তুদের ধীরে ধীরে ইঙ্গুশেটিয়াতে ফেরত পাঠায়। অনেক ইঙ্গুশই ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। সেই বছরের নভেম্বরে নাজরান অঞ্চলে বিক্ষোভ দেখা দেয়। চেচনিয়ার বিদ্রোহ থেকে যাদের মাথা গরম তারা অনুপ্রেরণা খুঁজে পায়। ইঙ্গুশদের জন্য চেচেন অস্ত্র বাজার ছিল, কিন্তু ভ্লাদিকাভকাযকে কব্জা করার মতো শক্তি তাদের নেই। উত্তর ওসেটিয়া রাশিয়ার একমাত্র স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র যার সরকারি ন্যাশনাল গার্ড বা সশস্ত্র বাহিনি তৈরি করার অনুমতি রয়েছে।

কে প্রথম আক্রমণ করে সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। অক্টোবর ১৯৯২-এর শেষ দিকে উত্তর ওসেটিয়ার একটি আর্মার্ড কার প্রিগোরদনি গ্রামের একটি ইঙ্গুশ বাচ্চার ওপর দিয়ে চলে যায়। এতে ইঙ্গুশদের উন্মত্ত জনতা এবং ওসেটিয়ান পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়, উভয় পক্ষের কয়েকজন নিহত হয়। ২৪ অক্টোবর ইঙ্গুশ নেতারা তাদের গ্রামে ব্যারিকেড স্থাপন এবং প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির আদেশ দেয়। ৩০ অক্টোবর ওসেটিয়রা ইঙ্গুশ অঞ্চলে শেল নিক্ষেপ শুরু করে। পরের দিন ইঙ্গুশরা চেরমান গ্রাম থেকে ওসেটিয়ান পুলিশদের বের করে দেয় এবং প্রিগোরদনি অঞ্চল তাদের করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত ওসেটিয়ান অঞ্চলের

BanglaBook.org

ওপর হামলা চালাতে থাকে। প্রচন্ড লড়াইয়ের ফলে রাষ্ট্রপতি বরিস ইয়েলসিন ২ নভেম্বর এ অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। রাশিয়ান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তিন হাজার সৈন্য ও প্যারাট্রুপার ইউনিটকে হস্তক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়।

যুদ্ধটি ইঙ্গুশদের জন্য একটি দুর্যোগময় অধ্যায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রিগোরদনিতে আর কোন ইঙ্গুশ অবশিষ্ট নেই, তাদের সবাইকে হয় বহিস্কার করা হয়, নয়ত পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। রাশিয়ান কর্মকর্তারা উত্তর ওসেটিয়া থেকে ইঙ্গুশেটিয়াতে আগত ৬৫,০০০ শরণার্থীর নিবন্ধন করেছিলেন। অফিসিয়ালি ৪১৯ ইঙ্গুশ, ১৭১ ওসেটিয়ান ও অন্যান্য ৬০ জন নিহত হয়। অন্যান্য তথ্য অনুসারে মৃতের সংখ্যা ৭৫০ এবং আহতের সংখ্যা ৫০০ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সব মিলিয়ে ৩০০০ ইঙ্গুশ ঘর পোড়ানো হয়।

ওসেটিয়ানরা বলেছিল, সব দোষ ইঙ্গুশদের। ইঙ্গুশরাই ভ্লাদিকাভকাযের ওপর আক্রমণ চালিয়ে উগ্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। আপনি সব জায়গায় যে গল্পটি শুনেছেন, সেই একই গল্প, কিন্তু আজও প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি, সেটা হলো- উত্তর ওসেটিয়ার বেসামরিক ইঙ্গুশরা আগে থেকেই জানত যে, প্রিগোরদনি এবং ভ্লাদিকাভকাযকে দখলে নেওয়ার জন্য একটা বড়সড় ইঙ্গুশ আক্রমণ হবে। স্বজাতি যোদ্ধারা আঘাত হানার আগেই তারা গোপনে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের প্রাক্তন ওসেটিয়ান প্রতিবেশী ও বন্ধুদের আক্রমণ সম্পর্কে কোনো সতর্কবাণী না দিয়েই। একজন ওসেটিয়ান আমাকে বলেছিল, 'ইঙ্গুশদের কাছে ভ্লাদিকাভকায তেমন, বারবারিয়ানদের কাছে রোম যেমন।'

ইঙ্গুশরা একেবারে নির্দোষ ছিল না। জাতীয়তাবাদীরা ভ্লাদিকাভকায বিভাজনের জন্য আন্দোলন করছিল। আর প্রথম আক্রমণ উসকে দেওয়ার জন্য তরুণ ওসেটিয়ানদের মতো ইঙ্গুশ যোদ্ধারাও মারাত্মকভাবে দোষী। তবে ওসেটিয়ান প্রতিবেশীদের সাথে ইঙ্গুশবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা করার গল্পটি হাস্যকর বলে মনে হয়। অনেক ইঙ্গুশের অজান্তেই আচমকা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় ফলে এরকম বিপর্যস্ত অবস্থায় তারা বেপরোয়া হয়ে উত্তর ওসেটিয়ায় পালাতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধটা খুবই এক তরফা ও নৃশংস ছিল। প্রথমে গ্রামগুলোর ওপর আর্টিলারি বর্ষণ করা হয় এরপর আর্মার্ড কার নিয়ে সৈন্যরা আক্রমণ করে। কোন ইঙ্গুশই নিরাপদ ছিল না তখন। অনেক ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ইঙ্গুশরা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে ইঙ্গুশ জাতিসত্তা নিকেশ করতে ওসেটিয়ানদের সাহায্য

BanglaBook.org

করার অভিযোগ করে। তাদের অভিযোগের সত্যতা ছিল। রাশিয়ানরা দাঙ্গা থামানোর বদলে ওসেটিয়ানদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

আমি ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রিগোরদনিতে গিয়েছিলাম। আমার প্রিগোরদনি ভ্রমণ মোটেও সন্তোষজনক ছিল না। দাঙ্গার তিন বছর পরেও শুধুমাত্র গুটিকতক ইঙ্গুশ প্রিগোরদনিতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। সেখানে ইঙ্গুশদের হাজারো গৃহ শূন্য পড়ে রয়েছে অথচ ইঙ্গুশেটিয়ার শরণার্থী ক্যাম্পে হাজারো ইঙ্গুশ উদ্বাস্তুর মতো জীবনযাপন করছে।

হাতেগোনা কয়েকজন ইঙ্গুশ প্রিগোরদনিতে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় ওসেটিয়ান ডকুমেন্টেশন পেতে সক্ষম হয়। অনুমতিপ্রাপ্ত কয়েকজন ব্যতিক্রমী ইঙ্গুশ ছাড়া আর কোন ইঙ্গুশ এখন পর্যন্ত ওসেটিয়ার মাটিতে পা দেওয়ার সুযোগ পায়নি। সীমান্তে চেক পোস্ট বসায় রাশিয়ানরা। কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করে ১৬৭টি ইঙ্গুশ ঘর এবং ১০৭টি ওসেটিয়ান ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার রিপোর্ট পাওয়া যায়। এদিকে দক্ষিণ ওসেটিয়ার শরণার্থীরা প্রিগোরদনিতে ইঙ্গুশদের খালি ঘরে বসবাস করতে শুরু করে দেয়। দক্ষিণ ওসেটিয়ানদের ইঙ্গুশরা ঘৃণা করত আর উত্তর ওসেটিয়ানরা ওদের আপদ মনে করত। কিন্তু ওরাই বা কী করবে? জর্জিয়ায় ওদের বাড়িতে ফেরা সম্ভব নয়।

প্রিগোরদনির যে তেরোটি গ্রামকে এই দুর্দশার ভাগ্য বরণ করতে হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে দাচনয়ে। দাচনয়ের চারশ বাড়ির মাঝে চল্লিশটি বাড়ি পুনঃনির্মাণের অনুমতি পায়। ধ্বংসস্তুপের মাঝে মাত্র একটা রাস্তার ঘর-বাড়ি এখনো টিকে আছে। ওসেটিয়ানদের বাড়ি বলেই তা সম্ভব হয়েছে। যে সব ইঙ্গুশ ফিরে এসেছিল তাদেরকে মারধোর বা গুলির ভয় তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। সাথে অবিরাম ঘৃণিত হওয়ার লাঞ্ছনা।

আমি যখন বিকেলে ভ্লাদিকাভকাযে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম তখন কাদা মাটির রাস্তায় কোনো গাড়ি ছিল না। আমি দূর থেকে ভেসে আসা কামানের গোলার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। একজন পথচারী আমাকে বলল, 'চেচনিয়ার প্রশিক্ষণ'।

ঘৃণা এবং যুদ্ধ থেকে সৃষ্ট ব্যথা অনুভব করতে চাইলে আপনাকে কেবল নাজরানের ইঙ্গুশ ঐতিহাসিক জাদুঘরে যেতে হবে। ইঙ্গুশদের জন্য একটা রুম শুধু যুদ্ধ আর স্ট্যালিনের নির্বাসনের ছবির জন্যই নিবেদিত। প্রিগোরদনিতে ইঙ্গুশদের পুড়িয়ে মেরে ফেলার ভয়াবহ ছবিও সেখানে ছিল। আরো ছিল গলা

BanglaBook.org

কাটা ইঙ্গুশদের ছবি, যার বেশির ভাগই মহিলা। একটা বোর্ডে ছিল স্কুলের ইয়ারবুক টাইপ ছবি, সেখানে তরুণ ও বৃদ্ধদের হাসিখুশি ছবি ছিল। যুদ্ধে সবাই মারা গিয়েছে। এছাড়া প্রাণ হারানো শিশুদের ছবিও ছিল।

একটি চিত্রকর্মে দেখা যায়—রাশিয়ান ট্যাঙ্কগুলি মাঠের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাড়ি-ঘর জ্বলছে, একটি জ্বলন্ত শূলে এক ইঙ্গুশকে বেঁধে রাখা হয়েছে, একজন ওসেটিয়ান এক মহিলাকে ছুরিকাঘাত করছে এবং দুটি বন্য শূকর এক মুসলিম ইঙ্গুশ শিশুকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। পরের চিত্রে নির্বাসনের চূড়ান্ত প্রতীক চিত্রিত করা হয়েছে—হিমশীতল আবহাওয়া, খালি ট্রেন লাইনের পাশে পড়ে রয়েছে প্রত্যাখ্যাত লাশ।

বেশিরভাগ গণহত্যার শিকার হয়েছিল ইঙ্গুশরা। তারা তাদের ঘরবাড়িও হারায়। তবে উত্তর ওসেটিয়ার যুদ্ধটি জাতীয় চেতনায় এক অদম্য চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। ওসেটিয়ানরা উঁচু সভ্যতার দাবি করলেও ইঙ্গুশদের প্রতি তাদের ঘৃণা এখনও বিদ্যমান। সরকারি অফিসার থেকে শুরু করে ট্যাক্সি ড্রাইভার পর্যন্ত প্রত্যেকেই বলে যে, ইঙ্গুশদের ফিরে আসতে দেওয়া উচিত নয়। ইঙ্গুশ আর ওসেটিয়ানদের সহাবস্থান কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

একবার ভ্লাদিকাভকায মসজিদ দেখার ইচ্ছে হলো আমার। মসজিদটি তেরেকের পাশেই নির্মাণ করা হয়েছে। উনিশ শতকে তৈরি মসজিদটি অলৌকিকভাবে কমিউনিস্ট যুগেও টিকে ছিল, যদিও তখন কেউ নামাজ পড়তে আসত না মসজিদে। প্রিগোরদনির মুসলিমরা চলে যাওয়ায় উত্তর ওসেটিয়ায় যে কয়জন মুসলিম রয়েছে তারাই এখন মসজিদের একমাত্র প্র্যাকটিসিং মুসলিম।

তাদের একজন হলো ইয়ুরি। সে বলেছিল, সে সবেমাত্র কিছুদিন আগেই সত্য ধর্ম ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। এখন সে নিয়মিত মসজিদে আসছে যদিও যুদ্ধের পর থেকে উত্তর ওসেটিয়ায় মুসলিমদের প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো ঝুঁকিপূর্ণ। ১৯৯৫ সালে ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে সেখানে পার্মানেন্ট পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করা হয়।

ইঙ্গুশ-উত্তর ওসেটিয়ান সীমান্ত

মাগোমেদ ও এলব্রুস, দুজনের বয়স ২০ এর কোঠায়। তারা দু'জন ঘাসের ওপর বসে পিৎজা শেয়ার করে খাচ্ছে, যেভাবে স্কুলের ছেলেরা লুকিয়ে ধুমপান করে। কিন্তু তাদের সাহস ছিল আরো অনেক বেশি বিপজ্জনক।

BanglaBook.org

মাগোমেদ হলো ইঙ্গুশ এবং এলব্রুস উত্তর ওসেটিয়ান। যুদ্ধের আগে তারা বন্ধু ও প্রতিবেশী ছিল। সে সময় মাগোমেদ থাকত ভ্লাদিকাভকাযে। তাদের যোগাযোগের জন্য প্রায় চার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। মাগোমেদ একটা গাড়িতে লুকিয়ে সাহস করে সীমান্ত পার হবার কারণেই আজ তাদের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। এখন তারা ইঙ্গুশ-ওসেটিয়ান সীমান্তের মূল চেকপয়েন্টে আবার বিদায় বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'এটা ভীতিজনক ছিল,' মাগোমেদ বলল, 'আমাকে ইঙ্গুশেটিয়ায় আমার সমস্ত পরিবারের লোককে এড়িয়ে এখানে আসতে হয়েছে। আমি কোথায় যাচ্ছি তাদের কাউকে বলিনি। ওসেটিয়ান পুলিশরা আমাদের গাড়ি থামালে ব্যাপারটা বিপজ্জনক হতো। তবে ভ্লাদিকাভকাযে পৌঁছার পর সব ঠিক হয়ে গেল। আমরা আমাদের পুরনো ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। সেখানে দক্ষিণ ওসেটিয়ান শরণার্থীরা ছিল। তাদের বলার মতো কিছুই পেলাম না আমি। কেবল বললাম, তাদের সবার নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়া উচিত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ছয়
অবতরণ

১৯৯৩ সালে পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্রের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। উত্তর ককেশাস স্বাধীনতা অনুসন্ধানের নতুন আরেকটি পথ খুঁজে পায়। মস্কোতে প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন তার ঘোর কমিউনিস্ট জাতীয়তাবাদী সংসদের কাছ থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। এক পর্যায়ে ইয়েলসিন সোভিয়েত লিগ্যাসি ভেঙে রাশিয়াকে পশ্চিমে উন্মুক্ত করার চেষ্টা করেন এবং সোভিয়েতপন্থীরা তার এই অর্থনৈতিক উদারনীতির বিরোধীতা করে। অন্য দিক দিয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শগুলো ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে উঠল। ইয়েলসিনের এক কালের সঙ্গী-সাথীরাই দুশমন হয়ে দাঁড়ায়।

পার্লামেন্ট মেম্বাররা মস্কো নদীর তীরে তাদের বিশাল সাদা বিল্ডিংয়ে ব্যারিকেড বসায়। ৩ অক্টোবর বিদ্রোহী এমপিদের সমর্থকরা ওস্তানকিনো টেলিভিশন টাওয়ারে দাঙ্গা করার চেষ্টা করে এবং অনেক বেসামরিক লোক রক্তপাত এবং ক্রসফায়ারের শিকার হয়। পরের দিন ইয়েলসিন সেনাবাহিনি ডেকে এনে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে সংসদে হামলা চালানোর পর বিদ্রোহী এমপিরা আত্মসমর্পণ করে।

বিশ্রী এই পর্বের পর উদার অর্থনৈতিক শক থেরাপিতে ক্লান্ত রাশিয়ানরা নব্য-কমিউনিস্ট, জাতীয়তাবাদী বা কর্তৃত্ববাদী আদর্শের দিকে ধাবিত হয়। ইয়েলসিন বিজয়ী হয়েছিলেন কিন্তু তিন বছর আগে সোভিয়েত সৈন্যদের বিরুদ্ধে সংসদ ভবন প্রতিরক্ষাকারী গণতন্ত্রের সেই নায়ক আর তিনি রইলেন না।

আবারো আতঙ্ক অনুভব করে ককেশীয়রা। মস্কোতে নিজেদের কৃষি

BanglaBook.org

পণ্য বিক্রি করার জন্য তারা গর্বাচেভের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করেছিল এবং এটাই ছিল ককেশাসের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সাফল্য। মস্কোর মেয়র ইউরি লুজকভ অবিলম্বে বিদ্রোহের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা কর্মকাণ্ডে হাজার হাজার ককেশীয়কে রাজধানী থেকে বহিষ্কার করেন।

ডিসেম্বরে নতুন সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইয়েলসিনের সমর্থক-রাশিয়ান চয়েস পার্টি ভালো কাজ করার প্রত্যাশা দেয় জনগণকে। বর্ণবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবাদী লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এ সময়। যার নেতৃত্বে ছিল ভ্লাদিমির ঝেরিনভস্কি। পশ্চিমের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই কোজরিভও কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করেছিল। এই সময় নতুন একটি সামরিক মতবাদ গৃহীত হয় যার ফলে সাবেক সোভিয়েত অঞ্চলগুলির ওপর কড়াকড়ি বাড়ে। এতে চাপের মুখে রাশিয়া-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়।

কাবার্ডিনো-বালকারিয়া সরকারের জাতিগত সম্পর্ক কমিটির প্রধান খাসসান ডুমানভ এখনো সেদিনের কথা মনে করতে পারেন যেদিন তাদের প্রজাতন্ত্রে জাতীয়তাবাদ চূড়ান্ত রুপ নেয়। সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সালের ঘটনা সেটা। অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভগুলি কাবার্ডিনো-বালকারিয়ার সরকারি ভবনের বাইরে, নালচিকের সেন্ট্রাল স্কয়ারে অনুষ্ঠিত হয়। সে সময়ের অস্থিরতার কারণ ছিল রাশিয়ান পুলিশ মুসা শানিবভকে আটক করে রেখেছিল। জনগণ সোভিয়েত যুগের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পদত্যাগ চায় এবং কাবার্ডদের পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানায়। পরিস্থিতি খারাপ দিকে মোড় নিতেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। সরকারি ভবনের ভেতরে স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনিকে শক্তিশালী করার জন্য রাশিয়ান অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের সৈন্যদের ডাকা হয়।

ওদিকে ইঙ্গুশ-ওসেটিয়ান দ্বন্দ্ব থেমে যায় আশাতীত দ্রুততায়। যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনি উত্তর ওসেটিয়ানদের সাহায্য করবে। উত্তর ককেশাস প্রজাতন্ত্রের অনেক লোকের পুরনো সন্দেহ—মস্কো এই অঞ্চলে তার ক্ষমতা জোরদার করার জন্য পেসিশক্তি ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না—সত্য প্রমাণিত হয়; মস্কোর নিজেকে শক্তিশালী প্রমাণ করার যুদ্ধ আবখাজিয়াতে তারা দেখেছিল। যুদ্ধ উত্তর ককেশাসের জাতীয়তাবাদকে বিভক্ত করতে সমর্থ হয়। ডিভাইড এন্ড রুল এখানেও তার ক্যারিশমা দেখায়।

BanglaBook.org

মস্কো এবং ইঙ্গুশদের মধ্যে চুক্তিটি উত্তর ককেশাসে অনন্য ছিল। রাশিয়ান পার্লামেন্ট ম্যাগাস নামে নতুন রাজধানীর অর্থায়ন করে এবং ১৯৯৪-১৯৯৭ এর সময় সরকার ইঙ্গুশেটিয়ার জন্য তহবিল জোগাতে অফশোর ট্যাক্স নিতে অনুমতি দেয়। ইঙ্গুশদের রাষ্ট্রপতি আউশেভ তার জনগণকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রত্যাশা দেন।

ম্যাগাসের ধারণাটা বেশ উচ্চাভিলাষী। ককেশাসের সমতলে ফাঁকা মাঠ ব্যবহার করে রাজধানীতে রূপ দেওয়া হয়। আউশেভ একটি অফিসিয়াল ভবন নির্মাণ করেন যাকে কেন্দ্র করে ছিল সরকারি অফিস ভবনগুলো।

১৯৯৬ সালে যখন আমি ইঙ্গুশেটিয়ায় যাই তখন ম্যাগাসের একমাত্র দৃশ্যমান চিহ্ন বলতে ছিল একটি নির্দেশনামূলক পাথর ফলক যা রাজধানীর সীমানা নির্ধারণ করছিল। বাইরে শুধু ফাকা মাঠ এবং পর্বত সারি। তবে অবকাঠামো তৈরির কাজ চলছিল।

মস্কোতে ইঙ্গুশেটিয়া নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে–তাদেরকে বেশি লাই দেওয়া হচ্ছে। আসলে মস্কো ইঙ্গুশদের সমঝোতায় আনার ব্যাপারে বিরল দক্ষতা দেখিয়েছে। সংখ্যালঘুদের রাশিয়ান ফেডারেশন কীভাবে দলে টানতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল এটা।

ইঙ্গুশরা ১৯৯১ এবং ১৯৯৪ সালে চেচেনদের সাথে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে মস্কোর বিশাল উপকার করে। রাশিয়ান সৈন্যরা যখন চেচনিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণে যাবার প্রস্তুতি নেয় তখন ইঙ্গুশদের আনুগত্য আগের চেয়েও বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময় ইঙ্গুশ জনসাধারণ চুপ করে থাকে। মস্কোর চেচনিয়া আক্রমণে আউশেভ বিরোধিতা করলেও জনগণকে তিনি নিয়ন্ত্রণে রাখেন। চেচেনদের অফিসিয়ালি কোন সাহায্য ইঙ্গুশরা করেনি।

নাজরান, ইঙ্গুশেটিয়া

আউশেভ কারিশমা দেখাতে জানেন। তিনি বিদেশি গাড়ির বহর নিয়ে তার রিপাবলিক ভ্রমণ করেন। প্রায়ই নাজরানের ধুলোমলিন স্টেডিয়ামে বিভিন্ন ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন। স্পিকারে যখন ঘোষণা দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতি আসছেন, তখন হাততালির ধুম পড়ে যায়।

মস্কোতেও আউশেভের প্রভাব বেশ শক্তিশালী। ইঙ্গুশেটিয়ার জনসংখ্যা ২৫০,০০০ এরও কম, অনেক শহরের চেয়েও ছোট কিন্তু আউশেভের

BanglaBook.org

আলাদা একটা অবস্থান আছে। তিনি অন্যান্য ককেশীয় নেতাদের চাইতে ভিন্ন।

আউশেভ লম্বা মানুষ, নিজেকে দেখেন একজন নির্মাতা হিসেবে। সোভিয়েত আমল ছেড়ে বেরিয়ে আসা. পুরানো ককেশীয় মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনা এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের সাথে সম্পূর্ণ নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার কাণ্ডারি তিনি।

‘আমরা যা চাই তা হলো, বিশ বছরের মধ্যে রাশিয়া ফেডারেশনের সবচেয়ে সুন্দর শহরগুলির মধ্যে একটি হবে আমাদের ম্যাগাস। অর্থনৈতিক বাজারের জন্য আমরা বিশ্বমানের প্রজাতন্ত্র চাই। পর্যটকরা আমাদের পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখতে আসবে। আমাদের প্রজাতন্ত্র ছোট হতে পারে তবে এটি বিশ্বজুড়ে পরিচিত হবে।’

আউশেভের লক্ষ্য ম্যাগাস, হোটেল ও ফ্যাক্টরি ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছিল। ইঙ্গুশেটিয়ার জন্য এটা ছিল একটা সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ। ‘আমরা আমাদের ট্র্যাজেডির শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাই যে ট্র্যাজেডি সর্বদা আমাদের ও চেচেনদের পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আমাদের উচিত ঐতিহাসিক ভুলগুলো সংশোধন করা— এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চতুর্থ পর্ব

চেচেন নেকড়ে

কেবল একটাই জাতি আছে, যারা কখনো মাথা নোয়াতে জানে না... চেচেন। বিস্ময়কর বিষয় হলো, সবাই তাদেরকে ভয় পেত। তাই কেউই তাদের জীবনযাত্রায় বাঁধা দেওয়ার সাহস করেনি। ত্রিশ বছর ধরে যারা এই দেশ শাসন করছে, তারাও তাদেরকে রাষ্ট্রের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবনত করতে পারেনি... কোনো চেচেন কখনোই শাসকবর্গের সেবায় বা শাসকবর্গকে খুশি করার কাজে নিয়োজিত ছিল না। শাসকবর্গের প্রতি তাদের মনোভাব ছিল সর্বদা গর্বিত ও দ্রোহী।

-নির্বাসনকালে আলেকজান্ডার সোলজেনিস্টাইন

অধ্যায় এক
বিপ্লব

গোধূলিবেলায় চেচেন রাজধানী থেকে প্রাণের ছোঁয়া বিদায় নিতে শুরু করল। যোখার দুদায়েভ সরকারের অবস্থা বড্ড নাজুক। অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত গাড়ি আর অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস স্কয়ার পাহারা দিচ্ছে তার অনুসারীরা। কিছু কিছু মানুষ এখনো সিগারেট বা কোন খাদ্যদ্রব্য কেনার জন্য বাজারে যাচ্ছে। কিছু মানুষ ছায়ার আড়ালে নিচুস্বরে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনের বেশি বাইরে থাকছে না কেউ। দশতলায় প্রেসিডেন্ট দুদায়েভের অফিসের একটা লাইট এখনো জ্বলছে। হয়তো এটা কেবল দেখানোর জন্যই, বা সত্যিই হয়তো রাত জেগে কাজ করছে দুদায়েভ। তার স্বপ্নের স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে—একাকী নেকড়ের প্রতীক সম্বলিত স্বাধীন চেচনিয়া-ইচকেরিয়া।

রাতের অন্ধকারে চেচেন তরুণরা এভিনিউয়ের নির্জন স্থানগুলিতে গাড়ির রেস করে। এটাই গ্রোজনির রাতের জীবন। বিদেশি মুদ্রার আদানপ্রদান আর শত শত সন্দেহজনক চুক্তি। তরুণরাও তাদের বিএমডব্লিউ গাড়ির কোনো যত্ন নেয় না, এটাই তাদের বেপরোয়াভাবের বহিঃপ্রকাশ।

প্যালেসের কাছেই প্রসপেক্ট লেনিনার মুখোমুখি একটা ব্যারিকেডের কাছে অবস্থান নিয়েছি আমি। আজ আমিও প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস পাহারা দেব। কিছু চেচেন যুবক তাদের দামি দামি গাড়ি নিয়ে পাল্লা দিচ্ছে। আমাদের এভিনিউয়ের দিকেই আসছে। গাড়ির গতি বাড়িয়ে সরাসরি আমাদের ব্যারিকেডের দিকে এগিয়ে আসছে ওরা। মিটার পঞ্চাশেক বাকি থাকতেই স্কিড করে ১৮০ ডিগ্রি মোড় নিয়ে গর্জন করতে করতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

BanglaBook.org

আমাদের পেছনের রাস্তায় অটোমেটিক রাইফেলের গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। চেঁচামেচি আর গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে এল। প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস থেকে রেড মিলিটারি অ্যালার্ট ঘোষণা করা হলো। একটা কুকুর লাগাতার ঘেউঘেউ করে যাচ্ছে।

১৯৯৪ এর শরতের দিকে জেনারেল দুদায়েভের বিপ্লব অনেকটা থিতিয়ে আসতে শুরু করল। স্বাধীনতা দিবসের তৃতীয় বছরেই সোভিয়েত ছাপ মুছে গেছে দেশটা থেকে। লেনিনের স্ট্যাচু সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পায়ের কিছু অংশ ঝুলে আছে শুধু। লাল-সবুজ-সাদা চেচেন পতাকায় পূর্ণচন্দ্রের আলোয় শুয়ে থাকা একটা কালো নেকড়ে জানান দিচ্ছে পৃথিবীতে নতুন এক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। চার লাখ মানুষের এই শহরে বড় একটা বাজার রয়েছে। আহামরি কিছু নয়। আমি একটা বুকশপ, দুটো রেস্টুরেন্ট আর একটা খালি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর দেখতে পেলাম। টেলিফোনগুলো অধিকাংশই অকেজো। মানুষজনের করার মতো কোন কাজ নেই। চেচনিয়ায় ঢুকতে হলে রাশিয়ান সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ব্যারিকেড পার হয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। চেচনিয়ায় প্রবেশের পর মনে হয় রাশিয়াকে যেন অনেক পেছনে ফেলে রেখে এসেছি।

সর্বত্রই বিপ্লবের ছাপ সুস্পষ্ট। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশও দুদায়েভের লোক, সোভিয়েত বা রাশিয়ান নয়। তবুও তাদের পরনে আছে সোভিয়েত পুলিশদের নীল পোশাক। মস্কো বা ভ্লাদিভস্তকেও একই পোশাক পরে পুলিশরা। দুদায়েভের চেচনিয়ার টাইম জোন চেঞ্জ করা হয়েছে। মস্কো থেকে এক ঘন্টা পিছিয়ে চেচনিয়ার স্ট্যান্ডার্ড সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে কেবল স্বাধীনতাকামীদের ঘড়িতে দুদায়েভের সময়, বাকি সবার ঘড়িতে মস্কোর। মিনুতকা চত্বরে একটা বিশাল ব্যানার নিয়ে স্বাধীনতা-১৯৯১ শ্লোগান চলছে। 'ওরা কোন স্বাধীনতার কথা বলছে?' আমার ড্রাইভার বলল, 'স্বাধীনতা হলো যখন পকেটে কিছু টাকা থাকে। বছরের পর বছর ধরে আমাদের পকেটে কোনো টাকা নেই।'

এগারো তলা প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের সামনে অতি উৎসাহী মানুষের ভীড়। বুড়োরা যুবকদের সাথে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে বাকবিতন্ডায় ব্যস্ত। বৃদ্ধরা উঁচু আসট্রাখান হ্যাট ও চামড়ার জুতো পরে বেঞ্চে বসে আছে। তরুণদের পরনে স্যুট আর কালো জিন্স। উভয় প্রজন্মের হাতেই রাইফেল। প্যালেসের ভেতরে ছিল এডমিরাল ও বেলবয়ের ইউনিফর্মের মাঝামাঝি

BanglaBook.org

জাতীয় কিছু একটা পরা গার্ড।

গ্রোজনির বাইরে দুদায়েভের অনেক প্রতিদ্বন্দী আছে কিন্তু গ্রোজনির মেইন স্কয়ারে কান পেতেও বিপ্লব বা যোখারের বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনতে পাবে না কেউ। তারা বলত, 'বিগত সত্তর বছরে আমরা কোনো আলো দেখিনি, জীবনের মর্ম বুঝিনি। এখন আমরা তিন বছর যাবত স্বাধীন, এর চেয়ে সুখী কখনো ছিলাম না। রাশিয়ানরা কেবল আমাদের তেল চায়। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদেরও তেল চাই। আমরা যাকে ইচ্ছে আমাদের তেলগুলো বিক্রি করতে পারব—রাশিয়া, ব্রিটেন, যে কাউকেই।' মুহাম্মাদ বলল। তরুণ যুবক, প্রথম দিন সে-ই আমাকে তার ভলভো গাড়িতে লিফট দিয়েছিল। ব্ল্যাক গোল্ড অর্থাৎ তেলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই বিপ্লবে। রিজার্ভটা ছোট হলেও তেল রিফাইনারি কোম্পানিগুলোর কাছে লোভনীয় ছিল চেচনিয়ার তেল খনি।

আমি অর্থমন্ত্রী তাইমাজ আবুবাকারভকে জিজ্ঞেস করি, 'চেচনিয়া তো চাইলেই তেল বিক্রি করতে পারে। তবুও এমন ভগ্নদশা কেন স্বাধীন চেচনিয়ার?'

সে বলে, সে আমাকে পাঁচটা পয়েন্টের মাধ্যমে পুরো ব্যাপারটা বলতে পারবে। কিন্তু সে আমাকে আগডুম বাগডুম বলে দশটা পয়েন্টের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করল। অথচ আমার আসল প্রশ্নের কোনো উত্তর মিলল না।

'আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন, যারা আমাদের সাপোর্ট করছে তারা হলো হতদরিদ্র লোক। অপরদিকে যারা আমাদের বিরোধিতা করছে, তাদের সবসময়ই টাকা ছিল। কারণ তারা ছিল রাশিয়ার হয়ে কাজ করা লোক। রাশিয়ানরা আমাদের প্রতিদন্দ্বীদের কাছে চেচনিয়ার অবস্থা সম্পর্কিত কোনো ডকুমেন্ট দিলে তারা চোখ বন্ধ করে সিগনেচার করে দেয়। আর তাদেরকে এজন্যই টাকা দেওয়া হয়। আর আমরা, আমরা টাকা চাই না। আমরা চাই স্বাধীনতা!'

এটা সত্য যে, চেচেনদের অনেককে দেখেই মনে হয় ওদের আসলে টাকার দরকার নেই। এই অবরোধের সময়ও দেখি ফল আর মাংসের দারুণ সমাহার বাজারগুলোতে। গ্রামে তাদের ঘরগুলোও অনেক দৃঢ় ও প্রশস্ত। অন্তত তাদের সহকর্মীরা রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে যেসব ঝুপড়া ঘরে থাকে তার চেয়ে ঢের উত্তম সেগুলো। কিন্তু পরে আমি জানতে পারি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সম্পদ এসেছে অন্যভাবে। অনেক সাধারণ মানুষ আশির দশকে রাশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ করে বাড়তি টাকা উপার্জন

BanglaBook.org

করেছিল। সেখানে তারা মৌসুমি কাজ করত। কখনো মিস্ত্রি হিসেবে, কখনো বা ট্রাক চালক। এই কঠিন শ্রমের ফলেই তাদের কাছে টাকা এসেছিল। তা দিয়েই পরিবারের সাথে মিলে নিজ হাতে এসব ঘর নির্মাণ করেছে। ওদের এই অবস্থায় আসতে কয়েক বছর, এমনকি দশকও লেগেছে। সাধারণ চেচেনরা স্বচ্ছল ছিল, নিজেদের বাড়িতে থাকত। কিন্তু ওরা ধনী ছিল না। এটাই পার্থক্য।

অতএব অর্থমন্ত্রী যখন বলেন, তাদের টাকার দরকার নেই, তখন তিনি কেবল ইটের প্রাসাদের বাসিন্দাদের কথাই বলেন। এসব লোক এখন জার্মানি থেকে আমদানিকৃত রোলস রয়েস বা ফেরারি গাড়িতে করে ঘুরে বেড়ায়। অতি ধনীদের নতুন শ্রেণি এটা। এরা হয় তেলের চোরাকারবারি অথবা বিদেশ থেকে ইলেকট্রনিক সামগ্রী বা জামাকাপড় এনে রাশিয়ার কাছে চড়াদামে বিক্রি করে; এই ধরনের ব্যবসায়ীদের শাটল বিজনেসম্যান বলা হয়। এরা হলো সেসব লোক যাদের আর টাকা না হলেও চলে। এদের জন্য বিপ্লব ও তেল বিক্রির স্বাধীনতা স্রেফ ব্যবসায়িক সাফল্য।

একই সময়ে কলেরা ভয়ংকর আকার ধারণ করে। দুদায়েভ নিয়ন্ত্রিত হাসপাতালগুলিতে অ্যাসপিরিন থেকে শুরু করে অ্যানেসথেটিক সবকিছুই ফুরিয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ। হাসপাতালগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্কুলও ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র সেসব স্কুলই খোলা থাকে যেখানে শিক্ষকরা ফ্রি পড়াতে আপত্তি করে না। সেন্ট্রাল গ্রোজনির প্রথম রিপাবলিক হাসপাতালে কোনো সাপ্লাই ছিল না। প্রধান ডাক্তার আমার সাথে কথা বলতে অসম্মতি জানায়। আমি চলে আসছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে একজন নার্স আমাকে চুপি চুপি সবকিছু খুলে বলে। এরপর কান্নায় ভেঙে পড়ে সে।

***

চেচনিয়া রাশিয়ার অধীন নয়, চেচনিয়া আল্লাহর অধীন।

- চেচেন স্বাধীনতা স্লোগান

১৯৯১ সালের ১লা নভেম্বর স্থানীয় কমিউনিস্টদের উৎখাত করে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারটা এখন ভাবতে কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে। একটা ভুল, যার জন্য শত হাজার মানুষের প্রাণহানি

ঘটেছে। অথচ সে সময় অনিবার্য ছিল বিষয়টা। ১৯৯০ সালে চেচেনরা যেন ছিল রোলার কোস্টারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাশিয়ান ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে বরিস ইয়েলসিন দুর্নীতিগ্রস্ত কমিউনিস্ট স্তম্ভকে ভেঙে দিতে চাচ্ছিলেন।

চেচেনদের প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল যোখার দুদায়েভ, জাতীয়তাবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কমিউনিস্ট বিরোধী ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা হওয়ার আগে ১৯৯০ সালের নভেম্বরে সে ছিল সোভিয়েত বিমান বাহিনির মেজর জেনারেল। সোভিয়েত অধিকৃত ইসতোনিয়ার একটি শহর তারতু'র নিউক্লিয়ার বোম্বার বেইসের কমান্ডিং অফিসার। তার পদমর্যাদা দেখে বোঝাই যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বস্ত লোক ছিল সে। কেজিবি তাকে বিশ্বাস করত। আফগানিস্তানেও সে রাশিয়ার পক্ষে কাজ করেছিল। তার স্ত্রী এলা ছিল রাশিয়ান। সে পেইন্টিং করত, কবিতা লেখত। তবে খুব একটা সাফল্যের দেখা পায়নি।

দুদায়েভ দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে সংশয়ের আরো কারণ ছিল। এক চেচেন বন্ধু আমাকে বলেছিল 'দুদায়েভ একজন জেনারেল- বিষয়টি আমার পছন্দ না। জেনারেলদের মানসিকতা থাকে যুদ্ধ করার! তারা দেশ পরিচালনা করতে জানে না, কেবল লড়াই করতে জানে।' অবশ্য ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিষয়টা আরো আগেই উপলব্ধি করা উচিত ছিল। সে আরো বলে 'আমার মনে আছে যেদিন দুদায়েভ পাহাড়ে আসে। জানো, সে একবারও বলেনি, পাহাড় কতো সুন্দর, কী কী ব্যবসা-বাণিজ্য এখানে করা যায় বা এ জাতীয় কোনো কথা। সে কেবল বলেছিল, "গেরিলা যুদ্ধের জন্য এই জায়গাটা খুব উপযুক্ত, অনেক বিশাল।" তখনই আমি বুঝেছিলাম, লোকটাকে আমার পছন্দ হবে না।'

কিন্তু চেচেনদের কাছে তার নির্ভরযোগ্যতা ছিল। সে একজন জেনারেল ছিল বটে কিন্তু চেচেনদের দৃষ্টিতে তার অবস্থান ছিল অনেক ওপরে। একজন সত্যিকার যোদ্ধা। রাশিয়ানদের এক সময় সেবা করলেও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভয় পেত না। তার স্বাধীনতার ঘোষণায় সাধারণ মানুষ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। অনেকের মাঝেই তখন ধারণা জন্ম নেয়, সে এতোকাল সোভিয়েতদের সেবা করেছে গোপনে গোপনে রাশিয়ানদের উৎখাত করার জন্য। এবার সে তার মনোবাসনা পূরণ করার সুযোগ পেয়েছে। তাছাড়া চেচনিয়ার জনজীবনের

BanglaBook.org

দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা তার জন্মের পর থেকেই। ১৯৪৪ সালে তার জন্মের পরপরই নির্বাসন শুরু হয়। প্রথম থেকেই সে কাজাখ উপত্যকার ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সাথে পরিচিত।

ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে তখন চেচেনদের মনে বিজয়ের আশা অঙ্কুরিত হয়। আর তাদের দৃষ্টিতে যোখার ছিল একজন মহান নেতা। সে বলে, ‘যে দাস নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে না, সে একাই দু’জন দাসের সমান।’

আগস্ট ১৯৯১ সালে সোভিয়েত মন্ত্রীসভা সোভিয়েত ইউনিয়নকে অটল রাখার একটা চেষ্টা করে। বরিস ইয়েলসিন এসময় গণতন্ত্রের সমর্থকদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। তৎকালীন চেচেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ডকু জাভগায়েভ ঠিক বুঝতে পারছিল না কার পক্ষ নেবে। মন্ত্রী পরিষদ নাকি ইয়েলসিন। তার সিদ্ধান্তহীনতাকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায় দুদায়েভ। সে তখন সাধারণ চেচেনদেরকে ইয়েলসিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়।

মস্কোর স্বৈরাচারী শাসকের মতো জাভগায়েভ সরকারও এ সময় আসন্ন ভবিষ্যতকে রুখতে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাকে নিষিদ্ধ ও বন্দি করে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দুদায়েভপন্থীরা সংখ্যা ও শক্তি দু’দিক দিয়েই বেশি ছিল। গ্রোজনিতে প্রতিদিন সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে জনগণ বিক্ষোভে যোগ দিত। বিক্ষোভকারীরা ২২ আগস্ট টেলিভিশন টাওয়ার দখল করে নেয় এবং দুদায়েভ টেলিভিশনে এসে বিপ্লবের ঘোষণা দেয়। এর দুই সপ্তাহ পর, ৬ সেপ্টেম্বর দুদায়েভের সংসদীয় ন্যাশনাল গার্ড স্থানীয় কমিউনিস্ট সংসদ দখল করে নেয়। ১৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম সোভিয়েতের শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং জাভগায়েভ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

এ সময় দুদায়েভের বিরোধিতা করে অনেকেই। বিশেষত শিক্ষিতরা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মস্কোর আচরণে বিপ্লব শুধু বেগবানই হতে থাকে। কেউ কেউ তীব্র জাতীয়তাবাদের কারণে বিপ্লবের বিরোধিতা করে। অন্যান্যরা বিরোধিতা করে এ কারণে যে, পুরনো শাসনের পতন হলে অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে।

সন্দেহপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের ২৭শে অক্টোবর। সেই নির্বাচনে ৯০ % ভোটে যোখার দুদায়েভ বিজয়ী হয়। অফিসিয়াল প্রতিবেদন

BanglaBook.org

অনুযায়ী, ৯০% এর মধ্যে ৭২% ভোটই তাকে দেয় বিপ্লবী যোদ্ধারা। আর আন-অফিসিয়াল রিপোর্ট অনুসারে এই হার ১০-১২%। সত্য এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সব বিপ্লবেই শক্তি আর মিথ গুরুত্ব রাখে, আর দুদায়েভের দুই-ই ছিল। পাঁচ দিন পর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে চেচনিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সে একটা ফরমান জারি করে।

মস্কো, বিশেষত সংসদ স্পিকার রুসলান খাসবুলাতভ প্রথমদিকে জাভগায়েভের বিরুদ্ধে বিপ্লবে দুদায়েভকে সাহায্য করলেও স্বাধীনতার ঘোষণায় তাদের সাথে দুদায়েভের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। রাশিয়ান ভাইস প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার রুতস্কই ছিলেন প্রাক্তন বিমানবাহিনির জেনারেল। তিনি বলেন, চেচেনরা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি তাদেরকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দেন এবং রাশিয়ার অনুগত নাগরিকের মতো আচরণ করতে বলেন। তিনি দাবি করেন, দুদায়েভের বাহিনিতে শ দুয়েকের বেশি মানুষ ছিল না।

দুদায়েভ যুদ্ধ ঘোষণা করে পাল্টা জবাব দেয়। ফলে চেচনিয়ার বিরুদ্ধে রুতস্কই আরেকটা জ্বালাময়ী বক্তব্য দেন। প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন দুদায়েভ বাহিনিকে অবৈধ সশস্ত্র দল হিসেবে আখ্যা দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করতে বলেন, অন্যথায় কঠিন শাস্তির হুমকিও দেন। দুদায়েভ এসব গায়েই মাখেনি। বরং সে রাশিয়ান পার্লামেন্টের স্পিকার রুসলান খাসবুলাতভের নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

যুদ্ধের প্রান্তসীমায় এই বিপজ্জনক নীতির খেলা আরো এক ধাপ অগ্রসর হয় ৮ নভেম্বর। দুদায়েভের স্বাধীনতা ঘোষণার জবাবে বরিস ইয়েলসিন জরুরি অবস্থা জারি এবং চেচনিয়া ও ইঙ্গুশেটিয়ার সাংবিধানিক অধিকার স্থগিতের আদেশ দিয়ে 'শৃঙ্খলা প্রত্যর্পণ' এবং 'রাশিয়ার আঞ্চলিক অখণ্ডতা' রক্ষার জন্য গ্রোজনিতে শত শত সৈন্য প্রেরণ করেন।

দুদায়েভও প্রস্তুত ছিল এসব কিছুর জন্য। রাশিয়ান সৈন্যরা গ্রোজনিতে পৌঁছে নিজেদেরকে চেচেন ন্যাশনাল গার্ডের ঘেরাওয়ের মধ্যে আবিষ্কার করে। তাদেরকে যুদ্ধ বা আত্মসমর্পণ- দুটোর যেকোন একটা বেছে নেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়। শামিল বাসায়েভ এ সময় ১৭৮ জন যাত্রীর একটা জেট হাইজ্যাক করে জটিলতা আরো বাড়িয়ে তোলে। ৯ সেপ্টেম্বর যাত্রীদের গ্রোজনিতে কোন রকম ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া মুক্ত করে দেওয়া হয়। এরপর বাসায়েভ বলে, রাশিয়ান সৈন্য মোতায়নে বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। এমনকি

BanglaBook.org

টার্কিশ কর্তৃপক্ষও বাসায়েভের কথার সাথে সম্মত ছিল। তারা বলে, বাসায়েভের কাজটি 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' নয় বরং 'প্রতিবাদ'। দুদায়েভের রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার পেছনে এর বিস্ফোরক ভূমিকা ছিল। সেদিন হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী চেচেন রাষ্ট্রপতির প্রাসাদের বাইরে স্বাধীনতা স্কয়ারে তাদের বিপ্লবী কর্মসূচি পালন করে। রাশিয়ান সেনাবাহিনি চেচনিয়া ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মস্কো চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। রাশিয়ান সংসদ ইয়েলসিনের জরুরি অবস্থার অনুমোদন দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এভাবে দুদায়েভ তার প্রথম শো-ডাউনে জয়ী হয়। ফলে রাস্তায় রাস্তায় ভিড় জমে যায়, বিপ্লবীরা উল্লসিত হয়ে ওঠে। রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হয়।

তবে নাটক তখনো শেষ হয়নি। বিপদের আগমনবার্তা শোনা যাচ্ছে। একদিকে মস্কোর কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেবার অক্ষমতা প্রকাশ পায় অপরদিকে দুদায়েভ আবিষ্কার করে যে, দানব রাশিয়ার বিরুদ্ধে দেশপ্রেমই তার জনপ্রিয়তার মূল চাবিকাঠি।

পরবর্তী তিন বছর সব এভাবেই চলতে থাকে। ক্রমেই রাশিয়া-চেচেনদের সম্পর্ক খারাপের দিকে গড়ায়। অচলাবস্থা অবশেষে যুদ্ধে মোড় নেয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় দুই
সারল্যের সমাপ্তি

আমি ক্ষমতার পিয়াসী নই, নই ধন-সম্পদের পাগল। আমার মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরপাক খায় আর তা হলো চেচেনদের স্বাধীনতা, চেচেনদের মুক্তি। এটাই আমার জীবনের লক্ষ্য আর আমি কোন পরিস্থিতিতেই আমার লক্ষ্য থেকে পিছ-পা হবো না।

-যোখার দুদায়েভ

দুদায়েভের পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কিছু অফিসিয়াল বই বের হয় এসময়। এদের মধ্যে 'স্বাধীনতার কন্টকময় পথ' অন্যতম। হার্ডব্যাক কাভারে পাইলটের সিটে বসা হাস্যোজ্জ্বল দুদায়েভের ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল। এসব প্রচারণাপত্রে প্রেসিডেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ চেচেন (৯ লক্ষ) এবং সংখ্যালঘু রাশিয়ানদের (৩ লক্ষ) সমান অধিকারের ব্যাপারে অঙ্গীকার প্রদান করে। অফিসিয়ালি দুই ভাষাই ব্যবহার করা হবে. সব ধর্মই সমান অধিকার পাবে। রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে যারা জেলে রয়েছে তাদেরকেও মুক্ত করে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেয় সে।

এতে ভুল কিছু ছিল না। চেচনিয়ার আজকের বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া সরল পথে ঘটেনি। তবে এর ঐতিহাসিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলার উপায় নেই। চেচনিয়া স্বেচ্ছায় রাশিয়ার সাথে যোগ দেয়নি, বরং স্বাধীনতা লাভের প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগিয়েছে অতীতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে চেচনিয়ার হাতে স্বাধীনতার আরেকটি সুযোগ আসে। সোভিয়েত রাশিয়ার অন্যান্য

BanglaBook.org

স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর মতো চেচনিয়াও স্বাধীনতা দাবি করলে সেটা না দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

ভারী ভারি শিরোনামের বইগুলো ছাপা হতে থাকে জাদুঘরের শো-পিসে পরিণত হওয়ার জন্য। দুদায়েভ স্ট্যান্ডার্ড টাইম বদলানোর এক বছরের মাঝেই রাশিয়ানরা চেচনিয়া ছাড়তে শুরু করে। চেচনিয়ায় একজন অর্থমন্ত্রী ছিল, কিন্তু দেশে কোন অর্থনীতির অস্তিত্ব ছিল না। একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল, কিন্তু বহির্দেশের সাথে কোনরকম সম্পর্ক ছিল না চেচনিয়ার। আইন-কানুন সবই থাকার পরও পিস্তল ছাড়া আর কোন আইনের বালাই ছিল না।

১৯৯৪ সালে এসব তথ্যকে অনেক গুরুত্ব সহকারে পেশ করত রাশিয়া। এর ওপর ভিত্তি করেই রাশিয়ান রাজনীতিবিদরা চেচনিয়াকে প্রথম সন্ত্রাসীদেশ হিসেবে আখ্যায়িত করে। যদিও এর পিছনে দায়ী রাশিয়ানরাই। তিন বছর তারা চেচনিয়াকে এই অবস্থায় চলতে বাধ্য করেছে। নিজের সুরক্ষার জন্য মাফিয়াকে চাঁদা দেয়া মস্কোর যেকোনো ব্যবসায়ীই জানে যে, শান্তিরও মূল্য আছে। দেখে মনে হতো যেন চেচনিয়াকে ছিনতাই ও লুট করতে কোনো বাধা নেই, রাশিয়া কেবল তাদের প্রাপ্য অংশ নিচ্ছে।

চোরাচালানের সাথে জড়িত চেচেনদের ইয়েলসিনের সীমানা ভাঙতে খুব একটা বেগ পেতে হতো না। চেচনিয়ার সীমান্তের কোনো বালাই ছিল না। দাগেস্তানের সাথে চেচনিয়ার সীমান্তে রাশিয়ান সরকার প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপই নেয়নি। আর চেচনিয়া ভেঙে ইঙ্গুশেটিয়া করার পর সীমান্তই নির্ধারিত হয়নি ওখানে। নামমাত্র মিলিটারি ব্যারিকেড ছিল, যার দায়িত্বে থাকত কম মজুরিপ্রাপ্ত, নিরুৎসাহী রুশ সেনা। চাইলেই টাকার বিনিময়ে যেকোনো গাড়ি সীমান্ত পার হতে পারত। প্রয়োজনে ট্রাকও সীমান্ত পার হতো। সবই ছিল টাকার খেলা। রুশ সেনাদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। এসব ব্যারিকেড অবৈধ সব ব্যবসার পথ সুগম করে, বন্ধ করে দেয় বৈধ ব্যবসা এবং উন্মুক্ত করে বিশাল একটা কালো বাজার।

ট্রান্সককেশাস থেকে আসা ট্রেনগুলোতে 'বুনো পশ্চিম' স্টাইলে ডাকাতি হত। রাশিয়ার ভাষ্যমতে শুধু ১৯৯৩ সালেই ৫৫৯টি ট্রেনে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। গ্রোজনির শাইখ মানসুর এয়ারপোর্ট উন্মুক্ত থাকার কারণে অবাধে প্রথম শ্রেণির অস্ত্রশস্ত্র পাচার হতে থাকে। গ্রোজনি রাশিয়ার জন্য একই সাথে চোরাচালান ও বৈধ মালামাল আনায়নের দরজা হয়ে যায়, সম্পূর্ণভাবে

BanglaBook.org

ট্যাক্সবিহীন আমদানি পণ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের আগাগোড়াই শাটল ব্যবসায়ীদের পরিচিত ছিল। তবে ট্যাক্সবিহীন চেচেন পণ্যগুলো সবাইকে হার মানায়। অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তর ককেশাসে গ্রোজনি কেনাকাটার সবচেয়ে বড় মার্কেট ও স্বর্গ হয়ে ওঠে। সবকিছুই অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাওয়া যেতো এখানে। জাপানিজ টেলিভিশন, হংকং ও আরব আমিরাতের ভিডিওপ্লেয়ার, ফ্রেঞ্চ পারফিউম, পশ্চিমা স্পোর্টসওয়্যার, টার্কিশ কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্য ও চামড়া ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বিখ্যাত সেকশন ছিল অস্ত্রের বাজার। কঠোর প্রকৃতির কালো সানগ্লাস ও ছোট চুলবিশিষ্ট পুরুষরা চেচেন নির্মিত বোরয সাব-মেশিনগান থেকে শুরু করে অ্যান্টি ট্যাংক রকেট লঞ্চার বা ভারি অস্ত্রশস্ত্র সবই বিক্রি করত।

রাশিয়ান কর্মকর্তারা এসব দুর্নীতির প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করত না। বরং টাকার বিনিময়ে তারাও সন্ত্রাসীদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। সবদিকেই একই দশা ছিল। রাশিয়ার তৎকালীন জাতীয়তা মন্ত্রী সারজেই শাখরাই ছিলেন সংখ্যালঘু জাতিদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার কাজে। তিনি বলেন, 'গ্রোজনি থেকে মাসে দেড়শ'র বেশি চার্টার্ড ফ্লাইট রাশিয়ার আইন ভঙ্গ করে আকাশে উড়ত। কিন্তু এ নিয়ে রাশিয়া সরকার কোনো পদক্ষেপই নেয়নি। রাশিয়ান এয়ার কন্ট্রোলারের অনুমতিতেই গ্রোজনিতে ল্যান্ড করত এসব ফ্লাইট। বিদেশি এয়ারপোর্টগুলোতে রাশিয়ান সরকার চেচেন ফ্লাইট অবতরণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারত কিংবা রাশিয়ান বিমান বাহিনি আকাশ পথে কাউকে প্রবেশের সুযোগ না দিলেই পারত। কিন্তু রাশিয়ান সরকার স্থল সীমান্তের মতো এখানেও গড়িমসি করেছে।'

রাশিয়ার সকল আইনকানুন ত্যাগ করে চেচনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরও মস্কো বারবার চেচেনদের পেনশন এবং অন্যান্য সামাজিক ভাতার জন্য ফেডারেল ফান্ড নির্ধারণ করত। ১৯৯২ ও ১৯৯৩-এর শুরু দিকে এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। এর কতোটা পেনশনারদের হাতে গেছে আর কতোটা তাদের পকেটে ঢুকেছে সে প্রশ্ন না-ই বা তুললাম। চেচনিয়া আর রাশিয়া এভাবেই চলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। নামের পাশে প্রেসিডেন্ট অফ চেচনিয়া লেখা দেখে প্রীত বোধ করত যোখার দুদায়েভ। এমনকি ১৯৯৩ সালে পার্লামেন্টে শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে শুভকামনা জানিয়ে ইয়েলসিনকে উষ্ণ চিঠিও লিখেছিল সে।

BanglaBook.org

ছোট্ট কোন স্বাধীন দেশের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হতে পারে একটি সেনাবাহিনি। ১৯৯২ সালে চেচনিয়া সেটাও পায়। গ্রোজনির প্রাক্তন সোভিয়েত আর্মি বেইস থেকে রাশিয়ান সৈন্যরা পালিয়ে যায়। তারা বলে, স্থানীয় জাতীয়তাবাদীরা নাকি তাদের হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। জুন ১৯৯২, রাশিয়ান চীফ অফ স্টাফের মতে, ৪২টি ট্যাংক, অসংখ্য আর্মার্ড কার, ১৪৫টি মর্টার এবং আরো কিছু আর্টিলারি অস্ত্র ও ৪০০০০ অগ্নেয়াস্ত্র ফেলে আসে রাশিয়ান সৈন্যরা। গ্রোজনির ট্যাঙ্ক প্রশিক্ষণ বেইসে ভারি গোলাবারুদের পাহাড় ছিল। তবে পুরনো সামরিক বেইসে নিউক্লিয়ার সামগ্রী থাকার গুজব কখনো প্রমাণিত হয়নি।

১৯৯১ সালের শেষভাগ থেকে ৯২-এর শুরুর মধ্যবর্তী সময়ে চেচেনরা অনেকবার গ্রোজনির রাশিয়ান ব্যারাকে আক্রমণ চালায়। কখনো কখনো রক্তপাতও ঘটে। একবার বিশ জন মারা যায় বলে রিপোর্ট করা হয়েছে। এক সামরিক উৎস থেকে জানা যায়, অফিসাররা চেচেন প্রজাতন্ত্র ত্যাগ না করলে চেচেনরা তাদের পরিবারকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। তখন মস্কোর সম্মতিক্রমে মধ্যস্ততার মাধ্যমে অস্ত্র ফেলেই সেনারা চেচনিয়া ত্যাগ করে।

যে লোকটি মধ্যস্থতা করে সে ছিল নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পাভেল গ্রাচেভ। মে ১৯৯২ সালে রাশিয়ান প্রতিরক্ষামন্ত্রী পাভেল গ্রাচেভ চেচেনযুদ্ধ নিয়ে একটি রিপোর্ট লেখে। তাতে চেচনিয়ার ৫০ ভাগ অস্ত্র দুদায়েভকে এবং বাকী ৫০ ভাগ আর্মিকে ফেরত দেওয়ার জন্য বলা হয়। অন্যান্য রিপোর্টে বলা হয়, তাকে ৮০ ভাগ অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল। সেভোদনিয়া পত্রিকা অনুসারে, দুদায়েভ সমস্তটাই রেখে দিয়েছিল। এমনকি পাঁচ বছর পরেও সবার প্রশ্ন ছিল—কতো শতাংশ অস্ত্র রেখে আসা হয়েছিল আর কতো শতাংশ বিক্রি করা হয়েছিল? কার কাছে বিক্রিত হয়েছিল?

চেচনিয়ার তেল বাজার থেকেও মোটা টাকা আসছিল। সোভিয়েত আমলে চেচনিয়ার ছোট কিন্তু উন্নতমানের তেল খনি থেকে রাশিয়ার বিমানের ৯০ শতাংশ তেলের যোগান আসত। ১৯৯০-এর দিকে বছরে প্রায় সাড়ে তিন মিলিয়ন টন তেল উত্তোলন করা হতো, যদিও তা সোভিয়েত আমল থেকে বেশ কম ছিল পরিমাণে। উৎসগুলো ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে আসছিল এবং তেলের রিজার্ভ মূলত ইঙ্গুশেটিয়ার ভাগে পড়ে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

তেল পরিশোধন করে প্রচুর টাকা আসত। এই লাভের টাকাই ছিল নিজ

সরকারের দুর্নীতি পরাস্ত করার জন্য দুদায়েভের সবচেয়ে ভালো সুযোগ। তেলের টাকায় অর্থনীতি ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে দুদায়েভ অনায়াসে চেচনিয়ার দারিদ্রতা দূর করতে পারত। কিন্তু পরিবর্তে টাকাগুলো কোথাও হাওয়া হয়ে গেল।

এখানে রাশিয়া ও চেচেন অফিসিয়ালদের গোপন চুক্তির কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অবরোধ থাকুক বা না থাকুক প্রতিনিয়ত সাইবেরিয়া থেকে তেল আসত। এরপর গ্রোজনি দিয়ে বের হয়ে রাশিয়ার নভোরোসিসস্ক ব্ল্যাক-সী টার্মিনালে পৌঁছত। রাশিয়ার সাংসদীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রী ইয়েগোর গাইদার এবং তার উত্তরসূরি ভিক্টর চেরনোমিরদিন সরাসরি এই তেল বাণিজ্যে জড়িত ছিল। প্রতিবেদনে পাওয়া যায় যে, গ্রোজনির পরিশোধনাগারে ১৯৯১ সালে ১৫ মিলিয়ন টন, ১৯৯২ সালে ৯.৭ মিলিয়ন টন এবং পরবর্তী বছর ৩.৫ মিলিয়ন টন তেল ছিল। ইউসুপ সোসলামবিকোভ, দুদায়েভের সম্পর্কের অবনতি হওয়ার আগে যিনি উঁচু পদে ছিলেন, তিনি বলেন, '১৯৯২ সালে ৪ মিলিয়ন টন ডিজেল, ১.৬ মিলিয়ন টন পেট্রোল, ১২৫,৫০০ টন কেরোসিন এবং ৩৬,৬০০ টন টেকনিক্যাল তেল চেচনিয়া থেকে পাঠানো হয়। বিশ্বের বাজারে যার দাম ছিল প্রায় ১৩০ মিলিয়ন ডলার।'

সোসলামবিকোভ বলেন 'অবশ্যই নির্দিষ্ট কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাশিয়ান সরকারি অফিসার এই তেলের কারবারের সাথে জড়িত ছিল। কারণ ১৯৯৪ সালেও রাশিয়ার তেল চেচনিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। রাষ্ট্রের বাজেটে কখনোই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। এই তেল থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে চেচনিয়ার সমৃদ্ধির জন্য কোনো কৃষি সরঞ্জাম, খাদ্যদ্রব্য, নতুন টেকনোলজি বা পোশাক-আশাক কিছুই ক্রয় করা হয়নি।'

১৯৯২ সালে দুদায়েভের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতিক অভ্যুত্থান ঘটে যখন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ইসতোনিয়া নিজস্ব মুদ্রা প্রচলন করে এবং তাদের অচল সোভিয়েত রুবল মস্কোর কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংকে ফেরত দেওয়ার বদলে চেচনিয়াতে পাঠিয়ে দেয়। প্লেনভর্তি সোভিয়েত রুবল ১৯৯৩ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত গ্রোজনিতে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে যুদ্ধ চলাকালে বোমা বিস্ফোরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মাটির সাথে মিশে যায়। তখন আমি রাস্তায় শিশুদের মূল্যহীন ব্যাংক নোট নিয়ে খেলতে দেখেছি।

১৯৯৫ সালে প্রকাশিত বই 'দ্য ক্রিমিনাল ওয়ার্ল্ড ইন রাশিয়া' অনুসারে,

BanglaBook.org

মস্কোর অধিবাসী চেচেনরা অপরাধের সাথে ভালোভাবেই জড়িয়ে ছিল। সেইন্ট পিটার্সবার্গের চেচেনরা বাল্টিক থেকে কালো বাজারের পণ্য আমদানি করত। ১৯৯৪ সালে চেচেনদের জাল টাকা তৈরির গ্যাং ভেঙে যায়। বিলাসবহুল গাড়ি ছিল এদের বিশেষত্ব। একটা কমন কেলেঙ্কারি জার্মানি থেকে শুরু হয়, যেখানে টপ ক্লাস মার্সিডিজ বা বি.এম.ডাব্লিউর মালিককে তার গাড়িটি নামমাত্র দামে বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়, অন্যথায় তার গাড়ি চুরি করা হয়। চুরি হয়েছে এই রিপোর্ট করার মধ্যেই গাড়িটি চেচনিয়ার পথে যাত্রা শুরু করে। দুর্নীতিগ্রস্ত কাস্টমস এজেন্টরা এ কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। জাল ডকুমেন্ট গ্রোজনিতে পাঠানো হলে গাড়িটি মাফিয়াদের ব্যবহার বা বিক্রির উপযুক্ত হয়। চেচনিয়া এরকম বিদেশি গাড়ি দ্বারা পরিপূর্ণ। অনেক সময় গাড়িতে সুইডিশ বা জার্মান নাম্বারপ্লেটও লাগানো থাকত।

দেশের এই অস্থিতিশীল অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে দুর্নীতিপরায়ণ কিছু ব্যবসায়ী অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। ওরা জানত, রাশিয়ান পুলিশ এখন তাদের টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। এ সময় নানা উপায়ে টাকা কামাতে শুরু করে চেচেনরা। চুরি, ডাকাতি, কালোবাজারি সবই চলতে থাকে। তবে সবচাইতে ভয়ানক ছিল ভসদুশনিকি চোরেরা। এরা মূলত বৈমানিক ছিল, শূন্য থেকে বিস্তর ধন সম্পদের মালিক হয়ে যায়। জাল টাকা ছাপিয়ে বা ব্যাংক জালিয়াতি করে প্রচুর সম্পদ গড়ে তোলে।

তবে মূল কথা হচ্ছে, আশেপাশে যা হচ্ছিল চেচেনরাও তাই করেছে। ওরা নিজে থেকে নতুন কোনো অপরাধ আবিষ্কার করেনি। গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েছে শুধু। ৯০-এর দশকে অপরাধ প্রবণতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তবে দুদায়েভ সে সময় শক্তিহীন প্রমাণিত হয়। সে স্বীকার করে যে, একটা সমস্যা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নিজ দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে রাশিয়ার ষড়যন্ত্রকেই পুরোপুরি দায়ী করে।

১৯৯২ সালে দুদায়েভের বিরুদ্ধে একটা অভ্যুত্থানের চেষ্টা চলে। পরের বছর দুদায়েভ সংসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে সে তার ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছিল। সংসদ তাতে বাগড়া দেওয়ায় ঝামেলাটা বাধে। এপ্রিল ১৯৯৩ সালে দুদায়েভ একটা সমীক্ষায় দেখায়, দেশের ৯৭ শতাংশ মানুষ তাকে সমর্থন করে। এরপর সে সংসদপ্রথা বাতিল করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলে দেশ শাসন শুরু করে। সে বছরই অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিনও

BanglaBook.org

একই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসেন।

নব্য চেচনিয়ায় রাশিয়ানদেরকেও সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। অনেকেই তখন দক্ষিণে স্ট্যাভ্রোপোল ও ক্রাসনোদারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যারা থেকে যায় তারা বিভিন্ন হয়রানির স্বীকার হয়। এমনকি নিজেদের এপার্টমেন্টেই লুণ্ঠিত বা খুন হয়। দুদায়েভ তথ্যটা স্বীকার করে তবে বরাবরের মতো সব দোষ চাপায় রাশিয়ানদের ওপর।

চেচেনদের মতো জাতিগত-রাশিয়ানদের পরিবার এতো বড় হতো না বা দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক থাকত না তাদের, ফলে তাদের থাকা-খাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল না। বিপদে-আপদে কারো সাহায্য পাওয়াও ছিল কষ্ট। এভাবেই তারা সিস্টেমের বাইরে রয়ে যায় এবং যেকোনো ক্রিমিনালের জন্য সহজ টার্গেটে পরিণত হয়। সন্ত্রাসীরাও জানত, দুদায়েভের পুলিশ তাদের বাধা দেবে না।

এই অবস্থা শুধু চেচনিয়ার না। সোভিয়েত শাসন থেকে স্বাধীনতা পাওয়া অন্য চোদ্দটি রাষ্ট্রেও এর থেকে চরম অবস্থা ছিল; পঁচিশ মিলিয়ন রাশিয়ান রাতারাতি বিদেশি এবং সংখ্যালঘু জাতিতে পরিণত হয়। তাজিকিস্তানের গৃহযুদ্ধ ও দারিদ্রতা এবং বাল্টিক প্রজাতন্ত্রের ভাষাবৈষম্যে তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল।

বিপ্লবের আগে চেচনিয়াতে রাশিয়ানরাই সবচাইতে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। ক্ষমতা ছিল তাদের হাতে, সবচেয়ে ভালো ভালো চাকুরি ছিল। বিশেষ করে তেল ইন্ড্রাস্ট্রিতে ৯০% রাশিয়ান লোক কাজ করত। কেবল কয়েকজন চেচেনকে তেল ইন্সটিটিউটে দেওয়া হতো, যারা যোগ্য ছিল। মূল পলিসি ছিল, চেচেনদের ক্ষমতা বা মর্যাদার কোনো পদে আসীন করা যাবে না। এ কারণে বিপ্লবের পরে রাশিয়ানদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। তবে চেচেনদের আর্থিক অবস্থা নিস্তেজ হয়ে যায় এতে।

দুদায়েভ নিজের দেশ সামলাতে ব্যর্থ হয়ে রাশিয়ার বিরোধিতায় মনোযোগ দেয়। উত্তর ককেশাসের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলোকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করে। ইরাক, জর্দান, সুদানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে সফর করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় তিন
মেকি যুদ্ধ

চেচনিয়ার রাশিয়ার সাথে থাকা না থাকা নিয়ে ফেডারেশন চুক্তিতে সই করার জন্য আলোচনায় বসতে হবে দুদায়েভকে। কিন্তু কোনোবারই সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। রাষ্ট্রপতি ইয়েলসিন দুদায়েভের সাথে দেখা করতে নারাজ। ইতোপূর্বে দুদায়েভের তর্জন-গর্জন সাফল্য লাভ করেছিল। তবে এবার সেটা অকেজো প্রমাণিত হয়। ১৯৯৪ সালের মধ্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের চাপ আসতে থাকে মস্কোর ঘাড়ে তাই গ্রীষ্মে মস্কো একটা গোপন কাগুজে যুদ্ধ শুরু করে। এই পদক্ষেপ ছিল চোরাবালিতে প্রথম পা রাখার নামান্তর।

চেচনিয়ার পশ্চিমাঞ্চল নাদ্রেচেনে রাশিয়ান সমর্থিত দুদায়েভ-বিরোধী জোট একটি অন্তর্বর্তী পরিষদ গঠন করে এবং ১৯৯৪ সালের আগস্টে তারা ঘোষণা দেয় যে প্রজাতন্ত্রের বৈধ ক্ষমতা তাদের। অবিলম্বে অন্তর্বর্তীকালীন কাউন্সিল একটি সেনাবাহিনি নির্মাণ এবং দুদায়েভ নিয়ন্ত্রিত এলাকার অর্থনৈতিক শক্তি দুর্বল করার জন্য গোপনে রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য পেতে শুরু করে। বিরোধীদলীয় হাসপাতাল ও বিদ্যালয় সংস্কার করা হয়। হাসপাতালে ওষুধ এবং স্কুলে শিক্ষকদের পকেটে বেতন ঢুকতে থাকে।

দুদায়েভের বিরুদ্ধে অনেক নেতা গজিয়ে ওঠে। দুদায়েভের দল থেকেও অনেকেই উলটো পথে হাঁটে। তবে সবচাইতে বড় দুদায়েভ বিরোধী নেতা ছিল রুসলান খাসবুলাতভ। মস্কোতে প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিনের বিরুদ্ধে মন্ত্রীসভার বিদ্রোহের এক বছর পার হয়ে গেছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে রুসলান। নিজ দেশ চেচনিয়ায় ফিরে বীরোচিত সম্মান পেল সে। সত্যি বলতে, সমগ্র চেচনিয়ায় দুদায়েভের বিরুদ্ধে দাম পাওয়ার মতো এই একজন ব্যক্তিই ছিল।

কিন্তু ক্রেমলিন তাকে প্রেসিডেন্ট না বানিয়ে তার চাইতে কম নির্ভরযোগ্য নেতাদের সমর্থন করেছিল।

'আমাদের জনগণের মন জয় করা দরকার', বিরোধীদলের এক মুখপাত্র নামনেস্কোয়িরি মূল কেন্দ্রে বলে। সে আমাকে জানায়, তার দল মস্কো থেকে সবেমাত্র দুই মিলিয়ন ডলার পেয়েছে। ডলারের সাথে সাথে আরো এসেছে রাইফেল, ট্যাংক, হেলিকপ্টার ও লোকবল। তবে যেকোনো গোপন অভিযানের চেয়ে দুদায়েভের বিরুদ্ধে অভিযানে নামা ছিল কল্পনার চেয়েও জটিল। মস্কো শীঘ্রই ধরতে পারল, এই ছোট প্রজাতন্ত্রকে তারা কতোটা ভুল বুঝেছিল।

প্রথম সমস্যা ছিল স্বয়ং বিরোধীদলের নেতারাই। এসব যুদ্ধবাজ লোক ছিল সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষ। অফিসিয়ালি এদের নেতৃত্বে ছিল চেচনিয়ার উত্তরাঞ্চলের একজন প্রো-রাশিয়ান, উমর আভতুরখানভ। সে মস্কো গিয়ে ক্রেমলিন স্টাফদের সাথে মিলিত হয়। তবে তার সাপোর্ট বেশি ছিল না। কিছু লোক তার সাথে ছিল, তাও সন্দেহপূর্ণ। আভতুরখানভের পর ছিল বেসলান গান্তেমিরভ। ত্রিশ বছরের এক ধনী ব্যক্তি, গ্রোজনির প্রাক্তন মেয়র। সে মূলত দুদায়েভের সহযোগী ছিল, পরে দুদায়েভের সাথে তার সম্পর্কচ্ছেদ হয়। আরো ছিল কুখ্যাত রুসলান লাবাযানভ, দুদায়েভের আরেক প্রাক্তন সহযোগী।

প্রোপাগান্ডার জন্য পরিস্থিতি উভয় পক্ষের জন্য উপযুক্ত ছিল। এই 'অভ্যন্তরীণ চেচেন দ্বন্দ্ব' স্পষ্টতই চেচেনদের সম্পর্কে রাশিয়ার অভিযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করে। মস্কোর দাবি ছিল, চেচেনদের স্বাধীনতা বিপ্লব কেবল বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করছে! মস্কো চেচেনদের ভয়ংকর জাতি বলে উপস্থাপন করেছিল সবার সামনে। অপরদিকে গ্রোজনিতে দুদায়েভ বিরোধীদের রাশিয়ান সাহায্য লাভের বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিন বছর ধরে দুদায়েভ ককেশীয় যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছে। এবার রাশিয়া দুদায়েভ বিরোধীদের সামরিক সাহায্য দিয়ে তার হাতে সেই সুযোগ তুলে দিয়েছে। অস্ত্রের পরিমাণ, বন্দুকের প্রতি চেচেনদের আকর্ষণ, প্রতিশোধের অন্তহীন চক্র এবং মস্কোর হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করেছিল— যুদ্ধ আসন্ন।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমি আজ পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়ানক লড়াই দেখেছি—দুদায়েভপন্থী এবং বিপ্লবীদের সবচেয়ে মারাত্মক সংঘর্ষগুলোর একটা হয় তলস্তয় ইয়ার্টে। বিশ থেকে ত্রিশ জন চেচেন লড়াই করে মারা যায়। একটা ট্যাংক এবং একটা আর্মার্ড কার উড়িয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধটা সবাইকে খুব বড়

BanglaBook.org

ধরনের ধাক্কা দেয়। পরদিন তলস্তয় ইয়ার্টে শত শত চেচেন তাদের আত্মীয় স্বজনদের জানাজার জন্য জড়ো হয় এবং হাত তুলে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে।

'আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, চেচনিয়াতে এরকম কখনো হয়নি। কারো পিঠে গুলি করার অভ্যাস আমাদের নেই। এই গৃহযুদ্ধ আমরা চাইনি,' একজন কৃষক আমাকে এই যুদ্ধের ব্যাপারে বলল।

আমি খাসবুলাতভের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে বলা হলো, তার এক চাচাতো ভাই যুদ্ধে নিহত হয়েছে তাই তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত। কারো সাথেই দেখা করছেন না।

গ্রোজনিতেও আমি যাদের সাথে কথা বলেছি, সবাই প্রচণ্ডরকম ধাক্কা খেয়েছিল। 'কতো জন মারা গিয়েছে? ত্রিশ? খুবই জঘন্য অবস্থা,' কথাগুলো বলেছিল দুদায়েভের ডাইহার্ড ফ্যান এক রেস্টুরেন্টের মালিক। এটা হলো এমন এক গৃহযুদ্ধ যা কেউই চায়নি।

যুদ্ধ শেষে তলস্তয় ইয়ার্টে গান্তেমিরভের বেজে গিয়েছিলাম আমি। একটা তথ্য এখনো আমার মাথায় গেঁথে আছে। গান্তেমিরভের বাহিনির এতো ক্ষয়ক্ষতির পরও তাকে শান্ত অবিচল দেখতে পাই আমি। যেন সে একরকম নিশ্চিত হয়ে আছে বড় রকমের সাহায্য আসছে তাদের জন্য।

সত্যি সত্যি ঘটলও তাই। ২৬ নভেম্বর ১৯৯৪, গ্রোজনি দখলের জন্য রাশিয়ান রেগুলার আর্মি এসে যোগ দেয় তার বাহিনির সাথে। রাশিয়ার সিক্রেট সার্ভিসও নাক গলাতে শুরু করে এসময়। পঞ্চাশটি ট্যাংক নিয়ে রাশিয়ার ভাড়াটে সৈন্যরা এসে হামলা করে গ্রোজনির সিটি সেন্টারে। কয়েক ঘন্টার মাঝেই রাশিয়ান সৈন্যদের কথা চেপে গিয়ে রাশিয়ান নিউজ এজেন্সি সংবাদ প্রচার করা শুরু করে দেয়, রুসলান লাবাযনভ চেচনিয়ার প্রেসিডেন্শিয়াল প্যালেস দখল করে নিয়েছে।

রাশিয়ান বাহিনি শহরের ভেতরে ঢোকে ঠিকই কিন্তু উপর্যুপুরি গেরিলা হামলায় বিধ্বস্ত হয় দলটি। লাবাযনভের লোকেরা পালিয়ে এসে তলস্তয় ইয়ার্টে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। দুদায়েভ সরকারের ভাষ্যমতে তিনশ'র মতো বিরোধী সেনা মারা যায়। অনেকেই বন্দিদশা বরণ করে।

প্রথমদিকে রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পাভেল গ্রাচেভ যুদ্ধের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে। সাংবাদিক ও

BanglaBook.org

রাশিয়ান পার্লামেন্টের দূতের সামনে বিশজন বন্দীকে প্রদর্শন করে দুদায়েভ সে প্রোপাগান্ডার জবাব দেয়। ২৮ নভেম্বর বিদ্রোহী সরকার হুমকি দিতেই মস্কোর অনবরত অস্বীকারের পরেও বন্দী সেনারা জনসম্মুখে স্বীকার করে, তাদের এফএসকে ভাড়া করেছিল। এফএসকে, কেজিবির তৎকালীন নাম, পরবর্তীতে সেটা পালটে এফএসবি রাখা হয়। এদের মাঝে অনেকেই এলিট আর্মির সদস্য ছিল।

মস্কোর নীতি ভেঙে পড়ে। প্রথমে নেগোশিয়েশনে ব্যর্থতা, এবার অভ্যুত্থানে ব্যর্থতার কথা রাশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয়বারের মতো জয় হয় দুদায়েভের। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়; যুদ্ধ বিমান উড়তে থাকে গ্রোজনির আকাশে। বিমান বন্দরে গোলা নিক্ষেপে ছয়জন মানুষ মারা যায়। বোমাবর্ষণের ঘটনাটা ঘটে দুদায়েভের একটি প্রেস কনফারেন্সের সময়। গোলাবর্ষণ শুরু হলে সাংবাদিকরা সবাই মেঝেতে আছড়ে পরে বাঁচার চেষ্টা করে। প্লেনগুলো চলে গেলে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে দেখে, তখনও অবিচলভাবে নিজের আসনে বসে আছে জেনারেল দুদায়েভ।

২৯ নভেম্বর, গ্রোজনিতে পরাজয়ের তিন দিন পর, ইয়েলসিন ও তার এক ডজন উপদেষ্টা ক্রেমলিনে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে আলোচনায় বসেন। এটি সাধারণ সরকারি সভা ছিল না, নিরাপত্তা পরিষদের একটি গোপন সমাবেশ ছিল। এদের হাতেই চেচনিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগে না কারও— চেচনিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করে দখল করে নেয়া। বিগত তিন বছর চেচনিয়াকে আমলে নেয়নি মস্কো। এখন যখন আর কোন পথ খোলা নেই তখন আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়।

ট্রান্সককেশাস অয়েল পাইপলাইনও ইয়েলসিনের এমন সিদ্ধান্তের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ ছিল। আজারি তেলক্ষেত্রগুলোর কথা ভেবে হলেও চেচনিয়া দখল করা উচিত রাশিয়ার। কেননা এর পেছনে ছিল অনেক টাকার মামলা, বড় বড় ইনভেস্টমেন্ট। সেপ্টেম্বরেই রাশিয়ান তেল ইন্ডাস্ট্রির সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। তাই চেচনিয়ার মধ্য দিয়ে রাশিয়ার পাইপলাইন নির্মাণ করা সম্ভব হলে চেচনিয়া তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। প্রায়ই বলা হতো, চেচনিয়া সীমান্তের বহির্পাশ্ব ঘেঁসে কেন পাইপলাইন তৈরি করা হয় না? কিন্তু সেই প্ল্যানে নাকি বড় একটা ভুল ছিল, যার ফলে বেশ কয়েক বছর লেগে যাবে। অর্থাৎ, শুরু হতো দীর্ঘায়িত নতুন এক পলিসির।

BanglaBook.org

তবে চেচনিয়া আক্রমণের প্রধান কারণ অবশ্যই রাজনৈতিক ছিল। সে বছর ১৯৯৬-এর পুনঃনির্বাচনের জন্য নিজের অবস্থান পাকাপাকি করার চেষ্টায় ছিলেন ইয়েলসিন। জনপ্রিয়তায় দারুণ ঘাটতি পড়েছে তার। নিজেকে স্বমহিমায় ফেরত আনার জন্য হলেও চেচনিয়াকে কোণঠাসা করা প্রয়োজন ছিল তার। চেচনিয়াকে বাগে আনতে পারলে সবার মনে বিশ্বাস জন্ম নেবে, ইয়েলসিনের হাতে রাশিয়া নিরাপদই আছে।

দুটো কারণে ইয়েলসিন এই শিশুসুলভ অসুস্থ পরিকল্পনা আঁটেন। ১৯৯৩ সালে তার প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদটি দারুণ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। নতুন সংসদটি একটি বিতর্ক মঞ্চের চেয়ে কিছুটা বেশি ছিল মাত্র। আর ইয়েলসিন ছিল তার পুর্বতন রুশ সম্রাট ও ক্রেমলিন কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সচিবের মতোই ক্ষমতাধর; গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতির চাইতে একজন আগাগোড়া শাসক। দ্বিতীয়ত, যেকোনো অভিজাত লোকের মতোই ইয়েলসিন তার রাজসভার ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন; বিশেষত তার স্বাস্থ্য ও মদ্যপানের সমস্যার পর থেকে। যারা ইয়েলসিনের নিকটবর্তী ছিল তারাই সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিত। বাইরের পরামর্শ গ্রহণের কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না তিনি। সত্যিই ধোঁয়াশাপূর্ণ এক রাজনীতি।

ইয়েলসিনের কাছের লোকজন যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছিল। এর মধ্যে ছিল প্রতিরক্ষা বাহিনির মন্ত্রীবর্গ, প্রাক্তন কেজিবি অফিসার—যারা পরবর্তীতে কট্টরপন্থী রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠে। প্রত্যেকের নিজস্ব ক্যারিয়ার ও প্রকল্প নিয়ে পরিকল্পনা ছিল। একটি যৌথ দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল সবার—যুদ্ধের ফলে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার হবে এবং নব্য-সাম্রাজ্যবাদে একটি নতুন আগ্রাসী পলিসি অনুসরণ করা যাবে।

কট্টরপন্থী কর্মীদের প্রধান শক্তির উপকরণ ছিল নিরাপত্তা কাউন্সিল। সমস্ত প্রতিরক্ষা বাহিনির প্রধানসহ মন্ত্রীদের সম্মিলিত সংগঠন। সংবিধানে সংগঠনটির কোনো ভূমিকা ছিল না, অথচ সেটাই দেশ পরিচালনার জন্য ইয়েলসিনের অন্যতম মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল।

নিরাপত্তা কাউন্সিলের সকল সদস্যই সংস্কার-বিরোধী ছিল বা যুদ্ধে যাওয়ার পক্ষে ছিল, তা নয়। প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর চেরনোমির্দিন ছিলেন তাদের অন্যতম। মন্ত্রীসভা এবং সিক্রেট সার্ভিসের ভিক্টর ইয়েরিন এবং সার্গেই স্টেপাসিনরাই আলোচনা অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করত। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রীসভা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে

BanglaBook.org

ব্যবহারের জন্য শক্তিশালী একটি সামরিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল। ১৯৯৭ সাল নাগাদ মন্ত্রীসভা ২৫০,০০০ জন সেনা এবং ৩০০,০০০ জনের পুলিশ বাহিনি গড়ে তোলে। তাদের ছিল ভারি অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাংক ও স্পেশাল ফোর্স ইউনিট।

নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্য না হয়েও বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল; ক্রেমলিনের একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি—প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ওলেগ সোসকোভেতস, যার ছিল সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্সের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। অর্থনৈতিক খাতের আরেক ব্যক্তিত্ব—বরিস বেরেজোভস্কি, সে ছিল রাশিয়ার অন্যতম নতুন শিল্পপতি। ১৯৯৪ সালের শেষদিকে তার লোগো-ভিএজেড সংস্থাটি জাতীয় প্রথম টেলিভিশন চ্যানেল 'ওআরটি' কিনে নেয়। যার মাধ্যমে বেরেজোভস্কি যুদ্ধের প্রথম দিকে ঘৃণ্যভাবে চেচেন বিরোধী প্রোপাগান্ডা চালায়।

এছাড়াও ছিল ইয়েলসিনের ক্রেমলিন সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্যরা—চিফ বডিগার্ড আলেকজান্ডার কোরজাকোভ এবং তার প্রাক্তন কেজিবি সহযোগী জেনারেল মিখাইল বারসুকভ, ক্রেমলিনের প্রেসিডেন্ট গার্ডের কমান্ডার। তারা কেউই নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্য ছিল না তবে অন্যান্য যুদ্ধ সমর্থক নেতাদের সাথে উভয়ের অনেক মিল ছিল। নিরাপত্তা কাউন্সিলের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পাভেল গ্রাচেভ। ইয়েলসিন চেচনিয়ায় আক্রমণ করতে চাইলেই তো আর হবে না, গ্রাচেভের বাহিনি প্রস্তুত করার ব্যাপার ছিল। গ্রাচেভ এ ব্যাপারে খুবই কর্ম দক্ষতার পরিচয় দিল।

পাভেল গ্রাচেভ ছিল সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের একজন সৈনিক। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করে। অথচ তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা বড়জোর সেনাবাহিনির একটা ইউনিট পরিচালনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য সংসদ সদস্যরা তাকে পছন্দ করত না তার অবিশ্বাস্য খরুচে বাজেটের জন্য। মিডিয়ার চোখে পড়ার আগে প্রচুর দুর্নীতির সাথে তার সম্পৃক্ততা ছিল। পূর্ব ইউরোপে সেনা প্রত্যাহার সংক্রান্ত একটা দুর্নীতির অভিযোগ আসে সর্বপ্রথম তার বিরুদ্ধে। এরপর সৈনিকদের আবাসন প্রকল্পের টাকা দিয়ে নিজের জন্য মার্সিডিজ কেনার খবর জানা যায়। সে সময় বাকি সাংসদরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং পাভেল গ্রাচেভের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি তোলে। অবশেষে ১৯৯৪ সালে তার দুর্নীতি নিয়ে রিপোর্ট করা

BanglaBook.org

সাংবাদিক দিমিত্রি খোলোকভকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়। আততায়ীর পরিচয় কখনই পাওয়া যায়নি।

এসব কারণে যুদ্ধ শুরু হওয়াটা পাভেল গ্রাচেভের জন্য জরুরি ছিল। তাতে সাময়িকভাবে হলেও মার্সিডিজ, দুর্নীতি, দিমিত্রি খোলোকভকে নিয়ে আর কেউ কথা বলবে না।

নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভার একদিন পরে ইয়েলৎসিন 'চেচেন প্রজাতন্ত্রের সংবিধান ও আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার'র আদেশ দেয়। আগ্রাসনের প্রস্তুতির জন্য এক সপ্তাহ দেশবাসী ও গ্রাচেভের কাছে ডিক্রি গোপন রাখা হয়, ওদিকে চেচনিয়ার সীমান্তে সেনা মোতায়েন জোরদার করা হয়।

ইয়েলসিনের এ সিদ্ধান্তে একজন লিবারেল সংসদ সদস্য পরবর্তীতে কাউন্সিল মেম্বারদের বলেন 'একদল উন্মাদ'। প্রেসিডেন্সিয়াল উপদেষ্টা এমিল পেইন এই সিদ্ধান্তকে 'ষড়যন্ত্রমূলক হঠকারিতা' নাম দেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গাইদার বলেন, 'যদি এই বাটন প্রেস করা হয়, তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবেই রাশিয়ার গণতান্ত্রিক পতন দেখতে পাব।' কালমিকোভ, যিনি মূলত চেরকেশ ছিলেন, একজন জাতিগত আদিজেই; তিনি পদত্যাগ করেন।

ওদিকে গ্রোজনিতে যোখার দুদায়েভ দিবাস্বপ্ন দেখতে ব্যস্ত। গণতন্ত্রের প্রতি তার এই অবহেলা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের জন্য অনেকাংশে দায়ী। আলোচনার সম্ভাবনা ছিল যখন, তখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সে। নভেম্বর ১৯৯২-এ রাশিয়ার পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে তার শাসন শুরু হয়েছিল। যুদ্ধের প্রাক্কালে, ডিসেম্বর ১৯৯৪-এ সে বন্দীদের হত্যা করার হুমকি দেয় এবং তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পারমাণবিক স্টেশন বিষয়ক হুমকির পুনরাবৃত্তি করে। অবশ্য ইয়েলসিন যদি টেবিলের পেছনে বসে না থেকে দুদায়েভকে ক্রেমলিনে ডেকে পাঠাতেন কিংবা নিজে ককেশাসে এসে আলোচনার চেষ্টা করতেন তাহলে এ অবস্থা হতো না। দুদায়েভের আত্মসম্মান ছিল। প্রজাতন্ত্রের মঙ্গলের জন্য তার আপোষ করতে রাজি হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

নভেম্বরের শেষে, উত্তর ককেশাসের নেতাদের তরফ থেকে ইয়েলসিনের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি এসেছিল 'সাংবিধানিক আদেশ এবং নাগরিকদের প্রতিরক্ষা করার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ' করার জন্য। আদিজিয়া, কারাচাই-চেরকেশিয়া, কাবার্ডিনো-বালকারিয়া, উত্তর ওসেটিয়া, স্ট্যাভ্রোপোল, ক্রাসনোদার এবং

BanglaBook.org

রোস্টভ অঞ্চলের নেতারা স্বাক্ষর করেছিল ওই চিঠিতে। শুধু দাগেস্তানের মাগোমেদ আলী এবং ইঙ্গুশেটিয়ার রুসলান আউশেভ স্বাক্ষর করেনি।

নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভায় গোপনে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়ার পর ৯ ডিসেম্বর ইয়েলসিন একটি গণ-ফরমান জারি করেন যার মাধ্যমে সকল অবৈধ সশস্ত্র ইউনিটকে নিরস্ত্রীকরণের জন্য রুশ সৈন্যদের আদেশ দেওয়া হয়। ইয়েগরভ এবং স্টেপাসিনের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য গ্রাচেভ ও ইয়েরিন চেচেন সীমান্তে চলে যায়।

১০ ডিসেম্বরে ক্রেমলিনে 'নাক অপারেশন'-এর কথা বলে ইয়েলসিন হাসপাতালে ভর্তি হন। পরদিন চেচনিয়ার তুষারময় সীমান্ত দিয়ে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার অর্ধ-প্রশিক্ষিত সৈন্যের একটি বাহিনি ঢুকে পড়ে। যাদের অনেকেই পরবর্তী ক্রিসমাস উদযাপন করার জন্য বেঁচে থাকবে না।

গ্রোজনি

সেপ্টেম্বর ১৯৯৪। গ্রোজনির প্রধান স্কয়ারে অবস্থিত হোটেল কাভকাজের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছে তিনজন নীরব বৃদ্ধা মহিলা, রাইফেল কাঁধে দুজন পুরুষ, একজন কিশোর এবং একটি ভারি অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রকেট লঞ্চার।

আমিই একমাত্র অতিথি। সাত ডলার দিয়ে ডিলাক্স স্যুইট নিয়েছি, যার জানালা দিয়ে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস দেখা যায়।

হোটেল কাভকাজ সবেমাত্র একটি বড় ধরনের সংস্কারের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। আমিই প্রথম অতিথিদের একজন। সম্মুখের অংশটি গোলাপি এবং ওপরের তলায় সাদা আর্কযুক্ত বারান্দা আছে। ভেতরে রয়েছে একটি আদর্শ সোভিয়েত লবি, প্রচুর মার্বেল ও বড় বড় আয়না।

হোটেলে পানির সমস্যা ছিল। আমি যখন পানির ব্যাপারে অভিযোগ জানালাম তখন বন্দুকধারী লোকটি হেসে ফেলল আর বৃদ্ধা মহিলাদের একজন বিলাপ করতে লাগলেন। 'আমি লজ্জিত', মহিলাটি বললেন। 'আমি যদি পারতাম, তাহলে আপনাকে আমার ঘরেই জায়গা দিতাম।'

আমার খারাপই লাগল। তাকে আশ্বস্ত করতে চাইলাম, পানির সমস্যা আসলে তেমন বড় কোনো সমস্যা নয়! আমার কথা শুনে একজন বন্দুকধারী বলে উঠল, 'ডিলাক্স!'। বাকিরা হাসিতে ফেটে পড়ল।

সেদিন রাতে আমি কিয়োস্ক থেকে হাফ ডজন রাশিয়ান মিনারেল ওয়াটার

BanglaBook.org

কিনে রাখলাম। সাথে কিনলাম হরেক রকম ওয়েস্টার্ন চকোলেট ও সিগারেট।

ঘুমানো অসম্ভব ছিল। মশারা বংশবিস্তারের জন্য ডিলাক্স স্যুইটকেই বেছে নিয়েছিল। আমি কাথার নিচে ঘামতে ঘামতে এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। বাইরে অবিরত গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তরুণরা এ সময় গাড়ির রেস করত। আমি কয়েকটা মশা মেরে চলে গেলাম বারান্দায়। অন্ধকারে একটি আর্মার্ড কার দেখা গেল। ওটার আশেপাশে মাথায় ব্যান্ড পরা লোকের ভিড়। তাদের কথাবার্তা দূর থেকে গরম গরম শোনালেও শেষ হতো গিয়ে অট্টহাসিতে।

মধ্যরাতে আমি আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু করিডোরের টেলিভিশনের সাউন্ড এতো বেশি ছিল যে ঘুমাতে পারলাম না। আমার রুমের বাইরে টিভি সেটের সামনে আমি দু'জন চেচেন সেনাকে ঘুমোতে দেখলাম। তাদের কোলে কালাশনিকভ রাইফেল। একজন পরিচারিকাকে করিডোর ঝাড়ু দিতে দেখলাম। এতো রাতে তাকে দেখে ভীষণ অবাক লাগল, কারণ হোটেলের একমাত্র গেস্ট হলাম আমি। সে সামনে এলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কথা বলতে পারি কিনা। ইশারায় দু'জন বন্দুকধারীকে দেখিয়ে সে বলল, 'এখানে নয়।'

আমরা দু'জন আমার রুমে প্রবেশ করলাম। সুদর্শন তরুণী, রাশিয়ান, বয়স ত্রিশের কোঠায়। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ থাকা সত্ত্বেও তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

'আমি এসব সৈন্যদের সহ্য করতে পারি না, ওদের ভয় পাই,' সে বলল।

'ওরা কী করছে এখানে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। এই প্রশ্নের উত্তর আমি সারাদিন ধরে খুঁজেও পাইনি।

'ওরা এখানেই থাকে,' মেয়েটি সরলভাবে বলল। 'আপনি কী জানেন, কেমন বোধ হয় তখন? আমাকে কয়েক মাসের বেতনও দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমার তো আর করার কিছু নেই। আমার ভয় হয়, খুব করে চাই এই জায়গাটা থেকে চলে যেতে।'

সে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি তাকে মস্কো নিয়ে যেতে পারব কিনা। সে বলল, 'আমার একটা ছোট মেয়ে আছে। আমরা দু'জন মিলে একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারব। শুধু প্রথম কয়েকদিন আপনার কাছে রাখলেই হবে, তাহলে আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব।'

চেচনিয়ার ট্র্যাজেডি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করার তুলনায় আমি বড্ড নতুন এখানে। পরবর্তীতে হোটেল কাভকাজ, রাশিয়ান পরিচারিকা, রিসেপশনের

BanglaBook.org

বৃদ্ধা মহিলা, ঘুমন্ত পাহারাদার, শূন্য ঘরগুলো এবং ভয়াবহ অনুভূতি— এই সবকিছুই যখন আগুনের সমুদ্রে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কেবল তখনই আমি চেচনিয়ার ট্র্যাজেডি বুঝতে পেরেছিলাম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঞ্চম পর্ব

ক্রোধ

.....এভাবে বলা যেতে পারে— যুদ্ধ এমন এক অনুষঙ্গ যেখানে দুটি সৈন্য দলের মধ্যে কোনো এক দলের নৈতিক ও দৈহিক ভঙ্গুরতা প্রকাশ পায়। আর এটাই বোধহয় যুদ্ধের কার্যকর সংজ্ঞায়ন।

-দ্য ফেস অব ব্যাটল, জন কিগান

অধ্যায় এক
নববর্ষ

'মনে রেখো, আমাদের উদ্দেশ্য একটাই আর তা হলো, হতভাগ্য চেচেন জাতিকে একটা স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেয়া। তোমাদের আসল কাজ দস্যুদের নিরস্ত্র করা।'

-প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলসিন

গ্রোজনিতে বিমান হামলার চারদিন আগে, ২৭ ডিসেম্বর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে

আমি পৌঁছানোর ঘণ্টা দুই পরেই গ্রোজনিতে দিনের আলোয় প্রথমবারের মতো বিমান হামলা হলো। দাগেস্তান থেকে সারারাত বিদ্রোহী অধ্যুষিত পথে গাড়ি চালিয়ে, রাশিয়ার বন্দুকের নল থেকে বেঁচে ভোরে শহরে এসে পৌঁছুলাম।

সে রাতেও বিমান হামলা হয়েছিল। আমরা এসে তরতাজা ধ্বংসস্তূপের দেখা পেলাম। পাওয়ার সাপ্লাই ডাউন হয়েছে। ভাঙাচোরা কাচের টুকরো আর ছিন্নভিন্ন লাশ। বিধ্বস্ত হওয়া পানির লাইন উপচিয়ে পড়া স্রোত সেগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

গুঁড়িয়ে গেছে ওকেয়ান রেস্টুরেন্ট। বাইরে পেঁজা তুলোর মতো বরফখণ্ড আর রক্তের মাখামাখিতে লাল লাল ছোপ-ছোপ পদচিহ্নের গোলকধাঁধা।

পূর্ব মাইক্রোরায়ানের কাছে রাস্তার পাশে কটেজের ধ্বংসস্তূপ। একটা কটেজকে ঘিরে বেশ কিছু মানুষের জটলা সৃষ্টি হয়েছে। এক বৃদ্ধা মহিলা ধ্বংসস্তূপের নিচে মরে পড়ে আছে। তার রান্নার বই, ভাঙা স্যুটকেস, বেডিংপত্র, ধুলোমাখা পুতুল রাস্তায়, ইটপাথরের স্তূপের ফাঁকে পড়ে আছে। সাংবাদিকেরা

BanglaBook.org

যে যার মতো ছবি তুলছে। উদ্ধারকারীরা ব্যস্ত মৃতদেহের সন্ধানে।

রাতেরবেলা বিমান হামলা চলতেই থাকল। রাতে শহরের মানুষগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে আর দিনে কাজকর্ম করে। এ এক অলিখিত নিয়ম হয়ে গেল।

২২ ডিসেম্বর, আমি যেদিন প্রথম AFP’র জন্য যুদ্ধের নিউজ কাভারিং করলাম সেদিনও রাস্তায় অনেক পথচারী, গাড়িঘোড়ার সমাবেশ ছিল। রাতে বোমাবর্ষণ চলে তবু দিনের আলো ফুটতেই যেন মানুষগুলো জীবিকার তাগিদে নিজেদেরকে স্বাভাবিক জীবনস্রোতে মিলিয়ে দিতে চাইত।

সকাল দশটা

প্লেনের শব্দে আতঙ্কিত মানুষের চোখ মেঘমেদুর আকাশের দিকে।

একের পর এক জেট বিমানগুলো এমনভাবে আসতে লাগল যে ভিন্ন ভিন্ন বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ আলাদা করাই মুশকিল। বিমানগুলো যাচ্ছিল মেঘের ওপর দিয়ে তাই সেগুলো চোখে পড়ছিল না ঠিকই কিন্তু তাদের শব্দ এতো তীব্র ছিল যে গা গুলিয়ে উঠছিল। বোমাবর্ষণ হতেই মানুষজন দৌড়ে পালাতে শুরু করল। বজ্রপাতের মতো বিস্ফোরণ চারিদিকে। গ্রোজনির মহাসড়ক আর স্কয়ারগুলোতে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত ও প্রবর্ধিত হতে লাগল। অবশেষে দিনের আলোতেও বিমান হামলা শুরু হলো।

আমি এতো কাছ থেকে কখনো যুদ্ধ দেখিনি। আমার কাছে সবকিছু ঘোরলাগা অবাস্তব মনে হচ্ছিল। আমি কালো হয়ে ওঠা আকাশের দিকে তাকালাম। ধোঁয়ার কুণ্ডলিগুলো শহর ছাপিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার প্রেস কলিগ ক্রিস বার্ডের সাথে আমি শহরের কেন্দ্রের ধোঁয়ার কুণ্ডলির দিকে দৌড়াতে লাগলাম। ঘোরলাগা অবস্থায় স্থবির হয়ে থাকার চাইতে বাস্তব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা পেতে আমার সেখানে যাওয়া জরুরি মনে হলো। নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ শুনলেই আমরা থেমে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একটা প্লেন আমার মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। আমি যেন নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেলাম। এই প্রথম ভয় আমাকে গ্রাস করল।

আমরা যাচ্ছিলাম ধোঁয়ার কুণ্ডলির দিকে আর মানুষজন দৌড়াচ্ছিল আমাদের ঠিক উল্টো দিকে। সবার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন, চোখে বুনো ভাব। তবু আমরা এগোতে থাকলাম।

BanglaBook.org

অয়েল ইনস্টিটিউটে আসতেই সুনঝা নদীর ব্রিজের পাশে দেখতে পেলাম একটা কার আর একটা ট্রাক পুড়ছে। লাল শিখার ওপর কালো ধোঁয়ার উত্তাল তরঙ্গ।

পাশেই একটা ছোট পার্ক। তুষারের কুয়াশাতেও দেখতে পেলাম গাছগুলো উপড়ে পড়ে আছে। একটা মৃতদেহের গায়ে আমি হোঁচট খেয়ে পড়তে না পড়তেই নজরে এলো আরেকটা মৃতদেহ। ঝোপের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যেতে দেখলাম রক্তের ধারা। দুটো মৃতদেহ; তাদের মাথার কোন হদিস নেই। শুধু ধরটা পড়ে আছে তুষারে। আমি অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। পোড়া যানবাহনের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। ফিরে এলাম। টের পাচ্ছি, কেমন হয় বাস্তব যুদ্ধের তাণ্ডব।

ওই দিন ম্যাগনাম এজেন্সির একজন ফটোগ্রাফার পল লউয়ি'র সাথে দেখা হলো। আমি সবেমাত্র বিমান হামলার খবর পোর্টেবল স্যাটেলাইট টেলেক্সের মাধ্যমে ফাইল করে হোটেল রুমে ফিরেছি। তৎক্ষণাৎ সে এলো। তার মুখ মলিন। অশ্রুসজল চোখে সে বলল, 'হত্যাযজ্ঞ, ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ। চারিদিকে লাশের ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ।'

এতোটুকুই বলল সে। সত্যি বলতে, খুব নিষ্ঠুর একটা সময়। মাইক্রোরায়ানের যে রাস্তায় আগের রাতে রাশিয়ানরা জৈবিক তাড়নায় নারী দেহ খুঁজে ফিরেছে, পরের রাতে সে রাস্তাতেই গোলাবর্ষণ করেছে। ঠিক একই জায়গায়। সেখানে প্রায় পনেরো থেকে বিশজন মারা পড়েছে। এদের মধ্যে আমেরিকান ফটোগ্রাফার সিনথিয়া এলবামও রয়েছে। যে বিশজন সাংবাদিক নিহত হয়েছে তার মধ্যে সে প্রথম সারির একজন। প্লেন বোমাবর্ষণের সময় একেবারে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওই সময় কিছু চেচেন, পল, আরেকজন সাংবাদিক স্টিভ ল্যামান কয়েক মিটার দূরের একটা দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যায়।

আমি সেখানে পৌঁছানোর আগেই তারা মৃতদেহগুলোকে সরিয়ে ফেলতে শুরু করেছিল। পাঁচটা কার রকেট ব্লাস্টের শিকার হয়েছে। অজ্ঞাত কারো ছেঁড়া কালো অস্থিসার হাত বাহুসহ আকাশের পানে থাবা খুলে ভষ্মিভূত গাড়ির সাথে আটকে আছে। একটা গাড়িতে মধ্যবয়সী গাড়িচালক স্টিয়ারিং-এর পেছনে বসে আছে; মৃত। সিটের সাথে লেপ্টে আছে, মুখ ডজনখানেক স্প্রিন্টারে ক্ষতবিক্ষত। ধূসর চামড়ায় লালকান্নার দাগ মিশে আছে। একজন তরুণী প্যাঁচপ্যাঁচে রক্তের কাদায় পা ফেলে এগোতে এগোতে বলছিল, 'এ যেন দুঃস্বপ্ন, এক দুঃস্বপ্ন, প্লেগের মতো এক মহামারী।'

BanglaBook.org

সেই সকালে প্রায় সকল কর্মী তাদের জিনিসপত্র স্পেশাল ইভ্যাকুয়েশন বাসে তুলে দিয়ে গ্রোজনি ত্যাগ করল। আকাশটা তখন সামরিক বিমানে পূর্ণ ছিল। সর্বত্র অস্বস্তির আবহ।

প্রধানমন্ত্রী চেরনোমিরদিন বিবৃতি দেন, 'শুধু সামরিক ঘাঁটিতেই বিমান হামলা হয়েছে, যেখান থেকে গোলাগুলি শুরু হয়।'

ক্রেমলিন নিরাপত্তা কাউন্সিলের বিবৃতিতে বলা হয়, 'চেচেনরা আবাসিক এলাকায় বিস্ফোরণ ঘটাতে উস্কানি দিয়েছে।'

***

যখন সেনাবাহিনি চেচনিয়ার পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে প্রথম আক্রমণ চালায় তখন আমি মস্কোতে টিভিতে দেখছিলাম। সাঁজোয়া বাহিনির ট্যাংক সর্পিল ভঙ্গিতে তুষারাবৃত লম্বা পথ জুড়ে এগিয়ে চলছে। তার সাথে আছে হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টারগুলো টেলিগ্রাফের খুঁটির মাথা ছুঁই ছুঁই উচ্চতায় উড়ে যাচ্ছে। ট্রাকভর্তি সৈন্য। ট্রাকের এন্টিনায় উড়ছে লাল-নীল-সাদা তেরঙা পতাকা।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত যুদ্ধের পর এটাই ছিল রাশিয়ান সেনাবাহিনি দ্বারা সর্বোচ্চ বড় যুদ্ধ। অবশ্য আমি-সহ সকলেই জানে, পূর্বের মহাশক্তিধর এই সৈন্যদল এখন বেশ বেকায়দায়ই আছে। প্রতিবছর যুদ্ধ ছাড়াই হাজার হাজার সৈন্য মারা যায়। কয়েকজন দুর্ঘটনায় মারা পড়লেও বেশিরভাগই যৌন নিপীড়ন আর সমকামী আগ্রাসনের কবলে পড়ে মারা যেতো অথবা আত্মহত্যা করত।

সরকারি হিসাব মতে ১৯৯২ সালের সৈন্যমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২৮২৪ জন। যদিও বেসরকারি হিসেবে সে সংখ্যা ৪০০০। পূর্ব ইউরোপ থেকে সরিয়ে আনা নামমাত্র বেতনের অফিসাররা বাস করত রেলের বগি, তাঁবু, সাধারণ হল বা জাহাজে। কিশোরদেরকে সেনাবাহিনিতে যোগ দিতে বাধ্য করা হতো। দিনে পাঁচ ডলারের বিনিময়ে (যদি তাদের ভাগ্য ভালো হতো) তাদেরকে এক রকম দাসে পরিণত করা হয়েছিল। তাদের কাজ—বেসামরিক রাস্তা নির্মাণ, বাঁধাকপি এবং আলু তোলা। এরপরও অনাহারে থাকতে হতো সৈন্যদের। শীতে জমে যাওয়া বা উন্মাদ হয়ে নিজেদের সহযোদ্ধাদেরকে সুযোগমতো নির্জন কোন জায়গায় হত্যা করা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতিরক্ষামন্ত্রী পাভেল গ্রাচেভ এসব নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করেছে অনেক। এ সবই আমার জানা ছিল।

BanglaBook.org

রাশিয়ান সেনাবাহিনি শহরের দক্ষিণ প্রান্ত বন্ধ করার কোন চেষ্টাই করেনি, যেটা ছিল সবচেয়ে কঠিন ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রান্ত। কারণ এটা বিদ্রোহী অধ্যুষিত গ্রাম ও দক্ষিণ চেচনিয়ার সাথে যুক্ত।

চেচেনরা অবশ্য কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করেনি যুদ্ধের ব্যাপারে। গ্রোজনির সর্বত্র দেয়ালে দেয়ালে চিকা মারা হয়েছে- 'মৃত্যু অথবা মুক্তি।' দুদায়েভ খুবই বেপরোয়া মানুষ। এমন একটা ভাব তার মধ্যে ছিল যেন স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধার কোন অভাব নেই তার। যাদেরকে বলে বোয়েভিক।

এদিকে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, রাশিয়ার কিছু শীর্ষ জেনারেলরা এ যুদ্ধে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায়। রাশিয়ান সেনাবাহিনির ডেপুটি কমান্ডার জেনারেল এডওয়ার্ড ভরাবয়েভ যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, সৈন্যদল প্রস্তুত নয়। জেনারেল বরিস গ্রমভ, যিনি অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিলেন আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারে নেতৃত্ব দিয়ে, তিনিও এ যুদ্ধের সমালোচনা করেন। একইভাবে সমালোচনা করেন গ্রাচেভের প্যারাট্রুপার কলিগ জেনারেল আলেকজান্ডার লেবেদ এবং প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী জেনারেল ভ্যালেরি মিরোনোভ। এমনকি প্রথম তিন সারির মধ্যে এক সারির কমান্ডার জেনারেল ইভান ব্যাবিচেভ গ্রোজনির দিকে অগ্রসর হয়েও আর সামনে পা বাড়াতে অনীহা প্রকাশ করেন যখন সাধারণ বেসামরিক লোকজন তার পথ রুদ্ধ করে বসে। তিনি বলেন, 'জনসাধারণের বিরুদ্ধে সৈন্যদের ব্যবহার করা উচিত নয়, বেসামরিক লোকদের ওপর গুলি চালানো নিষিদ্ধ কাজ।'

কিন্তু ব্যাপারটা আসলে হাস্যকরই বটে। পুরো চেচেন জাতির সংখ্যা দশ লক্ষেরও কম এবং সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্রের আয়তন পনেরো হাজার বর্গ কিলোমিটার, যা ওয়েলস বা সিসিলির চেয়েও যথেষ্ট ছোট। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগে দুই ঘণ্টার একটু বেশি। এদিকে রাশিয়ার সৈন্য সংখ্যা সতেরো লক্ষ আর অভ্যন্তরীণ সরকারি সৈন্য ও সীমান্ত বাহিনিসহ সে সংখ্যা প্রায় চব্বিশ লক্ষ। ক্রেমলিন থেকে বিবৃতিতে কখনোই যুদ্ধ শব্দটির ব্যবহার করা হয়নি। প্রোপাগান্ডায় বারবার বলা হয়েছে এটা মূলত সন্ত্রাস বিরোধী ও সংবিধানকে সমুন্নত রাখার অভিযান। ফলে সাধারণ মুসলিমদের ওপর এ যেন এক পুলিশি হামলা ছাড়া কিছুই নয়।

রাশিয়ান আর্মিকে আফগানিস্তান যুদ্ধের পর থেকে খুব বেশি বেকায়দায় পড়তে হয়নি তবে আমার মতো একজন বহিরাগতের কাছে রাশিয়ানদের ওইসব

BanglaBook.org

নতুন চকচকে অসীম সংখ্যক অস্ত্রকে অপরাজেয় বলেই মনে হচ্ছিল। অন্য কিছু বাদ দিয়ে শুধু জনবল ও অস্ত্রের সংখ্যা দেখলেও ওদের অপ্রতিরোধ্য মনে হবে। ওদের ‘শৃঙ্খলা’ ফিরিয়ে আনার যুদ্ধ দেখে আমি অস্বস্তিকর অনুভূতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলাম না। একজন আলোকচিত্র সাংবাদিক আমার সাথে টিভি দেখতে দেখতেই বলল, ‘তোমার এখানে একদমই থাকা উচিত নয়। তুমি কি বুঝতে পারছ, হেলিকপ্টারগুলো কী করতে পারে?!’

১৯১৮ সালে একজন রাশিয়ান জেনারেল গ্রোজনি শহর প্রতিষ্ঠা করেন আর প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন বোমাবর্ষণে সেটা ছিন্নভিন্ন করেন। এক কালে চার লাখ জনসংখ্যার গ্রোজনির এখন ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। সারি সারি শরণার্থী দক্ষিণী মুক্তাঞ্চল দিয়ে পালাচ্ছিল। সাথে কেবল গাড়িতে করে বহন করা যায় এমন সম্বল। সন্তানদের তারা গাড়ির পেছনের সিটে রাখত। একজন আরেকজনের ওপর বসেছে, তাদের চোখ মুখ বিবর্ণ, গম্ভীর। রাস্তার ধারে অসহায় কুকুরগুলো তাদের প্রভুর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় বসে ছিল আর কিছু উন্মাদ হয়ে বালুময় রাস্তায় ঘুরছিল আহত, বর্বর অবস্থায়।

প্রায় ১২,০০০০ লোক গ্রোজনি ছাড়তে পারল না। তাদের হয়তো অর্থ ছিল না কিংবা তাদের পালাতে সাহায্য করার মতো আত্মীয় স্বজন ছিল না অথবা ঘর ছাড়ার মতো যথেষ্ট মনোবল ছিল না। এদের অধিকাংশ ছিল রাশিয়ান উপজাতি যাদের দেশে আর কোন আত্মীয় স্বজন নেই, যা চেচেনদের ছিল। যে সকল রাশিয়ান উপজাতিদের প্রেসিডেন্ট রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারাই এক সময় রাশিয়ান বাহিনি দ্বারা নিহত হয়েছিল।

অবিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে এসে খুব দ্রুতই বাস্তবতা মেনে নিয়ে গ্রোজনিতে থেকে যাওয়া মানুষগুলো আদিম মানুষের মতো বসবাস করতে শুরু করল। মাটির নিচে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে থাকতে লাগল। তাদের একটাই চিন্তা- বেঁচে থাকা। বিদ্যুৎ ও পানির সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মোমবাতি বা তেলের কুপিই হয়ে পড়ল সম্বল। কাজ ছাড়া বাইরে বের হতো না কেউ। রাজপথ জনশূন্য হয়ে পড়ল। রাতে পুরো শহর নিকষ কালো আঁধারে ঢাকা পড়ত। হাসপাতালগুলো খালি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ডাক্তারগণ তখনও ইমারজেন্সি সামলাতে ডিউটিতে আসত। উদ্ধারকারী দল এলাকা ঘুরে ঘুরে আহত লোকদের হাসপাতালে নিয়ে আসত। কখনো কখনো মোমবাতির আলোয় অপারেশন চলত।

ক্রিসমাসের দিনগুলোতে আমি-সহ আরো জনা ছয়েক সাংবাদিক

BanglaBook.org

গ্রোজনিতে বাস করছিলাম, অন্যরা ইঙ্গুশেটিয়া বা দাগেস্তানে থাকত। দিনেরবেলায় যুদ্ধের জায়গায় আসা যাওয়া করত। আমাদের ধারণা ছিল, আমরা একটা পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিলাম। হয়তো খুব সাধারণ মনে হতে পারে কিন্তু সাংবিধানিক 'শৃঙ্খলা' পুনরুদ্ধারের নামে কী করা হচ্ছে আমরা শুধু তাই লিখতাম। রাতে এসে রেডিওর কাছে কান পেতে বিবিসি ওয়ার্ল্ড শুনতাম। মাঝে মাঝে তারা আমার রিপোর্টগুলোই হুবহু তুলে ধরতো। এতে আমি আরো উৎসাহিত হতাম এই ভেবে যে এটা নিয়ে আমার কাজ করার অনেক কিছুই রয়েছে। মাঝে মাঝে আমরা শুনতাম ওয়াশিংটন বা লন্ডন এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং এমন পাগলামি বন্ধের জন্য হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাশিয়াকে। এতে আমরা বেশ খুশি হতাম। এক রাতে তো আমরা এ নিয়ে বেশ ছেলেমানুষি আনন্দও করলাম। আমরা তখনও বুঝতে পারিনি প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের রিপোর্টের প্রভাব কতো ক্ষুদ্র। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যুদ্ধ বন্ধের জন্য কখনই কঠোর কোনো পদক্ষেপ নেবে না।

এক রাতে আমাদের হোস্টেলের নিচের রাস্তায় কয়েকটা আবাসিক বিল্ডিং-এ বোমা পড়ল। বিল্ডিংগুলোর নাম 'ফ্রেণ্ডহাউজ'। বোমার শকওয়েভে আমাদের রুমের জানালাগুলো চৌচির হয়ে গেল, আমরা দ্রুত সেলারে আশ্রয় নিলাম।

পরদিন সকালে হেঁটে বিল্ডিংদুটোর কাছে গিয়ে দেখি একেবারে মাটির সাথে মিশে গেছে। ভাঙাচোরা ইট-পাথরের টুকরোর মাঝে এক বৃদ্ধা বসে আছেন। হলুদ কম্বলে আবৃতা। কাঠের চেয়ারে বসা তার পায়ের কাছে দুটো মৃতদেহ পড়ে আছে। তার নাম আন্না ভলকোভা। একজন রাশিয়ান। পুরো ফোর্থ ফ্লোর-যেখানে তিনি থাকতেন-একেবারে ধ্বসে গেছে। তিনি ধ্বংসস্তুপের মাঝে তার ছোট্ট চেয়ারটায় বসে দোল খাচ্ছেন। দেহদুটো তার মধ্যবয়সী ছেলে ও পুত্রবধূর। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আছে, হয়তো জীবিত থাকতেও এভাবেই একে অপরকে আগলে রাখত। হাত দুটো এখনো দু'জনের ধরা। মুখ দুটো রক্তাক্ত। নিথর দেহের পাশে একটা বই; সম্ভবত বাইবেল আর একটা বাচ্চাদের খেলনা হাতুড়ি। আর কিছুর চিহ্নও নেই।

'আমি সোফাতে বসে ছিলাম আমার বৌমা আমাকে বলল, "মা, কয়টা বাজে?"' বৃদ্ধা বললেন, 'ঘড়িটা ছিল রান্নাঘরে। আমি ঘড়ি দেখতে টর্চ হাতে রান্নাঘরের দিকে যেতেই বোমা হামলা হলো। হুঁশ ফিরতে দেখি এই ধ্বংসস্তূপের

BanglaBook.org

মাঝে পড়ে আছি আমি।'

জীবন আর মৃত্যু আসলে নিয়তি ছাড়া কিছু না।

ওদিকে হাসপাতালগুলো থেকে রক্তের ধারা রাস্তায় এসে পড়তে লাগল। পিচ্ছিল পথে, বালুময় রাস্তায় গড়াতে থাকল। বারান্দায় জমাট বাঁধতে লাগল।

চিকিৎসকদের ওষুধ আর বেদনানাশকের স্বল্পতা ছিল। তারা জানত, যেকোন মুহূর্তে বোমা হাসপাতালেও আঘাত হানতে পারে। তাই তারা আহতদের গ্রামের বাইরে পাঠাতে লাগল। বিনা বেতনে কাজ করা এসব চিকিৎসক খেয়ে না খেয়ে প্রতিনিয়ত ছেঁড়া-কাটা নিয়ে কাজ করতে করতে ভাবলেশহীন অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তাদের সাদা এপ্রোনগুলো রক্তের দাগ-ছোপে গেরুয়া রঙা হয়ে যেতে লাগল। গায়ে বেদনানাশক অষুধের তীব্র দুর্গন্ধ।

'কীভাবে পারে তারা? কীভাবে নারী ও শিশুদের ওপর এভাবে বোমা হামলা করতে পারে প্রতিদিন, প্রত্যেকটা দিন?' একজন চিকিৎসক আমাকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন। অবসন্ন দেহে ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে ঝাঁকি দিয়ে করিডোরের বাইরে কম্বল উঠিয়ে এক বালকের নিথর দেহ দেখালেন। স্প্রিন্টারে ক্ষতবিক্ষত তার বুক। মৃত্যুর সময় গায়ে ওভারকোট আর মাথায় স্কি হ্যাট চাপানো ছিল, এখনও তেমনই আছে।

চিকিৎসক বলে উঠলেন, 'বদমাশগুলো ফ্যাসিস্ট ছাড়া কিছু না,' তারপর তিনি আমার হাতটা ধরে মৃত ছেলেটিকে দেখিয়ে বললেন, 'যা দেখলেন তা কখনো ভুলে যাবেন না। কক্ষণও না। আমাকে প্রমিস করুন।'

প্রথমে রিপাবলিকান হাসপাতালে অস্থায়ী মর্গ তৈরি করে বেনামী লাশগুলোকে স্তূপ করে ফ্রিজড অবস্থায় রাখা হয়েছিল যেন লাশগুলো পচে না যায়। প্রথম রুমে প্রায় পঞ্চাশটা লাশকে গাছের গুঁড়ি সাজানোর মতো করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। লাশগুলো কালো হয়ে গেছে, বিবস্ত্র। কোনটার হাত নেই তো কোনটার পা। যেন হাত-পা খুলে ফেলা ম্যানিকুইন একেকটা। আমার দ্বিতীয়বার তাকানোর সাহস হলো না। কিন্তু যারা তাদের আত্মীয়দের খুঁজতে এসেছে তাদের বারবার দেখা ছাড়া উপায় নেই।

তারা একজন একজন করে আসত। বিমান হামলার ভয়ে মুখ শুকনো। এদের জীবনের গল্প সংবাদের জগতে বেশ মুখরোচক হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে কথা বলার সাহস হতো না আমার।

আমরা ভাবতাম সবকিছুর একটা সীমা আছে। এ ধ্বংসযজ্ঞের শেষ ঘটবে।

BanglaBook.org

এ ভাবনায় ছেলেমানুষি ছিল। কেননা বাস্তবতা ছিল বড় রূঢ়। তাই যখন একদিন সকালে একজন চিকিৎসকের কাছ থেকে আমি এবং 'দ্য টাইমস' পত্রিকার রিচার্ড বেটসন শুনতে পেলাম একটা এতিমখানায় বোমা হামলা হয়েছে, আমরা একে অপরের দিকে তাকালাম অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। এ হামলার খবর আমাদের চিন্তার সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ডাক্তার কিন্তু সঠিক তথ্যই দিয়েছিলেন; উত্তর গ্রোজনিতে একটা পাঁচতলা এতিমখানার একপাশ পুরো ধ্বসে গিয়েছিল তাসের ঘরের মতো। বাগানটা ঝলসে কালো হয়ে ছিল, খেলনা প্রাণিগুলোর মাথা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল, দোলনাটা পরিণত হয়েছিল ধূলোয়। একটি অবিস্ফোরিত রকেট খেলার মাঠে পড়ে থাকতে দেখলাম।

আমরা এতিমখানার আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে দেখলাম, চল্লিশজন এতিম বাচ্চাই বেঁচে আছে। শিক্ষক বললেন, 'আর আধঘন্টা পর হামলা হলেই সব বাচ্চা খেলার মাঠে থাকার কারণে মারা পড়ত। অল্পতে সবাই বেঁচে গেছে।'

আট বছরের বেশি বয়সী বাচ্চারা প্রচন্ড ভয় পেয়েছে। কিন্তু এক থেকে তিন বছরের বাচ্চারা হাসছিল। তারা ভেবেছে এটা হয়তো নতুন আরেকটা খেলা।

সপ্তাহখানেক পর এসব কিছু স্বাভাবিক মনে হতে লাগল। মৃত্যু একটা সাধারণ ঘটনায় পরিণত হলো। যেদিন প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের বিপরীতে পার্লামেন্ট বিল্ডিংয়ে বোমাবর্ষণ হলো সেদিন মনে হলো চেচেনদের চিন্তা করারও কোন অধিকার নেই। তারা তো নিছক রক্তমাংসের দেহ। রাশিয়ানরা আমাদের বাধ্য করল মৃতদেহের ওপর দিয়ে হাঁটতে। চেচেনদের ছিন্নভিন্ন মগজ দেয়ালে-মেঝেতে লেগে আছে। আমরা দেখতে অনীহা প্রকাশ করলাম কিন্তু তারা দেখতে বাধ্য করল। মগজগুলো যেন আমাকে বলছে, 'দেখো ওরা আমাদের কী করেছে।'

রিপাবলিকান হাসপাতালে একজন আহত রাশিয়ান মহিলা একটা শীতল রুমে শুয়ে তীব্র মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। বমিতে ভাসিয়ে ফেলেছে চারিদিক। চোখের মণি ঘুরছে ক্রমাগত, শ্বাস অনিয়মিত। এর মাঝেই কেঁদে কেঁদে বলল, 'তারা বোমাবর্ষণ শুরু করতেই আমরা দৌড়াতে চেষ্টা করলাম। পিছন থেকে কিছু একটার আঘাতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

আমার মন বলতে থাকল, এটা মেনে নেওয়া সম্ভব না। এটা সম্পূর্ণ

BanglaBook.org

গণহত্যা। আমাকে সংবাদপত্রে লিখতে হবে।

পশ্চিম গ্রোজনিতে তেল শোধনাগারের কাছে কারপিনস্কি পর্বতের ওপর চেচেন বোয়েভিক বাহিনি আর্টিলারি, বন্দুক জড়ো করেছে যেন তারা সুউচ্চ পাহাড় থেকে সমগ্র রাশিয়ান সারিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এটা ছিল চেচেন প্রতিরক্ষার অন্যতম ফাঁড়ি যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। প্রতিদিন কারপিনস্কি রাশিয়ান প্লেন থেকে ছোঁড়া গোলাবর্ষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতো। তেল শোধনাগারে বোমা পড়তেই আকাশ কালো ধোঁয়ায় ভরে উঠত। গোলাবর্ষণের কারণে পাহাড়ের চূড়ার জায়গায় জায়গায় বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। গিরিখাত ছাড়া কোথাও আশ্রয়ের জায়গা ছিল না।

'বুম-বুম-বুম আওয়াজ আর আগুন চারদিকে, গতরাত ছিল একটা দুঃস্বপ্নের মতো।' বলল খিজির কাচুকায়েভ। পাহাড়ের মতো লম্বা, দানবের মতো বিশাল চেচেন কমান্ডার। রাশিয়ানরা তাকে 'শয়তান' বলে আখ্যা দিয়েছিল।

সে আরো বলল, 'কিন্তু রাশিয়ানরা যদি ভাবে যুদ্ধ ছাড়াই তারা সব জয় করে নেবে তাহলে তারা ভুল ভাবছে। কারণ কী জানো? আমরা দুদায়েভের পক্ষে যুদ্ধ করি না করি সেটা ব্যাপার না, ব্যাপারটা হলো আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়ছি। পরিবারের জন্য লড়ছি। আমরা চেচেন আর আমরা এমনি এমনি আমাদের জন্মগত ভাষা ছেড়ে দিতে পারি না।'

ডিসেম্বর শেষ না হতেই এটা পরিস্কার হয়ে উঠল যে, গ্রাচেভের পার্সোনাল কমান্ডে রাশিয়ান অপারেশন বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে। সৈন্যরা তিন দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিল, একদল ইঙ্গুশেটিয়া দিয়ে, একদল দাগেস্তান দিয়ে, আরেকদল উত্তরাঞ্চল দিয়ে; মোজদাক শহর ছিল আক্রমণ শুরুর কেন্দ্রবিন্দু। পরিকল্পনা ছিল শহরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা। কিন্তু আক্রমণের দশ দিন পরে সৈন্যদল গ্রোজনির বাইরে এক গ্রামে এসে দ্বিধান্বিত হয়ে থমকে গেল। মূল আক্রমণের আগে ঘেরাও করাটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কোনভাবেই তারা দক্ষিণ দিকের গ্রাম আর পাহাড়ের সাথে সমন্বয় করতে পারছিল না। ওইদিকের মুখটা অরক্ষিতই রয়ে গেল আর সেটাই ছিল বোয়েভিক সৈন্যদের রসদ সরবরাহের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুট।

রাশিয়ান সৈন্যদল নানা ধরনের ভারি অস্ত্রে সজ্জিত। এর মাঝে রয়েছে ট্যাংক, মর্টার, কামান, হুরাগান, রকেট এবং অবশ্যই প্লেন ও হেলিকপ্টার। কিন্তু এসব আগ্নেয়াস্ত্রের কার্যকারিতা সঠিক ট্রেনিং ও ক্রু'র অভাবে অনেকটাই

BanglaBook.org

ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। পাইলটদের অদক্ষতার একটা কারণ হলো তারা বছরে প্রয়োজনীয় একশ ঘন্টার ট্রেনিং ফ্লাই করার সুযোগ পায় না, পায় মাত্র উনিশ ঘণ্টা। তার ওপর তাড়াহুড়ো করে চেচনিয়ায় পাঠানো ত্রুটিহীন ইউনিটের মাঝে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় সৈন্যদের দুর্নীতি ও সাংগঠনিক দুর্বলতা।

স্বল্পোন্নত এলাকা কিংবা গ্রামে মার্চ করা সৈন্যদের জন্য কল্পনাতীত কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। আর্টিলারি আক্রমণেও চেচেনরা বাসস্থান ছেড়ে পালাতো না। যার অর্থ পদাতিক বাহিনির ক্ষেত্রে রাশিয়া সবচেয়ে দুর্বল। শুধু মুক্তাঞ্চল ও জনমানবহীন স্থানেই রাশিয়ান বাহিনি কার্যকর ছিল। গ্রোজনির বাইরেও বিস্তৃত অঞ্চলে ট্যাংক, এপিসি ও হেলিকপ্টারগুলো ছিল অপ্রতিরোধ্য এবং গ্রোজনিকে ঘিরে থাকা রাশিয়ান বুহ্যটাও আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছিল। প্রতিদিনই একটু একটু করে উভয়পক্ষ অনিবার্য সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

চেচেনদের লড়াই ছিল গতিশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের ধারণা এতোটাই পরিষ্কার ছিল যে তাদের দেখে মনে হতো এরা মৃত্যু-ভীতিশূন্য। চেচেনরা ঘরে তৈরি সাদা পোশাক পরত আর অস্ত্রগুলোও সাদা ফিতেয় জড়িয়ে রাখত যেন তুষার শুভ্রের মাঝে সহজেই লুকাতে পারে। তারা সাধারণত পাঁচ থেকে বিশজনের গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অপারেশন পরিচালনা করত; এর বেশি খুব একটা হতো না। তুলনামূলক 'ওয়েল আর্মড' একটা গ্রুপের সাথে হয়তো একটা মেশিন গান বা দুটো রকেটচালিত গ্রেনেড লঞ্চার এবং প্রত্যেকের জন্য একটা করে অটোমেটিক রাইফেল থাকত। কয়েকজন নিরস্ত্র সদস্যও থাকত গোলাবারুদ ও আহতদের বহন করার জন্য।

দেখা যেতো কোন কোন ইউনিট নিজেরা নিজেরা আত্মীয় বা প্রতিবেশীরা মিলেই তৈরি করে ফেলেছে। নিজেদের মধ্য থেকেই একজনকে কমান্ডার নির্ধারণ করত। প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিনের যুদ্ধ, আরো ভালোভাবে বলতে গেলে এই বর্বর বোমা হামলা দুদায়েভের সাধারণ এক বিদ্রোহকে গণমানুষের বিদ্রোহে পরিণত করেছিল।

চেচেন অস্ত্রাগারের প্রধান আকর্ষণ হলো আরপিজি লঞ্চার। ক্লোজ রেঞ্জে একজন আরপিজিধারী পরিণত হতে পারে ট্যাংক ধ্বংসকারী হিসেবে। সারাদিন, এমনকি দৌড়ানোর সময়ও বহন করতে খুব একটা কষ্ট হয় না। কয়েকশো মিটার পর্যন্ত নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করতে পারে—এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে আরপিজি সমতল ভূমিতে আদর্শ অস্ত্র। চেচেনদের কাছে রাশিয়ান তৈরি

Bangla Book.org

নানা ধরনের আরপিজি ছিল। রি-ইউজেবল বাজুকা থেকে শুরু করে পোস্টার কেস সাইজের ওয়ান শট টিউব। হালকা থেকে শুরু করে ভারি এন্টি-ট্যাঙ্ক রকেট পর্যন্ত। এমনকি ওয়ার গাইডেড ভার্সন—যেটা কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। এগুলোর কার্যকর ব্যবহার হতো গ্রোজনির বাইরে বিস্তৃত অঞ্চলে।

চেচেনদের প্রতিরোধ কৌশল সাধারণ হলেও গোলাগুলির সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হতো। প্রয়োজনের সময় লুকানো, শত্রুর যানবাহন আরপিজি দ্বারা ধ্বংস করা; এরপরও কেউ বেঁচে থাকলে গুলি করা, আক্রমণ থেকে বাচার জন্য অবস্থান পরিবর্তন করে নিরাপদ গর্তে প্রবেশ করা—এসবের জন্য প্রয়োজন গতিশীলতা।

চেচেনদের কাছে আর্টিলারির মতো ভারি অস্ত্র ছিল যেগুলো দুদায়েভের তিল তিল করে জমানো। গ্রেড মাল্টিপল রকেট লঞ্চার ও ট্যাংকও ছিল। এই গানগুলো গোলাগুলি বা বিমান হামলার জবাব দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই চেচেনরা সেই একই কৌশল প্রয়োগ করত—'ফায়ার এন্ড মুভ'। একটা সাধারণ দেখতে ট্রাকের পেছনে গ্রেড চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে দ্রুত নিরাপদ স্থানে চলে আসা।

এখন আসা যাক 'বোয়েভিক' কারা সে প্রশ্নে? প্রতিরক্ষামন্ত্রী পাভেল গ্রাচেভের মতে, ছয় হাজার বিদেশি 'ভাড়াটে সৈন্য' এবং বারো'শ 'বিপদজনক সন্ত্রাসী'সহ দশ হাজার জনের এক বিশাল বাহিনি। কিন্তু তা ছিল নিছকই এক প্রোপাগান্ডা। চেচনিয়ার অনেকগুলো সূত্র থেকে জানা যায়, এরা পুরোদস্তুর চেচেন এবং সংখ্যায় তিন হাজারেরও কম। সার্বক্ষণিক যোদ্ধা হবে মাত্র কয়েক'শ। মূল সেনাবাহিনিকে প্রেরণা দিত কয়েক হাজার পার্ট-টাইম যোদ্ধা এবং অগণিত সমর্থক ও সাহায্যকারী।

চেচেনদের মধ্যে ইসলামি রাষ্ট্র ইউক্রেন, বাল্টিকস-এর স্বেচ্ছাকর্মীর পাশাপাশি অভিজ্ঞ সৈনিকও ছিল। চেচেনরা আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাদের যুদ্ধনেতা শামিল বাসায়েভের আবখাজিয়াতে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাছাড়া কিছু সাবেক সোভিয়েত অফিসারও রয়েছে চেচেন বাহিনিতে। এদের মধ্যে অবশ্যই প্রথমে থাকবে যোখার দুদায়েভ এবং তার চিফ অফ স্টাফ ও সাবেক আর্টিলারি কর্নেল আসলান মাসখাদোভ এর নাম—যিনি এখন চেচেন জেনারেল। অধিকাংশ চেচেন সেনাদের অতীতই অতি সাধারণ। এই যেমন

BanglaBook.org

কারপিনস্কি পর্বতে খিজিরের দলের সদস্যরা বেশিরভাগ ছিল কৃষক, ট্রাকচালক ও শিক্ষক। কিন্তু একেবারে তরুণরা বাদে সকলেরই সোভিয়েত আর্মির হয়ে ক্রান্তিকালীন সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল।

বেশিরভাগ বোয়েভিক রাজনীতি দ্বারা যুদ্ধে অনুপ্রাণিত হয়নি বরং তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার কামনা দ্বারা। তারা দুদায়েভের সমর্থক হতে পারে কিন্তু তারাও দুদায়েভ ও তার দলের পূর্বের নৈরাজ্যকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখত। কোনো চেচেন যোদ্ধাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'কেন হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে?' তাহলে তারা 'আমার দেশকে রক্ষা করতে' জবাব দেয়াটাই পছন্দ করত।

একদিন মুসা নামের একজন গেরিলা আমাকে একটা কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল। কবিতাটা সে নিজেই লিখেছে নির্ভীক এক নেকড়ের সম্মানে। যে নেকড়ে আহত অবস্থায় ফাঁদে পড়েও তার শত্রু মেষপালককে বিনাশ করতে গিয়ে মারা পড়ে। এই নেকড়েটাই আসলে প্রকৃত চেচেন।

ঘৃণা জেগে ওঠে নেকড়ের মাঝে
শরীরে তার মর্মন্তুদ বেদনা।
অতঃপর নিকষ আঁধারে
মেষপালকের চোখ পড়ে নেকড়ের চোখে
এই প্রথম মেষপালক অনুভব করে দয়া,
দয়া ধূসর চামড়ার এই চোরের জন্য,
যার মৃত্যু হয়েছে মর্যাদাপূর্ণ

ধর্ম একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই যুদ্ধে। যদিও যুদ্ধটি আদৌ মুসলিম বনাম খ্রিস্টান ধর্মযুদ্ধ ছিল না, অনেক চেচেন যোদ্ধা ধর্মভীরু মুসলিম না কিন্তু যুদ্ধে যাবার আগে ঠিকই আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করত। তাদের ধর্মীয় ভাতৃত্ববোধের বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য তাদের মনোবল ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়বোধ টিকিয়ে রাখার প্রধান হাতিয়ার ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় রীতি যোদ্ধাদের যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে অনুপ্রেরণা দিত। স্বেচ্ছাসেবক কিংবা অস্থায়ী সৈন্যদের নিয়মানুবর্তী করে তুলতে সাহায্য করত। মূলত চেচেন যোদ্ধারা একত্রিত হয়েছিল আত্মরক্ষার সহজাত বোধ দ্বারা, তারা অতীতের নির্বাসন ও সকল

BanglaBook.org

যুদ্ধের স্মৃতি লালন করত। তাদের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'আর কখনই আমরা নিপীড়ন সইবো না'!

ডিসেম্বরের শেষদিকে ফ্রিডম স্কয়ার একটা বেদনাবিধুর স্থানে পরিণত হলো। ফ্রিডম স্কয়ার পেরিয়েই প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস। স্কয়ারে প্রায়শই বোমা পড়তে থাকল। স্কয়ারটা এতো বড় ছিল যে প্লেন এসে বোমা ফেললে দৌড়ে পালানোর সময় হতো না। ওই সময় একবার করে ওখানে ঢুঁ মারা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল আমাদের। যে সকল বৃদ্ধলোকেরা বিমান হামলাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যুদ্ধের আগে ওখানে যিকির করত তারাও দিনে দিনে কমতে থাকল।

অবাক করা বিষয় যে, স্কয়ারে সর্বশেষ যে ক'টি বিল্ডিং বোমার সরাসরি শিকার হয় তার মধ্যে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস একটি। একটু চুন সুরকি খসে পড়লেও প্যালেসটি মোটামুটি অক্ষত ছিল। প্যালেসের অক্ষত থাকা এবং চেচেনদের নেতৃত্বের ভীত নড়াতে না পারাই প্রমাণ করে রাশিয়ানদের দুর্বল রণকৌশল। কারণ দুদায়েভ ও তার অনুসারীরা বেশিরভাগ সময় প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসেই কাটাত।

বোমা হামলায় চেচেন সেন্ট্রাল ব্যাংক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ ঘটনা মুখরোচক একটা গুজবে ঘি ঢেলে দেয় যে, এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঘটা 'এভিসস কেলেঙ্কারি'র দলিলপত্র নস্যাৎ করা যা সেন্ট্রাল ব্যাংকে সংরক্ষিত ছিল।

চেচেনদের কাছে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস বিদ্রোহের শক্তিশালী প্রতীক। ওপরের গ্রাউন্ড ফ্লোরটা সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়। তবে গ্রাউন্ড ফ্লোরের নিচের জায়গা—বাংকার, সেলারে সকলের যাতায়াত ছিল। প্যালেসের কিছু কিছু রুমে শুধু একটা মোমবাতি বা তেলের কুপি মিটমিট করে জ্বলত। সে আলোতে চোখে পড়ত অস্ত্রের সমাহার, গোলাবারুদ, গ্রেনেড, সবুজ-সাদা-লালের বিদ্রোহী চেচেন পতাকা। জায়গাটা সর্বদাই উষ্ণ এবং নিরাপদ। আর কিছু না হোক অন্তত এমন কিছু একটা আছে যার কারণে মানুষগুলোর মাঝে একটা চেতনা নাড়া দেয়, যুদ্ধটা বিফলে না যাবার স্পৃহা যোগান দেয়।

কিছু অকর্মা লোক দিয়ে চেচেন প্রেস গঠিত। তারা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন এক রুমে বসে থাকত। রুমটাতে সব সময় তেলের কুপি জ্বলত। একজন ইউক্রেনিয়ান ছিল, সে বলতো, সে এসেছে চেচেনদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে কিন্তু

BanglaBook.org

সে অধিকাংশ সময় কাটাতো বাংকারে আর নতুন চেচেন সাংবাদিকদের সাংবাদিকতা শেখানোর নাম করে তার রোমান্টিক গল্পগুলো শোনাতো। আমার প্রিয় ছিল এক রাশিয়ান-আমেরিকান। সে নিজেকে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে পরিচালিত 'নন ভায়োলেন্স ইন্টারন্যাশনাল' নামক এক সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিত। 'আমার মনে হয় না আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগ কোন পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারবে।' সে বলত বেশ সততার সাথে কিন্তু গ্রোজনিতে তা বেশ হাস্যকর শোনাত।

সর্বশেষ এই ভবনের অফিস থেকে যে চলে গিয়েছিল সে তথ্যমন্ত্রী মোভলাদি উদুগভ। কালো জিন্স আর জ্যাকেট-এর চেচেন ইউনিফর্ম পরতো। তার কামরার শাটারযুক্ত জানালা ধাতব পাত দিয়ে ঢাকা। টেবিলে মূল্যবান ভিডিও ইকুইপমেন্ট এবং একটি পিস্তল থাকত। সে আন্তরিক ব্যক্তি ছিল না কিন্তু তবুও তার কাজের তারিফ করতেই হয়।

প্রতিদিন যুদ্ধটা একটু একটু করে গ্রোজনিমুখী হতে থাকল। ডিসেম্বরের শেষদিকে রাশিয়ার ট্যাঙ্কগুলো রাজধানীর 'আরগুন'-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করতে শুরু করল।

যুদ্ধের খবর নিতে আমি আমার গাড়িচালক ওসমানকে নিয়ে গাড়ি রেখে সামনে অগ্রসর হলাম। একপর্যায়ে ধোঁয়া দেখে দ্রুত একটা খন্দ টাইপ জায়গায় আশ্রয় নিলাম। আমাদের মাথার ওপর চারটা হেলিকপ্টার ঘুরতে লাগল এবং আমাদের ডানপাশের গাছের সারি বরাবর বোমা বর্ষণ করতে লাগল। ওই দিকে চেচেনরা অবস্থান নিয়েছিল। মাঠের দুটো জায়গা ধোঁয়ার কুণ্ডুলিতে ভরে গেল। সম্ভবত এপিসি বা ট্যাংক পুড়ছিল। এমন সময় হেলিকপ্টারগুলো আমাদেরকে দেখে ফেলল। একটা হেলিকপ্টার দলছুট হয়ে এগিয়ে এসে আমাদের গর্তে আক্রমণ শুরু করল। হিসহিস শব্দে খন্দের মধ্যে তুষারের টুকরো আছড়ে পড়তে লাগল। এটা একটা অবারিত অঞ্চলের দেশ, চেচেনদের লুকিয়ে বাঁচার কোনো সুযোগ ছিল না।

২৯ ডিসেম্বর হেলিকপ্টার ও আর্টিলারির সহায়তায় রাশিয়ান পদাতিক বাহিনি চেচেনদের সাথে এক সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হলো। চেচেনদের নেতৃত্বে ছিল শামিল বাসায়েভ। যুদ্ধ হলো শহরের পূর্ব প্রান্তে। রাতে শহরের মধ্যে এটাই প্রথম কোন সম্মুখযুদ্ধ। একের পর এক বিমান হামলা হতে থাকল। বোমা বিস্ফোরণে পুরো আকাশ ছেয়ে গেল। আমরা বুঝতে পারলাম সময় ফুরিয়ে

BanglaBook.org

আসছে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, চেচেনরা শেখ মানসুর স্কয়ারে এক বিশাল দেবদারু গাছ সাজাচ্ছিল নববর্ষ উদযাপনের জন্য!

উনিশ শতকের এই চেচেন সঙ্গীত 'খামজাদ'র মৃত্যু' থেকে বোঝা যায় চেচেনরা কতোটা বেপরোয়া জাতি।

কাগেরম্যান বলে, যদি করো আত্মসমর্পণ বাঁচবে তোমার প্রাণ
খামজাদ বলে, ওহে কাগেরম্যান আজ আমি অর্থ লোভে লড়তে আসিনি
আজ গ্রাজওয়ারের মৃত্যুকে জয় করতে এসেছি
আজ আমি যদি আত্মসমর্পণ করি
ঘিখের লোকেরা আমাকে নিয়ে উপহাস করবে
আমি যুদ্ধ করি ক্ষ্যাপা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো
ভুখা ঘোড়া যেমন তৃণভূমি ধ্বংস করে
তেমনি আমি শত্রুকে চিবিয়ে খাই
তাই তোমার সৈন্যদের দেখলে আমার হাসি পায়
আমি তো ভয় করি না কাউকে
শুধু মহাশক্তিশালী স্রষ্টা ছাড়া।

***

নববর্ষের আগের সকালে আরেকটা বিমান হামলায় আমাদের কটেজের একটু দূরেই কয়েকটা বাড়ি আর কারে আগুন লেগে গেল। আমাদের জানালাও অক্ষত রইল না। একটা এপার্টমেন্টের পাশে বিশাল এক গর্তের সৃষ্টি হলো। ধুলি ধূসরিত বেঁচে যাওয়া মানুষগুলো লাশের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো। এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে তার হাতের লাঠি আকাশের দিকে তুলে কিছু একটা বলল। হয়তো রাশিয়ান বিমানগুলোকে শাসাচ্ছিল। আবার বিমান হামলা হতে পারে এই ভয়ে আমরা ওই স্থান ত্যাগ করে শহরের কেন্দ্রে 'ডায়নামো স্টেডিয়ামের' পাশে এক পরিত্যক্ত হোটেলে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু আমরা উঠতে না উঠতেই পাশেই গোলাবর্ষণ শুরু হলো। বিস্ফোরণের শব্দে ঘরের মেঝে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকল। সাথে কাঁপতে থাকল আমার আত্মা। এটা শহরের কেন্দ্রে প্রথম আর্টিলারি হামলা। চেচেনরাও ফিরতি রকেট ছুঁড়তে লাগল ঠিক আমাদের হোটেলের পিছন থেকে। আমার মনে হলো যেন জায়গাটা দুই ভাগ

BanglaBook.org

হয়ে যাবে। এরমধ্যেই মেশিনগান আর গোলাগুলির শব্দ ছাপিয়ে হেলিকপ্টারের শব্দ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। শহরের প্রান্তের লোকগুলো ভয়ে এদিকটায় এসে জড়ো হতে লাগল। শহরতলিতেও রাশিয়ান ট্যাংকের আগমন ঘটেছে। পুরো গ্রোজনি অশান্ত হয়ে উঠল।

ঠাণ্ডায় জমে আর স্নায়ুবিক দুর্বলতা নিয়ে আমি স্যাটেলাইট টেলেক্সের মাধ্যমে দ্রুত খবরটা পাঠিয়ে দিলাম। তারপর আমার এএফপি'র কলিগ ইসাবেলা এস্ট্রিগারেগাকে নিয়ে বাইরে গেলাম। উদ্দেশ্য অন্য কলিগ সিবিএস এর গাসপেরিনি, পল লউয়ি, সানডে টাইমস-এর ক্যারি স্কটদের সাথে যোগ দেয়া।

আমাদেরকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরিস্থিতি আগের মতো নেই। এবার তিন দিক থেকে হাজার হাজার সৈন্য, ট্যাংক, এপিসি শহরকে আক্রমণ করেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না যে, চেচেনরা শেষ পর্যন্ত টিকতে পারবে। এবারে রাশিয়ানরা আদাজল খেয়ে নেমেছে। শহর দখল এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। পল যুদ্ধের ব্যাপারে অভিজ্ঞ সাংবাদিক। তার মতে এটা একেবারেই পাগলাটে পরিস্থিতি। সারায়েভোর চেয়েও এখানে খারাপ অবস্থা।

তার কথা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো। শহরে এমন গুজবও রয়েছে যে রাশিয়ান স্পেশাল হিট স্কোয়াডরা ধরে ধরে সাংবাদিকদের মারছে। সে বলল আমাদের এখান থেকে বের হতে হবে। রাস্তাগুলো রণক্ষেত্র হয়ে গেছে। নরকে পরিণত হয়েছে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। মনে হচ্ছে শহরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সময় এসেছে ছেড়ে যাবার।

ভয় নিয়ে আমরা দুটো কারে চেপে বসলাম। উদ্দেশ্য, শহরের প্রধান সড়ক ছাড়িয়ে চিপাগলি ধরা।

এ সময় আমরা এক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম। চেচেনরা রাস্তায় নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই একসাথে অবস্থান করছে অথচ এটা তাদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। তাদের মনোবল ছিল অটুট। এ মনোবলই আমার আর ইসাবেলার মধ্যে কী যেন একটা তৈরি করল। আমরা শহর ছাড়তে পারলাম না; থেকে গেলাম। এজেন্সির জন্য সংবাদ ফাইল করতে লাগলাম নিয়মিত। এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে ফার্স্ট হ্যান্ড নিউজের জন্য আমরা ছাড়া আর কোনো উৎসই শহরে থাকল না।

আমাদের দায়বদ্ধতা ছিল। সাথে সাথে সুযোগও। আমরা বাকি সবাইকে

BanglaBook.org

বিদায় জানিয়ে রয়েই গেলাম।

মেশিনগানের তীক্ষ্ণ বাতাসভেদী শব্দ আর বিস্ফোরণে কানে তালা লেগে যেতো। বোমার কালো ধোঁয়া, তেল শোধনাগারের বিষাক্ত ধোঁয়া শীতের বিবর্ণ আকাশ আঁধারে ঢেকে ফেলত। বেলা দুটোর আগেই সূর্যের আলো ঢাকা পড়ে যেত ধোঁয়ায়। একটু দূরেই শোধনাগারের আগুন মাঝে মাঝে আকাশচুম্বী শিখায় পরিণত হতো। দিগন্তে মিশে কমলা বর্ণের আভা তৈরি করত। রাতের বেলা আলো ঝলমল করত বিস্ফোরণের ছটায়। লাল রেখার বুলেটগুলোর ছোটাছুটি দেখে মনে হতো ছাদের ওপরে তারাগুলো খসে পড়ছে।

মস্কো তাদের হিসাব নিকাশে এক মস্ত বড় ভুল করে বসল। রাশিয়ান প্রোপাগান্ডাতে দস্যুরা হয়তো পালাত, কিন্তু চেচেনরা? একদমই না। যুদ্ধের দামামা যেহেতু শহরের কেন্দ্রেই বাজছিল, তাই চেচেনরা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে জুটল; এমন কি কোন অস্ত্র ছাড়াই। মজা করে তারা বলত 'কাজে যাই'। ঢিলেঢালা আলখাল্লা, সাধারণ চামড়ার জ্যাকেটে তাদেরকে রাখাল বালকের মতো দেখাতো অথবা মনে হতো ফুটবল খেলতে এসেছে। গোটা গ্রুপে একটা রাইফেল থাকত আর সবার হাতেই ছোটখাটো অস্ত্র—যেমন, শটগান, হাত বোমা বা ককটেল।

কোন কোন দলে একজন কমান্ডার থাকত। কারো বা আবার ছিল বিশেষ প্ল্যান। যেমন তেইশ বছর বয়সী দোকানের ক্লার্ক ঈসা বলেছিল, 'আমরা সামর্থ অনুযায়ী যা পারি তাই করব, একটা পেট্রোল বোমা হলেও বানাবো কিন্তু বসে থাকব না।'

তাদের গ্রুপে চারজন ছিল। সাথে একটা শটগান আর একটা অটোমেটিক রাইফেল। তারমধ্যে দুটো ছেলের বয়স বারোর কাছাকাছি। বড়দের ওভার কোট পরে আছে তারা, কলারটা কান পর্যন্ত ওঠানো। বড়দের সাথে সমানতালে হেঁটে চলে।

লিচি একজন ঊনচল্লিশ বছর বয়সী সোভিয়েত নেভির প্রাক্তন নাবিক। সে আমাকে বলল, 'বালক দুটোকে দেখো। এ বয়সেই অস্ত্র গোলাবারুদ টানতে আমাদের সাহায্য করছে। তাদের চোখে ট্যাঙ্ক রকেট—কিছুরই ভয় নেই।' ছোট্ট দলটা লিচির কথা উজ্জীবিত হয়ে হেসে উঠল। এমন সময় মেশিন গানের আওয়াজ আসতেই আমরা যার যার মতো আলাদা হয়ে গেলাম।

যুদ্ধটা এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে স্বল্প দূরত্বে কার্যকর

BanglaBook.org

অস্ত্রের ব্যবহার সহজ হয়েছে সাথে গেরিলা রণকৌশলও।

'এখানে তারা মেহমান আর আমরা মেজবান। তারা ঢুকেছে বটে কিন্তু বের হতে পারবে না। আমাদের জন্য শহরে রাতের আঁধারেও কাজ করা সহজ।' আটত্রিশ বছর বয়সী একজন গেরিলা কথাগুলো বলল। লোকটার হাতে একটা বিধ্বংসী রাইফেল, এন্টি ট্যাংক স্টিক গ্রেনেড আর চোখেমুখে শহীদি তামান্না।

সে আরো বলল, 'তারা কোন কিছুর জন্যই যুদ্ধ করছে না, কিন্তু আমরা যুদ্ধ করছি দেশ মাতৃকার জন্য। মরতে আমাদের ভয় নেই। তাদের ট্যাঙ্ক, প্লেন সব কিছু থাকতে পারে কিন্তু আমাদের আছে আরপিজি আর সাথে আল্লাহ। আমরা জানি, আমরা কার জন্য, কীসের জন্য লড়ছি।'

রাশিয়ান মশালের মৃদু আলো বা জ্বলন্ত ভবনের আগুনের শিখায় সাদা পোশাক আর মাথায় সবুজ ব্যান্ডের একজন গেরিলা যোদ্ধাকে যেন অশরীরী ত্রাতা বলেই মনে হতো। গাছের ডালের স্তুপ দিয়ে তাদের মেশিনগানগুলো লুকানো থাকত। বিল্ডিং-এর ওপরের তলাগুলো ব্যারিকেড দিয়ে রাখত। ওঁত পেতে থাকত রাশিয়ান শকুনের দলের জন্য।

একটা চেচেন গ্রুপ সাপের মতো সন্তর্পণে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের পেছনের ছোট বাড়িগুলোর দিকে গেল যেখানে রাশিয়ানরা ফাঁদে পড়েছে। দলটা দেয়ালে হেলান দিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেল যেন ছায়াটাও দেয়ালে লেপ্টে থাকে। তাদের কোন দলনেতা ছিল না। নিজে থেকেই সামনে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা করেছিল।

তখনই একটা ট্যাংক গর্জন করতে করতে অন্ধকার রাস্তায় এল। ব্যারেলটা কালো কুচকুচে। আমরা একটা দেয়ালের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, চেচেন গ্রুপ থেকে একজন লোক ট্যাংকের পেছনে গিয়ে চুপিসারে দাঁড়ালো। ঢিলেঢালা পোশাক পরিহিত লোকটা একটা হাতবোমা ট্যাংকের পেছনে সেট করে ফিরে এল। হেসে বলল, 'তাদের ভাগ্যে এই লেখা ছিল!'

যে চেচেন সংবাদ সংস্থা বিদেশি সংবাদ মাধ্যমগুলোর কাছে খুবই অবহেলিত ছিল তারাও তাদের অবস্থান থেকে লড়াইয়ে এগিয়ে এলো। তাদের মধ্যে একজন নিহত হয়েছিল। ওরা প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের চারপাশের যুদ্ধগুলো ধারণ করত। একটা অভিনব কৌশল বের করেছিল। প্যালেসের ওপরের ফ্লোরে জানালা দিয়ে একটা নাইট ভিশন ক্যামেরা সেট করে রেখে দিত। সেই ক্যামেরায় ধারণকৃত যুদ্ধের ঝাপসা সবুজাভ চিত্র স্থানীয় টিভিতে

BanglaBook.org

প্রচারিত হতো আর তার সাথে দুদায়েভের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেলিম খান ইয়েন্দারবিয়েভের যান্ত্রিক কণ্ঠ ভেসে আসত—আজ চেচেনদের ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে।

রাশিয়ান সাধারণ জনতা কেউ-ই জানত না কী ঘটছে চেচনিয়ায়। পুরো দেশজুড়ে তখন নতুন বছর ১৯৯৫ উদযাপনের সাজ সাজ রব। পুরো পরিবার রান্নাঘরে ভদকা আর রাতে আতশবাজি নিয়ে ব্যস্ত। তারা চেচনিয়া সম্পর্কে ততটুকুই জানত যতোটুকু সরকারি বার্তায় প্রকাশ পেত। কেউ অতি আগ্রহী হলে শুধু এতোটুকু জানত পারত যে, চেচনিয়াতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজ হচ্ছে।

নতুন বছরের ঠিক আগের মধ্যরাতে সংবাদ সংস্থা ইতার-তাস ঘোষণা করল যে, দুদায়েভের প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এই প্রোপাগান্ডার সাথে বাস্তবতার ফারাক আকাশ-পাতাল। আসলে রাশিয়ান সৈন্যদের কেটে টুকরো টুকরো করা হচ্ছিল তখন।

চেচেনদের কৌশল কাকতালীয়ভাবে ১৮৪৫ সালে প্রিন্স ভরন্তসভের আর্মি কর্তৃক শামিলকে ধ্বংসের সাথে মিলে গেল। একই রকমভাবে শত্রুদের ফাঁদে ফেলে শহরের কেন্দ্র থেকে ডানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং অতর্কিতে মর্টার, আরপিজি'র আক্রমণ চলল চারদিক থেকে। রাশিয়ান সৈন্যরা মূলত ফ্রিডম স্কয়ারে চলে গিয়েছিল কিন্তু সেটা যে ফাঁদ তা তারা বুঝল মৃত্যুকূপে পা দেবার পর।

যা ঘটার তাই ঘটল। শহরের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রের পেছনভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। চেচেনরা শত্রুকে সর্বাত্মক সুবিধাজনক জায়গা থেকে গুলি করতে লাগল। ১৮৪৫-এর মতো এবার চেচেনরা কোন ব্রীচবৃক্ষ বেছে নিল না আড়ালের জন্য, বেছে নিল নয়তলা সুউচ্চ ভবন। তরবারি ব্যবহার করল না, করল মেশিনগান।

ট্যাংকের সৈন্যরা মারা পড়ল। পদাতিক বাহিনি এপিসিতে গাদাগাদি করে আশ্রয় নিল। বের হওয়ার সাহসই পেল না। ভেতরে থাকা অবস্থাতেই আরপিজির আঘাতে মারা পড়ল। শীর্ষ কমান্ডাররা সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হলো। নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে নিজেদের সৈন্যরাই মারা পড়ল।

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল এবং প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস সম্পূর্ণরূপে চেচেনদের দখলে এলো। এটা ছিল রাশিয়ান সৈন্যদের জঘন্যতম

BanglaBook.org

পরাজয়। আফগানিস্তানের যুদ্ধের চেয়েও জঘন্য। এক হাজার সৈন্য নিহত ও তিন হাজার সৈন্য আহত হয়েছিল। একজন কর্মকর্তা, যিনি ট্র্যাক রেকর্ড রেখেছিলেন তার কাছ থেকে গোপনভাবে জানা তথ্য এটা। বেসরকারি তথ্যনুযায়ী নিহতের সংখ্যা দুই হাজারের বেশি।

সে রাতে যেসব রাশিয়ান সৈন্যদের চেচেন জেলে পাঠানো হয় তাদের মধ্যে সার্গেই নামে এক বিশ বছরের যুবকও ছিল। যদিও দেখে আরো কম মনে হয় বয়স। যাদের জোরপূর্বক রাশিয়ান সেনাবাহিনিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সার্গেই তাদেরই একজন। শত শত সৈন্য সেদিন মারা পড়েছিল। সে মারা পড়েনি, এ অর্থে সে ভাগ্যবান। আমরা যখন তার খোঁজ পেলাম তখন যুদ্ধের কয়েক মাস পেরিয়ে গেছে। সে আহত অবস্থায় এক শান্ত চেচেন হাসপাতালে শুয়ে ছিল। হয়তো আশা ছিল, ছাড়া পাবে সে, ফিরে যাবে বাড়িতে। যখন কথা বলছিলাম তার সাথে তখনও রাশিয়ান প্লেন সে হাসপাতালে ওপরে তর্জন গর্জন করছিল। সার্গেই ভয়ে কাতরে উঠল।

আমার অবচেতনভাবেই মনে হতে লাগল, সে হয়তো আর বাড়ি ফিরতে পারবে না।

জোরপূর্বক সৈন্যদলে যোগদান করানো অনেক কিশোরের মতোই সার্গেইয়েরও চেচনিয়া সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। সে অস্ত্রধারী সৈন্যদের গাড়ির মেকানিক হিসেবে এখানে এসেছিল।

সামারের ৮১ নম্বর গ্রুপের এক হাজার সৈন্যের অর্ধেকের বেশি নিহত, আহত বা ধরা পড়েছিল। প্রায় সকলেই আঠারো উনিশ বছর বয়সী। যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। জোর করে সৈন্যদলে ভর্তি করানো হয়েছে।

আদিজেই'র রাজধানী মেইকপে অবস্থানরত ১৩১তম ব্রিগেড আপাতদৃষ্টিতে সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল। পুরো ব্রিগেড খুব সহজেই তাদের গন্তব্য রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখল চারপাশ থেকে চেচেনরা ঘিরে ফেলেছে। পুরো চব্বিশ ঘন্টা অবরুদ্ধ ছিল তারা। এক রাশিয়ান রিপোর্ট অনুযায়ী ২৬টা ট্যাংকের মধ্যে ২০টা এবং ১২০টা সাঁজোয়া যানের মধ্যে ১০২টাই ধ্বংস হয়েছিল। বেঁচে যাওয়া সৈনিকেরা শতাধিক মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছিল।

ভ্যালোদা, একজন স্পেশাল প্রফেশনাল সৈন্য বারো ঘন্টা একটানা যুদ্ধ করে মাথায় শার্পনেলের আঘাতে আহত হয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল,

BanglaBook.org

'আমি বুঝেছিলাম, কী ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু আমি শুধু আদেশ মানতে বাধ্য ছিলাম। আমাদের অধিকাংশ সৈন্যই প্রস্তুত ছিল না। আমরা ভাবতেও পারিনি যে তারা কীভাবে আক্রমণ শানাবে, কারণ এটা ভাবার জন্য লোক আছে। এসব ভাবার জন্যই তাদের ইউনিফর্মের কাঁধে এতো বড় বড় তারকা রয়েছে।'

গ্রোজনিতে রাশিয়ানরা এক ঐতিহাসিক পরাজয়ের সম্মুখীন হলো। হয়তো বস্তুগত ও জানমালের দিক থেকে এটা অতো বড় কোনো ক্ষতি নয় তবে এই পরাজয় সৈনিক থেকে জেনারেল— সকলের নেতৃত্ব আর প্রশিক্ষণের দুর্বলতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। অধিকাংশ সৈনিকই গ্রাচেভকে দুষছে। কারণ সে আফগান যুদ্ধে অভিজ্ঞ, তার জানার কথা ছিল কী ঘটতে পারে। পদাতিক বাহিনির ব্যাকআপ ছাড়া শুধু ট্যাংক আর এপিসি নির্জন রাস্তায় ছোটালে চেচেনদের স্নাইপারস ও আরপিজিধারীদের হাতে মারা পড়তে পারে এটা তার বোঝা উচিত ছিল।

ট্যাংকগুলো কিছুই দেখতে পারেনি। এগুলো মাঠে ভালো সক্রিয় হলেও শহরে তারা কার্যত অন্ধ। ট্যাংকগুলোকে ব্যাকআপ দেয়ার জন্য পদাতিক বাহিনির দরকার ছিল। গ্রাচেভ জানত এই অবিন্যস্ত সৈন্যদল সম্পর্কে। এরা সবে সোভিয়েত যুদ্ধফেরত ক্লান্ত সৈন্য। এদের না আছে সার্জেন্ট, না আছে জুনিয়র অফিসার। ছোট ছোট সৈন্য দল পরিচালনার যোগ্যতাও নেই, স্ট্রিট ফাইটিং-এর দক্ষতাও নেই। তা সত্ত্বেও গ্রাচেভ এ যুদ্ধযাত্রা পরিচালনা করল। প্রথম দিকে বেসামরিক লোক মেরে সে যে বর্বরতা প্রদর্শন করেছিল যুদ্ধের এ অবস্থায় নিজের আনাড়ি সৈন্যদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে একই অমানবিকতার পরিচয় দিল। এ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে 'সংখ্যাই শক্তি' এ ভ্রমের অবসান ঘটল। অফিসিয়ালি তাদের সৈন্য ছিল সতেরো লক্ষ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল বারো লক্ষ। এর মধ্যে যুদ্ধপোযোগী ইউনিট ছিল হাতে গোনা। এমনকি প্যারাট্রুপার আর ট্যাংক ক্রু'র শক্তিও ছিল নড়বড়ে। অনেকেই ছিল বাধ্যতামূলক সৈন্য। এদের একত্রিত করে কোন রকম ট্রেনিং দিয়েই চেচনিয়াতে পাঠানো হলো এমন অবস্থায় যে একজন আরেকজনের নামটাও জানত না।

এরকম বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল নিয়মিত সৈন্যদলের হাই কমান্ডেও। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় ও কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস-এর মধ্যকার সমন্বয় পুরোপুরি ভেঙে পড়ল চেচেন আক্রমণ শুরু হতেই। সংখ্যাধিক্যের অহংকার চুরমার হয়ে যায় রাশিয়ানদের।

BanglaBook.org

আরেকটা মৌলিক ভুল, গ্রোজনিতে রাশিয়ান আক্রমণ শুরু হয়েছিল যথেষ্ট পরিমান শক্তি পৌঁছানোর আগেই। বিশ্লেষণ বলছে, প্রাথমিক আক্রমণে ২৪,০০০ সৈন্য, ৮০টি ট্যাংক, ২০০ এপিসি ছিল। পরবর্তীতে আরো শক্তি যোগ হলে মোট হিসাবটা দাঁড়ায় ৩৮,০০০ সৈন্য, ২৩০ ট্যাংক এবং ৪৫০ এপিসি। তার ওপর প্রধান ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরেট বা গ্রু (GRU)- কে ব্যবহার করা হয়নি যা ছিল এই যুদ্ধের আরেক বড় দুর্বলতা।

গ্রাচেভ এছাড়া কী-ই বা করতে পারত? সে যদি আসল অবস্থা অধীনস্ত জেনারেলদের সাথে শেয়ার করত, তারাই আক্রমণ চালাতে বেঁকে বসত। কিন্তু গ্রাচেভ স্বার্থপরের মতো কাজ করল। এই সৈন্য নিয়ে সে কিছু করতে পারবে না জেনেও স্রোতে গা ভাসালো। সে জানত, তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে ইয়েলসিন এবং সরকার, যুদ্ধ নয়। তাই সে তার সৈন্যদের জীবন, বেসামরিক লোকদের জীবন, সংবিধান কোন কিছুরই পরোয়া করল না।
গ্রাচেভ ছিল কৈফিয়তের ঊর্ধ্বে। সৈন্যদের মধ্যে যারা ভিন্নমত পোষণ করেছিল তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছিল অথবা এক পাশে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। গ্রাচেভ বাধ্যতামূলক সৈন্যদলকে বলেছিল, 'তাদের হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে।'

বিখ্যাত মানবাধিকারকর্মী সার্গেই কোভালেভ যখন এর বিরুদ্ধাচারণ করলেন তখন তাকে দেশদ্রোহী, রাশিয়ার শত্রু বলে আখ্যা দেয়া হলো।

হামলার দুই সপ্তাহ পর প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী জেনারেল জর্জ কোনদ্রায়েভ যা বললেন তা চেচেনরা আগে থেকে জানলেও ক্রেমলিন, গ্রাচেভ আর রুশ পার্লামেন্ট তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল। তিনি বলেছিলেন, 'যারা যুদ্ধ করছে তারা কেবল দস্যুই নয় বরং এদের মধ্যে সাধারণ জনগণও রয়েছে যারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে তাদের দেশ, মাতৃভূমি এবং পূর্ব পুরুষের সম্মান রক্ষার জন্য।

গ্রোজনি

২ জানুয়ারি, ১৯৯৫। এই যুদ্ধে কারা জয়লাভ করবে তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। সবুজ-লাল-সাদা বর্ণের পতাকাগুলো প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস এবং রাস্তায় পতপত করে উড়ছে। বিস্ফোরণের কালো আস্তর পড়েছে ছিন্নভিন্ন ট্যাংক, এপিসি আর মৃত সৈন্যের দেহের ওপর।

BanglaBook.org

হঠাৎ করেই অটোমেটিক রাইফেলের গোলাগুলি শুরু হতে আমি সুনঝা নদীর কিনারায় একটা দেয়ালের পাশে নিচু হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখনই দেখলাম দুই মিটার দূরে একজন রাশিয়ানের মৃতদেহ। লোকটা তরুণ, উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পা-গুলো ভাঁজ হয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে শেষ মুহূর্তে লোকটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কোন দিকে দৌড়াবে। চোখ দুটো অক্ষিকোটর থেকে অর্ধেক ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। সাদা চোখের মনি বার রুমের পুল বলের মতো। যদিও খণ্ডিত দেহ তবু তার কোমল হাত, হলদেটে চামড়া আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ইউনিফর্ম দেখে ঠিক বুঝে নেওয়া যায় ছেলেটাকে জোর করে সেনাবাহিনিতে ঢোকানো হয়েছিল। মৃত্যুও তার মুখের সারল্য ও ছেলেমানুষি কেড়ে নিতে পারেনি। আমি চমকে উঠি এই ভেবে যে এর মতো কতোজনকে আজ মরতে হবে।

এক দৌড়ে ফ্রিডম স্কয়ার থেকে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসে ঢুকলাম। ভেতরে অপরিপাটি ক্লান্ত চেচেন ফাইটারদের কেউ বিশ্রাম নিচ্ছে, কেউ ধূমপান করছে, কেউ অস্ত্র পরিষ্কার করছে। কেউ কেউ খুব দ্রুত রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে বয়াম থেকে টমেটোর চাটনি নিয়ে। কেউ বা আবার তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে, অন্যরা চুপচাপ।

চেচেন চিফ-অফ-স্টাফ, জেনারেল আসলান মাসখাদোভ বিরক্তি নিয়ে বসে আছে। তার চারপাশে মানচিত্র, গোলাবারুদের বক্স, এন্টি ট্যাংক রকেটের গাদা। কনুই'র নিচে লাল পাসপোর্টের স্তূপ। এগুলো হয়তো মৃত বা আটককৃত সৈন্যদের।

মাসখাদোভ মিষ্টিভাষী, শান্ত, রূপালি কেশের সবচেয়ে ভদ্র চেচেন কমান্ডার কিন্তু তার চোখ কালো এবং রুক্ষ। চেচেনদের বিজয়ের মহা পরিকল্পনাকারী এই ব্যক্তি সব সময় ফর্মাল থাকতে চেষ্টা করে। চারপাশের পরিস্থিতির ব্যাপারে সদা সজাগ।

'দুদিন আগে যে রুশ বাহিনি গ্রোজনি আক্রমণ করেছিল তারা প্রকৃতপক্ষে আজ পরাজিত। একটা ব্রিগেডের একজন কমান্ডারও মারা গেছে,' সে বজ্রকণ্ঠে শুরু করল। ধীরে ধীরে তার কণ্ঠ নরম হতে লাগল। মাসখাদোভ জানে, কিছুই শেষ হয়নি। সে জানে, প্লেনগুলো আবার ফিরে আসবে। আবার পুড়িয়ে ছারখার করতে চাইবে। ধোঁয়ার নগরীতে পরিণত করবে চেচনিয়াকে। হত্যাযজ্ঞের সবে তো শুরু। তবু রক্তগঙ্গা বয়ে যাওয়ার এ মধ্যবর্তী সময়ে, বারুদের গন্ধ ফিরে

BanglaBook.org

আসার আগে নববর্ষের সূচনায় সে শুধু একটি কথাই বলল, 'আমি অভিভূত! এই মানুষগুলোর সাহসে আমি অভিভূত!'

প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস আবার আক্রমণের শিকার হলো ১৯ জানুয়ারি, পূর্বের আক্রমণের এক সপ্তাহ পর। চেচেনবাসী জান্তব আতংকের মুখোমুখি হলো। ট্যাংক, হয়িটজার এবং বোমারু বিমান এগারোতলা প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের ধারে কাছে একের পর এক বোমা ফেলতে লাগল। সবগুলো দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল শহর। বিপরীত দিকের হোটেল পরিণত হলো শবাধারে। পার্লামেন্ট ভস্মীভূত হতে থাকল। প্যালেসের চারপাশের কয়েক একর জায়গার ভবনগুলো হয়তো ধসে গেছে বা আগুনে পুড়েছে। যদিও প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস তখনও অক্ষত দাঁড়িয়ে ছিল পেছনে টন টন কংক্রিটের স্তূপ আর সামনে বড় বড় গর্ত নিয়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার, চারপাশে রাশিয়ান সৈন্য দিয়ে ঘেরাও অবস্থাতেও প্যালেস রক্ষাকারী বাহিনি গভীর বাঙ্কার থেকে অনবরত গুলি করতে থাকে শত্রু লক্ষ্য করে।

অবশেষে রাশিয়ান বিমান বাহিনি তাদের অযোগ্যতার কলঙ্ক মোচনের একটা সুযোগ পেল। সাফল্যের সাথে দুটো বোমা ফেলল; যেটা প্যালেসের এগারোটা ফ্লোরের প্রতিটাতেই কিছু না কিছু ক্ষতি করল এবং ভূপাতিত হবার আগে বাংকারেও আঘাত করল।

সে রাতে বেঁচে থাকা চেচেনরা হামাগুঁড়ি দিয়ে অতি কষ্টে হিমশীতল সুনঝা নদী পার হয়ে দূরবর্তী তীরে নতুন অবস্থান নিল।

পরদিন রাশিয়ান বাহিনি ধ্বংসাবশেষের ওপর আবার হামলা চালালো এবং লাল-সাদা-নীল রঙা ফেডারেল পতাকা ওড়ালো। রাশিয়ান সরকার ঘোষণা দিল, প্যালেস অধিকার করার অর্থ জোখার দুদায়েভ এবং বোয়েভিকদের পরাজয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন বললেন, 'সাংবিধানিক পুনরুদ্ধারের সামরিক তৎপরতা সফলভাবে শেষ হয়েছে।'

দৈনিক পত্রিকা 'সেভনিয়া'র কলামিস্ট পাভেল ফেলজেনহর-যে নিয়মিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবস্থান তুলে ধরত-সে এটাকে 'প্রায় বিজয়' উল্লেখ করে বলে, 'প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসে চেচেনদের মরিয়া প্রতিরোধ দেখে এটা প্রতীয়মান হয় যে, তারা নিজেরাও বুঝেছিল খেলা প্রায় শেষ।'

সুনঝা নদীর তীরে তখনো খেলা শেষ হয়নি। চেচেন যোদ্ধারা আবার

BanglaBook.org

একত্রিত হলো। তারা সেলারে থাকত আর অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের জানালা দিয়ে যুদ্ধটা চালিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে আটকা পড়া সাধারণ মানুষেরা নিয়তিকে মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দিয়েছে ততদিনে। যুদ্ধটা ছয় সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলেছিল। এ সময়টায় যোদ্ধারা দুদায়েভের জন্য যুদ্ধ করেনি বরং তারা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেছে। রাশিয়ানদের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজি বাহিনির বিরুদ্ধে জয়লাভ একটি গর্বের স্মৃতি হলেও এবার যুদ্ধের কৌশলে বড় ভুল ছিল—নিউ ইয়ার ইভের সময় সৈন্য সরিয়ে নেয়া।

গত সপ্তাহের যুদ্ধটা বেশ মরিয়া যুদ্ধ ছিল। কয়েক সেকেন্ড পর পর প্রায় এক ঘন্টা যাবত বোমা বর্ষিত হচ্ছিল। হিসেব করলে প্রায় তিন থেকে চার হাজার বোমা, যা যেকোনো সময় মিত্র অঞ্চলেও আঘাত হানতে পারত, শেষ করে দিতে পারত সকল বিলাসিতার মোহকে। হয়তো আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, কথা বলছেন বা সিগারেট টানছেন, পরমুহূর্তেই বোমার শব্দে ভয়ে লাফিয়ে উঠে হামাগুঁড়ি দিয়ে সেলারের আশ্রয়ে যেতে চেষ্টা করবেন বা মাটিতে শুয়ে পড়ে নুড়ি পাথরের মধ্যে লুকোতে চেষ্টা করবেন।

এদিকে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, দক্ষিণ দিক দিয়ে শহর থেকে বের হওয়ার পথ তখনও চেচেনদের দখলে। পালানো কিংবা সাপ্লাইয়ের জন্য এই রুটটা ব্যবহার করার সুযোগ তাদের আছে কিন্তু আর্টিলারি বাহিনি আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল দিনে দিনে।

'সেন্ট্রাল প্রসপেক্ট লেনিনা'-যেখানে একসময় ধনীর দুলালরা বিএমডব্লিউ নিয়ে একবার হলেও ঢুঁ মারত-তার সেলারে বসে একজন চেচেন গেরিলা কমান্ডার তাদের গ্রুপের সকল আরপিজি পরিষ্কার করছিল।

প্রায় বিশজন সদস্য অন্ধকারে ম্যাট্রেসে শুয়ে আছে। একটা ভাঙা পোড়া গ্যাস পাইপ থেকে কমলা আলোর শেষ আভাটুকু বের হচ্ছে। এর তাপে সবাই উষ্ণ হচ্ছে। পাশে কিছু রুটির টুকরা, আচার, সবজি। লোকটাকে ক্লান্ত, মলিন লাগছিল। আরপিজির বাইরে গোটা দশেক রাইফেল শুধু আছে তাদের।

কমান্ডারের বয়স আটাশ, দলের এক সদস্য তাকে আমাদের 'লিজেন্ডারি লিডার ডাম্বুলা' বলে সম্বোধন করে। সে পুলিশে ছিল। পরনে হাওয়াই শার্ট, নিচে ট্রাকস্যুট আর গলায় মাদুলি।

'এটা আমাকে গুলি, স্প্রিন্টার, ট্যাংক, এপিসি থেকে বাঁচায়। গ্রামে থাকা আমার প্রিয়তমা এটা আমাকে দিয়েছে। কুরআন থেকে নেয়া দোয়া লেখা আছে

BanglaBook.org

এটায়,' সে বলে।

সেলারে থাকা মধ্যবয়সী আরেকজন বললেন, 'আমরা আমাদের জন্মভুমিকে রক্ষার প্রচেষ্টায় আছি। তাদের প্লেন, হেলিকপ্টার, রকেট, মর্টার-সব আছে, আমাদের কিছুই নেই। আমাদের মাঝে জয়ের চেতনা আছে, আমরা দুদায়েভের জন্য লড়ছি না, রাজনীতি নিয়েও খুব আগ্রহী নই। আমরা শুধুই দেশের জন্য লড়ছি। আমরা জানি ১৯৯৪ সালে এবং নবম শতকে কী ঘটেছিল। সব ইতিহাসই বলে, এখানে রুশদের কোন স্থান নেই।'

যদিও ফেব্রুয়ারিতেও এ সমস্ত ছোট গ্রুপগুলো পুরো দক্ষিণ গ্রোজনি জুড়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল কিন্তু আসল বাস্তবতা হলো, দক্ষিণ গ্রোজনি 'নো-ম্যান'স ল্যান্ড'-এর চাইতে খুব উন্নত কিছু ছিল না। মাত্র একটা চেচেন ট্যাংক মোটামুটি কার্যক্ষম ছিল। সেই ট্যাংকও কোনোমতে গুলি চালিয়েই লেজ তুলে ভাগত! রাস্তায় চলাচল করাটা ছিল প্রাণ বাজি রেখে চলার মতো। যোদ্ধারা বোমার আঘাত এড়িয়ে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করত। এমন প্রায় না থাকা রেডিও সিগন্যালে যোগাযোগ হয়ে পড়েছিল, খুবই দুরূহ। আমাকে এক তরুণ স্বেচ্ছাসেবক লিচি বলেছিল, 'আমরা যুদ্ধ করছি ঠিকই কিন্তু আমাদের মধ্যে শৃঙখলা নেই। দলে কোনো দলনেতাও প্রায় সময়ই থাকে না।'

অবশ্য পরিস্থিতি যতোই খারাপ হোক, আপনি তাদের মধ্যে অদ্ভুত এক পাগলামি দেখতে পাবেন। চেচেনরা বিজয়ের পতাকা ওড়াতে পারেনি বটে কিন্তু হারার কথা মাথায়ই আনতে পারত না তারা। ডাম্বুলাও এমনই একজন।

'আমরা শুধু জয়ের কথা ভাবি না, আমরা জানি, আমরাই জিতব।' বলেছিল সে। তার সাথে দেখা হবার পর চেচেনরা একমাসের মতো টিকেছিল গ্রোজনিতে। এরপর আর তার খবর পাইনি। জানি না, বেঁচে আছে কিনা।

সে সময় গ্রোজনির বাইরে আমি একজন বৃদ্ধ লোককে খুঁজে পেয়েছিলাম। রাস্তার পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তিনি আর তার স্ত্রী। দুটো বস্তায় সব জিনিস ভরে শহর ছাড়ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?'

জবাবে বৃদ্ধা দক্ষিণ পর্বতের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'ওখানে।'

'এটা কোন যুদ্ধ নয়,' এবার বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'এটা মর্টার বোমা দিয়ে গণহত্যা, শহর ধ্বংস। আমাদের শহরতলিতে পনেরো হাজার লোক ছিল আর আমি যখন ঘর ছাড়ি তখন মাত্র একশ। এক জায়গায় হামলা হলে অন্য জায়গায় পালিয়ে যেতে হয়। তবে আমি অল্প দিনের জন্য বাড়ি ছেড়েছি। আবার ফেরত

BanglaBook.org

যাব। কাল থেকে রমাদান। তাই বাড়ি ঘর পরিষ্কার করতে হবে যেন অন্তত ভালোভাবে মরতে পারি।'

বৃদ্ধ তোতলাতে তোতলাতে বললেন, 'এটা মঙ্গোলিয়ানদের কৌশল। আমি বুঝি না, ওরা কী করছে। আমাদের যোদ্ধারাই বা কী করছে? দু'পক্ষেরই থামা উচিত।' একটু থেমে ফের বললেন, 'আমার পাহাড়ে জন্ম। যখন আমার বয়স নয়, তখন আমাদের কাজাখিস্তানে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ফিরে আসার পর থেকে আমি গ্রোজনিতেই থাকি। তারা আবার আমাদের নির্বাসনে পাঠানোর বন্দোবস্ত করছে কিনা কে জানে! তারা বলে, পুরুষ মানুষের নাকি কাঁদতে নেই,' বলে চোখ মুছলেন বৃদ্ধ।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে রাশিয়ান ট্যাংক দক্ষিণাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকল শেষ পথটাকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। শামিল বাসায়েভের সৈন্য ছিল অধিকাংশই বোয়েভিক, তারা ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেল। অবশেষে ৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে পতন হলো গ্রোজনির।

ফেব্রুয়ারির শেষে রাশিয়ার অফিসিয়াল তথ্যসূত্র জানাল, ৭০০০ বোয়েভিক চেচেন মারা পড়েছে। পক্ষান্তরে রাশিয়ান সৈন্য মারা গেছে ১১৪৬ জন। ৫০০০ রাশিয়ান আহত এবং প্রায় ৪০০ নিখোঁজ; হয়তো তাদের বন্দি করা হয়েছে। বোয়েভিকদের মৃতের সংখ্যা সন্দেহাতীতভাবে অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে। কেননা প্রথম সারির এতোজন সৈন্যই বোয়েভিকদের মধ্যে নেই।

একজন সিক্রেট এজেন্ট নাম প্রকাশ না করার শর্তে আমাকে জানিয়েছে, রাশিয়ানদের ক্ষয়ক্ষতি বাস্তবে অনেক বেশি। মৃতের সংখ্যা চার হাজার। মৃতের পরিবারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যের ওপর বিশ্বাস নেই। বহু রাশিয়ান মহিলা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপন ছেলেকে খুঁজতে পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছিল চেচেন জুড়ে। অনেকে আবার মর্গ কিংবা রাশিয়ান ক্যাম্প মোযদোক-এ ফ্রিজার ট্রেনের বগি তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরেছে স্বজনের খোঁজে। অনেককে আবার ছিন্নভিন্ন লাশের অংশবিশেষ হস্তান্তর করা হয়েছে বস্তায় ভরে। কিন্তু পরে দেখা গেছে তাদের ছেলে বেঁচে আছে, খণ্ডিত দেহাংশ অন্য কারো, বেনামী কোনো সৈন্যের।

বেসামরিক অনেকে আহত নিহত হয়েছে। তবে সঠিক সংখ্যাটা বের করা কঠিন। এই নয় সপ্তাহের যুদ্ধকালীন সময়ে প্রায় ১২,০০০০ লোক ছিল গ্রোজনিতে। বেশিরভাগই রাশিয়ান উপজাতি। রাশিয়ান মানবাধিকার সংস্থা

BanglaBook.org

চারশজন শরণার্থীর মাঝে জরিপ চালিয়ে প্রকাশ করে, গ্রোজনিতে সাধারণ জনগণের হতাহতের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০। সংখ্যাটা অনেক বেশি মনে হয় তবে সঠিক সংখ্যাটা হয়তো কখনোই জানা যাবে না।

যদিও বলা হচ্ছিল যুদ্ধ শেষ কিন্তু চেচনিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ অব্যহত ছিল। তথাপি প্রায় ৮০০০০ রুশ সৈন্যকে একবারে প্রত্যাহার করা হয়। এমনকি যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল গ্রোজনিতেও প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিনের এমন কোন বিজয় নেই। তার 'সংবিধান পুনরুদ্ধার' গ্রোজনিকে বানিয়েছে ভাগাড়। চারিদিকে ইট-সুরকি। ক্ষুধার্ত কুকুর মানবদেহ খোঁজে ক্ষুধা মেটাতে। কতো শত দেহ ঠান্ডায় জমে রাস্তায় পড়ে আছে। রুগ্ন ভগ্ন প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের দেয়ালে গ্রোজনি দখলের পর বেশ খানিকটা সময় পেরিয়ে গেলেও বিদ্রোহীদের সবুজ পতাকা সাঁটা ছিল। এক বছর পরও যুদ্ধের শেষ হয়নি। ক্রুদ্ধ রাশিয়ানরা বিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসকে ভূপাতিত করে। ইট-সুরকির পাহাড় জমে, তবু মানুষ একে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস বলে ডাকে।

মস্কো

প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন দুটো অনুষ্ঠানে বোমা হামলা বন্ধের ঘোষণা দিলেও বোমা হামলা সত্যিকার অর্থে বন্ধ হয় না। ১৯৯৫ সালের ৫ জানুয়ারি সাবেক সোভিয়েত বিদ্রোহী এবং বর্তমানের আলোচিত মানবাধিকার কর্মী সার্গেই কোভালেভ গ্রোজনিতে তিন সপ্তাহ থাকার পর মস্কোতে ফিরে এসে চশমার নিচে নাক উঁচিয়ে বলেন, 'কে মিথ্যা বলছে? আমি প্রেসিডেন্টের কাছে শুধু একটা প্রশ্নই করতে চাই, সে কি ভুলে গেছে জনগণের সামনে সে কী ঘোষণা দিয়েছিল? সে কি দেখে না, সে যা বলেছিল তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না? এতো নির্লজ্জ মিথ্যা কি আগে কখনো সে বলেছে? বোকাও কি এ মিথ্যাচার আর বিশ্বাস করবে? এর চেয়ে তো নাজি বাহিনির প্রোপাগান্ডাও অধিক বিশ্বাসযোগ্য ছিল।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় দুই
মেশিন বনাম মানুষ

'তুমি কোন মানুষকে যুদ্ধ করতে দেখছো না, সবাই মেশিন।'

চেচেন যোদ্ধারা শালি শহরও ছাড়তে বাধ্য হলো। শালিতেই বিমান হামলা সবার শেষে ঘটে। গ্রোজনিতে গেরিলা বাহিনি অন্তত যুদ্ধ করতে পারত। সেলার ছিল, ঘুমানো-খাওয়া-লুকানোর জায়গা ছিল, ওঁত পেতে থাকার সুযোগ ছিল, বিশজনের একটা ইউনিট রাশিয়ান একটা ট্যাংককে ঠেকিয়ে দিতে পারত কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে এর কিছুই নেই। ফলে চেচেনদের পিছু হটতে হলো।

সমতলটা ছিল হল্যান্ড-ফ্লাট এর মতো এবং বৃক্ষশূন্য। গ্রোজনির পরে এখানেই বেশি মানুষের বাস। গ্রামীন বাজারকেন্দ্রিক শহর 'উরুস মার্টান' ও 'শালি', উন্নয়নশীল গ্রাম 'জার্মানচাক' আর দুটো শহুরে এলাকা 'আরগুন' ও 'গুডারমেস' নিয়েই এই এলাকা। দক্ষিণেই ককেশাশের প্রকৃত গেরিলাদের অভয়ারণ্য। এর জঙ্গলে ভরা পাদদেশ সমতল থেকে খাড়া হয়ে উঠে গেছে। কয়েক ডজন লোক উপত্যকায় ঘরও বেঁধেছে। আরো ওপরে পাহাড়ি ঢাল, যেখানে খুবই কম জনবসতি আর বারো মাসই তুষারে ঢাকা থাকে।

যখন চেচেনরা গ্রোজনি ছাড়তে বাধ্য হলো তখনও জেনারেল মাসখাদোভ একগুঁয়ে কঠোর অবস্থানে ছিল। পিছু হটে পর্বতে আশ্রয় নেয়ার বিপক্ষে সে। তার ছিল 'বিনাযুদ্ধে নাহি দেবো সূচাগ্র মেদিনী' মনোভাব; সমতল ভূমি রুশদের যুদ্ধ করেই জিতে নিতে হবে। মাসখাদোভের কাছে এটা ছিল সম্মানের ব্যাপার। আসলে কারা সঠিক? ক্রেমলিন-যারা চেচেনদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য করেছে, নাকি চেচেনরা- যারা একটা বৈধ স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য লড়ছে?

মাসখাদোভ শালিতে অবস্থানকালে একদিন আমাকে বলল, 'রাশিয়ানরা

গুডারমেস দখল করবে তারপর শালি। এরপর তারা আমাদেরকে পাহাড়ের দিকে ঠেলে দিয়ে ঘোষণা করবে যে, তারা বিজয়ী এবং আমাদেরকে 'পর্বতবাসী দস্যু' বলে আখ্যা দেয়া হবে। আমি তাদেরকে দেখাতে চাই, আমরা প্রকৃত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সৈন্যদলের বিপরীতে সৈন্যদল, অবস্থানের বিপরীতে অবস্থান।' এ এক অদ্ভুত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তার চোখে দক্ষ, প্রশিক্ষিত অস্ত্রসজ্জিত দলের বিপক্ষে কয়েক হাজার অদক্ষ ও সেচ্ছাসেবী সৈন্য নিয়ে জয়ের স্বপ্ন।

আরপিজি আর রাইফেল শহরের জন্য ভয়ানক অস্ত্র হলেও সমতলভূমির জন্য নয়। এখানে ভারি অস্ত্র বেশি কার্যকর। রাত্রিকালীন যুদ্ধের সময় আকাশটা রঙের খেলা দেখায়। চেচেনরা গ্রেড আর রকেট চালাচ্ছে। একেকবারে ডজনখানেক রকেট উজ্জ্বল হলুদ আলো ছড়িয়ে বিস্ফোরিত হয় রাশিয়ান লাইনে। প্রত্যুত্তরে রাশিয়ানরা গুলির তুবড়ি ছোটায়। আবার কখনও সাইলেন্সার লাগানো অস্ত্র দিয়ে গুলি ছোঁড়ে ওরা। তখন মাজল ফ্ল্যাশ আর ট্রেসার বুলেটের লাল-হলুদ আলো সমতলে বর্ণের ছটা দেখায়। এটাই বুঝি যুদ্ধের সৌন্দর্য!

হেলিকপ্টার গানশিপগুলো দ্রুতগামী এবং বেশ নিচ দিয়ে ওড়ে। আপনি হঠাৎ করেই ওদের দেখতে পাবেন গাছের মাথা কিংবা ছাদের ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে ছুটে যেতে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ওগুলোর মুখোমুখি যেন আপনাকে না হতে হয়।

যোদ্ধারা পরিখা খনন করে কিন্তু স্পটার প্লেনগুলো ছবি তুলে তাদের অবস্থান লোকেট করে এবং সেখানে আর্টিলারি ফায়ার চলে। যদি আর্টিলারি যথেষ্ট না হয় তবে প্লেন থেকে বোমা ফেলা হয় শত্রু নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত। টার্গেট এমনভাবে দৃশ্যমান হয় যেন একটুকরো কাগজে আঁকা ছবি।

বিমান হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে চেচেনদের সঙ্গী ছিল কুয়াশা, শীতকালের নিচু মেঘ আর কিছু সংখ্যক ম্যানুয়াল এন্টি এয়ারক্রাফট গান। বিশাল এসব মেশিনগান এক্সপ্লোসিভ বুলেট ছুঁড়ত। সমতলযুদ্ধে চেচেনদের লুকানোর জায়গা ছিল গ্রামে বা শহরের আশেপাশে। কিন্তু রাশিয়ানদের কাছে গ্রাম ঘিরে ফেলা ঘন্টাখানেকের ব্যাপার। অস্ত্রসহ সাঁজোয়া যান নিয়ে একবার পুরো গ্রাম ঘিরে ফেললে বোয়েভিকদের কারণে বেসামরিক মানুষের ওপরও নেমে আসে বর্বোরোচিত গোলাবর্ষণ।

চেচেনদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি যুদ্ধের কৌশলগত প্রধান দুর্বলতা ছিল পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম থেকে মিত্র

BanglaBook.org

গেরিলাদের সহজে চেচনিয়ায় প্রবেশের সুযোগ করে না দিতে পারা। চেচনিয়ার একমাত্র আন্তর্জাতিক বর্ডার ছিল জর্জিয়ার সাথে কিন্তু সেই বর্ডার আবার ককেশাস পর্বতের কারণে ব্লক। এটা সত্য যে, পূর্বে দাগেস্তান এবং পশ্চিমে ইঙ্গুশেটিয়ায় অনেক সহানুভূতিশীল ছিল। এমনকি তুরস্ক হয়ে আজারবাইজান দিয়ে দাগেস্তান—এরকম একটা রুটও ছিল। কিন্তু এই রুট মোটেও অনুকূল ছিল না। কারণ সীমান্ত ছিল রাশিয়ান। এজন্য ওখানকার বিদ্রোহী বাহিনির কার্যক্রম লুকিয়ে করতে হতো। রাশিয়ার জন্য এমন কোন সমস্যা নেই। বোমারু বিমানগুলো বেজ থেকে মিনিটের মধ্যে দক্ষিণ রাশিয়ায় উড়াল দিতে পারত আর হেলিকপ্টার বেজ তো খোদ গ্রোজনিতেই ছিল। সৈন্যদলকে সড়ক বা রেল পথে উদ্দিষ্ট স্থানে পাঠানো ছিল খুবই সহজ।

এমন একটা সময়ে আমি ভেবেছিলাম মাসখাদোভ আসলেই উন্মাদ। সে চাইত বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর সেনাবাহিনির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করতে। প্রতি সপ্তাহে তারা এমনভাবে পিছু হটছে যে তাদের পর্বতে পালানোটা সময়ের ব্যাপার মনে হতে থাকল।

মাসখাদোভ মেইন স্কয়ারে গোল হয়ে বসে শালির কমান্ডারদের সাথে শলাপরামর্শ করছিল। একজন ধুলার মধ্যে একটি মানচিত্র আঁকল। এমন সময় আচমকা হেলিকপ্টার গানশিপের আওয়াজ শোনা গেল। একজন চেচেন জানালা দিয়ে মেশিনগান চালালো। আর্টিলারি বোমাবর্ষণ ভীষণ আকারে শুরু হলে মাসখাদোভসহ আমরা লুকিয়ে নিরাপদ স্থানে যেতে চেষ্টা করলাম।

যোখার দুদায়েভের সরকার শুরু থেকেই বাগাড়ম্বরপূর্ণ দাবি করে আসছে যে রাশিয়া এবং চেচনিয়া সমানে সমান। কিন্তু তা সত্যি নয়। শান্তি-আলোচনা দুটো দেশের মধ্যে হতে পারে কিন্তু রাশিয়া আর চেচনিয়ার মতো একটা ভঙ্গুর প্রদেশের মধ্যে নয়। এদিকে রাশিয়ার দাবি তারা চেচেন দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এখন মাসখাদোভের উচিত ছিল যেকোনো মূল্যে এই যুদ্ধ বন্ধ করে এটা প্রমাণ করা যে, যুদ্ধটা আসলে রাশিয়া চেচেন সেনাবাহিনির বিরুদ্ধে করছে, কোনো দস্যুবাহিনির বিরুদ্ধে নয়।

শোৎসিন ইয়ার্ট

সাঈদ মাথা নিচু করে বাতাসের সাথে সাথে দৌড়ায় শোৎসিন ইয়ার্ট গ্রামের বাইরে। তারপর উঁচু নিচু ফাঁকা জায়গা দিয়ে একটা মাটির টিলার ওপর উঠতে

Banglabook.org

লাগল। সে টিলার গা বেয়ে ক্রল করে উঠতে উঠতে আমাকে অনুসরণ করতে বলল। ওঠার পর আমার হাতে বাইনোকুলার দেয়। রাশিয়ান ট্যাংকগুলো কয়েকশ মিটার লম্বা একটা সমতল মাঠ ধরে এগোচ্ছে। ট্যাংকের লম্বা ব্যারেল আমাদের পেছনের গ্রামের দিকে তাক করা।

'আমি যুদ্ধ করতে চাই না। আমার ইচ্ছা দুদায়েভ আর ইয়েলসিনকে একটা রিং-এর মধ্যে ছেড়ে দিই। তারা নিজেরা মারামারি করুক। আমি আমার জন্মভূমি রক্ষা করছি। গ্রোজনি হারিয়েছি, আরগুন হারিয়েছি, শালিও হয়তো হাতছাড়া হয়ে যাবে আল্লাহ সহায় না হলে। শোৎসিন ইয়ার্ট গ্রামটাও হয়তো যাবে। এমন পরিস্থিতিতে আপনি আশা করবেন না আমি অস্ত্র ফেলে দেবো। নেগোসিয়েশনের সময় আমি ওই মাঠে রাশিয়ান অফিসারদের সাথে কথা বলেছিলাম। তারাও তো মানুষ, তারাও যুদ্ধ চায় না, বাড়ি ফিরতে চায়। কেউই যুদ্ধ চায় না।

আমাদের পরিখা আছে কিন্তু তাদের রকেট হামলার সামনে এটা কিছুই না। তারা চাইলেই যেকোনো সময় রকেট হামলা করতে পারে। তাদের সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আছে। গ্রোজনিকে ছাড়েনি, আমাদেরকেও ছাড়বে না। তারা চাইলে দূর থেকেই আমাদের ওপর গুলি করতে পারে। এদিকে আমরা জবাব দিলেই আমাদের মরতে হবে।'

সমতলের যুদ্ধটা চিনিয়ে দিয়েছে কে প্রকৃত যোদ্ধা আর কে গ্রোজনির যুদ্ধের সময় উষ্ণ রক্তের আহবানে মাথা গরম করে আসা অস্থায়ী সৈনিক।

ফেব্রুয়ারি-মার্চের দিকে বাস-ট্রাকে করে পলায়নরত মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগল। শার্পনেলের আঘাতে জর্জরিত বাস-ট্রাকগুলোর মধ্যে বসে থাকা মানুষগুলোর মাঝে উন্মত্ত ভাব ছিল। বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হবার শংকা গ্রামেও ক্রমেই বাড়ছিল। অবশেষে তারা বোয়েভিকদের নিষিদ্ধের মাধ্যমে নিজেদেরকে নিরপেক্ষ ঘোষণা করল।

উরুস মার্টানের নেতাদের শুরু থেকেই দুদায়েভের বিরোধিতা করার ইতিহাস রয়েছে। তারা সব সময় যুদ্ধের বিপক্ষে। নিজেদের এলাকাকে যুদ্ধের ক্ষতি থেকে দূরে রাখতে চায়। নেতাদের এমন নিরাপদ মনোভাবের কারণেই এখানে মানুষ বেড়ে পঞ্চাশ হাজার হয়েছিল। গ্রামের প্রবীণ লোকেরা কখনো চেচেন যোদ্ধাদের সাথে, কখনো আবার নিজেরা নিজেরাই নিয়মিত তর্কে লিপ্ত হতো। তারা ভাবতো রাশিয়া সঠিক পথে আছে। সবাই আগে একটা জাতিই

BanglaBook.org

ছিল কিন্তু এখন আলাদা হয়ে গেছে। ওভারকোট আর হ্যাট পরা প্রবীণেরা এবং আলখাল্লা আর কর্দমাক্ত জুতা পরা তরুণ যোদ্ধারা প্রায়ই তর্কে মেতে উঠতো। বোয়েভিকদের কাছে এই গ্রামগুলো বিশ্বাসঘাতকতার মঞ্চ। কিন্তু গ্রামের মানুষ জানত গ্রোজনির ভাগ্যে কী ঘটেছিল। গ্রোজনির তুলনায় তো তাদের গ্রাম তাসের ঘর। আর তারা এটাও জানত যে রাশিয়ানদের থামানো যাবে না। তাই তারা মিনতি করত যেন তাদের গ্রামটাকে অন্তত রণভূমি না বানানো হয়।

অনেক বোয়েভিকই যুদ্ধ ছেড়ে দেয় এ সময়। হয় তারা কোনো আশা খুঁজে পাচ্ছিল না যুদ্ধটা চালিয়ে নেয়ার অথবা শারীরিকভাবে সমর্থ ছিল না। তাছাড়া যোদ্ধাদের অস্ত্র-গোলাবারুদও ফুরিয়ে আসছিল।

ত্রিশোর্ধ্ব খাসান যুদ্ধ ছেড়ে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়, 'আমি আর এ মরণ খেলায় নেই। ওদের প্লেন আছে, বোমা ফেলে, ট্যাংক দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়। আমাদের কী আছে? আজ পর্যন্ত একটা প্লেন অথবা ট্যাংকও তো চোখে দেখলাম না।'

আমি অনেকক্ষণ তার সাথে কথা বলেছিলাম। তার কণ্ঠ দুঃখ বেদনায় ভরা।

'আমরাই বোধহয় গ্রোজনিতে যুদ্ধ করা শেষ গ্রুপ। যখন আমরা পিছু হটলাম তখন সুনঝা নদীর ব্রিজ ব্যবহার করতে পারিনি। সুনঝার বরফগলা পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে পার হতে হয়েছে। আমি দু'বার শার্পনেলের আঘাতে আহত হয়েছি। আমাদের আঠারোজনের মধ্যে তিনজন মারা পড়েছিল। এটা এখন প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। আমি জানি আমি এখন বাইরে গিয়েই একজন রাশিয়ান মেরে ফেলতে পারি। কিন্তু এর নাম তো যুদ্ধ নয়।

আমার ধারণা দুদায়েভ আশা করছে, আমাদের ককেশিয়ান প্রতিবেশীরা আমাদের সাহায্য করতে আসবে। কিন্তু ভুল, তারা কখনই আসবে না, একজনও আসবে না। যুদ্ধের শুরুতেই সব ব্যবসায়ী আর দস্যুরা পালিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে। পেছনে রেখে গেছে আমাদের মতো গরীবদের। গরীবরাই অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।'

কতিপয় দ্বিধাগ্রস্থ যোদ্ধার জন্য নিবেদিতপ্রাণ যোদ্ধাদের আত্মত্যাগকেও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। দক্ষিণের গ্রাম স্ট্যারি-আখোই'তে লাল চুলের এক গেরিলাকে চিনতাম যে প্রথম দিন থেকেই যুদ্ধ করছে এবং শেষদিন পর্যন্ত করবে, রুসলান নাম তার। সবাইকে বলতো হাল না ছাড়তে। এটাই ছিল তার একমাত্র মূলমন্ত্র।

BanglaBook.org

খাসানের মতো সেও জানত, সে রাশিয়ান যোদ্ধাদের ধ্বংস করতে পারবে না।

'আমরা চাইলে অতর্কিত আক্রমণে একটা রাশিয়ান ইউনিট ধ্বংস করতে পারি কিন্তু তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভালো, চাইলে ছয় সেকেন্ডের মধ্যেই তারা হেলিকপ্টার, প্লেন খবর দিতে পারে। প্রথমে তো আর্টিলারি বোমারু বিমানের কথা আমাদের চিন্তাতেই আসেনি। আমরা ভাবতাম এটা হচ্ছে সম্মুখযুদ্ধ। ম্যান টু ম্যান। কিন্তু আমরা কীভাবে জানবো যে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হবে? ভাবতাম যুদ্ধ করতে হবে শহরে, কিন্তু এখন যুদ্ধটা গ্রাম পর্যন্ত চলে এসেছে।' তবে যুদ্ধ একেবারে পরিত্যাগ না করে রুসলান এখন নিজের সাথে নিজেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। 'আমরা এখন শুধু শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাচ্ছি যুদ্ধটা।'

এদের মাঝেই কিছু ছোট ছোট দেহ দেখা যায় হাতে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। এসব বাচ্চারা ছিল যুদ্ধে সব হারানোদের দলে। আর কিছু এদের হারাবার কোন ভয় ছিল না। এমনই এক ছেলে মাগোমেদ। তেরো বছর বয়সী এক এতিম। মার্চের শেষ দিকে তার সাথে দেখা হয়েছিল আমার। মাথায় সবুজ ব্যান্ড লাগিয়ে রেখেছে তার ক্যামোফ্লাজ টুপির সাথে। বুকে ঝুলিয়ে রেখেছে চারটা গ্রেনেড। এখনও গলার স্বরে বয়সন্ধির ভারিক্কি আসেনি এরমধ্যেই রাশিয়ান শত্রু মেরেছে, আরো মারবে হয়তো।

'যুদ্ধের আগে থেকেই আমার বাবা নেই, মা নেই। ছয় চাচা ছিল, দু'জন মারা গেছে যুদ্ধে। আমার আর কিছু অবশিষ্ট নেই তাই যুদ্ধে নেমেছি। আমার অন্য আত্মীয়রা আমাকে দু'বার বাধা দিয়ে ফল না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখানে এসে যোদ্ধাদের একটা গ্রুপের সাথে আমার দেখা হয়। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, আমি বাড়ি যাই না কেন? আমি আমার কাহিনি বলার পর তারা আমাকে একটা রাইফেল দিয়েছে। এখন আমি এর শেষ দেখতে চাই।'

মাগোমেদ দু'বার আহত হয়েছে। একবার স্নাইপার বন্দুকের গুলি তার বাম পা ভেদ করে বেরিয়ে যায় আরেকবার শার্পনেল হালকা করে তার পিঠ ও ডান পায়ে আঘাত করে।।

'আমি অবাক হয়ে ভাবি আমি এখনও কীভাবে বেঁচে আছি,' মাগোমেদ বলে। ওর সাথে কথা বলাটা একটু দুষ্করই। মাত্র তেরো বছর বয়স ওর কিন্তু চোখে বিশ বছর বয়সী তরুণের দৃষ্টি। আমি যখন তাকে রাশিয়ান কালাশনিকভ রাইফেল হাতে দেখি-যেটা প্রায় তার নিজের উচ্চতার সমান-তখন আমার হাসি

BanglaBook.org

পায় এরপর অবাক হই আর তারপরই প্রবল দুঃখবোধ আমাকে পেয়ে বসে।

'আগে আমিও স্বাভাবিক ছিলাম, স্কুলে যেতাম। কিন্তু এখন আমার একটাই স্বপ্ন—রাশিয়ানরা এখান থেকে চলে যাক।' সে বলে।

প্রথম দিন থেকেই রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে বোয়েভিকদের যুদ্ধটা প্রতিশোধের। তারা সবাই তাদের আত্মীয়-স্বজন হারিয়েছে। নির্বিচারে সাধারণ নাগরিকদের হত্যা করা হয়েছে। বিশেষ করে রাশিয়ান এয়ারফোর্সের মাধ্যমে। বোমার আঘাতে কারণে-অকারণে সাধারণ মানুষ মরেছে। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে বোমা ফেলা হয়েছে। বাসা, অ্যাপার্টমেন্ট, রাস্তা, মার্কেট এমনকি খোলা মাঠেও বোমা ফেলেছে ওরা। জানুয়ারির শুরুতে শালিতে এক বিমান হামলায় শতাধিক হতাহতের ঘটনা ঘটে। ওই দিনই সেখানকার একটা হসপিটালেও বিমান হামলা করা হয়।

যেহেতু চেচনিয়া একটা ছোট জায়গা, কেউই যুদ্ধের কথা ভুলতে পারত না। একটা গ্রামে হয়তো বোমা হামলা হয়নি কিন্তু আকাশে প্লেন ও বিস্ফোরণের শব্দ লেগেই থাকত। ধোঁয়ায় ধূসরিত আকাশ খুব কমই পরিষ্কার পাওয়া যেত। হঠাৎ হঠাৎই মেঘ কেটে উদয় হতো প্লেনগুলো। ওগুলোতে চেচেনরা নিজেদের দুর্ভাগ্য দেখতে পেত। মা-বাবারা দ্রুত রাস্তা থেকে বাচ্চাদের ঘরে নিয়ে আসত। এমনকি দুদায়েভের বিপক্ষে থাকা গ্রামগুলোর মানুষও এগুলো দেখে অভিশাপ না দিয়ে পারত না। আমি একটা লোককে দেখেছি যে তার ছেলেকে নিয়ে প্রতিদিন একজনের ছবি পোড়ানোর মাধ্যমে জাদুটোনা করত যেন লোকটা গুলি খেয়ে মরে। ছবিটা রাশিয়ান কমান্ডার পিয়তর ডিয়েনকিনের।

ফেব্রুয়ারির দিকে একটা জেটকে বোয়েভিকরা অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান দিয়ে ভূপাতিত করল। একজন চেচেন যোদ্ধা হেসে বলল, 'এবার ভালো করে ওড়ো!'

সে ভূপাতিত প্লেনের লেজের সামনে ছবি তোলার ভঙ্গিতে পোজ দিল। লেজে রাশিয়ান লাল তারকা খোদাই করা। প্লেনের বাকি ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিল তুষারাচ্ছন্ন মাঠ জুড়ে।

আমি প্লেনের পাইলট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সুলতান নামে একজন যোদ্ধা বলল, 'সে 'ইজেক্ট' করতে চেয়েছিল কিন্তু তার প্যারাসুট ফেল করে। যখন মাটিতে পড়ে তখনও সে জীবিত ছিল কিন্তু তার পা গুঁড়িয়ে গিয়েছিল আর এক হাত ছিল বাহু থেকে ছেঁড়া। একটা কথাই বলতে পেরেছিল সে, "বাড়িতে

BanglaBook.org

আমার একটা ছেলে আছে।"'

'তারপর কী হলো?' আমি জানতে চাইতেই সুলতান নিজের গলায় ছুরি দিয়ে পোঁচ দেয়ার ভঙ্গি করে দাঁত বের করা হাসি দিল।

সাথে সাথেই অন্য একজন যোদ্ধা তড়িঘড়ি করে বলল, 'না, না, ও মজা করছে। আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু তার আগেই সে মারা যায়।' সে আরো বলল, 'এই পাইলটের ফ্লাইট ডকুমেন্ট বলছে, সে গ্রোজনিতে সতেরোটা বিমান হামলা পরিচালনা করেছে। ভাবতে পারো?!'

***

রাশিয়ান চিফ অফ স্টাফ ভলখোভস্কি যখন শুনল চেচেনরা কোয়ার্টার প্রত্যাখ্যান করে তিনটা বাড়িতে নিজেদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে, গোলাগুলিতে তার একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মারা গেছে, বেশ কয়েকজন সৈন্যও আহত করেছে-তখন সে আর্টিলারি কমান্ডার কর্নেল ক্রুমার, সিওভলভোস্কি এবং বগদানভিচ-এই তিনজনকে ব্যাপারটা সমাধান করার নির্দেশ দিল।

একটা লাইট গান দিয়ে বাড়ি তিনটার ছাদ থেকে ফ্লোর পর্যন্ত এক পশলা গুলি ছোঁড়া হলো। দ্বিতীয় রাউন্ড গুলি শেষ হতেই একজন দৌড়ে এসে বলল, 'গুলি ভেদ করে বাড়ির ওপাশে আমাদের নিজেদের লোকেদের গায়েও লাগছে। এদিকে এখন যদি গুলি বন্ধ করে বাড়ির কোনো একপাশ খুলে দেয়া হয় তাহলে শত্রুদেরও পালাবার সম্ভাবনা আছে। তার চেয়ে গোলাগুলি বাদ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হোক।'

ধীরে ধীরে আগুন একটা বাড়ি থেকে তিনটা বাড়িতেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এবার চেচেনদের সামনে আত্মসমর্পণ অথবা পুড়ে মরা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

আগুন খানিক স্তিমিত হলে আটারসকফ এগিয়ে গিয়ে চেচেনদের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেয়। চেচেনরা তার কথা শুনতে পেয়ে কয়েক মিনিট নিজেদের মধ্যে আলাপ সেরে নেয়। এরপর বাড়ির ফোঁকর দিয়ে এক অর্ধনগ্ন ব্যক্তি বেরিয়ে আসে। ধোঁয়ায় সারা দেহ কালো। একটা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করে সে, যার সারকথা হলো: 'আমরা কোয়ার্টার চাই না। রাশিয়ানদের কাছে শুধু একটাই অনুরোধ আমাদের পরিবারকে

BanglaBook.org

যেন জানিয়ে দেয়া হয় আমরা বীরের মতো মরেছি, কোন বিদেশি দাসত্ব মেনে নেইনি।'

চেচেনরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তাদের মৃত্যু সংগীত গাইতে থাকে। প্রথমে উচ্চকিত কণ্ঠে, ধীরে ধীরে তা ম্রিয়মাণ হয়ে আসে ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ হবার কারণে।

জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে ছয়জন দাগেস্তানিকে উদ্ধার করা হয়। তাদের বেঁচে থাকাটা ছিল একটা অলৌকিক ব্যাপার। সৈন্যরা তাদের দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সেদিন একজন চেচেনও বাঁচেনি। বাহাত্তরজন মানুষ অগ্নিশিখায় দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

রাশিয়ান জেনারেল টর্নাও ১৮৩২ সালে জার্মানচাক গ্রামে কী ঘটেছিল তার বর্ণনা দেন এভাবেই।

সামাস্কি চেচনিয়ার পশ্চিমের একটা সমতল গ্রাম। প্রায় চোদ্দ হাজার লোকের বাস। মানুষগুলো সচ্ছল। বাড়িতে নীল-সবুজ রঙা সদর দরজা। ভেতরে বিস্তৃত জায়গা, পশুর খামার, আঙ্গুরের বাগান, সবজি ক্ষেত। গ্রোজনি যদি হয় আধুনিককালের গুয়ের্নিকা, তাহলে সামাস্কি চেচনিয়ার মাইলাই। অখ্যাত এই গ্রাম হঠাৎ করেই যুদ্ধবিধস্ত এক জনপদে পরিণত হয়। যারা বহু আগে এই গ্রাম ছেড়েছে তারা এখন এলে চিনতেই পারবে না।

এসবের শুরু জানুয়ারির শেষ দিকে। যখন যুদ্ধটা গোটা চেচনিয়াতেই ছড়িয়ে পড়ছিল। যোদ্ধারা গ্রোজনি থেকে পিছু হটে নিজ নিজ গ্রামে এসে অবস্থান নিচ্ছিল।

এক ঠান্ডা শীতের সন্ধ্যায় ডজনখানেকের হালকা ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া যান এবং কমিউনিকেশন ট্রাকের রাশিয়ান বহর সামাস্কি গ্রামের উত্তরে ঢুকে পড়ল। কোন পূর্ব পরিকল্পনা নেই, কোন আর্টিলারি নেই, নেই কোন বিমান। ঘুরতে ঘুরতেই যেন এই প্রতিকূল গ্রামে এসে উপস্থিত। হয়তো এরা কোথাও আক্রমণের শিকার হয়েছে অথবা যোগাযোগের ভুলের কারণে এখানে চলে এসেছে।

কিন্তু সামাস্কির লোকজন এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাল যেভাবে তারা আক্রমণ হলে দেখায়। প্রায় জনা তিরিশেক কিশোর- বয়স্ক একসাথে লাফিয়ে একটা ট্রাকে উঠে পড়ল, সাথে আরপিজি এবং রাইফেল। উত্তেজনায় চিৎকার

BanglaBook.org

করতে করতে আমাদের পিছিয়ে যেতে বলল। এরপর গ্রামের প্রান্তসীমায় পৌঁছুতেই লুকিয়ে পড়ল দলটা। রাশিয়ান বহর তাদের গুলির আওতায় আসামাত্রই ফায়ার ওপেন করে।

পরদিন সকালে তিনজন রুশ তরুণের মৃতদেহ কাদায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। আকাশের দিকে নিষ্প্রাণ তাকিয়ে। মুখ রক্ত, কাদা আর সূর্যের আলোতে মাখামাখি। চারপাশে ছড়িয়ে আছে তাদের সাঁজোয়া যান এবং মৃত কমরেডদের পোশাক। আরপিজির এক রাউন্ড বুলেট গিয়ে আঘাত করেছে ট্যাংকের এমিউনিশন ম্যাগাজিনে। ফলে বিস্ফোরিত হয়ে ট্যাংকের টারেট একদিকে আর মেশিন আরেকদিকে ছিটকে চলে গেছে। যোগাযোগের সরঞ্জামবাহী ট্রাকটা রাস্তার অন্য পাশে পড়ে আছে।

সংঘর্ষটা কোনো পূর্ব পরিকল্পনা বা আদর্শ ছাড়াই ঘটেছিল। সামাস্কি গ্রামবাসীর কাছে এটা কোন যুদ্ধ নয় বরং অস্তিত্ব রক্ষা। গ্রোজনি থেকে যুদ্ধটা গ্রামের দিকে সরে আসার সময় থেকেই এই ধারণা নিয়ে চলছে গ্রামের নেতারা।

'মাতাল রাশিয়ানরা এখানে এলে এটাই ঘটবে,' একজন রাগান্বিত লোক মৃতদেহগুলো দেখিয়ে বলল।

'আমাদের যাবার কোন জায়গা নেই,' মাগোমেদ নামে আরেকজন বলল, 'এটাই আমাদের বাড়ি এবং আমরা এটা ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না। আমি সাহসী বলে এখানে থাকছি এমনটা নয়। এটাই আমাদের নীতি। আমরা নীতি নিয়ে জন্মাই। আমার মায়ের দুধ থেকেই এই মনোবল পেয়েছি।'

এই হামলার জবাব খুব সাধারণভাবে যেন রাশিয়ানরা দিয়ে গেল। সাঁজোয়া যান এল, তারপর ট্যাংক, মর্টার শেল ঢুকল; সবশেষে হেলিকপ্টার। রাস্তা, বাড়িঘর—সমস্ত কিছুই আক্রান্ত হলো। বিশ জন হতাহত হলো। পরবর্তীতে আরো বেশ ক'জন মারা গেল অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে। কারণ চারপাশ ঘিরে রাখা গ্রাম থেকে কেউই হাসপাতালের উদ্দেশে বের হতে পারেনি।

পাঁচঘণ্টা পর রাশিয়ান সাঁজোয়া যান চলে গেল।

এমন শাস্তিমূলক বিমান হামলা নিত্যকার ঘটনা ছিল। কিন্তু আরো খারাপ অবস্থা সামনে অপেক্ষা করছিল। রাশিয়ান সেনাবাহিনী পূর্ব চেচনিয়া দখল নিয়েছিল। এবার তাদের নজর পশ্চিম চেচনিয়ার দিকে। এর জন্য তাদের দরকার ছিল সামাস্কি। খারাপ কিছু ঘটতে পারে ভেবে প্রবীণরা আগেই বোয়েভিক আর্মিদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। মাত্র পঞ্চাশজন স্থানীয়

BanglaBook.org

লোক অস্ত্র হাতে রয়ে গেল গ্রামে। যা পুরো রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ছিল না। রাশিয়ানরা গোটা গ্রাম দখল করতে চাইছিল।

ছোট ছোট সংঘর্ষ গ্রামটাতে লেগেই রইল। রাশিয়ানদের পোতা ল্যান্ডমাইনে কৃষক ট্রাক্টরসহ উড়ে যেত। প্রতি সপ্তাহে দফায় দফায় গ্রামের প্রবীণ ও ধর্মীয় নেতারা রাশিয়ান ক্যাম্পে গিয়ে সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছিল যেন এই গ্রামে আক্রমণ চালানো না হয়; এই গ্রাম রাশিয়ানদের জন্য কোনো হুমকি নয়। কিন্তু সামাস্কি নামটাই একটা হুমকি, আর রক্ত পিপাসার আনন্দ পৈশাচিক।

৬ এপ্রিল রাশিয়ান অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় থেকে সামাস্কিকে ৭ এপ্রিল সকাল ৭ টা পর্যন্ত আলটিমেটাম দেয়া হলো। এর মধ্যে রাশিয়ান সৈন্যদেরকে সেখানে প্রবেশাধিকার দিতে হবে। সাথে ২৬৪টা রাইফেল, দুটো মেশিনগান আর সাঁজোয়া যানসহ আত্মসমর্পণ করতে হবে। গ্রামের প্রবীণরা জবাব দিল, তাদের গ্রামে এতো অস্ত্র নেই এবং তাদের আরো সময় দরকার নিজেদের অবস্থান আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার করার জন্য। কিন্তু আল্টিমেটাম বহাল থাকল।

একজন কর্নেল জানাল, আগামীকাল সকালে গ্রামে সেনাবাহিনি প্রবেশ করবে। যদি কোন একটা বাড়ি থেকেও গুলি চলে, তাহলে ওই বাড়ি সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে ট্যাংক দিয়ে। এটাই নিয়ম।

সে রাতে রাশিয়ান আর্টিলারি সামাস্কির ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করল আল্টিমেটাম শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগেই। বিমান হামলাও চলতে লাগল। ৭ এপ্রিল সকাল থেকে টানা অটোমেটিক ক্যানন গুলির আক্রমণের শিকার হলো গ্রামটি। বিকেলের আগেই বেশিরভাগ গ্রামবাসী পালানোর চেষ্টা করল কিন্তু গোলাগুলির তীব্রতায় এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। একদল প্রতিনিধি আবার রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলে সেখান থেকে ফের বলা হলো অস্ত্র জমা দিতে— যা তাদের কাছে আদৌ ছিল না।

অফিশিয়ালি বলা হলো, রাশিয়ান বাহিনি গ্রামে প্রবেশের চেষ্টা করলে প্রায় তিনশজন ভারি অস্ত্রে সজ্জিত বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাশিয়ান সৈন্যরা অবাক করার মতো বীরত্ব প্রদর্শন করে। পত্রিকা ইতার-তাস লেখে, এ যুদ্ধের একশ ত্রিশজন 'দুদায়েভের সৈন্য' মারা যায়।

BanglaBook.org

বেঁচে যাওয়া লোক, প্রত্যক্ষদর্শী ও মানবাধিকারকর্মীদের বরাতে 'মেমোরিয়াল' নামক সংস্থা যে রিপোর্টটা করে তাতে জানা যায়, প্রায় সাড়ে তিনশ রাশিয়ান সৈন্য যখন আক্রমণ চালায়-যাদের মধ্যে এলিট ফোর্সও ছিল-স্থানীয় কয়েকজন বাধা দিতে চেষ্টা করে; এদের সংখ্যা চল্লিশের ওপরে হবে না এবং কেউই সত্যিকারের যোদ্ধা না। রাশিয়ান আর্মি ধীরে সুস্থে পুরো গ্রামে লুট ও গণহত্যা চালায়। যুদ্ধের পর একশজনের লাশ গ্রামের স্থানে স্থানে পড়ে থাকতে দেখা যায়। যাদের অধিকাংশই নিরস্ত্র লোক; সাধারণত নারী, শিশু, বৃদ্ধ। কেউই চেচেন যোদ্ধা নয়। মেমোরিয়াল-এর গবেষণা অনুযায়ী, অনেকে মর্টার শেলের আঘাতে মারা যায় আর বেশিরভাগ মারা যায় ভারি মেশিনগানের গুলিতে।

রাশিয়ানদের ভাষায় 'মোপিং আপ' নামের অপারেশন সামাস্কিতে শুরু হয় ৮ তারিখ সকালে। এটা এই অভিযানেরই অংশ। গোলাগুলি অনেক আগেই শেষ হয়েছে। গ্রামবাসী পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে বাঁচার আশায়। রাশিয়ান সৈন্যরা তখন দৌড়াতে থাকা লোকজনকে নির্বিচারে হত্যা শুরু করে। সামাস্কির অধিবাসীরা জানায়, মহিলাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, বৃদ্ধ লোকদের রাস্তার ওপর নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে ওরা। পরিবারগুলোর শেষ আশ্রয়স্থল বেজমেন্ট উড়িয়ে দেয়া হয় গ্রেনেড দিয়ে। এক কথায় মানুষগুলোকে নিজ গৃহেই হত্যা করা হয়।

অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় ও সরকার অবশ্য এ রিপোর্ট অস্বীকার করে। কমিউনিস্ট অধ্যুষিত রাশিয়ান পার্লামেন্টে মেমোরিয়ালের এ স্টাডি রিপোর্ট নিয়ে যথেষ্ট উপহাস করা হয়। কিন্তু হাজার হাজার প্রত্যক্ষদর্শী ও সারভাইভারের সাক্ষী সামনে আসে। অনেক গুলিবিদ্ধ ও জ্বলন্ত মৃতদেহ পাওয়া যায়। এরমধ্যে কিছু জ্বলন্ত দেহ পাওয়া যায় যেখানে গুলির চিহ্ন ছিল না। অর্থাৎ তারা যুদ্ধের কারণে মরেনি, এক তরফাভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

অনেক বাড়িঘর আর্টিলারি দিয়ে উড়িয়ে না দিয়ে ভেতর থেকে পুড়িয়ে দেয়া হয়। ভেতরের দেয়ালে বুলেট-শার্পনেলের ক্ষত কিন্তু বাইরে থেকে ধ্বংসের কোন চিহ্ন নেই। এইসব বাড়িতে অসংখ্য নিরীহ মানুষেরা মারা পড়ে।

মেমোরিয়ালের করা মৃতের তালিকা রীতিমতো ভীতিপ্রদ। প্রায় ১০০ জনের মধ্যে ৪৫ জনের বয়স ১৯ থেকে ৪৫। অর্থাৎ এদের যুদ্ধের সামর্থ্য রয়েছে। বাকিদের মধ্যে ১৩ জন নারী, ৭ জন শিশু, ১৯ জনের বয়স ৪০ থেকে ৬০ এবং ২০ জনের বয়স ষাটোর্ধ্ব। একেবারে কণিষ্ঠ ভিকটিমের বয়স

BanglaBook.org

ছিল মাত্র ১৫ দিন আর সবচেয়ে প্রবীণ মানুষটির ৯৬ বছর। এদের মধ্যে জাতিগতভাবে ৪ জন রাশিয়ানও ছিল, যার একজন বেঁচে যায়। ঘরের ভেতরের দেয়ালে বুলেট ও রক্তের দাগ দেখে যে ধারণা করা হয়েছিল, এই লোকটার সাক্ষী সেগুলোকে সত্যতা দেয়।

সামাস্কিতে বেঁচে যাওয়া এক প্রবীণ, ইউসুফ সাদুল্লাহ মেমোরিয়াল-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি ভিগোনায়া স্ট্রিটে থাকতেন, আলটিমেটামের আগেই তিনি তার পরিবারকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে চেচেন রীতি অনুসারে নিজে থেকে গেছেন শেষ মুহূর্তে ঘর ত্যাগ করার জন্য। তিনি বেশ অনেকটা সময় বাড়িতে অপেক্ষা করেন। ৮ তারিখ সকাল দশটায় সৈন্যরা গুলি করতে করতে বলে, ‘কুত্তার বাচ্চা বের হ।’

তিনি সেলারে গিয়ে লুকান, সৈন্যরা তখন তার দরজায় পৌঁছে গেছে।

‘আমি ডান দিকের দেয়ালের আড়াল থেকে সরতে লাগলাম। সেখানে আমার একটা ছোট বিছানা ছিল বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। এক সৈন্য সেই বরাবর গুলি করে চলে যেতে উদ্যত হয়েও থমকে গেল। তার কমরেড তাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, “মনে হচ্ছে এখানে এখনও কেউ বেঁচে আছে।” সৈন্যটা এ কথায় ফিরে এসে একটা গ্রেনেড ছুঁড়লো। আমি ভাবলাম, আমি হয়তো শেষ। এভাবেই নীরবে মৃতুকে বরণ করে নিতে হবে। তবে ভয় আমি পাইনি। গ্রেনেডের আঘাতে ডাবল তক্তার মজবুত বিছানাটাও দু’ভাগ হয়ে গেল। কানে তালা লেগে গেল বিকট আওয়াজে। বোমাটা বিছানার নিচে বিস্ফোরিত হয়েছিল। আমি অনুভব করলাম কী যেন একটা ছিটকে এসে আমার কাঁধে আর পায়ে আঘাত করল। আমি হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলাম। কানে প্রায় কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছিলাম না।

পায়ের আওয়াজ শুনে আমি ভাবলাম, তারা হয়তো চলে গেছে। আমি আমার পা এদিক ওদিক নাড়িয়ে পরীক্ষা করলাম। না, ভাঙেনি। কিন্তু কী যেন আঘাত করেছে। রক্ত বের হচ্ছিল আমার হাত থেকে। বাইরে বের হয়ে দেখি, তারা আমার টাকা ও কাগজপত্র রাখার ছোট সিন্দুকটা নিয়ে গেছে। তারা যদি আমাকে দেখে ফেলে তাহলে তৃতীয়বারের মতো হত্যার চেষ্টা করবে।’

মার্চের শেষদিকে রাশিয়ান ট্যাংক চেচেনদের শেষ সমতল ভূমির অধিকার নিতে ছুটল। আরগুন, স্ট্যারি এটাগি, নোভি এটাগি সব ঘিরে ফেলে দখল করা হয়েছে এবং বোয়েভিকদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এখন শুধু গুডারমস আর

Banglabook.org

শালিই বাকি; গ্রোজনি হারাবার পর যেটা এখন বিদ্রোহীদের রাজধানী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাশিয়ানদের অগ্রসরতার কারণে সামরিক-বেসামরিক সব ধরনের লোক দক্ষিণ পার্বত্য অঞ্চলের দিকে জমা হচ্ছে। এমনকি রাতেরবেলাও হাজার হাজার মানুষ লরি, ট্রাক্টর, মোটরসাইকেল, কারে করে সরু পাহাড়ি উপত্যকা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক- প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ এখন পলায়নপর। হয় ইঙ্গুশেটিয়া বা দাগেস্তানের দিকে যাচ্ছে অথবা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

ককেশিয়ান আতিথেয়তাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। এতো বিশাল জনসমুদ্রের বড় অংশকেই রিফিউজি ক্যাম্পে যেতে হয়নি, বরং পাহাড়ি গ্রাম ভেদেনো ও ডার্গোতে বন্ধু, আত্মীয় বা একেবারেই অপরিচিত কারো কাছে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছে। এক শতাব্দী আগে দুটো গ্রামই ইমাম শামিল-এর অস্থায়ী সদর দপ্তর ছিল। অনেক বাড়িতেই সর্বোচ্চ বিশজন করে আশ্রয় পেয়েছে। অবকাশ যাপনের জন্য সোভিয়েতের তৈরি পুরনো সামার ক্যাম্প এবং পাইওনিয়ার কমিউনিস্ট ইয়ুথ ক্যাম্প এখন শরণার্থীতে পূর্ণ। ছোট ছোট একেকটা রুমে গোটা এক পরিবার আশ্রয় নিয়েছে।

এমএসএফ নামের এক নিবেদিতপ্রাণ সংস্থা ভেদেনো হাসপাতালে দু'জন চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছে এবং সমতলের অসুস্থ মানুষকে সেখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে। শালি ইয়ার্টের হাসপাতাল দ্রুততার সাথে বাচি ইয়ার্ট নামক পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক স্কুল ঘরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। যদিও গ্রামের লোক প্রথমে রাজি ছিল না এই ভয়ে যে এখানেও এই 'অপরাধে' বোমাবর্ষণ হবে।

কোথাও বসে থাকা কিংবা দৌড়ে পালানো—দুই-ই বিপদজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাসের শেষে অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। এমন এক অবস্থা যে কেউ জানে না কী ঘটবে. কোন দিক থেকে আক্রমণ হবে! আকাশপথে নাকি সামনাসামনি। আরগুনের দক্ষিণে সেখানকার একজন স্কুল শিক্ষক পালানোর চেষ্টা করছিলেন তার গাড়িতে গাদাগাদি করে আটটা শিশুকে নিয়ে। কিন্তু পথেই এক মেশিনগানধারীর আক্রমণের শিকার হন তিনি।

'গাড়িটাকে ক্ষত বিক্ষত করা হয়েছে। আমি হাতে গুলি খেয়েছি। ভাগ্য ভালো বাচ্চাগুলোর কিছু হয়নি,' বললেন শারফুদ্দিন আবদুল সালানোভিচ। তার বয়স সাতান্ন। এখনও শক-এ আছেন। বাহুতে রক্তাক্ত একটা ব্যান্ডেজ

BanglaBook.org

জড়ানো।

'আমি তেত্রিশ বছর ধরে কাজ করছি। পনেরো বছর স্কুলের পরিচালকও ছিলাম। আর এখন আমি জানি না, আমার হাত দিয়ে কখনো আর কিছু করতে পারব কিনা।'

রাশিয়ানদের এখনকার উদ্দেশ্য গ্রোজনির পর বিদ্রোহীদের স্বঘোষিত রাজধানী শালি'র দখল নেয়া। রাশিয়ানরা যুদ্ধে নিজেদের অবস্থান ফিরে পাবার সাথে সাথে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, চেচেনদের পক্ষে অল্প ক'জন যোদ্ধা ছাড়া আর কেউ নেই। সাধারণ জনগণ ঘর ছাড়া। এখন যারা টিকে আছে তারা যুদ্ধের উপযুক্ত না। যেমন একজন বৃদ্ধের সাথে আমার কথা হয়েছিল। লাল রংয়ের মুখ, ঠোঁটের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে স্বর্ণের দাঁত। আমাকে বলল, 'আমি আমার ঘর রক্ষা করছি!'

ভয়াবহ যুদ্ধের এই থমথমে আবহাওয়ায় চেচেনদের ভরসা দুটো—এক, আল্লাহ আর দ্বিতীয়ত, ছয় কিলোমিটার দূরের পর্বতে পালানোর পথ।

এক রাতে জেট প্লেন শালিতে চক্কর দিতে আরম্ভ করল যখন মসজিদের মিনার থেকে লাউডস্পিকারে ভেসে আসছিল মুয়াজ্জিনের আজানের সুর। বোমারু বিমানের গুঞ্জন আর মুয়াজ্জিনের নিচু, দুঃখী সুর একসাথে এতোটাই বেমানান লাগছিল যে আমার মনে হচ্ছিল, একটাকে অবশ্যই পরাস্ত হতে হবে। অবশেষে স্রষ্টার স্তুতিবাণীই জিতল। বোমাবর্ষণ শেষে যখন প্লেন চলে গেল তখনও মুয়াজ্জিন করুণ সুরে আজান দিয়েই যাচ্ছে।

আমার বন্ধু মুসার অডিতে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে দেখছিলাম আমরা, হঠাৎই রকেট হামলার শিকার হলাম। একটা তো আমাদের গাড়ির এক মিটার সামনে পড়ল। দ্বিতীয়টা পড়ল ঠিক আমাদের বাঁয়ে, একটা বাড়ির ওপর। আরেকটা বিশ মিটার দূরের একটা ব্রিজ উড়িয়ে দিল। সব কিছু যেন কয়েক সেকেন্ডের ভেতর স্লো মোশনে ঘটে গেল। চারপাশটা ধোঁয়া আর আগুনের চাদরে ঢেকে যেতেই আমাদের গাড়ি সোজা ফুটপাতে গিয়ে ধাক্কা দিল। আমার কানে তখন একজন মহিলার আহাজারি ভেসে আসছিল।

এখান থেকে বেঁচে ফেরা ছিল স্রেফ ভাগ্য। আমি শুধু প্রার্থনার মাধ্যমে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিতে পারি। তবে ভাগ্য পরপর দু'বার সহায় নাও হতে পারে।

মুসা তার বাড়ি ঘর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল। সে তার ককেশিয়ান কুকুরকে কিছু খাইয়ে ছেড়ে দিল। কুকুরটা ইতোমধ্যেই পাগলপ্রায়। গাড়ি স্টার্ট দিয়েই

BanglaBook.org

মুসা কেঁদে উঠল।

আমাকে ককেশাস পর্বতের পাদদেশের প্রথম গ্রাম সার্জেন ইয়ার্ট-এ নামিয়ে দিয়ে একাই গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। চেচেন পুরুষের জন্য কান্না বিরল ঘটনা। যাবার আগে সে শুধু বলে গেল, 'এ কথা কাউকে বলো না।'

শালিতে রাশিয়ানদের চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু হলো ২৯ মার্চ, ১৯৯৫। ভারি অস্ত্রের যথাযথ ব্যবহার করা হলো। আমি ভাবছিলাম, এমনটা শুধু সিনেমাতেই দেখেছি।

একসাথে ছয়টা প্লেন এলো। এসেই চক্কর দিতে লাগল উজ্জ্বল সূর্যকে পেছনে রেখে। এরপরই শুরু হলো রকেট ও বোমা হামলা। শালি ও সার্জেন ইয়ার্ট-এর প্রান্তে হামলা চালাতে লাগল ওরা।

আমি তখন একটা পাহাড়ের মাথায় বসে এসব দেখছিলাম। প্লেনের পরে এলো হেলিকপ্টার। অনেক নিচু দিয়ে উড়ছিল আর একটা আরেকটাকে কাভার দিতে দিতে রকেট হামলা করতে লাগল। শালিতে তখনও কিছুটা প্রতিরোধ বজায় ছিল। হেলিকপ্টারগুলোকে শহরের প্রান্তসীমায় হলদে আলোর গানফায়ারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে অধিকাংশ যোদ্ধাই পুরনো কৌশল অনুযায়ী জায়গা বদল করে সরে এল।

অবশেষে আর্টিলারি হামলা শুরু হলো। যে সমস্ত ভবনে প্রতিরোধ ছিল সে জায়গাগুলো কালো ধূসর মেঘে ছেয়ে গেল। ট্যাংকগুলো আরো দক্ষিণে যাওয়ার আগে পুরো শহর একবার চক্কর দিল। আর্টিলারি সামনে এগোবার জন্য গোলা বর্ষণের মাধ্যমে পাহাড় কাটতে লাগল। যদিও পথটা খুব একটা দীর্ঘ ছিল না তবুও ডজনখানেক বার ফায়ার করা হলো। প্রতিবারই মাটি ছিটকে ছিটকে আগেরবারের চাইতেও ওপরে উঠছিল। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ।

৩০ মার্চের মধ্যে গুডারমেস-এর পতন হলো এবং একদিন পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে শালিও পুরোপুরি রাশিয়ানদের দখলে এলো।

সদ্য পালিয়ে আসা শামিল বাসায়েভের আবখাজিয়া ব্যাটেলিয়নের সদস্য বিশ বছর বয়সী রুস্তম বলল, 'অটোমেটিক রাইফেলগুলো কোনো কাজেরই না। ওখানে তুমি কোনো মানুষকে যুদ্ধ করতে দেখবে না, শুধু মেশিন। একবার বুম বুম আওয়াজ আর সাথে সাথেই তিন-চারজন নেই। কারো কাপড় নেই, কারো পা উড়ে গেছে। আমাদের না আছে খাওয়ার কিছু, না আছে পানের। দেখো, আমি কতো শুকিয়ে গেছি অথচ আমি কারাতে চ্যাম্পিয়ন ছিলাম

BanglaBook.org

একসময়।' একটু থেমে আবার বলল, 'যাক, সমস্যা নেই। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আমরা পাহাড়ে চলে যাব। এটাই আমাদের জন্য ভালো হবে।'

শালি

শালি'র মানসিক হাসপাতালের রোগীরা পশুর চেয়েও খারাপ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। এই কনকনে শীতে মলমূত্র'র মাঝে পড়ে থেকে তারা চিৎকার করে, আপন মনে হাসে। আবার প্লেনের শব্দে কেউ কেউ বাইরে বের হয়ে উচ্চস্বরে হাসতে থাকে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ তে চব্বিশজন রোগী অবশিষ্ট ছিল। সংখ্যাটা একসময় ছিল দুই শতাধিক, আগে এটা একটা আদর্শ সোভিয়েত প্রতিষ্ঠান ছিল অথচ এখন তাদের বেঁচে থাকার শেষ ও একমাত্র ভরসা পঁচাত্তর বছর বয়সী রাশিয়ান বংশোদ্ভূত নার্স নিনা ইভানোনা।

'যখন বোমা হামলা শুরু হলো তখন সব নার্স এখান থেকে পালালো শুধু আমি এদেরকে ছাড়তে পারিনি। এরা আমার সন্তানের মতো। এদের বিবেক বুদ্ধি নেই তবু এরা মানুষ,' ইভানোনা বললেন। 'একেবারে উন্মাদ রোগীদের তালাযুক্ত কক্ষে রাখা হয়। দু'জন মহিলা গাদাগাদি করে এক ম্যাট্রেসে শুয়ে থাকে যতোক্ষণ না এদের একজন আরেকজনের পায়ে কামড় বসিয়ে দেয়। আরেকজন তো কম্বল মুড়ি দিয়ে লাশের মতো শুয়ে থাকে অথচ এদের জন্য কিছুই করার নেই।

এক লোক সারাদিন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পোশাক পরে। গাড়ি দেখলেই হাত নাড়ে আর বলে, "আমার মা'কে বোলো যেন দেখতে আসে।" বোমা হামলা হলে এই লোক নিশ্চিত মারা পড়বে।' ইভানোনা ফিসফিস করে বললেন, 'তার মা-বাবা কখনোই আসেনি। আর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তো কারো মা-বাবাই আসে না; এমনকি তারা মারা গেলেও না। আমরা হসপিটালের পেছনে এদেরকে কবর দেই।' ইভানোনা কান্না আটকাতে চাইলেন। তার মুখে অসংখ্য বলিরেখা ছাপ ফেলেছে। তিনি আমাকে এক ব্যাচ ওষুধ দেখালেন। কেউ একজন পাঠিয়েছে, কিন্তু তিনি নার্সিং ট্রেনিং খুব সামান্যই পেয়েছেন এবং ইংরেজি বোঝা তার জন্য দুঃসাধ্য।

'স্যানিটেশন নেই, কম্বল নেই, কাপড় নেই, বাঙ্কার নেই। কিছুই করার নেই আমাদের। এখানে বোমা হামলা হলে আমরা সবাই মারা যাব।' বললেন

BanglaBook.org

তিনি।

কয়েক মাস পর যখন পুরো শালি এবং আশপাশের এলাকা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পরে তখন আমি ওখানে আবার গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি অর্ধেক হাসপাতাল কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কোথাও ইভানোনাকে খুঁজে পেলাম না।

এখন ছয়জন রোগী আছে, এদের একজনকে আমি চিনি। মহিলা সবচেয়ে বিপদজন রোগীদের একজন। শীর্ণদেহে কোমরের হাড় এমনভাবে বেরিয়ে আছে যেন একটা হ্যান্ডেল। বাগানে নগ্ন দেহে শুয়ে চিৎকার করছে।

পেছন থেকে একজন বলল, 'সে ক্ষুধার্ত তাই কাঁদছে।'

আমি ফিরে দেখি একজন চেচেন মহিলা। সে-ই বর্তমানে হাসপাতালের দায়িত্বে আছে। লীলা মুজায়েভা তার নাম। বলল, 'এখানে কেউ থাকতে পারে না এমনকি শুকরও না।'

ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের দিকে তাকিয়ে আমি জানতে চাইলাম, 'কী ঘটেছিল এখানে?'

সে বলল, 'বোয়েভিকরা এখানে অবস্থান নিয়েছিল শালিতে যুদ্ধের সময়। তারা পনেরো থেকে বিশজনের মতো ছিল এক দিনের জন্য। সেদিনই হেলিকপ্টার হামলা হলে মোটামুটি সবাই মারা গেল। রকেট হামলা এই ভবনেও হয়েছিল। মানসিক রোগীদের বেজমেন্টে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তারা তো কিছুই বোঝে না।'

সে কি যোদ্ধাদের দোষারোপ করছে? এটা তো সত্য যে, ওরা আশ্রয় না নিলে হয়তো এতোজন মরতো না আর ভবনটাও হয়তো টিকে থাকত। চেচনিয়ায় এটা একটা উভয়সংকট। বিশেষ করে সমতলে। এখানে বিল্ডিং ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ চালানোর খুব একটা সুযোগ নেই। এদিকে তারা কিছু ছুঁয়ে দিলেও রাশিয়ানরা সেটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

'না, আমি যোদ্ধাদের দোষ দিচ্ছি না,' বলল লীলা, 'তারা খুব দ্রুতই এখান থেকে সরে পড়ে এবং হেলিকপ্টারগুলোকে যতোক্ষণ সম্ভব মাঠের মধ্যে ঠেকিয়ে রাখে। আর তার আগে ওরাই ছিল একমাত্র মানুষ যারা এখানকার অসহায়দের কিছুদিন খাবার এনে দিয়েছিল। না, আমি তাদের দোষ দেই না।'

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় তিন
দূর্গ

স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু,
পাহাড়ে শোনা যায় কান্নার রোল।
স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু,
আল্লাহ আমাদেরই পক্ষে।

-১৯৯৫ সালে ইমাম আলি সুলতানভ রচিত চেচেন রণসঙ্গীত

বসন্তে পাহাড় অশান্ত হয়ে উঠল। বোয়েভিকরা ভেবেছিল আফগান যুদ্ধের মতো গেরিলা পদ্ধতিতে সম্মুখ যুদ্ধ হবে কিন্তু তার পরিবর্তে রাশিয়ানরা বিমান ও আর্টিলারি হামলা চালিয়ে তাদের হিসেব না মেলা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। শরণার্থীরা ভেবেছিল, পর্বতের শরণার্থী শিবিরে হয়তো তারা নিরাপদ কিন্তু পাহাড় এবং পাহাড়ি গ্রামগুলোতে মানুষের ঢল মাত্রা ছাড়িয়েছে। বিশেষ করে শিশু। আমি একসাথে এতো শিশু কখনও দেখিনি। বোমা হামলা এখানেও শুরু হলো। শরণার্থীরা বুঝতে পারল, সমতলের মতো তারা এখানেও নিরাপদ নয়। গ্রীষ্মের আগেই হয়তো এখান থেকেও পালাতে হবে।

চেচেন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা ডার্গো, ভেদেনো, সাতোই গ্রামের উঁচু পর্বতে পলায়ন করার পর তাদের সামনে ছিল কঠিন রাজনৈতিক ও সামরিক পরীক্ষা। তারা তাদের সমস্ত শহরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে ফলে তাদের এখন বিশ্বের সামনে প্রমাণ করতে হবে যে অস্বীকৃত বিদ্রোহী রাষ্ট্রটি এখনও টিকে আছে। তাই দুদায়েভের টিম রাশিয়ানদের সাথে শুরু করল প্রোপাগান্ডা-যুদ্ধ!

রাষ্ট্রের জন্য সিম্বল বা প্রতীক খুব গুরুত্বপূর্ণ। সকল প্রাতিষ্ঠানিক বিবৃতি চেচনিয়া-ইচকেরিয়ার নামে হতো। ‘ইচকেরিয়া’ ছিল চেচনিয়ার ট্রাডিশনাল নাম যা গণমাধ্যম বা রাশিয়ান সরকার কখনও ব্যবহার করত না। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদী যোদ্ধারা নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের অংশ হিসেবে এই নামকে সগৌরবে লালন করত। সবুজ-লাল-সাদা রঙের কাপড়ে ঘুমন্ত নেকড়ে ও পূর্ণচন্দ্র খচিত সম্মানসূচক পতাকার দেখা মিলত সবখানে; পর্বতে, যুদ্ধের পোশাকে, বিদ্রোহীর গাড়িতে। উচ্চপদস্থ নেতারা টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় সর্বদা পেছনে এই পতাকা রাখতেন। কারণ টেলিভিশনে প্রচারের জন্য একটা ভাবমূর্তি খুবই জরুরি।

সরকার ভেঙে পড়ার পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা এর কাঠামো আঁকড়ে ধরে ছিল। বিদ্রোহী নেতারা সংবিধান নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতো। এতে মনে একটা বিশ্বাস তৈরি হতো যে, তাদের দেশে এখনো পার্লামেন্ট ও প্রশাসন টিকে আছে। যতোদিন সংবিধান থাকবে ততদিন তাদের কেউ দস্যু বলতে পারবে না। বাধ্য হয়ে হয়তো তাদের সরকারকে এখন পর্বতে আশ্রয় নিতে হয়েছে কিন্তু দুদায়েভ এখনও তাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। রয়েছে একদল সেনাপতি ও বেসামরিক লোকের সমন্বয়ে গঠিত তাদের মন্ত্রণালয়, মিলিটারি প্রসিকিউটর, আইন বিভাগ। আসলান মাসখাদোভ চেচনিয়া-ইচকেরিয়া প্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনি প্রধান। অবাক করা সংখ্যায় কর্নেল ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেলও রয়েছে। সংসদ এখনও গোপনে বসে। দুদায়েভ, কমান্ডার ইন চিফ ও আসলান মাসখাদোভের বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্ত আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা ‘ইচকেরিয়া’তে প্রকাশিত হয়।

আমার পছন্দের ছিল ২০ মার্চ ১৯৯৫তে প্রকাশিত ১৬ নং অধ্যাদেশ। যার শিরোনাম ছিল, ‘আত্মঘাতী ব্যাটেলিয়ন গঠন’। আসলে এটা ছিল অর্থহীন এক আইন। কারণ অধিকাংশ ইউনিটকে এমনিতেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। কিন্তু প্রোপাগান্ডার যুদ্ধে এই অর্থহীন আইনই অনেক বড় কিছু হয়ে দাঁড়ায়।

প্রকৃত ক্ষমতা ছিল এক ডজন নেতার হাতে। যাদের প্রধান হলো দুদায়েভ, মাসখাদোভ, উচ্চপদস্থ কমান্ডার ও ইন্টেলিজেন্স চিফ। উচ্চপদস্থ কমান্ডাররা মূলত সেনাপতি, সরকারি ও বেসরকারি সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করত। তাদেরকেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাখাটা জরুরি ছিল কারণ তাদেরকে প্রতিদিন যুদ্ধ করতে হতো এবং নিত্যদিনের কৌশল গ্রহণে তারা অভিজ্ঞ।

BanglaBook.org

অনেক ছোটখাটো সেনাপতিও ছিল তাদের অধীনে। তবে মূল দায়িত্ব ছিল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হাতেই। দক্ষিণ-পশ্চিমের কমান্ডার সুদর্শন প্রাক্তন অভিনেতা সুলতান গেলিসখানোভ, যিনি দুদায়েভের সংস্কৃতি মন্ত্রী ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্বের সর্বোচ্চ কমান্ডার হলো তরুণ ও বুদ্ধিমান খুনকার পাশা ঈসরাপিলভ; তার নিজের গ্রাম এলোরেই থেকে সে নেতৃত্ব দিত। কেন্দ্র এবং ভেদেনো এলাকার কমান্ডার ছিল আনপ্রেডিক্টেবল এবং দুর্ধর্ষ শামিল বাসায়েভ। সে যে কোন অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করার অধিকার রাখত। এদের সকলেরই সম্মোহনী ক্ষমতা ছিল। এর কারণ হয়তো অনুগামী যোদ্ধাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা, সৈনিকদের মনে তাদের জন্য ভীতি কিংবা তাদের ব্যক্তিত্ব।

গেলিসখানোভ অহংবোধের সুরে বলেন, ‘আমি যেখানে যুদ্ধে যাই আমার আশেপাশের যোদ্ধারা নির্ভীক হয়ে যায়। তারা বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে অনুসরণ করে।’

সবচেয়ে প্রতিভাবান ও মেধাবী ছিল শামিল বাসায়েভ। সে দ্রুতই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারত কারণ সে সৈনিক থেকে শুরু করে অপরিচিত—সব ধরনের মানুষের সাথে সহজে মিশতে পারত এবং তার কৌতুকবোধ ছিল অসাধারণ।

কিন্তু রাশিয়ানদের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক ব্যক্তি ছিলেন দুদায়েভের তথ্যমন্ত্রী মোভলাদি উদুগভ। তিনি প্রমাণ করেছেন এ যুদ্ধে তিনি একজন ভেলকিবাজ পরিকল্পনাকারী। শুধু নিজ দক্ষতায় প্রোপাগান্ডা-যুদ্ধকে টিকিয়ে রাখার জন্যই নয় বরং তার রাজনৈতিক আদর্শের গভীরতার জন্য। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছিল পরিষ্কার ধারণা। দাড়িওয়ালা মানুষটি কখনও অস্ত্র হাতে নেননি, এমনকি ক্যামোফ্লাজে থাকার সময়ও কিন্তু একটা মাত্র স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে বহির্বিশ্ব ও রাশিয়ানদের কাছে চেচনিয়া-ইচকেরিয়া নামক রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রেখেছেন। নইলে কবেই তারা মনে করত যে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের খেল খতম।

উদুগভের মিডিয়া-যুদ্ধ সামরিক যুদ্ধের মতোই মহাকাব্যিক! প্রথমে প্রোপাগান্ডা শুরু করে রাশিয়ান সরকার ও তাদের ভৃত্য মিডিয়া ইতার-তাস, ইন্টারফ্যাক্স ও ন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেল ওআরটি। তারা শুধু তা-ই প্রচার করত যা মস্কো থেকে বলা হতো।

মিডিয়া বলতে লাগল, কোন সাধারণ মানুষ মারা যায়নি। কোন বিমান হামলা হয়নি। চেচেন বিদ্রোহীরা গুজব ছড়াচ্ছে। ঠিক তখন উদুগভ পাল্টা

BanglaBook.org

প্রোপাগান্ডা ছড়ালেন, পাঁচশ সাধারণ লোক মারা গেছে এক বোমা হামলায়, এদিকে অপর এক চেচেন হামলায় আটশ রাশিয়ান সৈন্য মারা গেছে!

তিনি বিভিন্ন বিদেশি ও রাশিয়ান নিউজ এজেন্সি, টেলিভিশন ও রেডিওতে ফোন দিয়ে চেচেনদের পক্ষে যুদ্ধের গল্পটা বলতেন। যখন তিনি, 'চেচেন-ইচকেরিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং চিফ অফ স্টাফ যোখার দুদায়েভ মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন' বলে শুরু করতেন তখন বহির্বিশ্বের কাছে সেটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য শোনাতো। তার ভাষা ছিল খুবই অফিসিয়াল ও ডিপ্লোম্যাটিক। বলে না দিলে কেউ বুঝতেই পারবে না, মিটিংটা আসলে একটা কাঠের টুকরোর ওপর বসে হয়েছিল!

মাঝে মাঝে উদুগভের পক্ষ হতে ইস্তাম্বুল থেকে কথাগুলো সম্প্রচার করা হতো। যা 'চেচেন প্রেস' থেকে ফ্যাক্স করে পাঠানো হতো সেটাই প্রচার করা হতো। তুরস্কের সরকারকে ধন্যবাদ, তারা তুরস্কের মাটিতে প্রো-চেচেন অ্যাক্টিভিস্টদের দেখেও না দেখার ভাণ করত।

চেচেনরা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেয়ার কাজটা খুব সাধারণ কিন্তু কার্যকরী পদ্ধতিতে করতে পেরেছিল। সাংবাদিকদের মোটামুটি সবখানে প্রবেশাধিকার ছিল। তারা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারত। চাইলে যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের সাথে থাকতে পারত, নেতাদের সাক্ষাৎকার নিতে পারত এবং যুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারত। যা মূলত চেচেনদের পক্ষেই-ই সাক্ষ্য দেয়। চেচেনরা এ ব্যাপারে ছিল উদার। যদিও স্পাই ঢুকে যাওয়ারও ভয় ছিল এ উদারতার মাঝে।

অন্যদিকে রাশিয়া এ ব্যাপারে বেশ সংকীর্ণ। অন্যান্য ফর্মাল আর্মিদের মতো এরা স্বাধীন সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী না। এদের ঘাঁটি কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র—কোথাও সাংবাদিকরা প্রবেশ করতে পারত না। সাংবাদিকরা ততটুকুই জানত যতোটুকু অফিসিয়ালি জানানো হতো; যা আত্মসম্মানবোধ আছে এমন কোনো সাংবাদিকই বিশ্বাস করবে না।

রাশিয়ানরা নিজেদেরই গণমাধ্যম দ্বারা বেশ ভুগেছে। ওআরটি চ্যানেল বা সরকারি নিউজ এজেন্সি বেঁধে দেয়া কথার বাইরে যেত না। কিন্তু ইজভেস্টিয়া, সেভোডনিয়ে, মস্কোভস্কি, কসমোপলিটান পত্রিকা ও প্রাইভেট এনটিভি টেলিভিশন চ্যানেল এবং খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে জাতীয় আরটিআর চ্যানেল যুদ্ধের বর্বরতা তুলে ধরত। এমনকি দু'এক লাইনে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কথা ইতার-তাস ও ইন্টারফ্যাক্স লেখা শুরু করল। আমেরিকান রেডিও লিবার্টির

BanglaBook.org

রাশিয়ান করসপন্ডেন্ট আন্দ্রেই বেবিস্কি চেচেনদের জন্য একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। সে যুদ্ধের চরম মুহূর্তের খবর প্রচার করত। রাশিয়ান গণমাধ্যমের এই স্বাধীনতার হালকা ছোঁয়া বহাল ছিল যুদ্ধের প্রথম বছরেই। ১৯৯৬ সালে ইয়েলসিনের প্রেসিডেন্সি পুনঃনির্বাচনী প্রচারণার সময় তা আবার অন্য দিকে মোড় নেয়। বিদেশি সাংবাদিকদের মতো রাশিয়ান সাংবাদিকরা হয়তো অতোটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যুদ্ধের অবস্থা তুলে ধরেনি কিন্তু যা তুলে ধরেছে সেটাই রাশিয়ান সরকারের প্রোপাগান্ডা-'কোনো যুদ্ধ নেই', 'সব হলো বিচ্ছিন্ন দস্যু দমন'-এমন কথার মুখে সার্থক ঝামা ঘষে দেয়া।

বিদেশি পাসপোর্ট না থাকায় রাশিয়ান সাংবাদিকদের জ্বালা ছিল দ্বিগুণ। তারা চেচেন মুল্লুকে প্রায়ই স্পাইইংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হতো এবং রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস এফএসবি বা অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার রোষানলে পড়তো।

এখন পর্যন্ত বিশজন সাংবাদিক যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে বলে জানা যায়। দু'জন পশ্চিমা, নয়জন রাশিয়ান, নয়জন চেচেন। রাশিয়ান দুই সাংবাদিককে-এরমধ্যে একজন ওআরটি প্রতিনিধি-দিনের বেলায় চেকপোস্টে গুলি করে হত্যা করে রাশিয়ান সৈন্যরা। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে এক গ্রামের বাইরে সাপ্তাহিক 'অবসায়া গাজেতা'য় নিয়মিত চেচেন মানবাধিকার বিষয়ক কলাম লেখিকা তরুণী নাযেজদা চাইকোভার লাশ পাওয়া যায়।

আরো তিনজন রাশিয়ান, তিনজন ইউক্রেনিয়ান একজন চেচেন ও একজন আমেরিকান তরুণ সাংবাদিক গুম হয়ে যায়। তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল, নিশ্চিত করে জানা যায়নি। কিন্তু অনুমান করা যায় যে, তাদেরকে যেকোনো এক পক্ষ মেরে ফেলেছে।

উদুগভ যখন একদিক থেকে বিশ্ববাসীর সমর্থনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন গোপন ট্রান্সমিটার পর্বতে স্থাপন করে 'প্রেসিডেনস্কি ক্যানেল' নামে আন্ডারগ্রাউন্ড এক টেলিভিশন স্টেশনের সম্প্রচার শুরু হলো। নিউজগুলো বিক্ষিপ্ত ও নিম্নমানের ছিল কিন্তু এর সঞ্জীবনী শক্তি ছিল অতুলনীয়।

চ্যানেলের এমন ঔদ্ধত্য চেচেনদের পুলকিত করত। অনেক চেচেন গভীর রাত পর্যন্ত চ্যানেল টিউন করে বসে থাকত। এ যেন এক বৈদ্যুতিক জলদস্যু! রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের নিয়মিত স্থানীয় অনুষ্ঠানের মাঝে ঢুকে পড়ে এই চ্যানেল ফিল্ড কমান্ডারদের সাক্ষাৎকার, দুদায়েভের বক্তৃতা প্রচার করত। ভিডিও

Banglabook.org

ফুটেজ নিত একদল নারী ক্যামেরাম্যান, যার নেতৃত্বে ছিল চৌত্রিশ বছর বয়সী দুর্দান্ত খাজমান উমারোভা। সে যুদ্ধের কিছু উল্লেখযোগ্য ভিডিও ধারণ করে প্রচার করে। পুরুষদের মতো নারীদের কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে যেতে হতো না। তারা সহজেই রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করতে পারত, রোডব্লকে তাদের আটকানো হতো না।

টেলিভিশনে আবার কখনও কখনও দেখা যেত যোদ্ধারা গিটারে গান গাচ্ছে বা খুব আত্মবিশ্বাসী সুরে কথাবার্তা বলছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হতো, চেচেনরা যুদ্ধ নিয়ে মোটেও হতাশ না।

স্ট্যালিন বা তার উত্তরাধিকারদের অধীনে কোন প্রেস ছিল না। যদিও এখন রাষ্ট্রের প্রেস আছে কিন্তু তা মিথ্যাচারে ভরা। মস্কো অবশ্য দেশিয় সাংবাদিকদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বা বিদেশি সাংবাদিকদের বের করে দেয়ার চেষ্টা করেনি। এতে কিছুটা প্রযুক্তির হাতও আছে বটে। কারণ উদুগভের মতো যেকোন রিপোর্টারের একটা স্যাটেলাইট টেলেক্স বা টেলিফোন এবং কার ব্যাটারি ও পোর্টেবল জেনারেটর থাকলেই রিপোর্ট করতে পারত যে কোন প্রান্ত থেকে। সরকারের কিছু করার থাকত না। উপরন্তু গণমাধ্যমের ওপর বৈষম্যমূলক নিয়ন্ত্রণ একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল যুদ্ধে।

রাশিয়ানরা তাদের বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে পর্বতে শরণার্থী শিবির খালি করার ব্যাপারে তোরজোর শুরু করে যেন বোয়েভিকদেরকে সকল সামাজিক নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে এবং তাদের পৃথক রাষ্ট্র গড়ার কাজকে প্রতিহত করা যায়। প্রথম রিফিউজি ক্যাম্পে বোমা হামলা হয় ২৭ মার্চ সার্জেন ইয়ার্টে। এ সময় শালি ও ভেদেনোর মাঝের পার্বত্য গ্রামগুলো সাধারণ মানুষে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। চারজন নিহত হয়, দশজন আহত। এরমধ্যে এক নিহত ব্যক্তি গতরাতেই আমাকে চা খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিল। সে আমাকে ফুটবল ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল আর আমার সলজ্জ উত্তর ছিল—আমি ফুটবল সম্পর্কে কিছুই জানি না। সে যা জানে তাই বলল। ম্যান-ইউ তাদের একজন একনিষ্ঠ ভক্তকে হারালো।

তার স্ত্রীও ভীষণভাবে আহত হয়েছে কিন্তু ভাগ্যক্রমে বেঁচে আছে। ক্যাম্পে ফেলা আরেকটা বোমা অবিস্ফোরিত ছিল; ছাদের ফাঁক দিয়ে এক বাড়ির মেঝেতে এসে পড়ে। সেখানে তখন একটা পরিবার ছিল। আমি যখন গেলাম তখন তারা গর্তটা ঢাকার চেষ্টা করছিল। তারা আহত হয়নি বটে তবে তাদের

BanglaBook.org

কাচের চাইতেও ভঙ্গুর মনে হচ্ছিল।

রাস্তার পাশের গাছগুলো বোমার আঘাতে খড় কুটোর মতো ধ্বসে গেছে। একজন মানুষ নিজের গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসা অবস্থায়ই মারা গেছে।

এলস্ট্যানজি, অনেক উঁচুতে পর্বতের উপত্যকার একটি গ্রাম। সেখানকার রিফিউজি ক্যাম্পে প্রায় বিশটি ছোট ছোট অগ্নিকুণ্ড দেখতে পেলাম একসময় হলিডে ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত আটটা বিল্ডিংয়ে বোমা বর্ষণের কারণে। একটা গরু দু'ভাগ হয়ে পড়ে আছে। দেহের দুই অংশের দূরত্ব কয়েক গজ।

বোমা হামলার পর জেট আক্রমণ শুরু হলো। দেয়ালগুলো ক্যানন ফায়ারের আঘাতে মাখনের মতো কেটে যাচ্ছিল। এখানেও পাঁচজন নিহত বারোজন আহত হলো।

শালি-ভেদেনো সড়কের পাশে আরেক ক্যাম্পে লোকজন একটা বড় গোলা বাড়িতে বাস করত। প্লেন ঘেরাওয়ের আগেই সবাই স্থান ত্যাগ করতে সক্ষম হয় কিন্তু সেখানে আর কেউ ফিরে যায়নি। বাড়িটা পুরোপুরিভাবে ধ্বসে যায়। জায়গায় জায়গায় বোমার আঘাতে দু'মিটার পর্যন্ত গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল।

এগুলো শুধু সেই ক্যাম্পগুলোর অবস্থা যেগুলোতে আমি যেতে পেরেছিলাম। এরকম প্রচুর ক্যাম্প ছিল। সেখান থেকেও একই ধরনের সংবাদ আসছিল। ক্যাম্পগুলোতে এক হাজারেরও বেশি সাধারণ শরণার্থী ছিল, ছিল না কোনো যোদ্ধা।

বিমান হামলার চাপ নেয়া সত্যিই অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভালো আবহাওয়া ভয় আরো বাড়িয়ে দেয়। কারণ এমন আবহাওয়ায় পাইলট লক্ষ্যভেদ করতে পারে সহজেই। একসাথে বেশি মানুষ জড়ো হতো না। এই পরিবেশে থাকতে থাকতে সবারই শ্রবণ ক্ষমতা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। বিমানের মতো কোন শব্দ শুনলেই কথা বন্ধ হয়ে যেত। রাস্তায় থাকলে দাঁড়িয়ে পড়ে সবাই বলত, 'শশশ!'

মাথা খাড়া করে চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করত তেকোণা 'মৃত্যুদূত' কোথায়। গাড়িতে থাকলে ড্রাইভারকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথচারীর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কাউকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেই বোঝা যেত কী ঘটতে চলেছে। অমনি শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যেত।

বোমা হামলার একটা নিয়মের মধ্যে সামান্য দয়ার একটু ব্যাপার ছিল। রাশিয়ানরা চাইলে মধ্যরাতে বিমান হামলা চালাতে পারত যখন প্রতিটি বাড়ি

BanglaBook.org

ভর্তি ঘুমিয়ে থাকা শরণার্থী। সেক্ষেত্রে সবাই মারা পড়তো। কিন্তু শরণার্থী শিবিরে বোমা হামলা হতো মধ্য দুপুরে। তখন অধিকাংশ মানুষ বাইরে থাকে এবং বিপদের ব্যাপারেও পূর্ণ সতর্ক। দিনে একবারই বিমান হামলা হতো, পরেরদিন আবারও। এর মাঝের সময়টা থাকত শান্ত; তখন চাইলে লরি কিংবা ট্রাক ঠিক করে জিনিসপত্র, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে পালানো যায়। সবাই তাই-ই করতে লাগল এবং গ্রীষ্ম আসতে আসতে ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামগুলো সুনসান ভূতের রাজ্যে পরিণত হলো।

পর্বতের উঁচুতে ভেদেনোর দিকে যাওয়ার আগে প্রথম বসতি ছিল সার্জেন ইয়ার্ট। সার্জেন ইয়ার্টে ইয়ারেগি নামের এক চুয়ান্ন বছর বয়সী লোক তার ছেলেকে কবর দিচ্ছিল। কবর খোঁড়ার সারাটা সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে বোমারু বিমানের ভয়ে। গ্রামের বাইরে তখন বোমা হামলা চলছিল কয়েক সেকেন্ড পর পরই। লাশ দাফনের আগে প্রার্থনার সময় ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছিল ইয়ারোগি ও তার এক আত্মীয়। এখানে শুধু সাদা কাফনে মোড়া মৃতদেহটাই নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ইয়ারেগি আর তার ছেলে শালিতে আক্রমণের ঠিক পরপরই পালাতে চেষ্টা করে। ছেলেটা গাড়ি চালাচ্ছিল এমন সময় একটা বুলেট এসে তার গায়ে লাগে। সাথে সাথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ছেলেটা।

একটা শেল এসে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। ইয়ারেগি বলল, 'আমি আমার ছেলেকে টেনে বের করি গাড়ি থেকে। ওর লাশ নিয়ে ছয় ঘন্টা একটা নর্দমায় পড়ে রইলাম। অন্ধকার ছাড়া বের হবার উপায় ছিল না। রাত নামলে আমি ওখান থেকে পালালাম। একটু পর কয়েকজনকে সাথে নিয়ে গিয়ে ওর লাশ নিয়ে আসি। চারিদিকে তখনও গোলাগুলি চলছিল। মৃত্যু বোধহয় আমার কপালে লেখা ছিল না, তাই বেঁচে আছি।'

মেঠো বুনোপথ দিয়ে তখন কিছু বোয়েভিক হেঁটে যাচ্ছিল। ওদের দেখে ইয়ারেগি বলল, 'সব এই হারামজাদাগুলোর দোষ। আমরা কেউ যুদ্ধ চাইনি, চাইনি এতো শেষকৃত্য। অনেক বৃদ্ধদেরও পালাতে হচ্ছে, নয়তো মারা পড়ছে।'

রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে চেচেনদের ঘৃণাটা স্বাভাবিকভাবে এখন বোয়েভিকদের ওপরেও অনেকে ক্ষিপ্ত। তারাও বোমা হামলার প্রত্যক্ষ কারণ। যেদিন যোদ্ধারা গ্রামে এসে ঘাঁটি গাড়লো, বিদ্রোহী পতাকা ওড়ালো, এরোপ্লেন তাক করে মেশিনগান চালালো সেদিন থেকেই গ্রামবাসীর ভয়—এই বুঝি ধ্বংস এলো!

BanglaBook.org

***

একজন ফ্রেঞ্চ রীতিমতো হতভম্ব। এ কেমন যুদ্ধে জড়িয়েছে রাশিয়ানরা? পচা-বাসি রুটি খেয়ে বেঁচে আছে, তুষারের ওপর ঘুমাচ্ছে, কোন কোয়ার্টার নেই, বন্দী নেই। আহত ব্যক্তিকে ফেলে রাখা হয় মৃত্যুর প্রহর গোণার জন্য। শত্রুরা এসে মাথা কেটে নেয় (অতি দয়াদ্র কেউ হলে শুধু হাত কাটে)।

আমাদের দেশের কেউ কেউ আলজেরিয়ায় গিয়েছিল। তারা ভালো খেতে পারত, ভালো পরতো, ভালো বেতন পেত। এমনকি বিজয়ের আশাও ছিল।

-আলেকজান্ডার দ্যুমা, ১৮৫৮

পার্বত্য উপত্যকা দখলের যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হতে থাকায় রাশিয়ান সেনাবাহিনি তাদের চিরায়ত কিম্ভুতকিমাকার আর্মি ইউনিফর্ম ছেড়ে ক্যামোফ্লাজ স্পোর্টস টি-শার্ট পরতে শুরু করল। মহিকানদের মতো চুল বড় করল, কেউ কেউ একেবারে ন্যাড়া। ধীরে ধীরে আবহাওয়ার উন্নতিতে তাদের শরীর তামাটে হয়ে গেল। দাড়ি গজালো। মাথায় জলদস্যুদের মতো রুমালের নিচে চকচকে সানগ্লাস।

রাশিয়ান সৈন্যরা গ্রোজনি জুড়ে আঁকাবাঁকা পথে এপিসিতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। রাস্তায় পাশে জায়গায় জায়গায় পড়ে থাকতে দেখা যায় সাধারণ মানুষের পরিত্যক্ত গাড়িগুলো। রাশিয়ানদের গাড়িতে লাল পতাকা, লেলিনের ছবি আর আর্মিদের অদ্ভুত গুণগান।

একবার আমি দেখেছিলাম, দু'জন বিশালদেহী সৈন্য তাদের রাইফেল আর বডি আর্মার পরে পোজ দিচ্ছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন সায়েন্স ফিকশন সিনেমার চরিত্র। বিশাল হেলমেট, ক্যামোফ্লাজ প্যাড, বুলেটপ্রুফ ভেস্ট কাঁধের ওপর রাখল আর তাদের আরেক বন্ধু ছবি তুলল।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, তরুণ সৈন্যরা হয়তো তো ফ্যাশন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছে যেন নিজেদের শক্তিশালী বীর মনে হয়। যেমনটা তলস্তয় ১৯ শতকে চেচনিয়া যাবার সময় লিখেছিলেন, 'আমার একটা বন্দুক আছে, শক্তি-তারুণ্য সবই আছে। আর আছে পর্বত!

BanglaBook.org

প্রকৃতপক্ষে এই দখলদার সেনারা যা করছিল তার পুরোটাই ছিল মেকি। ভেতরে ভেতরে তারা আসলে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল, তারা মূলত রাজনীতিবিদদের যুদ্ধের আজ্ঞাবহ দাস। এমনকি তারা নিজেদের পদ অনুযায়ী নিয়মানুবর্তিতাও মেনে চলতে পারছে না। সোভিয়েত আইডোলজি ভেঙে পড়তে দেখে নিজেরাও ইতোমধ্যেই ভেঙে পড়েছে।

তারওপর সেনাবাহিনির বাজেট কমিয়ে দেয়া ও হঠাৎ করে সমগ্র ইউরোপ ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সেনাবাহিনি প্রত্যাহার করা তো আছেই। চেচনিয়ার যুদ্ধটা রাশিয়ান কার্যকরী বাহিনিকে শেষ করে দিয়েছে। বেসরকারি সৈন্যদের পলায়ন, সৈন্যদের ঠিকমতো খেতে দিতে না পারা, সাধারণদের ওপর আক্রমণের আদেশ দেয়া—এসব কারণে সকল পদেই সৈন্যরা মনোবল হারিয়েছে। দ্বিধাবিভক্ত, ক্ষুব্ধ সৈন্যর সংখ্যা দিনকে দিন বেড়েই চলছিল।
পাহাড়ি এলাকা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে সৈন্যদের দেরি হবার কারণ হিসেবে রাশিয়ান প্রোপাগান্ডা মেশিন দারুণ এক অজুহাত বের করল। তারা বলল, বামুত এলাকাটি দুর্ভেদ্য কারণ সেখানে অব্যবহৃত সোভিয়েত নিউক্লিয়ার মিসাইল ঘাঁটি রয়েছে যা রাশিয়ান আর্টিলারি ও বিমান বাহিনি ধ্বংস করতে পারবে না। এদিকে কাছেই ওরেখোভোতে শত শত বিদেশি ভাড়াটে সৈনিক জড়ো হয়েছে। হাজার হাজার দেশি সৈন্য দলবেঁধে অবস্থান নিয়েছে গ্রামগুলোতে। তারা রাশিয়ানদের চেয়েও ভারি অস্ত্রে সজ্জিত। এমনকি টেলিভিশনে উপত্যকার গ্রামগুলোর অবস্থানকে বলা হচ্ছিল 'বিশাল পর্বত চূড়া'র ওপর।

বামুত-এ পুরনো মিসাইল বাংকার রয়েছে এ কথা সত্য তবে বাকি সবই প্রোপাগান্ডা। চেচেনরা বামুতের পুরো উপত্যকা রক্ষা করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নেয়ার পর্যায়ে নেই কারণ সেক্ষেত্রে তাদেরকে ছড়িয়ে পড়তে হবে। বিদেশি ভাড়াটে সৈন্য দলের গপ্পোও পুরোটাই বানোয়াট। আর তাদের 'বিশাল উঁচু পর্বত' আসলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র পাঁচশ কি এক হাজার মিটার ওপরে। সবচেয়ে তিক্ত সত্য হলো, একেকটা গ্রামে সর্বোচ্চ দু'শ মানুষের বাস আর এদের মধ্যে যোদ্ধা হবে টেনেটুনে চল্লিশজন।

চেচেনরা অস্ত্রেশস্ত্রে রাশিয়ানদের চেয়ে শক্তিশালী এই দাবি রাশিয়ান জনগণের জন্য হতবুদ্ধিকর হলেও বাস্তবে হাস্যকর। চেচেনদের সেরা অস্ত্র আরপিজি, দূরপাল্লার ওয়ার-গাইডেড এন্টি ট্যাংক রকেট আর কিছু রাশিয়ানদের থেকে পাওয়া হেভি গান। বেশ কিছু যোদ্ধার কাছে কালাশনিকভ

BanglaBook.org

আছে বটে কিন্তু দেখলে মনে হয় পরের শটেই খুলে পড়ে যাবে! বামুতবাসীর গর্ব ছিল একটা ট্যাংক; পাশের এক গ্রামে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সময় রাশিয়ানদের থেকে দখল করা। এটাকে তারা বলে 'দ্য চেচেন আর্মস ইন্ড্রাস্ট্রি' (!)। তাদের এসব 'হোমমেড' অস্ত্র শক্তিশালী কিন্তু তা এ পরিস্থিতিতে আদর্শ নয়। একটা ব্ল্যাকমার্কেট হেলিকপ্টার রকেট ছিল যেটাকে মেরামত করে আরপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছিল। আরেকটা ছিল ভারি মেশিনগান; দখল করা এপিসি থেকে পাওয়া নল ঝালাই করে ট্রাইপড বানানো হয়েছে এয়ারক্রাফটে গুলি করার জন্য।

রাশিয়ান এক সামরিক সূত্র মতে নতুন অস্ত্র ও গোলাবারুদ-যেমন গ্রেড রকেট, আরপিজি-আজারবাইজান ও তুরস্ক থেকে ককেশিয়ান পর্বত পথে চোরাচালান করে আনা হয়। কিছু আনা হয়েছে চুরি করে আর কিছু দাগেস্তানের রাশিয়ান বর্ডার গার্ড এর সাথে টাকার বিনিময়ে আঁতাত করে। আজারবাইজান থেকে বিমানের মাধ্যমে অস্ত্র যোগানের অন্তত একটা ঘটনার কথা জানা যায়। অজ্ঞাতে আরো হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু রাশিয়ানরা যতোই অভিযোগ দায়ের করুক না কেন কখনও প্রমাণ করতে পারেনি—বোয়েভিকরা বিদেশি অস্ত্রের যোগান পায়।

আসল কলংকজনক সত্য হলো, রাশিয়ান বাহিনির শৃঙ্খলা এমন ভেঙে পড়েছে যে স্বয়ং রাশিয়ান সৈন্যরা চেচেনদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে শুরু করেছে! আদর্শহীনতা, ভঙ্গুর মনোবল, দারিদ্র্য, ক্ষুধা দুর্নীতিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। একজন ক্যাপ্টেনের বেতন মাসে সাতশ ডলার মাত্র। অর্থাৎ দৈনিক যুদ্ধ বাবদ বাইশ ডলার পায়, তাও মাসের পর মাস বেতন আটকে থাকত। আর অস্থায়ী সৈন্যদের বেতন ছিল দিনে মাত্র পাঁচ ডলার। প্রতিটা রাস্তার চেক পয়েন্ট এক একটা ব্ল্যাকমার্কেটে পরিণত হয়েছিল। সৈন্যরা সেখানে আর্মড ভেহিকেলের পেট্রোল বিক্রি করত ভদকা বা খাদ্যের বিনিময়ে। মাঝে মাঝে তো পথচারীদের ডকুমেন্টস চেক করার সময় আক্ষরিক অর্থেই ভিক্ষা চেয়ে বসত! একদিন তো দেখি আরগুনের চেকপোষ্টে এক হাড় জিরজিরে অস্থায়ী সৈনিক ডেলিভারি ট্রাকের চেকিং-এর সময় ট্রাকের পেছন থেকে পিঁয়াজ নিয়ে পকেটে ভরছে। এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে দামী বিক্রয়যোগ্য বস্তু হলো—অস্ত্র ও গোলাবারুদ।

একটা ঘটনায় রাশিয়ান সৈন্যদের এক ইউনিটের বিরুদ্ধে এপিসি বিক্রির

BanglaBook.org

অভিযোগ সামনে এলো। চেচেনরা জানাল-প্রমাণও মিলল তাদের কথার-এই এপিসি বিক্রি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কিছু অস্ত্র, বিশেষ করে এপিসি ও ট্যাংক আসলেও যুদ্ধের সময় ফেলে পালাতে হয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে একটা চক্র ছিল যারা অস্ত্র হারানোর নাম করে চেচেনদের কাছে বেচে দিত। এক রাশিয়ান অফিসার আমাকে বলেছিল, ট্যাংক ও গ্রেড রকেট ছয় হাজার ডলারে বিক্রি হয়।

মিলিটারিদের এই ব্যর্থতা ক্রমেই সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। বেশিরভাগ সৈন্যদের মাঝে সাধারণ জনগণ মেরে জয়ী হবার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। জিতে গেলেও ঘৃণিত দখলদার হিসেবে নাম লেখাতে হবে, কখনই সম্মানিত কর্তৃপক্ষ হতে পারবে না তারা। একটা অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে এলেও সৈন্যরা ব্রিজ বা রাস্তার পাশের ব্যারিকেড দেয়া চেকপোষ্টে বসে থাকত। শুধু বহির্গামী যানবাহনের কাগজপত্র চেক করার জন্য বের হতো। কাজ শেষে ফের বালির বস্তায় ঘেরাও করা ট্রেঞ্চে বসে ভদকা আর রক মিউজিকে মেতে উঠতো।

এমন নির্জন চেকপয়েন্ট চেচেনদের ঘৃণা উদগীরণের মোক্ষম জায়গা হয়ে উঠেছিল; প্রায়শই আক্রমণের শিকার হতো। এর ফলে রুশ সৈন্যরাও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের যানবাহনের ওপর। কখনও তাদের চেকপোস্টে আটকে দিত, কখনও লাইনে না দাঁড়ালে টায়ারে গুলি করত। কখনও কখনও তো মানুষকেও ছাড় দিত না। ক্রোধ আর অ্যালকোহল—এই দুই বস্তু রাশিয়ার নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিল।

এমনকি গ্রোজনিও সৈন্যরা ভালোমতো পরিচালনা করতে পারছিল না। সাধারণের জীবনযাত্রার তেমন উন্নতি হয়নি। বিদ্যুৎ সংযোগ ও পানি সরবরাহ পুনঃস্থাপন ও কিছু হাসপাতালের সংস্কার হয়েছে বটে কিন্তু গত কয়েকমাসে দশ হাজারের মতো বাড়িঘর-অ্যাপার্টমেন্ট ধ্বংসের তুলনায় এ যেন গরু মেরে জুতা দান। চোখে পড়ার মতো একটাই স্থাপনা তৈরি হয়েছে। তা হলো রাশিয়ান সরকার কর্তৃক গঠিত পুতুল সরকারের সদর দপ্তর। যার পরিচালক হিসেবে আছে সালামবেক খাদজিয়েভ, প্রাক্তন সোভিয়েত খনিজ মন্ত্রী। বিল্ডিং থেকে নতুন লাগানো রঙের গন্ধ আর রাশিয়ান সচিব কর্মকর্তা ও তাদের আলোচনার গুঞ্জন পাওয়া যায়। ভেতরে গেলে মনে হবে আপনি শান্তশিষ্ট মস্কো শহরে আছেন অথচ ভবনের বাইরেটা পরিপূর্ণ রাগ, ঘৃণা আর অবিশ্বাস দিয়ে।

রাতেরবেলা গ্রোজনিতে স্নাইপাররা লুকিয়ে থাকত কংক্রিটের দেয়াল বা

BanglaBook.org

বাংকারের পেছনে। সুযোগ পেলেই রাশিয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে চমকে দিত তাদের। রাশিয়ানরা জানত, দিনের বেলায় এসব স্নাইপার দেখতে রাস্তায় হাঁটতে থাকা এক সাধারণ নাগরিকের মতোই, আলাদা করার জো নেই।

রাশিয়ানরা অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসের চারপাশে ব্লকের পর ব্লক জুড়ে থাকা সমস্ত ভবন বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে করে দিল যতোক্ষণ না সিটি সেন্টারের চারপাশ গড়ের মাঠে পরিণত না হয়। যোদ্ধাদের মারতে না পেরে তাদের আশ্রয়স্থল ধ্বংস করা হলো।

গ্রোজনির পরিবেশও রাশিয়ানদের জন্য একেবারেই অনুকূলে ছিল না। সৈন্যরা দিনের বেলায় শহরে অবস্থান করলেও আশেপাশের কথাবার্তার একটা অক্ষরও বুঝতো না। ওই কর্নারে বসে থাকা লোকগুলো কি খাবারের দাম নিয়ে কথা বলছে নাকি ভাঙা বাসা মেরামত নিয়ে? আবার হতে পারে, ওরা তাকে হত্যা কিংবা আক্রমণের প্ল্যান আঁটছে! আসল কথা কখনই জানতে পারবে না রাশিয়ান সৈনিকটি।

সব চেচেনকে দেখতে একই রকম লাগত ওদের কাছে। কোন বিচক্ষণ রাশিয়ান সৈন্য কখনই জনাকীর্ণ মার্কেটে প্রবেশ করত না, যদিও সেখানে চাইলেই অস্ত্র থেকে ফার কোট কিংবা মসলা—সব মিলত। কারণ ভীড়ের সুযোগে প্রায়ই প্রকাশ্যে সৈন্যদের গুলি করে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যেত। আবার কখনো গুম হয়ে যেত সৈন্যরা। পরবর্তীতে তাদের মাথাবিহীন ধরটা শুধু রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যেত।

এমনকি খাদজিয়েভের সরকারি ভবনের লোকজন কী ভাবছে, বলা মুশকিল। এন্টি-দুদায়েভদের তালিকা করে তাদের রাশিয়ান ইউনিফর্ম পরার অনুমতি দেয়া হয়েছিল কিন্তু এমন একজন লোকই আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বোয়েভিকদের ব্যাপারে কী ভাবো?'

আমি ভাবলাম, লোকটা হয়তো দুদায়েভ এবং বিদ্রোহীদের মুণ্ডুপাত করবে। কিন্তু তার পরিবর্তে আমাকে চুপি চুপি বলল, 'তারা এই রাশিয়ান শুয়োরদের দেখিয়ে দিচ্ছে কীভাবে যুদ্ধ করতে হয়, তাই না? যদি পর্বতের ওদিকে যাও তাহলে বলবে, তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে।'

খাদজিয়েভ রাশিয়ানদের গোলাম হওয়া সত্ত্বেও নিজেই এই প্রহসনের শেষ চায় এবং রাশিয়ানদের 'দখলদার বাহিনি' বলে ডাকে।

শুধু যে পুরুষরাই রাশিয়ানদের ঘৃণা করত এমন না, শিশুরাও সেই প্রথম

Banglabook.org

দিন থেকেই যুদ্ধে সাহায্য করছে। আহত যোদ্ধা বা গোলাবারুদ বহন করতে করতে মনে মনে আশা করত, একদিন বাবা বা বড় ভাইয়ের সাথে সেও যুদ্ধ করবে। এমনিভাবে মেয়েরাও ঘৃণা করত ওদের। রাশিয়ান সৈন্যরা কীভাবে জানবে, যে মেয়েটা এখন তার কাছে সিগারেট বিক্রি করছে সে একজন যোদ্ধার মা কিংবা বোন নয়, কিংবা বিদ্রোহী নেটওয়ার্কের সক্রিয় সদস্য নয়?

একবার আমি একটা বাসে চড়েছিলাম। বাসে একদল মহিলা গল্প করছিল। চেকপোস্টে বাস থামলে রাশিয়ান এক তরুণ সৈন্য চেক করতে উঠল। সাথে সাথেই প্রতিটি মহিলার চেহারায় তীব্র দ্বেষ ফুটে উঠল। তরুণ সৈন্যটি দশ সেকেন্ডের মধ্যে কোনোমতে 'চেক' শেষ করে তড়িঘড়ি নেমে গেল।

রাশিয়ান আর তাদের চেচেন দোসররা কিছুতেই এই ঘৃণা কমাতে পারছিল না।

মাঝে মাঝে গ্রোজনিতে প্রোপাগান্ডা অফিসাররা এপিসিতে চেপে লাউডস্পিকারে সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীদের ত্যাগ করার আহ্বান জানাত। একই বার্তা সংবলিত লিফলেট বিতরণ করা হতো হেলিকপ্টার থেকে। কিন্তু মানুষ অতো বোকা না।

একদিন একটা এপিসি এসে বাজারের পাশে পার্ক করল এবং এক অফিসার দুদায়েভ বিরোধী আর্টিকেল ও রাশিয়ান শাসনের উপকারিতা সম্বলিত সংবাদপত্র বিলি করতে লাগল। প্রথমে লোকজন কৌতূহলবশত জড়ো হয়েছিল কিন্তু খানিকবাদেই তারা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে লাগল অফিসারকে। অফিসার এবং চালককে খুবই নার্ভাস দেখাচ্ছিল। অফিসারকে দেখে বেশ শিক্ষিত ও ভালো মানুষ মনে হচ্ছিল। সে জবাব দেয়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু তার কথা হারিয়ে যাচ্ছিল চিৎকার চেঁচামেচিতে। এরমধ্যেই এক চেচেন চিৎকার করে বলে উঠল, 'এ সবই তোমরা আমাদের উপহার দিয়েছ,' একটা আঙুল দিয়ে চারপাশের ধ্বংসস্তূপ দেখাল সে।

অবস্থা বেগতিক দেখে অফিসার এপিসির ঢাকনা বন্ধ করে চলে গেল। লাউডস্পিকার থেকে ভেসে আসতে লাগল—*দস্যুদের সাহায্য করবেন না। আপনাদের ব্যবহার করছে তারা। আপনাদের আশ্রয়ে থেকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে নিয়োজিত রাশিয়ানদের হত্যা করছে। দস্যুদের সাহায্য করবেন না।...*

গ্রোজনি থেকে দূরে, রণক্ষেত্রের কাছে ভয় আর ভুল বোঝাবুঝির মাত্রা

BanglaBook.org

অনেকগুণ বেশি। শালিতে রাশিয়ান সৈন্যরা রাস্তায় টহল কমিয়ে দিল কিন্তু লাভ হলো না। একজন সৈন্য ইউনিফর্ম ছাড়া বের হয়ে কয়েকজন নিরস্ত্র মানুষের রোষানলের মুখে পড়ল।

মার্চের দিকে আমি অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের সৈন্যদের সাথে এপিসিতে চেপে গ্রোজনিতে গিয়ে দেখলাম, আবহাওয়া একেবারেই বদলে গেছে। গ্রোজনি এখন বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। রাস্তায় কোন মানুষ বা যানবাহন দেখতে পেলাম না। চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রান্তিক পরিবেশ।

ওয়াটার প্লান্ট স্টেশনে চেকিং করতে গিয়ে বিস্ফোরিত কুঁড়েঘরে একজন মহিলার দেহাবশেষ দেখতে পেলাম। সম্ভবত শুরুর দিকের বিমান হামলার সময় মারা গেছেন। তার চেহারা মেহগনি রঙ ধারণ করেছে। জায়গাটা ভয়াবহ রকমের শান্ত।

এপিসি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট নিকোলাই সেন্ট্রিদের দাঁড়া করালো। এরপর সবার উদ্দেশ্যে বলল, 'এটেনশন! আমরা প্রথমে জায়গাটা চেক করব তারপর চলে যাব। এখানে আমার সময় শেষ, আমি শিগ্রই ফিরে যেতে চাই।' তার কণ্ঠের ভীতি সকলের মাঝে সংক্রমিত হলো—এপিসির ছোট্ট খুপড়িমতো জানালা দিয়েও তা স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

নৈতিকতার পতনের পাশাপাশি নিজেদের এবং অপর মানুষের জীবনের প্রতি সম্মানবোধ হারিয়ে ফেলেছিল রাশিয়ানরা। রাশিয়ান সৈন্যদের নির্মমতার গল্প অনেক পুরনো। কিন্তু এই যুদ্ধ নির্মমতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। সর্বত্র একটা চিরস্থায়ী বিশৃঙ্খলা। মা'কে বলা হয় না তার সন্তানের ভাগ্যে কী ঘটেছে।

যুদ্ধশেষে আরটিআর ন্যাশনাল টেলিভিশন একটা মনে রাখার মতো তথ্যচিত্র প্রচার করে যেখানে দেখা যায়, সৈন্যরা তাবুতে নির্বিকারভাবে বসবাস করছিল পাশেই বডিব্যাগের মধ্যে লাশ নিয়ে! এই ঘটনাও অজানাই থেকে যেত। তথ্যচিত্রটা আলোর মুখ দেখে কারণ তাদের তাবু একবার আগুনে পুড়ে যায়।

পরিস্থিতি আরো খারাপ হলো যখন অস্থায়ী তরুণ সেনাদল সরিয়ে বয়স্ক সৈন্যদেরকে বেশি বেতনে চুক্তিবদ্ধ করা হলো। এই 'কন্ট্রাক্টনিকস' (এই চুক্তির আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত সৈনিকদের বলা হতো) নিয়োগের এর লক্ষ্য ছিল পরিণত বয়সের সৈনিকদের নিয়োগ দেয়া, জোর করে ঢোকানো স্কুল বালকদের নয়। কিন্তু পশ্চিমা দেশের সাথে তুলনা করলে এরাও পেশাদার সৈন্য

BanglaBook.org

নয়, কয়েক মাসের জন্য চুক্তিবদ্ধ মাত্র। এমনকি পূর্বে কখনও দেশের জন্য সামরিক কাজে অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতাও নেই অনেকের।

মার্সেনারি রিক্রুটমেন্টের সময় সাধারণত যেসব প্রশ্ন করা হয়, এদের নিয়োগের সময়ও সেসব প্রশ্ন করা হয়েছে। তাদের অনেকেই স্বীকার করেছে যে তারা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি, কেউ মাতাল, এমনিক গৃহহীন উদ্বাস্তুও আছে এ তালিকায়। কেউ বলেছে দেশপ্রেম থেকে আসতে চায়, কেউ বলেছে অ্যাডভেঞ্চারের অনুভূতি নিতে। অনেক লোক এসেছিল যাদের সমাজের কোথাও যাবার জায়গা নেই। তবে সবচেয়ে দুঃখজনক ছিল তাদের উত্তর যারা চেচনিয়ায় আসতে চায় কিছু টাকা কামাতে।

শালিতে একজন তো সরাসরিই আমাকে বলেছিল, 'আমি একটা ফ্রিজ কিনব এ টাকায়!'

এতে সমস্যা আরো ঘনীভূত হলো। যাদেরকে নেয়া হয়েছে তাদের বয়স ত্রিশের বেশি। মাসে তিনশ ষাট ডলারে নিয়োগপ্রাপ্ত। তারা দশ বছরের ছোট, আপাতদৃষ্টিতে বিনা বেতনের অস্থায়ী তরুণ সৈন্যদের ওপর খবরদারি করতে লাগল। কন্ট্রাক্টনিক ও পেশাদার অফিসারদের মাঝে শীতল একটা সম্পর্ক বিরাজ করতে লাগল।

চেচেন লোকজন বেশি ঘৃণা করত কন্ট্রাক্টনিকদের। কারণ বাধ্যতামূলক সৈন্যরা তাদের নিজের ইচ্ছায় আসেনি। কিন্তু এরা নিজের ইচ্ছায়, টাকার জন্য লড়ছে তাই তারা বেশি ঘৃণিত ছিল। আর এরাও জানপ্রাণ দিয়েই যুদ্ধ করত চেচেনদের বিরুদ্ধে। কারণ তারা জানে, একবার ধরা পড়লে মৃত্যু নিশ্চিত।

কন্ট্রাক্টনিকরা সন্দেহভাজন যোদ্ধাদের খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল। চেচেন লোকজন কন্ট্রাক্টনিক দ্বারা পরিচালিত চেক-পয়েন্টগুলোকে ভয় পেত। তারা ডান কাঁধে কোনো দাগ আছে কিনা খোঁজ করত; ভারি অস্ত্র বহন করলে এমন দাগ হয়। সামান্য সন্দেহ দেখা দিলেই তাদেরকে গোপন বিচার বহির্ভূত 'ফিল্ট্রেশন ক্যাম্প'-এ নেয়া হতো।

যুদ্ধের উপযোগী বয়সী পুরুষরা হঠাৎ হঠাৎ গুম হয়ে যেতে থাকল।

১৯৯৫-এর গ্রীষ্ম আসতে আসতে এক হাজার নিখোঁজ চেচেন তালিকাভুক্ত হলো। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান এবং সাংবাদিকদের ফিল্ট্রেশন ক্যাম্পে প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিন্তু যারা ফিরে আসত, কী এক ভয় যেন তাদের তাড়িয়ে বেড়াত। গর্তে বন্দি করে রাখার গল্প বলত। বলত, কীভাবে সিগারেটের ছ্যাঁকা, পাথরের

BanglaBook.org

আঘাত এবং গরম পানি দিয়ে নির্মম নির্যাতন করা হতো।

অনেক পেশাদার অফিসারকেই এই যুদ্ধ বিব্রত করছিল। তারা যুদ্ধের বিভীষিকা ভুলে থাকার জন্য তাদের ট্রেনিং ও সোভিয়েত আর্মির সময়কার স্মৃতি রোমন্থনের চেষ্টা করত। ১৯৯৫-এর গ্রীষ্মের শুরুতে সামাস্কির বাইরে একজন অফিসার আমাকে বলল, 'এসব আমাদের শেষ করা প্রয়োজন এবং একটা মধ্যস্থতায় পৌঁছানো উচিত।'

সে সামাস্কি গ্রামের দিকে ইশারা করে জানাল, গ্রামটা বসন্তে তথাকথিত দখলে এলেও সত্যি বলতে গ্রামের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

'প্রতি রাতে তারা গাছের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে এসে মেশিনগান ও রাইফেল দিয়ে গুলি করে আমাদের।'

এরপর যখন সে বামুত নিয়ে বলল, সে কথাগুলো ছিল কোনো ধরনের প্রোপাগান্ডাবিহীন নিরেট তথ্য।

'ওখানে একশ'র মতো যোদ্ধা আছে তবুও জায়গাটা কব্জা করা আমাদের জন্য খুব কঠিন। বোমা ফেললেই বিদ্রোহীরা বাংকারে আশ্রয় নেয়। আমরা বোমার পর বোমা ফেলি। কিন্তু এটা কোনো কার্যকর সমাধান নয়। আমাদের সমঝোতায় আসা উচিত। আমার কথা যদি বলি, আমি বাড়ি ফিরতে চাই। ছয় মাস ধরে এখানে আছি। আমি এখন ক্লান্ত।'

যারা মারা পড়েছে তারা অধিকাংশ অস্থায়ী সৈন্য। তারাও সমাজের অংশ ছিল কিন্তু এখন আর ফিরে আসবে না, যুদ্ধও করতে পারবে না।

'আমি জানি না, আমি মারা যাব কিনা। আমি প্রতিদিন গোলাগুলি করি। আমি এখন বাড়ি যেতে চাই। আমার মনে হয় না, কেউ-ই যুদ্ধ চায়। সবাই বাড়ি ফিরতে চায়। আমাদের অনেকেই মারা গেছে। আমার কিন্ডারগার্টেনের এক বন্ধু গ্রোজনিতে মারা গেছে,' বিশ বছর বয়সী অস্থায়ী সৈন্য লিওনিদ বলল। তার বয়সী শত শত তরুণ বন্দি হয়েছে। বন্দি অবস্থায় কেউ কেউ নিজেদের বাহিনির বোমার আঘাতে মারা গেছে, কেউ মুক্ত হয়েছে, কেউবা আবার বন্দি-বিনিময়ের আওতায় পড়েছে। আর যারা বেশি হতভাগা তারা যুদ্ধের পরও বহুদিন পর্যন্ত আটক ছিল। তাদের সরকার তাদের ভুলে গেছে।

তবে অস্থায়ী সৈন্যদের সবচেয়ে তীব্র হতাশা বুঝতে হলে আপনাকে পলাতক সৈন্যদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। এরা পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনি ছেড়ে পালিয়ে শত্রুর কাছে গেলে তাদের স্বজাতি বন্দিদের হত্যা

BanglaBook.org

করতে বলা হতো।

এসব পলাতকরা পুরো দক্ষিণ চেচনিয়া জুড়েই ছিল। গেরিলাদের জন্য রান্না ও পয়-পরিষ্কারের কাজ করত। এমনকি বোয়েভিকদের সাথে যুদ্ধও করত। বোয়েভিকরা তাদের অদ্ভুত প্রস্তাব দেয়। তাদের বলে, তারা শুধুমাত্র মুসলিম হলেই যুদ্ধ করতে পারবে। আর না হলে বন্দী হয়ে থাকতে হবে বন্দি-বিনিময় পর্যন্ত। অনেকেই মেনে নিয়েছিল এ প্রস্তাব। ফিরে গিয়ে কোর্টমার্শালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার চাইতে অচেনা চেচেনদের সাথে থাকা অনেক ভালো প্রস্তাব।

কিছু পলাতক সৈন্যের অভিভাবক চেচেনদের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদের সন্তানকে গোপনে রাশিয়া ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এমন সৌভাগ্যবান ছিল সংখ্যায় খুবই কম।

প্রায় একশ'র মতো বন্দি রাশিয়ান সৈন্যকে বিভিন্ন চেচেন পরিবারে বিক্রি করা হয়। পরিবারগুলো এদের মাধ্যমে রাশিয়ানদের কাছে আটক নিজেদের সন্তানদের সাথে বন্দি-বিনিময় করত।

আবার মাঝে মাঝে রাশিয়ানরা চেচেনদের কাছে তাদের জীবিত সন্তান বা সন্তানদের লাশ বিক্রি করত শত, কখনও হাজার ডলারের বিমিময়ে। মানব জীবনের এই বিনিময় প্রথা নিয়ে প্রায় এক শতাব্দী আগে আলেকজান্ডার দ্যুমা লিখে গেছেন।

পাহাড়ি এক ক্যাম্পে কনস্ট্যানটিন নামে বিশ বছর বয়সী এক রাশিয়ান সৈন্য আমাকে তার রেজিমেন্ট থেকে পালাবার কারণ হিসেবে বলে, 'ওখানে আমরা পশুর মতো ছিলাম। একজন অফিসার আমাকে বেলচা দিয়ে মেরে পা ভেঙে দেয়। দু'মাস পরে পালাবার মতো সক্ষমতা অর্জন করামাত্রই আমি পালাই। অনেকেই পালানোর কথা চিন্তা করে। কেউই যুদ্ধ চায় না।'

কনস্ট্যানটিন পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তার নতুন নাম হয় কাজবেক। সে চেচেন গেরিলা বাহিনিতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

চেচেন গেরিলা বাহিনিতে যোগদান করা আরেক পলাতক সৈন্য বিশ বছর বয়সী শাশা। দক্ষিণ রাশিয়ার ছেলে সে। পালায়, কারণ এক রাশিয়ান অফিসার তাকে পর্বতের গুহায় রেখে শাস্তি দেয়। শাস্তি শেষ হতে হতে সেনাবাহিনিতে তার অস্থায়ী চুক্তিও শেষ হয়ে যায়। চুক্তি অনুযায়ী সে এখন আর্মি থেকে মুক্ত কিন্তু রাশিয়ানরা তাকে আরেকটা গুহায় আরো তিন মাস আটকে রাখে। শাশা তখন বুঝতে পারে, সে কখনোই মুক্ত হতে পারবে না, বাঁচতে পারবে না। তাই

BanglaBook.org

গ্রীষ্মের শুরুতে সে তার রাইফেল ফেলে বনের মধ্যে পালায়। সেখানে চেচেনরা তাকে খুঁজে পায়। সাধারণ জামাকাপড় পরিয়ে শাশাকে শামিল বাসায়েভের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

দু'মাস পরে ভাগ্যক্রমে আবারও তার সাথে আমার দেখা হয়। তার নাম এখন সেরাজদী। হাতে একটা তাসবীহ্ ধরে আছে।

আমাকে বলল, 'আমি এখন চেচেনদের সাথেই থাকছি।'

***

তোমার হৃদ-স্পন্দন একদিন বন্ধ হবে
ক্রন্দনরত মুখে থেমে যাবে 'আল্লাহ' উচ্চারণ
আর কখন দেখবে না সূর্যটা
আল্লাহ তোমায় নিয়ে যাবেন
যেভাবে শেষযাত্রার আগে আমরা বিদায় জানাই
সেভাবেই তোমার কাছে শপথ করলাম,
আমরা আমাদের জীবন দেব
যেন ককেশাস মুক্ত হতে পারে

তুমি চাইলেই পারতে নিজগৃহে বসে থাকতে
দূরে বসে দেখতে শয়তানের তাণ্ডব
কিন্তু তুমি এখানে এসেছো
এই ছোট্ট দেশের স্বাধীনতার জন্য
তুমি এই ভূমিতে এসেছো
চেচনিয়াকে শত্রুমুক্ত করতে
এবং আজ তুমি স্বাধীনতার তরে শহীদ

(১৯৯৫ সালে বামুত-এ গাওয়া চেচেন বাহিনির সংগীত)

চেচেনদের কাছে বামুত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। এমনিভাবে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস প্রতিরক্ষা এবং নিউ ইয়ার ইভের সময় রাশিয়ান সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করাটাও ছিল এক একটা কিংবদন্তী। দুদায়েভ অফিসিয়ালি

বামুতকে ‘বামুত দূর্গ’ বলে আখ্যা দেয়। ১৯৯৬-এর জুনে তেরোশ বাড়ি আক্রমণ করে চূর্ণবিচূর্ণ করার আগ পর্যন্ত আঠারো মাস যাবত বামুত ছিল দুর্ভেদ্য।

অন্যান্য আরো কিছু গ্রামের মতো বামুতও একটা খাড়া উপত্যকাবেষ্টিত। গাছে ঢাকা পর্বতের ঢাল গ্রামের প্রতিরক্ষার জন্য আদর্শ একই সাথে গুরুত্বপূর্ণও বটে। গ্রামের পেছনভাগ ইঙ্গুশেটিয়ার সীমান্তে হওয়ায় সেদিক থেকেও নিরাপদ বামুত। রাশিয়ানরা পেছন থেকে আক্রমণ করলে বামুতকে ঘিরে ফেলা সহজ হবে কিন্তু মস্কো ইঙ্গুশ ও উত্তর ককেশাশ অঞ্চলকে যুদ্ধে টেনে আনতে মোটেও ইচ্ছুক নয়। হতাশ জেনারেলদের কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে ইঙ্গুশেটিয়াকে না ঘাঁটানোর ব্যাপারে। সৈন্যরা সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া আসা করতে পারে কিন্তু ইঙ্গুশের ভেতরে বা ইঙ্গুশের মাধ্যমে সক্রিয় আক্রমণ চালানো ছিল অসম্ভব।

যেহেতু পেছনের অংশ নিরাপদ, বামুতের বোয়েভিকরা বুদ্ধিমানের মতো বিশ্রাম ও সাপ্লাইয়ের জন্য আরস্টি গ্রাম ব্যবহার করতে থাকে যা ইঙ্গুশেটিয়ার ঠিক ভেতরে। ওই গ্রামকে পেছনের ঘাঁটি বানিয়ে নেয়।

এই দুই গ্রামের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে রাশিয়ানরা দু’জায়গাতেই বিমান হামলার পাশাপাশি পদাতিক সৈন্যও প্রেরণের পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু ইঙ্গুশ প্রেসিডেন্ট রুসলান আউশেভ-এর তীব্র প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

বামুতের সামনের অংশ থেকে সমতল খুব ভালো মতো দেখা যায়। রাশিয়ানদের অবস্থান সাতশ মিটার দূর থেকে নজরে আসে। ব্লক হাউস, আর্মড ভেহিকেল আর চিন্তিত চেহারার গার্ডদের ভালোভাবেই দেখা যায়। শিফট পরিবর্তন করে বোয়েভিকরা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করল বাইরের দিকে। মাঝে মাঝে ইট-সুরকির আড়াল থেকে স্নাইপাররা রাশিয়ানদের হত্যা করত। উঁচু পাহাড়ের ডান দিক থেকে চেচেন মর্টার আর আর্টিলারি হামলা চালানো হতো রাশিয়ান ক্যাম্পে। প্রত্যুত্তরে দিন-রাত রাশিয়ান আর্টিলারি বর্ষণ হতে লাগল। ইতোমধ্যেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া স্থাপনাও রেহাই পায় না। মসজিদ ধ্বসে পড়েছে। কবরস্থানগুলোতে শেলের আঘাত পড়েছে। দুর্গন্ধময় মৃতদেহ আর পচা-গলা প্রাণির দেহ পাগলা কুকুর মুখে করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল গ্রাম জুড়ে। বামুতের আশেপাশের জঙ্গল আর পাহাড় চূড়ায় এমন বাজেভাবে বোমাবর্ষণ করা হয় যে গরমের দিনে মাটি পাউডারের মতো ভেসে বেড়ায়। জঙ্গলের জায়গায় জায়গায় স্প্লিন্টারের স্তূপ কিন্তু প্রতিবার বোমা বর্ষণের পর

BanglaBook.org

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট চেচেন গ্রুপ সংঘবদ্ধ হয়ে পাল্টা জবাব দেয়। এপ্রিল ১৯৯৫-এ তারা রাশিয়ার চারটা ট্যাংক আক্রমণ প্রতিহত করে!

চেচেন যোদ্ধারা যখন বুঝতে পারল এখানে তাদের অনেকদিন থাকতে হবে তখন তারা ইট-পাথরের মধ্যে থাকার অভ্যাস গড়ে তুললো। স্বাভাবিক জীবনের প্রতি বিদ্রুপ ভরা হাসি হাসল। বেশিরভাগ সৈন্য বামুত-এরই স্থায়ী বাসিন্দা। তারা আপনাকে দেখাতে পারবে যুদ্ধের আগে কোথায় তাদের ঘর ছিল, কোথায় তারা বেড়ে উঠেছে। এখন কংক্রীটের জঞ্জালে পরিণত হলেও এক সময় এটাই তাদের বাড়ি ছিল।

একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে চেচেনদের মধ্যে, 'হুম্মা আ ডাতস' (কোন সমস্যা নেই)।

তাদের হেডকোয়ার্টার ছিল মরা নদীর প্রান্ত ঘেঁষে। কাছেই একটা গরম পানির গোসলখানা এখনও টিকে আছে। পাশেই দোতলা বাড়ির ওপর বোমা পড়েছে কিন্তু এই সউনা বাথ এখনও একটা কাঠের স্টোভের মাধ্যমে গরম হয়। কালো দাড়ির বোয়েভিক মাগোমেদ এবং আমি গরম পানির সাথে খানিক ঠান্ডা পানি মিশিয়ে গায়ে ঢেলে বাইরে ইট-সুরকির মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। সন্ধ্যের ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে, দূরে তুষারাবৃত ককেশাসের চূড়া দেখা যাচ্ছিল।

রাশিয়ান আর্টিলারি শেল যখন আক্রমণ করল তখন আমরা কোথায় ছিলাম, বলা মুশকিল। আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু গোলার টার্গেট ছিল আমাদের মাথার অনেক ওপরের পাহাড় চূড়ায়। মাগোমেদ হেসে আমাকে বাথরুমের ভেতরে ফিরে যেতে বলল।

আমি অতিথি হওয়ায় কমান্ডার খানজাদ বাতায়েভ সবসময় আমাকে বোমা হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া ভালো রুমে রাখত। সাথে রান্নার মেয়ে রাইসা থাকত। আমাকে চা বানিয়ে দিত।

সে রাতে রাইসা খাসীর মাংসের স্যুপ ও আলু রান্না করে আমাকে, কমান্ডার খানজাদ এবং আরো কয়েকজন যোদ্ধাকে চায়না বোলে করে খেতে দিল। মনে হচ্ছিল যেন থিয়েটারে বসে খাচ্ছি। এই কামরাটি দেখলে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু পাতলা কাপড় দিয়ে আড়াল করা এর পাশের রুমটাই ইট-পাথরের স্তূপে পরিণত হয়েছে।

আমাদের খাওয়া চলাকালীনই বোমা হামলা শুরু হলো। দেয়াল থেকে শুরু করে হাতের চায়ের কাপ পর্যন্ত কাঁপছিল।

BanglaBook.org

খামজাদ আমাকে আশ্বস্ত করল, 'চিন্তা করো না, এখানে তোমার কিছুই হবে না। তোমার চারপাশে বিশ্বাসীর দল।'

আমি ভেবেছিলাম সে মজা করেছে কিন্তু পরে বুঝলাম, তারা আসলেই এ ধরনের ব্যাপার বিশ্বাস করে।

খানজাদের ইউনিট ঘুমাতো এবং গোলাবারুদ রাখত ভারি কংক্রীটের তৈরি সেলারে। রাইফেল এবং গ্রেনেড লঞ্চার ভালো করে কাপড় জড়িয়ে মাথার ওপরের শেলফে রাখা হতো। এক রাতে ঘন্টাখানেকের জন্য সতেরো বছর বয়সী উজ্জ্বল চোখের অধিকারী মোভলাদি গান ধরল।

নেকড়ের দল গ্রাচেভের পরোয়া করে না,
ঈগলের দল ইয়ারমলভকে পাত্তা দেয় না।

সবাই গানে মুগ্ধ হয়ে বলে উঠল, 'আল্লাহু আকবার'! আনন্দ অশ্রু দেখা গেল তাদের চোখে। মোভলাদির গানের গলা যে সুন্দর তা নয়, কিন্তু গানের কথায় সবাই মুগ্ধ হলো।

বামুতের লোক 'মেলখি টিপ' বা 'ক্লান' ঘরানার। এদের কাছে সুফিজম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এপ্রিলের এক শান্ত সন্ধ্যায় আট ন'জন যোদ্ধা হেডকোয়ার্টারের উঠোনে জড়ো হয়ে যিকির শুরু করল। প্রথমে যিকিরের ছন্দ ছিল না কিন্তু ধীরে ধীরে ধীরে প্রাণ সঞ্চারিত হলো। হাততালি এবং দুলুনির ছন্দ মনকে হালকা করে তোলে। তরুণরা দ্রুতই জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল এবং ঘামতে থাকল।

হ্যাঁ, তখনও গ্রামের প্রান্তে গোলাগুলি চলছিল। অন্ধকার আকাশে রাশিয়ান সিগন্যাল ফ্লেয়ার দেখা গেল উজ্জ্বল লাল ও সবুজ রঙের।

যিকিররত সৈনিকদের বুটের নিচে কাচ ভাঙার মচমচ শব্দ হচ্ছে। এক হয়ে ঘুরছে আর বলছে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।' তাদের মুখ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে। যখন তারা লাফাচ্ছিল, তাদের গোলাবারুদ পরস্পরে বাড়ি লেগে ক্লিপ ক্লিপ শব্দ তুলছে, ছুরিতে ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। যিকিরের চরমতম সময়ে যোদ্ধারা যেন অন্য জগতে চলে যায়, মন্ত্রমুগ্ধ। আমার ধারণা সেই মুহূর্তে তারা মরতে কিংবা মারতে একটুও দ্বিধা করবে না। তারা নশ্বর পৃথিবী থেকে আত্মাকে বহু দূরে নিয়ে চলে যায়।

যিকির শেষে এক লোক মুনাজাত ধরল, বাকিরা তাকে অনুসরণ করল।

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে সকলের চেতনা যেন এ জগতে ফিরে এলো। তারা এক অন্য মানুষে পরিণত হয়েছে, যেন তারা দেখে এসেছে মৃত্যুর ওপারের জগতটা। জানে, আজ রাতেই যদি তারা মারা যায় তাহলে জান্নাতে চলে যাবে। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, রাশিয়ানরা ট্রেঞ্চে বসে কখনো এই যিকির শুনেছে কিনা। শুনলে তাদের আত্মা শুকিয়ে যাবে!

বামুত একটা অন্ধকার জায়গা। একে রক্ষা করছে কঠিন, নিষ্ঠুর এবং ক্ষেত্র বিশেষে অপরাধীরা। কন্ট্রাক্টনিকরা ধরা পড়লে মেরে ফেলা হয়। অস্থায়ী সৈন্যদের বাঁচিয়ে রাখা হয়, কিন্তু নিজেদের সেনাবাহিনির বিমান হামলা থেকে বাঁচতে তাদেরকেও তেলাপোকার মতো সেলার আর গর্তে গর্তে থাকতে হয়। যে কোন বহিরাগতকে গুপ্তচর ভাবা হয় এখানে। কারণ রাশিয়ানরা তাদের অবস্থান যতো কম জানবে ততো তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি। চেচেনরা রাশিয়ান আর্মির পঞ্চম কলামকে অনেক ভয় পেত।

প্রথমবার ভ্রমণের আটমাস পর, প্রচন্ড শীতে আবার বোয়েভিকদের ওখানে গেলাম আমি। আমি যেন বোয়েভিকদের চিনতে পারছিলাম না। তরুণদের বয়স হঠাৎই যেন বেড়ে গেছে। সন্দেহপ্রবণ আর নিষ্ঠুর হয়েছে। এখন আর তারা বহির্বিশ্ব সম্পর্কে জানতে মোটেও ততোটা উৎসুক নয়। আতিথিয়তা ফর্মালিটির পর্যায়ে পৌঁছেছে। বেশিরভাগ লোকই আমাকে অতিথি না ভেবে স্পাই ভাবতে শুরু করল। রাঁধুনি রাইসা চলে গেছে। যোদ্ধারা প্রায়ই ক্ষুধার্ত থাকে। তাদের বাংকারও স্যাঁতসেঁতে ও ঠাণ্ডা।

রাতটা ভয়ংকর ছিল। গ্রেড মিসাইল একের পর এক রাস্তায় আছড়ে পড়ছিল। এতো দ্রুত যে, আকাশ-পাতাল উল্টে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। আমরা দৌড়ে সেলারে ঢুকলাম। সেলারের ওপরের ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাদে আগুন ধরে গেল। রাশিয়ান পলাতক দু'জন তরুণ সৈন্য তাড়াতাড়ি করে পানি এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করল।

রাশিয়ান আর্মিরা যেখানে অবস্থান নিয়েছে সেদিক থেকে হলদে আলোর শিখা ইট-পাথরের স্তূপে এসে পড়ল। একজন সতেরো বছর বয়সী বোয়েভিক বাংকারে প্রবেশ করল। উত্তেজিত, চোখ জ্বলজ্বল করছে। শ্বেত পাথরের মতো তার গায়ের রঙ। খানিকবাদে সে এবং আরেকজন তরুণ বাইরে টহলের জন্য বের হলো। পরনে ঢিলা জামা, স্কি হ্যাট; হাতে রাইফেল। আমি আর এখানে অপেক্ষা করতে পারলাম না।

BanglaBook.org

বামুত

৯ মে ১৯৯৫, ইউরোপ বিজয় দিবসের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন চেচনিয়ায় সাময়িক যুদ্ধবিরতির আদেশ দিলেন। চেচেনরা জানে, এটা মিথ্যা। রাশিয়ান সৈন্যরাও জানে এটা মিথ্যা কিন্তু যখন পশ্চিমা নেতারা মস্কোতে ইয়েলসিনের সাথে সাক্ষাতে গেল এবং বিশ্ব শান্তি উদযাপন করল—তারা ভাব দেখাল এটা সত্যি। যুদ্ধবিরতির ব্যাপ্তি ছিল এপ্রিলের শেষ থেকে ১১ মে পর্যন্ত। সকল পশ্চিমা নেতা আবার দেশে ফিরে যাওয়ামাত্রই অফিসিয়ালি আবার যুদ্ধ শুরু হবে।

পশ্চিমা নেতারা কঠোরভাবে নিষেধ করেন যেন কোন চেচেন রেড স্কয়ারের সামরিক প্যারেডে অংশ না নেয়। প্রেসসচিবেরা ব্যাখ্যা করেন, এর মধ্য দিয়ে পশ্চিমাদের চেচনিয়ার পক্ষেই কূটনৈতিক সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পশ্চিমা নেতা জন মেজর, হেলমুট কহল, বিল ক্লিনটন আরো বড় একটি সামরিক প্যারেডের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। একই সাথে চিন্তিতও হলো, যখন দেখল সামরিক বাহিনিকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকায় প্রবেশের লিখিত আদেশ দেয়া হয়েছে।

১০ মে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সামনে প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন এক পরিষ্কার মিথ্যা কথা বললেন, 'এখন চেচনিয়ায় কোন মিলিটারি অপারেশন চলছে না, কিছু উন্নয়নমূলক কাজ চলছে।'

ক্লিনটন বিন্দুমাত্র চমকালেন না। সাংবাদিকদের বললেন, 'জনদুর্ভোগ এবং সেনাবাহিনিকে দীর্ঘ সময় যুদ্ধে রাখা বহির্বিশ্বের জন্য উদ্বেগের কারণ।'

যখন দুই বিশ্বনেতা প্রেসের সামনে ঠিক একই সময় সার্জেন ইয়ার্টে হেলিকপ্টার গানশিপ দিয়ে রকেট হামলা চলছে।

ইয়েলসিনের মিথ্যা যুদ্ধবিরতি ঘোষণার শুরুতে ওএসসিই (অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি এন্ড কোঅপারেশন ইন ইউরোপ)-এর একদল কূটনীতিক প্রথমবারের মতো বামুতে গেল।

৫ জন ওএসসিই প্রতিনিধি ইঙ্গুশেটিয়া থেকে হলুদ বাসে করে এল। চেচেন যোদ্ধারা তাদের পাত্তা দিল না, ওএসসিইকে বামুতে ঘুরতে দিল। রৌদ্রোজ্জ্বল একটা দিন ছিল। কোন গোলাগুলি নেই। পরিবেশ শান্ত। কিন্তু আমি চেচেনদের জন্য খুশি হতে পারলাম না। কোথাও যেন একটা ভুল হচ্ছে। প্লেজার সাফারি পরিহিত ওএসসিইর লোকদের মধ্যে যেন ঘাপলা আছে। তারা যেভাবে মুগ্ধকর

BanglaBook.org

ভঙ্গিতে রাস্তাঘাটের ছবি তুলছিল দেখে মনে হচ্ছিল টুরিস্ট, ডকুমেন্টটালিস্ট নয়। তারা চেচেনদের সাথে কথা বলার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যেই বেশি কথা বলছিল।

আমি অলিভার পেলেন নামে একজন বাকপটু সুবেশী ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই সাময়িক যুদ্ধবিরতি কেন বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না যুদ্ধে?'

জবাবে সে মিনিট দশেক হড়বড় করে কী যে বলল, আমার মাথায় ঢুকল না। আমি আবার কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলাম আরেক দফা তার দুর্বোধ্য লেকচার শোনার ভয়ে।

এমন সময় গ্রামের প্রান্তে আমরা গোলাগুলির মধ্যে পড়ে গেলাম। গোলাগুলি বেশি ভারি নয় কিন্তু আমরা একটা দেয়ালের আড়ালে বসে থাকতে বাধ্য হলাম। কয়েক গজ দূরে এক রাশিয়ান ট্যাংকের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। স্নাইপারদের বুলেট দেয়াল অতিক্রম করে কয়েক মিটার দূরে মাটি ভেদ করছিল। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গগণবিদারী শব্দ তুলে মর্টার শেল গ্রামের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। পেছনে লম্বা ধোঁয়ার রেখা। ওএসসিই ডেলিগেটরা তাদের ম্যাচিং ফ্ল্যাক জ্যাকেট খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল।

'আশা করি আমরা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারব। স্বচক্ষে দেখলাম, রাশিয়ার মিলিটারি যুদ্ধ বিরতি সত্ত্বেও এখানে মিলিটারি অপারেশন এখনো সচল রয়েছে,' ওএসসিইর প্রধান প্রতিনিধি হাঙ্গেরিয়ান স্যান্ডল মেজারস বললেন। তার কথা শুনে চেচেন যোদ্ধারা তার দিকে কৌতুক ও হতাশা মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাল।

ওএসসিএ এরপর আরস্টিতে গেল। বামুতের লোকজন এখানে স্কুল ও গুদামঘরে গাদাগাদি করে আছে। সাধারণ মানুষজন যোদ্ধাদের চেয়ে সাদাসিধে। তারা ডেলিগেটদের চারপাশে ভিড় করল, তাদের জামাকাপড় ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

মোভলাদি নামে একজন প্রতিনিধিদের বোঝাতে চাইল যে তারা সবকিছু হারিয়েছে। আরেক বৃদ্ধ চিৎকার করে বলে উঠল, 'পশ্চিমারা কিছু করছে না কেন?'

প্রথম প্রথম পশ্চিমারা গুরুত্বসহকারে মাথা ঝাঁকাতে লাগল, একজন তো নোটবুক বের করে কী যেন লিখল। কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি তারা

BanglaBook.org

কিছুই শুনছে না। একটু পর বাসে চেপে তারা চলে গেল চেচেনদের তথাকথিত এই যুদ্ধবিরতির মাঝে রেখে। আমি মোভলাদিকে জিজ্ঞেস করলাম, তার আশা পূরণ হয়েছে কিনা।

সে বলল, 'তারা ভালো মানুষ কিন্তু কাজের না। তারা আসবে, দেখবে, চলে যাবে। বাড়ি গিয়ে ভদকা খাবে, আরাম করবে। এরপর তাদের বসদের ভালো ভালো কথা বলবে। ওরা আসলেও আমাদের নিয়ে চিন্তা করে না। ওদের এখানে থাকা দরকার। দেখুক, কীভাবে মানুষ না খেয়ে মরছে। দেখুক, কীভাবে আমার পরিবার পশুদের সাথে ফার্মহাউসে জীবন-যাপন করছে—তাহলে ওদের কিছুটা ধারণা হবে আমাদের ব্যাপারে।

সে রাতে আমি আরস্টিতে থাকলাম। বামুত থেকে চার কিলোমিটার দূরে। যখন বোমাবর্ষণ শুরু হলো, আমার পায়ের নিচের মাটি কাঁপতে আরম্ভ করল, জানালার কাচ ঠক ঠক আওয়াজ করতে লাগল। আমার চারপাশে শরণার্থীরা নীরবে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল।

১৯৯৫-এর মে'র মাঝামাঝি সময়ে রাশিয়ান বাহিনি চেচেন প্রতিরোধ প্রতিহত করে পাহাড় দখল করার সিদ্ধান্ত নিল। উনিশ শতক থেকে পরিচিত 'মহান দুর্গ'র পতন ঘটল। শতবর্ষ আগে যেসব গ্রামকে দুর্ভেদ্য মনে করা হতো সেগুলো সুখোই-২৫ ডাইভ বোমার সহজ টার্গেটে পরিণত হলো। অপারেশন কমান্ডার জেনারেল মিখাইল ইয়েগোরভ বলল, তার বাহিনি যে কোনো মূল্যে পর্বত দখল করে নিতে প্রস্তুত। সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হলো ঐতিহাসিক নগরী ভেদেনোকে। শামিল বাসায়েভ এর নিজের শহর, চেচনিয়া-ইচকেরিয়ার রাজধানীও বলা চলে।

গ্রীষ্মের শুরুতেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। প্লেনগুলো আকাশে একটু পর পর এমনভাবে চক্কর কাটতে লাগল যেভাবে মাছের পাত্রের পাশে বিড়াল ঘুরঘুর করে। গাড়ি চালকেরা বৃক্ষঘেরা পর্বতের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে একটু পর পরই লুকিং গ্লাসের মাধ্যমে আকাশের দিকে তাকাত। দেখার চেষ্টা করে, মৃত্যুদূতগুলো আকাশের কোথায় আছে।

চেচেন যোদ্ধারা পালাক্রমে পাহাড়ের ওপর নজর রাখে। প্যারাট্রুপার বা এয়ারক্রাফট দেখলেই তাদের রাইফেল নির্দয়ভাবে গর্জে ওঠে।

দ্য টাইমস পত্রিকার আনাতোল দিয়াসেন এবং আমি ভেদেনো উপত্যকা বরাবর হাজী ইয়ার্ট নামক গ্রামে অবস্থান করছিলাম। অন্য গ্রামের মতো এ

BanglaBook.org

গ্রামটাও বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়েছে। সেলারে প্রায় হাফ ডজন লোক থাকত। আমরা ইসলাম নামে এক লোকের সাথে থাকতাম। ভেদেনো গ্রামে বিমান হামলার ভয়াবহ শব্দ শুনে রাত কাটতো আমাদের। সকাল সকাল তারা আবার আসত। চক্কর কাটতে কাটতেই দেখা যেত একটা বিমান দল ছেড়ে বেরিয়ে হামলা করেই আবার চক্রে ফিরে যায়।

ভেদেনো দুদায়েভের অধীন। এমনকি গ্রামবাসী দুদায়েভের কথামতো মস্কো থেকে একঘন্টা সময় এগিয়ে রেখেছে। গ্রামের মধ্যে প্রশাসনিক ভবনে স্থানীয় নেতারা বসে। খুব সহজ বিমান হামলার টার্গেট এই ভবন। এখানে একজন মাথামোটা প্রশাসক কূটনীতিতে তার কতোটা আগ্রহ সেটা বলছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার লেকচারে ছেদ পড়ল দিনের তৃতীয় বিমান হামলার কারণে।

রাশিয়ানরা স্বীকার করত না, তারা হামলায় অস্বাভাবিক বিধ্বংসী ক্ষমতার কোন বোমা ব্যবহার করে। অথচ আমরা শার্পনেল পড়ে থাকতে দেখতাম মাটিতে। সেখানে থাকত একগুচ্ছ শার্পনেলে ভরা ক্লাস্টার বোমা, বলবিয়ারিং বোমা এবং ছোট স্পাইক ডিস্কেটসহ বোমা। চিকিৎসকগণ আহতদের গায়ে 'নিডল' বোমার শত শত লাল কাঁটাযুক্ত ডার্ট পেত। যদিও রাশিয়ানরা এগুলো স্বীকার করত না। অবশ্য এটাও তো স্বীকার করত না যে তারা এতিমখানা, বৃদ্ধাশ্রম ও সাধারণ মানুষের গাড়িতে বোমা ফেলছে। এমনকি তারা তো বিমান হামলার কথাও বেমালুম অস্বীকার করত।

অধিকাংশ সময় রাশিয়ানরা যে বোমা ফেলত, চেচেনরা তার নাম দিয়েছিল 'ডেপথ বোমা'। এর আঘাতে সুইমিং পুলের সমান গর্ত তৈরি হতো। এগুলো বাড়িঘর শুধু ধ্বংস করে না, একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে দেয়। সম্প্রতি ভেদেনো থেকে সার্জেন ইয়ার্টে যাওয়ার মহাসড়কে পড়েছিল এমন এক বোমা। আরেকটা আঘাত করেছিল শামিল বাসায়েভের পারিবারিক বাসভবনে। এমনভাবে ধ্বংস করেছে যে বাড়ি আর বাড়ি নেই; হাঁটু সমান উচ্চতা সম্পন্ন ইট-সুরকির স্তূপে পরিণত হয়েছে। সে বাড়িতে ছিল না কিন্তু তার এগারোজন আত্মীয় মারা যায়। এ ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'এগুলো কিছু নয়।' সত্যিই কঠিন মানুষ সে।

একটা ডেপথ বোমা গ্রামের মাঝেও আঘাত করে অনেকগুলো বাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দিল। রকেট হামলা হলো গ্রামের প্রান্তে একটা ফার্মে। পশু চরাতে চরাতে সাতান্ন বছর বয়সী এক বৃদ্ধের মৃত্যু হলো। আরো বেশি হতাহত না

BanglaBook.org

হবার কারণ, গ্রামে এখন অল্প কিছু মানুষই বসবাস করে। প্লেন চলে গেলে মেষ পালককে কবর দেয়ার জন্য আনা হলো। তার মাথা আর ডান পা উড়ে গেছে। তারপরও তার গোসল দেয়া হলো মুসলিম রীতি অনুসারে। এরপর বাইরে প্রায় বিশজন টুপি পরিহিত দাড়িওয়ালা মানুষ তার জন্য প্রার্থনা (জানাযা) করল।

মার্চে সমতল থেকে পালিয়ে পর্বতে আশ্রয় নেয়ার সময় সবাই বদ্ধ অনুভব করছিল, যেমনটা পশুর দল অনুভব করে সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময়। ভেদেনোতে এখনকার আবহাওয়াটা ভারী, অপ্রাকৃতিক। এখান থেকে পালিয়ে আর কোথাও যাবার নেই, এদিকে সময়ও যেন ফুরিয়ে আসছে। কয়েকজন সাংবাদিক আর এমএসএফ-এর গুটিকয়েক ডাক্তার ছাড়া বাইরের পৃথিবীর আর কোন মানুষ এখানে ছিল না। জনশূন্য রাস্তায় নিঃসঙ্গতার চাইতে সর্তকতা বেশি অনুভূত হয়। যাকে যতো বেশি অস্বাভাবিক মনে হবে সে ততো বেশি স্বাভাবিক।

একটা অদ্ভুত গুজব শুনতে পেলাম, এখানে নাকি স্কার্ট পরা কিছু লোককে দেখা গেছে। শুনলে মনে হবে এরা স্কটিশ ড্যান্সার। যদিও আমি এমন কাউকে দেখতে পাইনি। ইমাম আলী সুলতানভ; সুদর্শন এই গায়কের গান ইতোমধ্যেই রণসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে—তিনি একথা বলেছিলেন।

এমনই নানা বিচিত্র মানুষের দেখা মিলত এখানে। একজন লোক ছিল যে নিজেকে ডাচ সাংবাদিক বলে পরিচয় দিত অথচ সাথে কালাশনিকভ নিয়ে ঘুরত। একদমই রাশিয়ান ভাষা বলতে পারত না। একজন নারী যোদ্ধা ছিল; পনিটেইল করে বাঁধা তার চুল। হাতে রাইফেল নিয়ে সেন্ট্রাল স্ট্রিটে হেঁটে বেড়াত। হাফ ডজন সৈন্য এমন ছিল যারা বিমান ভূপাতিত করেছে বলে দাবি করত। ছিল সোভিয়েত আমলের প্রশাসনিক ভবন; ভেতরে একটা অকেজো টেলিফোন সোনালি অতীতের সাক্ষী হয়ে টিকে ছিল। আরো ছিল খাসান বাচায়েভ, ক্লান্ত, সাহসী এক ডাক্তার, এখন রোগীদের সেবা করেন স্কুল ঘরে বসে, কারণ তার হাসপাতালটি অনেক আগেই বোমার আঘাতে উড়ে গেছে।

আমি আর আনাতোল সার্জেন ইয়ার্টের পথ ধরে যাচ্ছিলাম। যোদ্ধারা নিজেদের ক্লান্তি, অবসাদ আর হতাশা লুকিয়ে রাখতে পারছে না। এক যোদ্ধা, যাকে অটোমেটিক রাইফেল ক্যালিবারের সাথে মিল রেখে ০.৫৪৫ বলে ডাকা হতো, সে অশ্রুসজল চোখে বলল, 'আমাদের নেতারা সব ইঁদুর। তারা ভেদেনোতে বসে আসল যুদ্ধ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা তাদের জন্য যুদ্ধ

BanglaBook.org

করছি না। আমরা শুধু আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করছি। আমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন, সহযোদ্ধাদের জন্য যুদ্ধ করছি। আমাদের কাউকে দরকার নেই। না দুদায়েভ, না মাসখাদোভ। শুধু আল্লাহ হলেই চলবে।'

সে সংক্ষেপে মোনাজাত সারলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কেন লাল ব্যান্ড মাথায় পরেছে? মুসলিমরা তো সাধারণত সবুজ ব্যান্ড পরে। সে বলল, 'এটা আমার ভাইয়ের রক্তের প্রতীক; সে গ্রোজনিতে মারা গেছে। আমার যুদ্ধ এখন আমার ভাইয়ের রক্তের জন্য।'

সার্জেন ইয়ার্টের সেন্ট্রাল স্ট্রীটের প্রতিটা বাড়ি ধ্বংস হয়েছে বিমান হামলায়। সর্বশেষ বিমান হামলার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে এখনও কিছু বাড়িতে আগুন জ্বলছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সাতাশ বছর বয়সী বেসলান ইয়ারকিয়ভ ঘাড়ে দুটো আরপিজি ও হাতে একটা রাইফেল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওরা সবকিছু ধ্বংস করে ফেললেও আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।' তার চোখ জ্বলছে।

সার্জেন ইয়ার্টের পেছনের ঘাঁটি গ্রাম থেকে প্রায় এক কিলো দূরে। তাদের হাফ ডজন এপিসি ও আর্টিলারি গান গাছের আড়ালে লুকানো আছে। সার্জেন ইয়ার্টের অস্ত্রের রাজা হলো হাস্যকর রকমের ট্যাপ খাওয়া একটা এপিসি আর একটা রকেট লঞ্চার। এগুলো হয় যুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া অথবা ব্ল্যাকমার্কেট থেকে কেনা। একজন চেচেন বলল, 'এটা আমাদের চ্যাম্পিয়ন। এগুলো দিয়ে আমরা জবাব দেবো।'

ক্যাম্পের একটা হয়িটজার অতি ব্যবহারে নষ্ট হয়ে গেছে। একটা এপিসির টায়ার পাংচার আরেকটার ইঞ্জিন একেবারেই গেছে

'আমাদের এখন রাইফেলের গুলি নিয়েও চিন্তা করতে হয়,' সিদ্দিক নামে একজন বোয়েভিক বলল।

যখন আমরা কথা বলছিলাম তখন আকাশ থেকে বিমানের বিরক্তিকর শব্দ ভেসে এলো। কোন বোমা হামলা নয় শুধু বারবার করে জেট বিমানগুলো চক্কর দিতে লাগল আকাশে। কেউ কেউ গাছের নিচে ছোট অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে লাল চা খাচ্ছিল। আবার কেউ গর্তে গা-ঢাকা দিল।

'তারা আমাদেরকে খুঁজছে, আমাদের ঘাঁটি খুঁজছে,' সাদিক বলল,' পেলেই আমাদেরকে হত্যা করা হবে।'

ভেদেনোতে ফিরে এসে দেখলাম মাসখাদোভ ক্লিন শেভ করে পরিপাটি ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম পরেছে। আমরা তাকে প্রশ্ন করলাম; সে প্রথমে গ্রোজনি

BanglaBook.org

থেকে পালিয়ে সমতলে এসেছে তারপর সেখান থেকে পার্বত্য উপত্যকায়। এরপর কোথায়? ম্যাপটা দেখো, এরপরে আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই পনেরো হাজার ফুট উঁচু ভূ-প্রাকৃতিক এবড়োখেবড়ো পাহাড় ছাড়া।

কিন্তু তাকে মোটেও বিচলিত জেনারেল মনে হলো না। সে সব সময় যেভাবে বলে এখনও সেভাবেই বলল, ‘যুদ্ধ শেষ হোক, সৈন্যরা বাড়ি ফিরে যাক; তারপর স্বাধীনতার কথা। প্রথমে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। আমাদের গণভোট দরকার? আমাদের নির্বাচন দরকার? আমাদের কি কথা বলা দরকার? নাকি রাশিয়ার সাথে আপোষে যাওয়া দরকার— এই সিদ্ধান্ত জনগণকেই নিতে দিতে হবে। আমরা সব কিছুর জন্য তৈরি। কিন্তু সব হবে যুদ্ধ বন্ধ এবং সৈন্য প্রত্যাহারের পর।’

সে বরাবরের মতোই শান্ত ভঙ্গিতে বলল কিন্তু শুনতে বিপদজনক শোনালো।

‘রাশিয়া যদি না মানে তাহলে যুদ্ধ ভিন্ন আঙ্গিকে প্রবাহিত হবে। ঘুমন্ত লোক জেগে উঠবে। তারপর এটা ধর্মযুদ্ধে পরিণত হবে। কোন আত্মসমর্পণ নয়।’

ঠিক ছয় দিন পর ৩ জুন ভেদেনোর পশ্চিমে সাতোই থেকে নাযোই ইয়ার্ট পর্যন্ত চেচেনদের প্রতি-আক্রমণে রাশিয়ান অস্ত্রশস্ত্র ও প্যারাট্রুপারসহ হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হলো।

তথাকথিত সম্মুখ যুদ্ধে না গিয়ে যুদ্ধটা পরিচালিত হতো দ্রুতগতির হেলিকপ্টার আক্রমণের মাধ্যমে ভেদেনোর দিকে শত্রুদের কোণঠাসা করার মাধ্যমে। অবাক করা বিষয় হলো, চেচেনরা তাদের শেষ অবস্থান ভেদেনো ও সার্জেন ইয়ার্টও বিদ্যুতের গতিতে ত্যাগ করতে সক্ষম হয় চারিদিক থেকে রাশিয়ানরা ঘিরে ফেলার আগেই। কোনো রকম যুদ্ধ ছাড়াই রাশিয়ান বাহিনি ভেদেনোতে ঢুকে পড়ে। বুধবার, ১৪ জুন, একইভাবে তারা পার্বত্য গ্রাম সাতোই-এর কেন্দ্র দখল করে নেয়।

চেচেন যোদ্ধাদের এখন হয় মরতে হবে অথবা গভীর জঙ্গলে দূরবর্তী গ্রামে গা ঢাকা দিতে হবে। বামুত, ওরেকোভো, স্ট্যারি-আখোই-এর মতো দক্ষিণের গ্রামগুলো এখনো চেচেনদের হাতে কিন্তু ওখান থেকে ক্ষুদ্র যুদ্ধ পরিচালনা করে পুরো দেশের যুদ্ধে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে না। সত্যি বলতে, সাতোই দখলের সাথে সাথে সকল মহাসড়কের দখল রাশিয়ানদের

BanglaBook.org

হাতে চলে গেল এবং গ্রোজনি থেকে পাহাড় পর্যন্ত সকল প্রশাসনিক ভবনে রাশিয়ান পতাকা উড়তে শুরু করেছে।

মস্কোতে তখন প্রিন্সেস ডায়ানার আগমন নিয়ে তোড়জোড় চলছে। মস্কো ধরেই নিয়েছে, যুদ্ধ 'ভালোভাবেই' শেষ হয়েছে।

ওই একই দিন, অর্থাৎ ১৪ জুন রাশিয়ান নিউজ এজেন্সি এক অদ্ভুত রিপোর্ট করল—বুদেনোভস্ক নামের এক রাশিয়ান শহরে রাতেরবেলা গোলাগুলি হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরে হামলা করেছে কারা যেন। সদর হাসপাতালের ছাদ থেকে মেশিনগানের মাধ্যমে এই হামলা হয়েছে। আবছা আবছা শোনা গেল, সেখানে নাকি লাল সাদা চেচেন পতাকা দেখা গেছে।

এরপর জানা গেল—কোনো একভাবে শামিল বাসায়েভ আর ১৫০জন আত্মঘাতী যোদ্ধা ভেদেনো থেকে ২৪০ কিলোমিটার ভেতরে এক রাশিয়ান শহরে হামলা চালায় এবং হাসপাতালে ঢুকে ১৫০০জনকে জিম্মি করেছে। সাথে বিস্ফোরকের গাদা। একটাই দাবি—যুদ্ধ বন্ধ করো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় চার
প্রতিশোধ

‘তারা বলেছে, আমরা কাপুরুষ। বলতে দাও। আমরা চেচনিয়ায় বসে বসে নির্মূল হতে রাজি নই। সতর্ক করে দিচ্ছি, আমরা আবারও রাশিয়ায় আঘাত হানতে পারি। হামলা করার জন্য অনেকগুলো টার্গেট রয়েছে। আমাদের কাছে রাশিয়ানদের ফেলে যাওয়া তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, জৈব অস্ত্র আছে। আমরা চাইলে ইয়াকাটেরিনবার্গে জৈব অস্ত্র রাখতে পারি, তাতে পুরো শহর অসুস্থ হয়ে পড়বে। মস্কোতে ইউরেনিয়াম রেখে আসার জন্য একজন লোকই যথেষ্ট; আমাদের একজন মরবে আর তার বদৌলতে ওদের পুরো শহর মরবে। কেউ যদি তোমার মুখে সারা বছর ধরে থুতু দেয় তোমার কি উচিত না, একবার হলেও সেটা ফিরিয়ে দেওয়া? আমরা সেটাই করেছি এবং আবার করব।’

-বুদেনোভস্ক আক্রমণ শেষে শামিল বাসায়েভ

বুদেনোভস্কের চেচেন আক্রমণ একটা পুরনো কৌশল; সীমান্ত পেরিয়ে আক্রমণ করে জিম্মি করা, তারপর সর্বোচ্চ ক্ষতি করে দ্রুত ফিরে আসা। এ কৌশলটা চেচেনরা ঘটিয়েছে বিংশ শতাব্দীর ভয়ংকর মেশিনগান এবং আরপিজি দিয়ে।

শামিলের অধীনে এক-দেড়শ বোয়েভিকের এই সাহসিকতা বিস্ময়করই বটে। একাধিক বদ্ধ লরির পেছনে চেপে পর্বত থেকে সমতল হয়ে বুদেনোভস্কের স্ট্যাভ্রোপোল শহরে অনুপ্রবেশ করে তারা। শান্ত শহর, দেউলিয়া প্লাস্টিক ফ্যাক্টরি ও চেচনিয়ায় হামলা পরিচালনাকারী বিমান ঘাঁটির জন্য পরিচিত।

বাসায়েভ দাবি করল, সে চেক পয়েন্ট পার হয়েছে হাজার ডলার ঘুষ

BanglaBook.org

দিয়ে। এটা আংশিক সত্য হতে পারে। খুব সম্ভবত চেচেনরা ঘুষ এবং চাতুরি-দুটোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই ঢুকতে পেরেছিল। চেচনিয়া ও বুদেনোভস্কের মাঝের জায়গাটায় খুব কম লোকের বাস। একটু সাবধানতা অবলম্বনে সহজেই সেনা আর পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব। চেচেনদের বহনকারী এক ট্রাকের ড্রাইভারের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে চেচেন হলেও তার সোনালি চুল দেখলে মনে হয় রাশিয়ান। যে সময় প্রায় সমগ্র চেচনিয়া রাশিয়ানদের দখলে ঠিক তখন চেচেনরা যে নৈপুণ্য দেখাল তা সত্যিই অবাক করার মতো।

সব জায়গায় ফাঁকি দিলেও বুদেনোভস্কের বাইরে গ্রুপটি অবশেষে পুলিশের সম্মুখীন হয়েছিল। ওখানে চেচেনরা কী পরিচয় দিয়েছিল তা অস্পষ্ট। কেউ প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে কাজের কথা বলেছে। বাসায়েভের প্ল্যান ছিল রাশিয়ার আরো ভেতরে গিয়ে হামলা করা কিন্তু তাদের ছদ্মপরিচয় হুমকির মুখে পড়ে যেতে শেষপর্যন্ত বুদেনোভস্কেই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আবার এমনও হতে পারে, তারা বুদেনোভস্কের কেন্দ্রস্থলেই আক্রমণের প্ল্যান করেছিল। কিন্তু পরে গল্পটা একটু পরিবর্তন করেছে যেন তাদের প্ল্যানটা মুখোরোচক শোনায়।

ট্রাক সবাইকে নামিয়ে দেয়। লোকজন তাদের বোয়েভিক হিসেবে চিনে ফেলতে পারে এই ভয়ে তারা দ্রুত, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ স্টেশন এবং প্রশাসনিক ভবনে হামলা চালায়। রাস্তায় কিছু সাধারণ মানুষকে গুলি করা হয় এবং কয়েকশ লোককে জড়ো করে-অনেককে ঘর থেকেও বের করে নিয়ে এসে-সবাইকে হাসপাতালে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। হাসপাতালে আগে থেকেই রোগী ও কর্মীরা তো ছিলই। চেচেনরা ১৫০০ জনকে জিম্মি করে। কেউ বলে, সংখ্যাটা ছিল ৫০০০। যাইহোক, এটা ছিল ইতিহাসের অন্যতম বড় জিম্মির ঘটনা।

রাশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনি তাদের শক্তিমত্তা প্রদর্শনের আগেই শামিল বাসায়েভ হাসপাতালের প্রবেশমুখে মাইন পুঁতে রাখে, যোদ্ধাদের মেশিনগান এবং আরপিজি হাতে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে বসায়। হতভম্ব কর্তৃপক্ষের সামনে তারা যে দাবী রেখেছিল সেখান থেকে এক চুলও নড়েনি। আর তা হলো—চেচনিয়ায় শান্তিচুক্তি শুরু করা।

একদল 'মাথায় কালো পট্টি বাঁধা দস্যু' যখন বুদেনোভস্ক পোড়াচ্ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন তখন হ্যালিফ্যাক্সে (কানাডিয়ান রাজ্য নোভা স্কটিয়ার রাজধানী) সাত বিশ্বনেতার সাথে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন!

BanglaBook.org

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি না করেই ইয়েলসিন এবং পাভেল গ্রাচেভ তাদের চিরায়ত জুয়াড়ি টাইপ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হাসপাতালে হামলা চালিয়ে জিম্মিদের উদ্ধার করাটাই হবে চেচেনদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভালো প্রতিউত্তর।

চেচনিয়ায় যুদ্ধকালীন সময় রাশিয়ান বাহিনি যে দুর্বলতা দেখিয়েছে সেখানে ১৫০ জন সশস্ত্র আত্মঘাতী যোদ্ধা কর্তৃক দখলকৃত হাসপাতালে আক্রমণ অবশ্যই একটা বিধ্বংসী সিদ্ধান্ত। কিন্তু আক্রমণ শুরু হলো। ব্যাপারটা বেশ অবাক করা ছিল টেলিভিশনের লক্ষ লক্ষ দর্শকের জন্য যারা চেচনিয়ায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানত না বা কেয়ার করত না। তারা দেখল, পাগলাটে আলফা কমান্ডস ট্যাংক শেল ও এপিসির মাধ্যমে হাসপাতালের জানালায় গোলাবর্ষণ শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে প্রধান ভবনে আগুন ধরে গেল। কালো ঘন ধোঁয়া ছাদ ফুঁড়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল।

যে কেউ দেখলে বুঝবে এই অপারেশনের প্রধান উদ্দেশ্য—চেচেনদের হত্যা করা, জিম্মিদের রক্ষা করা নয়। যখন চেচেনরা জিম্মিদের জানালায় দাঁড় করালো এবং সাদা পতাকা দেখিয়ে চিৎকার করতে বাধ্য করল তখন আক্রমণ বন্ধ হলো। কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় কমান্ডো আক্রমণ শুরু হলেও দখল চেচেনদের হাতেই থাকল।

পুরো অপারেশনটাই গত ছয় মাসের যুদ্ধের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ। বোয়েভিকরা সাধারণ জনগণের মাঝে অবস্থান নেয় আর রাশিয়ানরা সাধারণের ক্ষয়ক্ষতির চিন্তা না করেই নৃশংসতার কদর্য রূপ দেখায় এবং শেষ পর্যন্ত শত্রু ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়। পার্থক্য শুধু এটা হচ্ছে রাশিয়ায়, রাশিয়ার শহরে আর সবাই টেলিভিশনে দেখেছে। রাশিয়ানদের জন্য এই ঘটনাটা অপমানজনক কিন্তু অনেকেরই এতে চোখ খুলেছে। এ যুদ্ধ ব্যথার এক পুঞ্জিভূত প্রদর্শনী। সরকারের অদক্ষতা এবং পর্বতের যোদ্ধাদের মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করাও দেখছে তারা।

দ্বিতীয় আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর বরিস ইয়েলসিনের অবর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা ভিক্টর চেরনোমিরদিন এক অচিন্তনীয় পদক্ষেপ নিলেন। তিনি স্বয়ং চেচেনদের সমঝোতার প্রস্তাব দিলেন।

যখন চেরনোমিরদিন ন্যাশনাল টেলিভিশনে লাইভ চলাকালীন ফোন তুলে শামিল বাসায়েভকে কল করেন, সেটা রাশিয়ান জনগণ, এমনকি জিম্মিদের কাছেও ছিল চরম বিস্ময়। তাদের নেতা জীবন বাঁচাতে সমঝোতা করছে, এমনকি

BanglaBook.org

এটা 'যে কোনো মূল্যে চেচেন দস্যুদের ধ্বংস করা'র আদর্শিক নীতিবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও! শুধু তাই নয়, সংকটময় পরিস্থিতিতে কেউ একজন জনগণের দায়িত্ব নিচ্ছে যা পুরো যুদ্ধের সময় জুড়ে সমরনায়ক ও রাজনীতিবিদরা সযতনে এড়িয়ে গেছে।

পরবর্তীকালে চেরনোমিরদিন বলেন, 'এটা রাশিয়ার ইতিহাসে প্রথম ঘটল, যেখানে জীবন বাঁচানোকে রাষ্ট্রের স্বার্থের ওপরে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।'

শান্তি আলোচনায় বাসায়েভের দাবী অনমনীয়। সে প্লেন, টাকা, নিরাপদ বিদেশি আশ্রয়—সকল প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। সংকট ষষ্ঠ দিনে গড়ালে অবশেষে রাশিয়ানরা বশ্যতা স্বীকার করে—চেচনিয়ায় পূর্ণ যুদ্ধবিরতি ঘটবে এবং বাসায়েভের লোকদেরকে নিরাপদের ফিরে যেতে দেয়া হবে। বাসায়েভ সকল জিম্মিকে ছেড়ে দিয়ে শুধু ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবককে মানববর্ম হিসেবে রেখে দেয় যেন তার লোকগুলো চেচনিয়ায় ফিরতে পারে। বাসের বহরের সাথে এই যুদ্ধে নিহত ষোলোজন যোদ্ধার লাশবাহী একটা ফ্রিজিং-ভ্যান রওনা হয়।

বহরের সাথে ক্রোধে উন্মত্ত রাশিয়ান মিলিটারি ছায়ার মতো লেগে ছিল। কিন্তু চেচনিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে এসে উপস্থিত হওয়ামাত্রই শেষ জিম্মিকেও ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে গ্রামবাসী বোয়েভিকদের নায়কের মতো উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়।

নিজেদের কথার সত্যতা রাখতে রাশিয়ানরা যুদ্ধবিরতিতে স্বাক্ষর করে ২১জুন এবং যুদ্ধ বন্ধ করে। যুদ্ধে পিষ্ট যোদ্ধা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শান্তিতে বুক ভরে শ্বাস নিতে শুরু করে এবং গ্রোজনিতে পরিপূর্ণ শান্তি-চুক্তির আলোচনার ব্যাপারে প্রস্তুতি শুরু হয়। বাসায়েভ চেচেনদের নিশ্চিত পরাজয় থেকে বাঁচিয়েছে।

এদিকে রাশিয়ানরা বুদেনোভস্কের ঘটনায় দগ্ধ হচ্ছিল, পাশাপাশি বাসায়েভের ব্যক্তিত্বে বিস্মিত। লজ্জিত হচ্ছিল, সংকট মোকাবেলায় তাদের সরকারের ভূমিকা এবং নিজেদের সেনাবাহিনির দুর্দশায়। চেরনোমিরদিনের সিদ্ধান্তে চমৎকৃতও হয়েছিল বটে। পুরো ঘটনা রাশিয়ানদের জন্য ছিল ঘৃণা ও যুদ্ধের এক নতুন উপলব্ধি।

বুদেনোভস্কে সংশয় ছিল আরো বেশি। মোট ১৪২ জন এ হামলায় মারা গেছে। তার মধ্যে কয়েকজন প্রথমদিন চেচেনদের আক্রমণের শিকার হয়ে মারা গেলেও বেশিরভাগই মারা গেছে রাশিয়ান আর্টিলারির আঘাতে।

BanglaBook.org

আরো ১৯৮ জন আহত। বুদেনোভস্ক গড়পড়তা রাশিয়ান শহরের মতোই জনবহুল। চেচনিয়ার সীমান্ত থেকে বেশ দূরে, মাঝে বিস্তীর্ণ উষর এলাকা। তারা চেচনিয়ায় হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে উড়াল দেয়া বিমানের শব্দ শুনে অভ্যস্ত ছিল, 'চেচেনরা দস্যু' তাদের এ ধারণাই বদ্ধমূল হতো এতে। ফলে চেচেনদের দ্বারা হাসপাতাল জিম্মির ঘটনায় তারা অবাক হয়নি। তবে বুদেনোভস্কবাসীর এমন অজ্ঞানতার পাশাপাশি ভিন্নমতও ছিল। স্থানীয় যারা জিম্মি হয়েছিল তারা চেচেনদের প্রশংসাই করত। প্রশংসা না করলেও অন্তত চেচেনদের ঘাড়ে একতরফা দোষ না চাপিয়ে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষকেও সমান দোষী মানত।

তাদের বক্তব্য, চেচেনরা কোন জিম্মির ক্ষতি করেনি। সবাইকে বলেছে, তারা এটা করছে শুধু তাদের দেশমাতৃকাকে বাঁচাতে। বাসায়েভ বলেছিল, 'গত সাত মাস ধরে আমরা আমাদের নিজেদের ভূমিতেই লড়ছি। প্রতিটা বুলেট হয় কোনো চেচেনের বুকে, নয়তো চেচনিয়ার বুকে লেগেছে। তাই আমরা যুদ্ধটা চালিয়ে নিচ্ছি। তবে এবার রাশিয়ার ভূমিতে, যেন বুলেট রাশিয়াকে আঘাত করে, চেচনিয়াকে নয়।'

অবশেষে যখন হাসপাতাল ধ্বংসের লক্ষ্যে রাশিয়ানদের অগোছালো আক্রমণ শুরু হলো, তখন অনেক আতঙ্কিত জিম্মি বুঝতে পারল, তাদেরকে রক্ষা করছে বোয়েভিকরা, সরকারি বাহিনি নয়।

ভ্যালেন্তিনা ভাসিলেভা, একজন ডক্টর, সেদিনের জিম্মি। তিনি বলেন, 'সরকার আমাদের উদ্ধারের চেষ্টাও করেনি। তারা পাঁচ হাজার মানুষের ভাগ্য নিয়ে কথা বলছিল অথচ তাদের কথায় মনে হয়নি, তারা আমাদের ব্যাপারে চিন্তিত। আমার মনে হয়, রাশিয়ানরা যদি একবার ভেতরে ঢুকে জায়গাটা দখল করত, আমরা কেউ বেঁচে থাকতাম না। চেচেনরা পুরো ফ্লোরেই মাইন বিছিয়ে রেখেছিল। একজন চেচেনের দায়িত্ব ছিল গড়বড় দেখলেই পুরো ফ্লোর উড়িয়ে দেয়া। আমাকে বলেছে সে এ কথা। রাশিয়ানদেরও সতর্ক করেছিল এ ব্যাপারে।'

যখন বিল্ডিংটা পুড়ছিল, আমাদের শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমরা আমাদের মুখ ভেজা তোয়ালে দিয়ে চেপে রেখেছিলাম। চেচেনদের কাছে শুধু আরপিজি ছিল। বাইরে সৈন্যদের চাইতে আর্মড ট্রুপার ক্যারিয়ারের সংখ্যাই বেশি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এ অবস্থায় চেচেনদের রাইফেলগুলো ছিল কার্যত অচল। রাশিয়ানরাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমার ধারণা তারাও বুঝে উঠতে

BanglaBook.org

পারেনি যে এমনটা ঘটতে পারে। প্রথমবার হামলার সময় চেচেনরা আমাদেরকে জানালার সামনে দাঁড় করায় এবং চিৎকার করে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলে। দ্বিতীয়বার ট্যাংক থেকে আমাদের লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ শুরু হলে চেচেনরা আমাদেরকে লুকাতে বলে।'

ভ্যালেন্তিনার স্বামী গোলাগুলিতে মারা গেছে। সে জানে না, কাদের গুলিতে তার স্বামী মারা গেছে। কাদেরকে সে ঘৃণা করবে?

সে বলে, 'অবশ্যই চেচেনদের এ কাজ ঘৃণার যোগ্য; তারা এখানে এসে শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর আক্রমণ করেছে। তবে তারা এটাও বুঝিয়েছে, তাদের দেশে কী ঘটছে। তাদের দেশে এমনটা না ঘটলে তারা আমাদের জিম্মি করত না। এই 'চেচেন সিনড্রোম'ও তৈরি হতো না।

***

প্রশ্ন : কেন তুমি যোখার দুদায়েভের সাথে সাক্ষাৎ করেছো?

উত্তর : আমি তাকে প্লেন, টাকা, নিরাপত্তার প্রস্তাব দিয়েছি এবং বলেছি ইন্টারপোল তাকে কোন হয়রানি করবে না।

প্রশ্ন :এটা কাজ করেনি?

উত্তর: না, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। সে চেচনিয়াতে দিব্যি বসে আছে।

১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে 'কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা' সংবাদপত্রে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে গ্রোজনিতে নিযুক্ত রাশিয়ান শান্তিদূত আর্কাদি ভলস্কি একথা বলেন।

বুদেনোভস্কির ঘটনার পরে ইয়েলসিন অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ভিক্টর ইয়েরিন, এফএসবি চিফ সার্গেই স্টেপাসিন ও জাতীয়তা বিষয়ক মন্ত্রী নিকোলাই ইয়েগারোভকে বরখাস্ত করেন। তারা তিনজনই যুদ্ধের কট্টর সমর্থক হলেও গভীরভাবে দেখলে এদের পরিবর্তে যারা এলো তারা চেচেনদের জন্য আরো বড় দুঃসংবাদ।

চেচনিয়ায় নিযুক্ত মাথা-গরম সেনা কমান্ডার জেনারেল আনাতোলি কুলিকভকে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী, এক্স কেজিবি জেনারেল এবং যুদ্ধের সমর্থক মিখাইল বারসুকভকে এফএসবির দায়িত্ব এবং গোঁড়া সোভিয়েতপন্থী ভায়াচেসলভ মিখাইলভকে ইয়েগারোভের স্থলাভিষিক্ত করেন।

অবিশ্বাস্যভাবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পাভেল গ্রাচেভ তার স্বপদে বহাল থাকে।

BanglaBook.org

ওলেগ সসকোভেট, যুদ্ধের অন্যতম রচয়িতা, তাকে মিলিয়ন ডলারের বাজেট দিয়ে প্রায় অদৃশ্য চেচনিয়াকে পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয়।

ক্রেমলিন নিরাপত্তা কাউন্সিল সেক্রেটারি, যে প্রথম থেকেই যুদ্ধের মদদদাতা, তাকে ইয়েলসিনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এ যেন কবুতরের ঝাঁকের মধ্যে একটা বেড়াল!

তথাপি গ্রোজনির আলোচনা রক্তপাত বন্ধের প্রথম উদ্যোগ। আলোচনা বসল ওএসসিই সদর দপ্তরে। ছোট একটা ভবন। চেচনিয়ার ঐতিহ্যবাহী নীল রঙের গেট রাস্তার দিক থেকে বন্ধ। বাইরে সাংবাদিক, দু'পক্ষের নিরাপত্তা কর্মী, হারানো স্বজনের খোঁজে ক্রন্দনরত মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। এরা দীর্ঘ গ্রীষ্মের সময়টা পার করেছে ভালো কোনো ফলাফলের আশা নিয়ে। রাশিয়ান এপিসি ও বিদ্রোহীদের সবুজ পতাকাবাহী তোবড়ানো জীপ একই সাথে পার্ক করা। দু'পক্ষের সৈন্যরা একে অপরের অস্ত্র পরীক্ষা করছে, গল্পগুজব করছে। শহরের প্রান্তে তখনও খণ্ডযুদ্ধ এবং গোলাগুলি চলছে তবে যুদ্ধের প্রকোপ এখন সবচাইতে কম। এটাই আশার কথা।

চেচেন প্রতিনিধিরা দুদায়েভের আইনমন্ত্রী ওসমান ইমায়েভের নেতৃত্বে জিপে চড়ে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। গাড়িতে বিদ্রোহী পতাকা, সাথে নিরাপত্তাকর্মী। রাশিয়ানদের নেতৃত্বে ছিল মিখাইলভ। নতুন রাশিয়ান কমান্ডার জেনারেল আনাতোলি রোমানভ এবং আসলান মাসখাদোভের মধ্যে সম্পূর্ণ সামরিক ইস্যুতে কথা হলো। ৩০ জুলাই ৬ সপ্তাহের ধাপে ধাপে আলোচনা শেষে চেচেন নিরস্ত্রীকরণ এবং রাশিয়ান সৈন্য প্রত্যাহার ইস্যুতে দু'পক্ষই চুক্তি সাক্ষর করল। চুক্তি হয়েছে 'যুদ্ধশেষে চেচনিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের' নামে। কোন রাজনৈতিক কথা হয়নি। চেচনিয়ার স্বাধীনতা নিয়ে তো নয়ই। আসলে ছয় মাস যুদ্ধের পর কোন পক্ষের মধ্যে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা ছিল না। রাশিয়ানরা ভাবছে, জয়ের এতো কাছে গিয়ে ছেড়ে দেয়া ঠিক হচ্ছে না, আর চেচেনরা ভাবছে, বুদেনোভস্কির আক্রমণের পর আরো চেপে ধরা দরকার ছিল। বাস্তবে এই যুদ্ধবিরতি মূলত চেচেনদের নিরস্ত্রীকরণের জন্য নাটকমাত্র।

চেচেনরা অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে রাশিয়ানদের কাছে অস্ত্র জমা দিতে লাগল। মজার মজার দৃশ্যের তৈরি হলো অস্ত্র জমাদানকে কেন্দ্র করে। এক বৃদ্ধ লোক নিয়ে এলো তার 'স্পেশাল কালেকশন'! যার মধ্যে রয়েছে জং ধরা AK-47, ভাঙা আরপিজি এমনকি শতবর্ষী পুরনো পাখি শিকারের বন্দুক পর্যন্ত!

BanglaBook.org

অস্ত্রের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছিল। ১৯০ ডলার AK-47-এর জন্য, ২২০ ডলার মেশিনগানের জন্য। বৃদ্ধের সাদা দাড়ি আর ভাবলেশহীন চেহারার মাঝেও আপনি দেখতে পাবেন—ভেতরে ভেতরে সে পাগলের মতো হাসছে!

সমতল এলাকার ব্ল্যাকমার্কেটে রাশিয়ান সৈন্যরা কদাচিৎ পা রাখত। আর্মস ডিলাররা সেখানে প্রকাশ্যে অস্ত্রের পসরা সাজিয়ে বসত। একজন যোদ্ধা দাঁত বের করে আমাকে বলল, 'আমরা মান্ধাতা আমলের ০.৭৬২ ক্যালিবারের AK-47 রাশিয়ানদের জমা দেই, তারা আমাদের টাকা দেয় আর সেই টাকা দিয়ে ব্ল্যাকমার্কেট থেকে ঝাঁ চকচকে আধুনিক ০.৫৪৫ AK-47 কিনি!' এ যেন নাগরদোলায় চড়ার মতো ব্যাপার।

ভেদেনোতে এক শান্ত গ্রীষ্মে বোয়েভিক ও রাশিয়ান সৈন্যরা ঘাসের বিছানায় অলস শুয়ে ছিল। অদূরেই স্থানীয় লোকজনের জমা দেয়া অস্ত্রগুলো ট্যাংক দিয়ে ধ্বংস করা হচ্ছে। এক অদ্ভুত গতি পরিবর্তন। বিভিন্ন মডেলের ১৩৫টি আরপিজি এবং ২৬টি কালাশনিকভ। যার সবগুলোই পুরনো মডেলের এবং অধিকাংশই ভাঙা। ছিল দুটো বড় ওয়্যার গাইডেড রকেট। ৩০ ডলারের বিনিময়ে জমা দেয়া ৩১টি শটগানও ছিল; যার কিছু জাদুঘরে রাখারও উপযুক্ত নয়। এর বিনিময়ে ভেদের্নোবাপ রত্য এলাকার চারপাশে অবস্থান নেয়া রাশিয়ার ৫০৬তম রেজিমেন্টকে এলাকা ছাড়তে হবে।

৫০৬ তম রেজিমেন্টের কর্নেল ভিচেলাভ মিরোশনিচেস্কো বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি, মানুষ ঠিক পথেই এগোচ্ছে। যতো বেশি অস্ত্র তাদের কাছে থাকবে ততো বেশি যুদ্ধের সম্ভাবনা।'

শামিলের ভাই এবং ভেদেনো এলাকার সৈন্য প্রত্যাহারের আয়োজক শেরভানি বাসায়েভ বলল, 'আশা করি, এক সপ্তাহের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। আমরা হ্যান্ডশেক করব, একসাথে কাবাব খাব, তারপর বর্ডার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব। এরপর সুখে থাকা, নির্বাচন আয়োজন করা ইত্যাদি ইত্যাদি।'

সম্ভবত গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক আলোচনার পথ উন্মুক্ত করেছে এই সেনা প্রত্যাহার অনুষ্ঠান। কিন্তু উভয় পক্ষই ভয়ে ভয়েই হয়তো আলোচনার টেবিলে বসেছিল। ছাড় দেয়ার মানসিকতা কোনো পক্ষই দেখায়নি, এমনকি কেউ কেউ চাইছিল, পুরো প্রক্রিয়া কার্যকর না হোক।

দুদায়েভ পর্বতে লুকিয়ে থেকে জানত, তার হারানোর কিছুই নেই। রাশিয়ান

BanglaBook.org

সৈন্য প্রত্যাহার এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানানোর ক্ষেত্রে সে যদি ছাড় দিত তবে নেতা হিসেবে তাকে কলঙ্কিত হতে হতো। রাশিয়ান এক জেনারেল তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল টাকা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার। কিন্তু সে সব কিছুর উর্ধ্বে চেচেন স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

একদিন হঠাৎই সে তার প্রধান সমঝোতাকারী ইমায়েভকে বরখাস্ত করে এবং গ্রোজনির প্রতিনিধিদের কাছে অবাস্তব দাবি পেশ করতে থাকে।

এদিকে বাসায়েভ দুদায়েভের শান্তি আলোচনায় অনাস্থা প্রকাশকে পছন্দ করে এবং রাশিয়ানদের হুমকি দেয়া বজায় রাখল। বুদেনোভস্কের ঘটনার পর যখন আমি তার সাক্ষাৎকার নেই তখন সে জৈব অস্ত্র ও রাসায়নিক অস্ত্রের ভয় দেখিয়েছিল। কেউ-ই তার এসব হুমকি কার্যকর করার মতো কারিগরি দক্ষতা আছে বলে বিশ্বাস করত না, বিশেষ করে নিউক্লিয়ার ওয়েপন। কিন্তু রাশিয়ার সাধারণ জনগণ এতে ভীত হয়ে পড়ে। ফলে শান্তি আলোচনা আরো কঠিন হয়ে যায়। আমি জানতাম, শান্তি আলোচনাকে ফলপ্রসূ করতে সে আমাকে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত। কিন্তু তার সমালোচনা করা আমার কাজ নয়। সাধারণ বোয়েভিকরা আলোচনাকে দেখত সংশয় নিয়ে। বুদেনোভস্ক একটা বড় মনোবল হিসেবে কাজ করেছে এবং গত ছয় মাসে গ্রোজনি থেকে ভেদনো পর্যন্ত তারা যেসব শহর হারিয়েছে সেসব ক্ষতে কিছুটা হলেও মলম লাগাতে সক্ষম হয়েছে। বাসায়েভ জাতীয় বীর হিসেবে পরিচিত ছিল, সন্ত্রাসী হিসেবে নয়।

এজন্য চেচেন প্রতিনিধিরা যখন বাসায়েভকে ধরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে রাশিয়ানদের সাহায্যের হাস্যকর প্রতিজ্ঞা করত তখন তা শান্তি আলোচনার অন্তঃসারশূন্যতাই প্রমাণ করে।

সার্থক সমঝোতা না হওয়ার পেছনে মস্কোও সমান দায়ী। প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিনের খুব একটা ধারণা ছিল না, ছয় মাস আগে প্রবল উৎসাহ নিয়ে যে সর্বনাশা অভিযাত্রা তিনি শুরু করেছিলেন, কীভাবে তার ইতি টানবেন। উপরন্তু তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। দু-দুবার তিনি হৃৎপিণ্ডের সমস্যায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন; একবার গ্রীষ্মে, একবার শরতে। পরবর্তী ক্ষমতায় যে আসবে সে যুদ্ধকেই উসকে দেবে। বুদেনোভস্কে পরাজিত হয়ে নিরাপত্তামন্ত্রী, সামরিক বাহিনির নেতৃস্থানীয়রা এবং খুব সম্ভবত ইয়েলসিন নিজেও প্রতিশোধ চাইতেন। তারা চেচেনদের ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেয়ার পদ্ধতি এবং চেরনোমিরদিনের

BanglaBook.org

'রাষ্ট্রের আগে জীবন নীতি'তে ক্রুদ্ধ। রাশিয়ান যুদ্ধ সমর্থিত গোষ্ঠীর লোকজনও ক্ষতিগ্রস্থ তবে তাদের ক্ষতির কারণ ভিন্ন। চেচেনদের মতো তারা তাদের মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করেনি। তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য—জয়লাভ করা।

কুলিকভ হুমকি ছুঁড়ে দেয়, 'যুদ্ধবিরতিকে সাধুবাদ জানাই কিন্তু সন্ত্রাসী বাসায়েভকে আমাদের হাতে তুলে না দিলে নতুন বিরোধের জন্ম হবে এবং এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া চেরনোমিরদিন কর্তৃক আয়োজিত পাবলিক অনুষ্ঠানে হতে হবে।'

গ্রাচেভও মনে করে, শান্তি আলোচনা সময়ের অপচয়মাত্র। সে দাবি করে, বাসায়েভকে চাইলেই বুদেনোভস্কে গ্রেফতার করা যেত, যদিও শত শত সাধারণ মানুষের জীবন হুমকির মুখে পড়ত। এবং এটাও পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে, চেচেনরা আলোচনার যোগ্য নয়। গ্রাচেভ বলল, 'যুদ্ধের এক পক্ষে রয়েছে রাশিয়ার সরকারি বাহিনি আরেক পক্ষে নাশকতা সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী বাহিনি।'

পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে উঠল প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন কর্তৃক একটা ডিক্রি স্বাক্ষরের মাধ্যমে। নতুন আর্মি জন্ম দিলেন (৫৮তম) তিনি যারা উত্তর ককেশাসে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি স্থাপন করবে। উদ্দেশ্য, স্বদেশরক্ষা ও রাশিয়ার আঞ্চলিক সমন্বয়। তারা স্থায়ীভাবে চেচনিয়ায় থাকবে। এ সিদ্ধান্তের পর আর কোন সন্দেহ বাকি থাকল না যে, রাজনৈতিক আলোচনা হলেও তার মধ্যে এজেন্ডা হিসেবে চেচেনদের স্বাধীনতার স্থান নেই। জুলাইয়ের শেষদিকে সাংবিধানিক আদালত রুল জারি করল, ইয়েলসিনের অধিকার রয়েছে যুদ্ধ পরিচালনা করার। কেউ অবাক হলো না এই রুল নিয়ে। যেন এমনটাই হবার কথা ছিল।

এ সময়ের মধ্যে চেচেনরা তাদের বিচ্ছিন্ন সৈন্যদের সংগঠিত করতে শুরু করল এবং অস্ত্রসহ তাদের সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে সমতলের বিভিন্ন গ্রামে পাঠাতে লাগল। এসব গ্রাম অনেকদিন ধরেই রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণে। রাশিয়ান সৈন্যরা বিদ্রোহী অঞ্চলে আর্টিলারী শেল বর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিল তবে তা আক্রমণাত্মক ছিল না। এর একটা কারণ হতে পারে গ্রীষ্মকালীন বিরতি। শীতে লোকজন ঘরে থাকে, আক্রমণ করা সুবিধাজনক। গ্রীষ্মকালীন দিন যতোই ফুরিয়ে আসছিল পাল্লা দিয়ে চিন্তাও বাড়ছিল। তাই দ্রুত শান্তি আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়া জরুরি ছিল।

BanglaBook.org

***

জুলাইতে মুখোশধারী কিছু লোক গ্রোজনির বাইরে একটা চেচেন পরিবারকে হত্যা করে কিন্তু কে দোষী তা কখনই জানা যায়নি। আলোচনায় সাময়িক বিরতি দেয়া হয়। আগস্টে চেচেন ফিল্ড কমান্ডার আলাউদি খামজাতোভ যুদ্ধবিরতি বাজেভাবে লঙ্ঘন করে আরগুনে হামলা চালিয়ে গ্রামটা দখলে নেয়। আলোচনা তারপরও চলে।

২০ সেপ্টেম্বরে লোবভ গ্রোজনি ভ্রমণের সময় অল্পের জন্য গুপ্তহত্যার হাত থেকে বেঁচে যান। আক্রমণের দায়িত্ব কেউ স্বীকার করেনি। তবে সন্দেহের তীর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দিকেই যায়। তারপর অক্টোবরে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত চেচেন পুতুল সরকার ওএসসিই সদরদপ্তরে হয়রানির শিকার হয় ডেলিগেটদের দুদায়েভের দালাল বলায়। প্রতিটি ঘটনাই আশার শেষ সলতেকে সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিল।

আগুনে শেষবারের মতো ঘি ঢেলে দেয় জেনারেল রোমানভকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা। এর চেয়ে নির্লজ্জ আক্রমণ আর হতে পারে না। সেন্ট্রাল গ্রোজনির মিনুতকা ট্রাফিক টানেল দিয়ে দিনেরবেলা গাড়িতে করে যাওয়ার সময় রিমোট নিয়ন্ত্রিত বোমা বিস্ফোরিত হয়। বোমা বিস্ফোরণের ফলে নিরেট কংক্রিটের দেয়াল ধ্বসে গাড়ি বহরের ওপর পতিত হলে চারজন মানুষের মৃত্যু ঘটে।

রোমানভ কোমায় চলে গেল। দুই বছর পর এখনও সে সুস্থ হয়নি। যদিও কেউ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করল না। যুদ্ধবিরতি অফিসিয়ালি শেষ না হলেও আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। শান্তি স্থাপনের শেষ আশার প্রদীপ নিভে গেল। মস্কোতে বসে গ্রাচেভ অদূর ভবিষ্যতে চেচেন গ্রামগুলোতে 'সক্রিয় সামরিক অপারেশন'-এর ঘোষণা দিল। এদিকে সদ্য সংগঠিত হওয়া বোয়েভিকরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগল।

রোমানভের ওপর কে হামলা করেছে আর কে যুদ্ধকে উসকে দিয়েছে সে সিদ্ধান্তে আসা গেল না। চেচেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে শান্তি আলোচনার শম্বুকগতি নিয়ে অসন্তোষ অবশ্যই ছিল। রোমানভ সামাশ্কি গণহত্যাসহ অনেক রক্তক্ষয়ী ঘটনার মূল হোতা ছিল। তার মাথার দাম ধরা হয়েছিল। সাধারণভাবে মনে হয়, এই বোমা হামলা রাশিয়ান জেনারেলের মাথার দামের জন্য হয়েছে। কিন্তু মাসখাদোভ, যে রোমানভের সাথে শান্তি আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের চেষ্টায় ছিল এবং উল্লেখযোগ্য সফলতাও অর্জন করেছিল, সে

BanglaBook.org

বারবার করে বলল, সে তার যোদ্ধাদের আক্রমণের কোন আদেশ দেয়নি। বাস্তবেও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এতে তেমন কোনো লাভ ছিল না। বরং যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে রাজনৈতিক বৈধতা ও শক্তি অর্জনের পথ সুগম হচ্ছিল।

রাশিয়ানদের মধ্যে বিশাল সংখ্যক সৈন্য চাইত রাজনৈতিক সমাধান আসুক এবং এই দলাদলির অবসান হোক। যদিও বুদেনোভস্কের ঘটনার আগে চেচেন যোদ্ধারা দৌড়ের ওপরে ছিল কিন্তু গ্রীষ্মে তাদের উঠে দাঁড়ানো প্রমাণ করে, রাশিয়ানদের সামরিক বিজয় এখনও অনেক দূরে। অপরদিকে উচ্চপদস্থ জেনারেল এবং ক্রেমলিনের রাজনীতিবিদ—যাদের ক্যারিয়ার যুদ্ধের সাথে লটকানো তারা শান্তি আলোচনাকে ভালোভাবে দেখেনি। দুদায়েভের সাথে রাজনৈতিক চুক্তি পক্ষান্তরে তাদের ব্যর্থতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

রাশিয়ান অধ্যুষিত এলাকা শাসনের জন্য চেচনিয়ায় নিযুক্ত পুতুল সরকারও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। সালামবেক খাদজিয়েভ এবং উমার আভতারখানভ ছিল এদের নেতৃত্বে। এরাই ১৯৯৪ সালে ভেতরে ভেতরে দুদায়েভকে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়ার ধান্দায় ছিল। তোষামোদির ফলস্বরূপ মস্কোয় নির্বাসিত জীবন থেকে মুক্তি, ক্ষমতা এবং অর্থ লাভ করেছে। বিশেষ করে গ্রোজনি পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে বিশাল পরিমাণ অর্থ এখন তাদের হাতে। বেসলান গান্তেমিরভ এমন একজন। যুদ্ধের আগে গ্রোজনির মেয়র ছিল। দুদায়েভকে ঘৃণা করে। এখন পুতুল সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী। গ্রোজনিকে বিশাল বাজেট ও প্রাইভেট আর্মি দ্বারা পরিচালনা করছে।

রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ফিরিয়ে আনা মানেই এসবের শেষ। দুদায়েভের লোকজন পুতুল সরকারকে হয় অপরাধী নয়ত বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বিবেচনা করবে।

মোভলাদি উদুগভ শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পেছনে মস্কোর যুদ্ধ সমর্থিত দলকে দায়ী করেন। যদিও তিনি নাম উল্লেখ করেননি। তার কাছ থেকে জানা যায়, দুদায়েভ এবং ইয়েলসিনের মধ্যে একটা সম্ভাব্য মিটিং- যা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সবসময়ই চেয়ে আসছিল-নস্যাৎ করে দেয়া হয়। তিনি ইয়েলসিনের 'কাছের লোক' হিসেবে বিবেচিত কিছু রাশিয়ান অফিসিয়ালদেরকেও দোষারোপ করেন। তারা চেচেনদের ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করেছে এবং টাকাও দাবি করেছে।

BanglaBook.org

উদুগভ অবশ্য বলেননি ব্ল্যাকমেইলারা কী প্রস্তাব রেখেছিল। হতে পারে তারা একটা কার্যকর শান্তি চুক্তি অথবা ইয়েলসিনের সাথে মিটিং আয়োজন করে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল টাকার বিনিময়ে। যদি টাকা না দেওয়া হয় তাহলে চেচেনদের কী বিপদে পড়তে হবে সেটাও বলেননি উদুগভ। তবে রোমানভকে হত্যা এ তালিকার শুরুতে থাকতে পারে!

গ্রোজনি

৭ জুলাই সন্ধ্যা ঘনালে মুখোশ পরা বন্দুকধারীরা গ্রোজনির শহরতলিতে চাপানোভা পরিবারের ছোট্ট বাসায় আসে। বাবা, দাদা, চাচা, দুই বাচ্চা আর দুই বছরের কন্যা শিশুকে হত্যা করে। চাচি প্রচন্ড আহত হয়। মা বেঁচে যায়, কারণ তখন সে বাড়ির বাইরে মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়েছিল। কেউ গুলির শব্দ শোনেনি। হয়তো সাইলেন্সার ব্যবহার করা হয়েছিল। সাক্ষীরা শুধু এটুকু বলতে পারে, আততায়ীরা রাশিয়ান এপিসি নিয়ে এসেছিল। গায়ে ছিল রাশিয়ান ইউনিফর্ম। যদিও এর কোন প্রমাণ নেই। রাশিয়ানরা দাবি করল, যে কেউ চাইলেই রাশিয়ান আর্মির পোশাক পরতে পারে।

তবে সিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য শান্তি আলোচনার কয়েক ঘন্টা পূর্বে এমন গণহত্যার উদ্দেশ্য পরিষ্কার।

চাপানোভা পরিবারের মৃতদেহগুলো সাদা চাদরে শুইয়ে একটা খোলা ট্রাকে করে গ্রোজনির সেন্ট্রাল স্কয়ারে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের কাছে আনা হয়েছে। লাশের চাদর যারা ধরেছিল তাদের হাত রক্তে চ্যাটচ্যাটে হয়ে গেছে। গাড়ি পৌঁছুনোমাত্রই সমবেত হাজার হাজার জনতা ক্রোধে চিৎকার করে উঠল। তারা কাঁদছে, দোয়া করছে। একজন মহিলা চিৎকার করে বলে ওঠে, 'এই যদি হয় শান্তি, তাহলে যুদ্ধই ভালো।'

স্কয়ার চারপাশ থেকে রাশিয়ান সৈন্যরা ঘিরে রেখেছে। এপিসিগুলো জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করছে। যুদ্ধযানের ওপর সৈন্যরা সতর্ক অবস্থায় বসে সূর্যের তাপ এবং জনতার ঘৃণায় পুড়ছে। জনসমুদ্র ওএসসিই'র সদর দপ্তরের দিকে যেতে চায়। সেখানে তারা লাশগুলো প্রদর্শন করবে। কিন্তু সৈন্যরা অনমনীয়, তারা জনগণকে এক পাও এগোতে দেবে না। মৃতদেহগুলো সূর্যের তাপে তেতে উঠছে। ট্রাকের চারপাশে জনগণ শ্লোগান দিচ্ছে, 'চেচনিয়া, চেচনিয়া!' সব সময়ের মতো ছোট একটা গ্রুপ যিকির করছে।

BanglaBook.org

যখন ওএসসিইতে থাকা নেতারা শুনলেন জনসমুদ্রকে আটকে দেয়া হয়েছে, তারা আলোচনাকক্ষ থেকে ঝড়ের গতিতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সাধারণ জনগণের মূর্তি ছুঁড়ে ফেলে হঠাৎ করেই তারা গেরিলা যোদ্ধাতে পরিণত হলেন। ওসমান ইমায়েভ, আসলান মাসখাদোভ এবং সংস্কৃতিমন্ত্রী আহমেদ জাকায়েভ মুহূর্তের মধ্যে নিরাপত্তারক্ষী, রাইফেল, মেশিনগান ও আরপিজি দিয়ে জিপ ভর্তি করে ছুটলেন প্রধান রাস্তার দিকে।

তারা রাশিয়ান সারির পেছনে পৌঁছুনোমাত্র দ্রুত জিপ থেকে নেমে এপিসির ফাঁক গলে জনসমুদ্রের দিকে এগোতে লাগলেন। তাদের দৃষ্টি সামনে, অস্ত্রের মুখ আকাশের দিকে তাক করা। রাশিয়ান সৈন্যরা নীরব ক্ষোভ নিয়ে এপিসির ওপর থেকে দেখতে থাকল তাদের। কোনো এক পক্ষ থেকে একটা গুলি চলা মানেই এখানে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। জনসমুদ্র 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল যখন মাসখাদোভ ও তার সঙ্গীরা ভীড় ঠেলে লাশবহনকারী ট্রাকের দিকে এগুচ্ছিলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য সেন্ট্রাল স্কয়ার যেন চেচেনদের দখলে চলে এসেছিল।

ইমারভ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাচ্চার লাশ তুলে নিয়ে হাত উঁচু করলেন। সমবেত সবাই মোনাজাতের উদ্দেশ্যে হাত ওঠালো। বাচ্চার মা ট্রাকের এক সাইডে অন্য মৃতদেহের পাশে বসে আছে।

'এই হত্যার পেছনে দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আলোচনা বন্ধ থাকবে। দেখো, তাদের কাজ দেখো। প্রতিবাদ না করলে এই অত্যাচার চলবেই। এটা তোমাদের সবার বাড়িতেই ঘটবে,' ইমায়েভ জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে বললেন।

নেতারা মৃতদেহ ওএসসিই'র সামনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিল। এ মুহূর্তে কী করতে হয় তা রাশিয়ান সৈন্যরা জানে। তারা এপিসিতে করে স্থান ত্যাগ করল এবং মানুষের ঢল মাসখাদোভের নেতৃত্বে পায়ে হেঁটে ওএসসিই বিল্ডিং লক্ষ্য করে এগোতে লাগল।

মৃতদেহ সমেত ঢল ওএসসিই বিল্ডিং-এর সামনে এসে 'চেচনিয়া, চেচনিয়া' শ্লোগানে আকাশ বাতাস ভারি করে তুলল। পুতুল সরকারের এক সদস্য ভয়ে বিল্ডিং-এর ভেতরে পালাতে চাইল। উন্মত্ত জনগণ তাকে ধরে পেটাতে লাগল। ওএসসিই'র এক কুটনীতিবিদ অলিভার পেলেন ক্রোধান্বিত জনগণের মধ্যে ঢুকে ছাইরঙা কোট পরিহিত লোকটাকে উদ্ধার করে বিল্ডিং-

BanglaBook.org

এর ভেতরে নিয়ে গেলেন।

চরম উত্তেজনার পর অবশেষে চেচেনরা আলোচনায় বসতে রাজি হলো। যদিও দোষীদের খুঁজে পাওয়া যায়নি আর কখনও যাবেও না তা সবাই জানত।

তিনদিন পর চাপানোভা পরিবারের বাড়ির বাইরেই আরেকটা ছিন্ন মস্তক পাওয়া গেল। পচে সবুজ হয়ে যাওয়া মাথাটা মাছির দঙ্গল ঢেকে ফেলেছে প্রায়। কেউ জানে না মাথাটা কার তবে উদ্দেশ্য পরিষ্কার। শংকা জিইয়ে রাখা।

'কাকে তুমি দোষ দেবে? প্রশ্নটা খুবই জটিল,' একজন প্রতিবেশী সারানি ইয়াকিয়েভ বলল, 'আমরা সবাই শান্তি চাই।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় পাঁচ
যুদ্ধ সমর্থনকারী পার্টি

ক্রেমলিনের যুদ্ধ সমর্থনকারী পার্টি, যারা 'সংক্ষিপ্ত অথচ বিজয়সূচক যুদ্ধ'র স্বপ্ন দেখত, তাদের উচ্চাশা কমতে কমতে ১৯৯৫-এর শীত এসে নতুন লক্ষ্যে স্থির হলো। যেভাবেই হোক এ যুদ্ধ ১৯৯৬ এর জুনের নির্বাচনের আগেই শেষ করতে হবে এবং ইয়েলসিনকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা গিনেডি যুগানোভের কাছে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

রাশিয়ার নতুন কৌশল দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমত, রাশিয়ান আর্মি আবার গ্রামগুলোতে ফিরে যাবে এবং বিদ্রোহীদের কোণঠাসা করে পর্বতে পাঠিয়ে দেবে। তারপর গতবারের বড় ভুল সংশোধন—চেচনিয়ায় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা। এরপর আর্মি ফেরত আসবে। কিন্তু পুতুল সরকার যুদ্ধবিদ্ধস্ত গ্রাম পুনর্দখল করে সেগুলোকে 'শান্তি ও সহাবস্থানের এলাকা' হিসেবে গড়ে তুলবে। বিনিময়ে বোয়েভিকদের গ্রেফতার করা হবে। এটা এক প্রকার সন্ধিস্থাপন, যুদ্ধ নয়।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান দায়িত্ব যার ওপর পড়ল সে আর কেউ নয়, চেচনিয়ার সর্বশেষ 'সোভিয়েত বস' ডকু জাভগায়েভ, যাকে দুদায়েভ ১৯৯১ সালে চেচনিয়া থেকে বের করে দিয়েছিল। সে মস্কো থেকে উড়ে এসে চেচনিয়ার পুতুল সরকারের প্রধান হলো অক্টোবরে। পরবর্তীতে ডিসেম্বরের চরম প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনে জয়ী হয়।

ক্রেমলিনের কাছে জাভগায়েভ তার পূর্বতন সালামবেকের চাইতে অধিক যোগ্যই নয় শুধু বরং তাকে দেখে আদর্শবাদীও মনে হতো। সশস্ত্র বাহিনির সমালোচক ছিল সে।

রাশিয়ার কৌশলের প্রধান দিক ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পক্ষে সাধারণ

BanglaBook.org

জনগণের সমর্থন নষ্ট করা। যুদ্ধ যতো দীর্ঘ হবে, বোয়েভিকরা ততো সাধারণ মানুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এদিকে গ্রামগুলোকে 'শান্তি ও সহাবস্থানের এলাকা' হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা সফল হলেই বিমানের মাধ্যমে বোয়েভিকদের রসদ পাওয়ার উপায় বন্ধ করে দেয়া যাবে। ফলে বিদ্রোহীরা দু'দিক থেকেই কোণঠাসা হয়ে পড়বে। জাভগায়েভ জনপ্রিয় না কিন্তু শান্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি বীতশ্রদ্ধ জনগণের আস্থার কারণ হতে পারে। তাছাড়া তার কিছু অনুসারীও ছিল যারা সোভিয়েত আমলের কথা স্মরণ করে নস্টালজিক হয়ে পড়ত। এমনকি মস্কোর কট্টরপন্থীদের কাছেও জাভগায়েবভ ছিল শান্তি আলোচনা বন্ধের এক আদর্শ অস্ত্র, কারণ সে 'নির্বাচিত'। সে নিজেকে চেচনিয়ার বৈধ ক্ষমতাসীন হিসেবে দাবী করতে পারে। অপরদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা 'জাভগায়েভ-বিরোধী' প্রান্তিক গোষ্ঠী ছাড়া কিছুই নয়।

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্য দ্রুত কোনো পদক্ষেপ নেয়া ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নিজেদের শক্তিমত্তার প্রদর্শন, রাশিয়ানদের নাকাল করা এবং জাভগায়েভকে অসহায় প্রমাণ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। মাসখাদোভ এজন্য গুডারমেস শহরকে বেছে নিল। প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় শহর। প্রধান পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়ক এবং রেলওয়ের পাশে অবস্থিত। ১৪ ডিসেম্বর নির্বাচনের ভোট গ্রহণের দিনকে বেছে নেয় তারা। নির্বাচনের একমাত্র কার্যকরী পদপ্রার্থী জাভগায়েভ। কয়েক'শ গেরিলা রাশিয়ান বাহিনিকে আক্রমণ করে শহর দখলে নেয়। তবে দ্রুতই রাশিয়ান বাহিনি ট্যাংক ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে কাউন্টার-এটাক করে। শহরকে সিল করে দিয়ে আর্টিলারি ও বোমারু হেলিকপ্টার সমেত অবস্থান নেয়। অবশেষে ২৫ ডিসেম্বর চেচেনদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

এই আক্রমণটাকে সাধারণ জনগণ 'দ্বিতীয় যুদ্ধ' নাম দিয়েছে। হতোদ্যম রাশিয়ান বাহিনির জন্য এটা বেশ অবমাননাকরই বটে। যদিও পুনর্দখল সম্ভব হয়েছে কিন্তু জয়ের প্রোপাগান্ডা চেচেনদের পক্ষে গেছে। বসন্তে দখল করা একটা শহরের জন্য রাশিয়ানদের লড়াই তো করতে হয়েছেই উপরন্তু চেচেনরা তাদের বোকা বানিয়ে পালিয়ে যেতেও সক্ষম হয়েছে।

রাশিয়ান বাহিনি এবং জাভগায়েভ গুডারমেসের ঘটনার ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই চেচেনরা আবার হামলা চালায়। এবার দাগেস্তান সীমান্ত দিয়ে। আসন্ন ড্রামা শুধু নিষ্ঠুরই নয় বরং রাশিয়ানদের জন্য অপমানজনক হতে চলেছে।

BanglaBook.org

দুদায়েভের আটাশ বছর বয়সী ভাতিজা সালমান রুদায়েভের গুডারমেস হামলার একজন কমান্ডার ছাড়া খুব একটা পরিচিতি ছিল না। মুখে লম্বা দাড়ি, ঝকঝকে চোখ, পাতলা মুখ। ৯ জানুয়ারি তার এবং খুনকার পাশা ঈসরাপিলভের নেতৃত্বে দু'শ যোদ্ধার এক কমান্ডো ফোর্স 'কিজলার' হেলিকপ্টার ঘাঁটিতে আক্রমণ করে। এটা দাগেস্তানের উত্তর দিকে। কিন্তু আক্রমণ সফল হয়নি। রাশিয়ান সেনাবাহিনি দ্রুততার সাথে অবস্থান নেয়, অল্প কিছু হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়।

বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গেরিলারা কিজলার হাসপাতালে ঢুকে ২০০০ জনকে জিম্মি করে। ৯ জন সৈন্য অথবা পুলিশ, কয়েকজন বোয়েভিক এবং ২৪ জন সাধারণ লোক গোলাগুলিতে মারা যায়।

এ যেন দ্বিতীয় বুদেনোভস্ক। কিন্তু শামিল বাসায়েভের অপারেশনের মতো অতোটা আন্তরিক ও মরিয়া ভাব এতে ছিল না। দাগেস্তানি কর্তৃপক্ষের সাথে রুদায়েভের চুক্তি হয় যে বাসের বহর তাদের বর্ডারে রেখে আসবে, সঙ্গে মানববর্ম হিসেবে থাকবে ১৫০ জন জিম্মি। বুদেনোভস্কের ঘটনাই যেন পূনরায় ঘটতে লাগল। তবে মস্কো এবার চেচেনদের পালাতে দেবে না।

চেচেন সীমান্তে পৌঁছে যখন রাদুয়েভ জিম্মিদের ছেড়ে দিয়ে নিজেদের লোক নিয়ে পালাবে তখনই একটা হেলিকপ্টার গানশিপ আচমকা উড়ে এসে ফায়ার ওপেন করল। বাস দাঁড়িয়ে গেল। চেচেনদের তখনও মানববর্ম ছিল যার ফলে শত্রুরা আক্রমণ করতে পারবে না। রাদুয়েভের লোকজন দ্রুত গাড়ি ঘুরিয়ে দাগেস্তানের গ্রাম 'পার্ভোমাইস্কোয়ে'র উদ্দেশে রওনা হলো। সেখানে পৌঁছে গ্রামের পুলিশ চেকপয়েন্ট ঘেরাও করে বিনা যুদ্ধে পুলিশদের বন্দি করল। তারপর বোয়েভিকরা জিম্মিদের নিয়ে পার্ভোমাইস্কোয়েতে প্রবেশ করে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করল।

জিম্মি মুক্ত করার আলোচনা পাঁচ দিন ধরে চলল। এরমধ্যে চেচেনরা যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল। যদিও চারিদিকে ঘেরা তবু তাদের প্রচুর খাদ্য, পানি এবং আশ্রয় ছিল আত্মরক্ষার জন্য। উপরন্তু পুলিশ চেক পয়েন্ট থেকে লুট করা হয়েছিল ৭টা আরপিজি, ৩৫টা বিধ্বংসী রাইফেল, ৩টা স্নাইপার রাইফেল এবং ১০ হাজার রাউন্ড গোলাবারুদ। জিম্মিদেরকে পরিখা খনন করার কাজে নিয়োজিত করা হলো।

আলোচনার কোনো ফলপ্রসূ সমাধান এলো না। ক্রেমলিনের ঘাড়ে কোনো চাপ নেই চেচেনদের দাবি মানার। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর মাত্র পাঁচ মাস

BanglaBook.org

বাকি। অসুস্থ ও দুর্বল ইয়েলসিন মরিয়া হয়ে আছেন নিজের 'কর্তৃত্ব' দেখানোর জন্য। অপরদিকে চেচেনরাও ফাঁদে পড়ে গেছে। এই মুহূর্তে টেরোরিস্ট ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই তাদের। তাদের টেরোরিস্ট পরিচয়কে আরো জোরদার করার জন্য অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী আনাতোলি কুলিকভ এবং এফএসবি প্রধান মিখাইল বারসুকভ সেখানে উড়ে গেল এবং অপারেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করল। জনগণের নৈতিক সমর্থন পাবার জন্য মস্কো ঘোষণা করল, রাদুয়েভ বন্দিদেরকে গুলি করেছে- যদিও পরবর্তীতে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

আক্রমণ ১৫ জানুয়ারি শুরু হয় বিশাল ট্যাংক বহর ও একদল কমান্ডো বাহিনির মাধ্যমে। সেদিন সকালেই আমি মস্কো থেকে দাগেস্তানের প্লেন ধরলাম এবং ভাবলাম ওখানে গিয়ে হয়তো শুধু লাশই গুনতে হবে। প্রায় দু'হাজার সৈন্য গ্রামকে ঘিরে রেখেছে। আলফা, এসওবিআর-এর মতো এলিট কমান্ডো ফোর্স-যারা চেচনিয়ায় ইতোমধ্যেই নিজেদের সুনাম যথেষ্ট খুইয়েছে-তারাও সিনেমায় দেখা মৃত্যুঞ্জয়ী নায়কের মতো কালো স্কি মাস্ক এবং হেলমেট পরে অবস্থান নিয়েছে। ক্রেমলিন থেকে তিন স্তর বিশিষ্ট সৈন্যের কথা বলা হলো। এদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন নিজেকে জোকারে পরিণত করলেন যখন ন্যাশনাল টেলিভিশনে ভাঙা ভাঙা অসুস্থ গলায় এই বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন যে, আটত্রিশজন স্নাইপার সার্বক্ষণিক টেলিস্কোপ রাইফেল দিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে!

কিন্তু পরদিন আমি ওখানে পৌঁছে দূরবর্তী গোলাগুলির শব্দে বুঝলাম, যুদ্ধ এখনও দানা বাঁধছে। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় বলল, চেচেনদের শেষ প্রতিরোধকেও নস্যাৎ করা হবে, ওরা ভীত হয়ে পড়েছে এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ হারিয়েছে।

কিন্তু সত্য হলো, যে ক'টা রাশিয়ান সৈন্যদল গ্রামে ঢুকেছে তাদের খুব কমই ফিরে আসছে। চেচেনরা এখনও প্রতিরোধ করেই চলছে।

পরের দু'দিন আমি এবং আমার কলিগ পার্ভোমাইস্কোয়ে থেকে চার কিলোমিটার দূরে একটা চেকপোস্টে অবস্থান নিলাম। এর বেশি কাছে যাবার অনুমতি আমাদের ছিল না। আমরা চাচ্ছিলাম, যতোটা সম্ভব কাছে থেকে অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা যায়। কিন্তু দেখা যেত খুব কমই। তবে শুনতে পাচ্ছিলাম। আর্টিলারি হেলিকপ্টার আর রকেট বিস্ফোরণের বিকট শব্দ থামছিলই না। ধোঁয়ায় আকাশ ধূসর হয়ে যেত। যুদ্ধের ময়দান থেকে আমাদেরকে

BanglaBook.org

দূরে রাখল একটা পাগলা কুকুর, প্রচন্ড ঠান্ডা এবং বাজে মেজাজের সৈন্যরা। গার্ডরা মাঝে মাঝে কুকুরটাকে ছেড়ে দেয়া হতো লোকজনকে কামড়ানোর জন্য। কখনো কখনো রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স বা গোলাবারুদের ট্রাক গর্জন তুলে যেতে দেখা যাচ্ছিল। আসলে তেমন কিছু লেখার নেই শুধু একটা ব্যাপার বাদে—চেচেনরা এখনও পাল্টা গুলি করে যাচ্ছিল।

যতোই চেচেনরা টিকে যাচ্ছিল, তাদের দিকে নিক্ষেপ করা শেল ততো বেশি ভারি হচ্ছিল, টেলিভিশনে ততো বেশি মিথ্যা সম্প্রচারিত হচ্ছিল। এফএসবি প্রতিনিধি বলল, সব কিছু ঠিকঠাক; ৬ জন রাশিয়ান ও ৬০ জন চেচেন সৈন্য মারা গেছে। কিন্তু এরপরও যুদ্ধ চালানোর উদ্দেশ্য হলো, চেচেনরা ৮ জন পুলিশকে মেরে ফেলেছে এবং বাকিদেরকেও মারার হুমকি দিচ্ছে। গল্পকে মুখোরোচক করার জন্য-বিশেষত স্থানীয় জনগণের কাছে- তারা আরো বলল যে, ৬ জন দাগেস্তানি প্রবীন লোক আলোচনার জন্য গিয়েছিল, তাদেরকেও গুলি করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত এই কৌশল হয়তো কিছুটা কাজও করল কিন্তু তৃতীয় দিনে এসেও চেচনিয়া প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল। এখন রাশিয়ানরা কী বলবে? তারা কি এখনও বলবে, সব ঠিকঠাক? এফএসবি জেনারেল আলেকজান্ডার মিখাইলোভ নতুন গল্প ফাঁদল:

'আজ অপারেশন শেষ হবে।'

'কীভাবে?'

'আমি সব গোমর ফাঁস করব না, আপনারাই দেখতে পাবেন তবে সর্বোচ্চ অ্যাকশনে যাওয়া হবে।'

'জিম্মিদের কী হবে? তাদের রক্ষার ব্যাপারে পরিকল্পনা কী? এটা কি জিম্মি উদ্ধারের অপারেশন নয়?'

'এখন আর এটা জিম্মি উদ্ধারে সীমাবদ্ধ নেই।'

আমরা অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

'আমি চাই, সবাই বুঝুক বর্তমান পরিস্থিতি শুধু জিম্মি মুক্ত করাতে সীমাবদ্ধ নেই। আপনি যদি মিলিটারি রুলস ফলো করেন তাহলে বুঝবেন, এটা এখন সামরিক ঘাঁটি পুনরুদ্ধারের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, পুরো শহর মুক্ত করার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'শহর? পার্ভোমাইস্কোয়ে? আর জিম্মিদের প্রাণ?'

'আমরা জানতে পেরেছি, জিম্মিদের অল্প সংখ্যকই বেঁচে আছে এই

BanglaBook.org

মুহূর্তে।’

আমি টেপটা একবার, দু’বার, তিনবার বাজালাম। নিশ্চিত হতে চাইছি, আমি কি ঠিক শুনছি? রাশিয়ানরা উন্মাদ হয়ে গেছে। তাদের স্বপ্ন ছিল, জিম্মিরা বেঁচে ফিরে হাসিমুখে কমান্ডোদের সাথে করমর্দন করবে আর চেচেনদের লাশ মাটিতে বিছিয়ে থাকবে। কিন্তু তা এখন কল্পনাতেও হবার নয়। তাই তারা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চলে গেছে। একটা গ্রাম, যেটা মানচিত্রে জায়গা করে নেবার তুলনায়ও খুব ছোট, সেটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া।

ওইদিন বিকেলে আমরা কিছু সাংবাদিকের কাছ থেকে খবর পেলাম-তারা গ্রামের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল-ভয়ংকর অ্যাকশন শুরু হয়েছে। গ্রেড রকেট কয়েক কিলোমিটার জুড়ে হামলা হচ্ছে। গ্রাম উড়িয়ে দিচ্ছে। আধ ডজন হেলিকপ্টার গানশিপ ঘণ্টাব্যাপী নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঘুরছে আর গোলা ফেলছে।

রকেটের কালো ধোঁয়া, আগুনের ধোঁয়া এবং ধ্বংস হওয়া বাড়িঘরের জঞ্জালের ধোঁয়ায় দৃষ্টি অচল হবার আগ পর্যন্ত চলল এই তাণ্ডব। এমনকি আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখানকার মাটি-বাতাস বিস্ফোরণে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, চেচেনদের মেশিনগান আর রাইফেল তখনও গর্জে উঠছিল। তুষারে দাঁড়িয়ে বিমর্ষ আমি ভাবছিলাম, জিম্মিরা যেন কষ্ট না পেয়ে দ্রুত মারা যাবার মতো সৌভাগ্যবান হয়। মানলাম, চেচেন যোদ্ধারা হাসপাতাল দখল করেছে, মানুষকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে, তারা খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু তারা যেভাবে জিম্মিদের রক্ষা করছে সেটা প্রশংসার দাবিদার।

আমরা সকালে উঠে একটা কানাঘুষা শুনলাম। দাগেস্তানের ওই এলাকাতে স্থানীয় চেচেন যারা বাস করত তারা সারা রাত রেডিও টিউন করে বসে ছিল। বোয়েভিকদের রেডিও বলেছে—রাদুয়েভ ও ঈসরাপিলভ রাশিয়ান অবরোধকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চেচনিয়া পালাতে সক্ষম হয়েছে, সাথে জিম্মিদেরকেও নিয়ে গিয়েছে।

আমরা হাসলাম। কিন্তু এই গল্প চারিদিক ছড়িয়ে যেতে লাগল। যে সকল জিম্মি পালাতে পেরেছে হঠাৎ তাদের দু’একজন জাহাজডুবি থেকে বেঁচে যাওয়া নাবিকের মতো ভেসে উঠে যখন ঘটনার সত্যায়ন করল তখন বুঝলাম, গুজবটা সত্য ছিল।

পরবর্তীতে জানা গেল যুগপৎভাবে চেচনিয়ার ভেতর থেকে একটি

BanglaBook.org

ডাইভারশন তৈরি করা হয় সোভিয়েতস্কোয়ে গ্রাম ঘিরে। সোভিয়েতস্কোয়ে গ্রামটা পার্ভোমাইস্কোয়ের পাশেই। আসলান মাসখাদোভ জানায়, প্রায় চারশ যোদ্ধা এই ডাইভারশনে অংশ নেয়। রাশিয়ানদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়া হয় যাতে এই ফাঁকে রাদুয়েভ এবং ঈসরাপিলভ বের হয়ে আসতে পারে।

'মস্কো চেয়েছিল সবাইকে হত্যা করতে তাই আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের পরিকল্পনা করি যেন রাদুয়েভের লোকজন এবং জিম্মিদেরকে রকেট আর্টিলারি বোমার আঘাত থেকে বাঁচিয়ে বের করে আনা যায়। আমরা চিন্তা অনুযায়ী কাজ করেছি এবং সফল হয়েছি।'

এটা ছিল তার বাহিনির সবচেয়ে নাটকীয় বিজয়।

প্রথম দিন যে সত্য বের হয়েছিল, রাশিয়ান সরকার তার বিপরীত কথা বলে। তারা নিজেদের বিজয়কে সুনিশ্চিত বলে বিবৃতি দেয়। প্রথমে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় বলে, একটা অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু তা প্রতিহত করা হয়েছে। অবশেষে সরকার সত্যতা স্বীকার করে। মিলিটারি বিশেষজ্ঞরা বলল, সেখানে অনেক সৈন্য ছিল কিন্তু তারা ছিল অনাহারে-অর্ধাহারে। এমনকি এটাও বলল, চেচেনরা পার্ভোমাইস্কোয়েতে বিশাল সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছে।

নিজেদের লজ্জা বাড়িয়ে দিয়ে কমান্ডোরা স্বীকার করে, প্রথম দিন তাদের নিজস্ব হেলিকপ্টার দ্বারা নিজেরাই আক্রমণের শিকার হয়। তবে মৃতের সংখ্যা নিয়ে দ্বিমত থেকেই গেল। কেউ বলে ৮০ জন মারা গেছে, কেউ বলে ২৪, কেউ বলে আরো কম। যদিও গ্রামের পড়ে থাকা মৃতদেহ হিসাব করে এটা বের করা কঠিন কিছু নয়। একটা নিরপেক্ষ সূত্র জানায়, ১০০ জন চেচেন ও ৭০ জন রাশিয়ান সৈন্য মারা গেছে।

এতো কিছুর পর রাশিয়ানদের একটাই আশা ছিল, রাদুয়েভ হয়তো মারা গেছে। আপনি অনুভব করতে পারবেন, ক্রেমলিন কীভাবে প্রার্থনা করছিল যেন রাদুয়েভ মারা যায়। কিন্তু সে মরেনি।

একজন চেচেন গাইডের সহায়তায় আমি ঘটনার পরের রাতে চেচনিয়া বর্ডার পালিয়ে পার হলাম। বরফ জমা পথে হেঁটে রাশিয়ান চেকপোস্ট ফাঁকি দিয়ে দুই ঘন্টা পর এনজেল ইয়ার্টে পৌঁছুলাম। আমরা ট্রাকের চাকার দাগ অনুসরণ করে পথ চলছিলাম। এনজেল ইয়ার্টে ভ্যান ভর্তি একদল যোদ্ধা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা পার্ভোমাইস্কোয়ে থেকে পালিয়ে আসা চেচেনদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার পরিবর্তে আমাদের পেল। আমার সাথে স্যাটেলাইট

BanglaBook.org

টেলেক্স-এর জিনিসপত্র, ছবি তোলার ফিল্ম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জিম্মিরা কি আসলেই পালাতে পেরেছে?'

'হ্যাঁ।'

'সালমান রাদুয়েভ কি বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ।'

দুই ঘন্টা পর আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

শেষ জিম্মিকে কিছুদিন পর মুক্তি দেয়া হলো এবং ক্রেমলিন এই ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার সর্বত চেষ্টা চালাল। পার্ভোমাইস্কোয়ের প্রতিটা বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। এখানকার বাসিন্দাদের বাড়ি নির্মাণের জন্য ক্ষতিপূরণের টাকা ও গাড়ি দেয়া হলো। যদিও কুলিকভ এবং বারসুকভের কাছে কেউ কৈফিয়ত চাইল না। এমনকি অপারেশন সফল বলে ঘোষণাও করা হলো। যখন প্রশ্ন করা হয়, উদ্ধারকারী সৈন্যরা কেন গ্রেড রকেট, আর্টিলারির মতো বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করল, বারসুকভ তখন আধ্যাত্মিক (!) উত্তর দেয়, 'এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক কৌশল।'

যখন জিম্মিরা একসাথে বিবৃতি দিল তখন বোঝা গেল রাশিয়ান আর্মির বিবৃতি মিথ্যা। কোন জিম্মি বা দাগেস্তানি প্রবীণকে হত্যা করা হয়নি।

সেনাবাহিনি জিম্মিদের এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাদের চেচেনদের দোসর বলে তিরষ্কারও করল।

প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন দেখালেন, তর্জন গর্জন করে সে কতোটা নিচে নামতে পারে।

'পাগলা কুকুরকে গুলি করে হত্যা করতে হয়। প্রাদেশিক বাহিনি দুদায়েভের দম্ভকে চূর্ণ করবে,' তিনি বললেন। 'আমাদের স্পেশাল ফোর্স চেচনিয়ায় যে সব সামরিক ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছে চাইলে সেগুলো ধ্বংস করার জন্য পুরো চেচনিয়া উড়িয়ে দিতে পারি আমরা।'

তবে চেচনিয়ার রাজনৈতিক নেতারা এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী।

'তারা চেচেন যোদ্ধা এবং জিম্মিদের মারতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তো অন্যরকম চেয়েছেন,' মাসখাদোভ বলল, 'রাশিয়ান সৈন্যরা দেখিয়ে দিয়েছে তারা কতোটা অসহায়।'

পার্ভোমাইস্কোয়ে নাটকীয়তার আরেক পার্শ্ব ঘটনা রাশিয়ানদের অপমানকে

BanglaBook.org

বাড়িয়ে তুলল। যুদ্ধের সময় কতিপয় তুর্কি রাশিয়ান যাত্রীবাহী একটি ফেরি আটকে দেয় তুরস্কের কৃষ্ণ সাগরের 'ট্রাবযোন' বন্দরে এবং চেচনিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ দাবি করে। উত্তর ককেশাসের বেশিরভাগ অধিবাসীই ছিল তুর্কি মুসলমান। চেচেনদের বিদ্রোহীদের জন্য তারা আত্মিক টান অনুভব করত। ফেরি ছিনতাইকারীদের প্রতি সমর্থন জানাতে তারা সমুদ্রের পারে র‍্যালি করল। সেখানে রাশান পতাকা জ্বালিয়ে চেচেন পতাকা ওড়ানো হয়।

ইয়েলসিন তুর্কি কর্তৃপক্ষের 'মান্ধাতা' আমলের চিন্তাধারার জন্য সমালোচনা করেন এবং রাশিয়ানদের সাহায্য করার প্রস্তাব দেন।

অবশ্য জিম্মি করার তিনদিনের মাথায় অস্ত্রধারীরা নিজ থেকেই বিনা রক্তপাতে জিম্মিদের মুক্ত করে দেয়।

এটা একটা ওপেন সিক্রেট ব্যাপার যে, তুরস্কে চেচেনদের সমর্থক রয়েছে। চেচেন আবিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা চাইলে সেখানে আশ্রয় নিতে পারে, এমনকি অফিস প্রতিষ্ঠাও ইস্তাম্বুলে সম্ভব।

কিছু রাশিয়ান বিশ্লেষক তো তুরস্কের সরকারকেই চেচেনদের সাহায্যের জন্য দোষারোপ করে। অবশ্য এমনটা ঘটার সম্ভাবনা কম। কারণ ইস্তাম্বুল খোদ তাদের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কুর্দিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। রাশিয়ানদের সাথে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ভালো রাখা জরুরি; অন্তত চেচনিয়ার থেকে। এতদসত্ত্বেও ফেরি সমস্যা শেষ হওয়ার পরে তুর্কি প্রধানমন্ত্রী তানসু সিলার বলেন, 'শোকাবহ ঘটনা ককেশাসে ঘটেই চলেছে। সেখানে মা ও শিশুকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। বিশ্ব নেতৃত্বের সেদিকে নজর দেয়া প্রয়োজন।

নভোগ্রোজনি

যখন রাদুয়েভ নভোগ্রোজনি শহরের সেলারে প্রবেশ করল তখন জিম্মিরা মাদুরে আড়মোড়া দিচ্ছিল। তারা উঠে বসল এবং অভিবাদন জানাল পুরনো বন্ধুর মতো, 'হ্যালো সালমান', সমস্বরে বলে উঠল।

'তোমরা সবাই কেমন আছো?' সালমান তার সুচালো দাড়ির ফাঁকে স্মিত মুখে বলল।

তারপর করমর্দন এবং গলা মেলালো বন্দীদের সাথে। কেউ কেউ আহত কিন্তু সবাই ক্লান্ত, শ্রান্ত। সবাই মৃত্যুর দরজা থেকে ফেরত এসেছে। তাদের কাছের রাদুয়েভ আর সন্ত্রাসী নয় বরং জীবনরক্ষাকারী। সে *সালমান দ্য*

BanglaBook.org

সেভিয়র। মানুষটা জিম্মিদের নিরাপত্তা দিয়েছে।

সে বলল, 'আমি শুধু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তোমরা সবাই নিরাপদ।' তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

জিম্মিদের সবার মাঝে গুঞ্জন শুরু হলো, চেহারায় ফুটে উঠল কৃতজ্ঞতা।

জিম্মিরা বলল, তারা রেডিওতে শুনেছে, রাশিয়ানরা পার্ভোমাইস্কোয়ে'র যুদ্ধে তাদের মৃত বলে ধরে নিয়েই মূল হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছে। তার মানে পুরো গ্রামকে ধ্বংস করে দেয়ার নীলনকশা ছিল, তাদের জীবনের এক বিন্দু দাম ছিল না ওদের কাছে। চেচেন কমান্ডারও বুঝেছিল, গ্রেড-রকেটের পরই বোমা হামলা হতে যাচ্ছে এবং পরিখা তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না।

পালানোর সময় যোদ্ধারা আগে ছিল, পেছনে জিম্মিরা গোলাবারুদ আর আহতদের বহন করেছে। কাউকে ফেলে আসা হয়নি। দলটাকে একটা মাইন বিছানো মাঠ পেরুতে হয়েছে। জিম্মিদের কাছ থেকে জানা গেল, সে সময় চারিদিকে বোমা হামলা হচ্ছিল; মানুষকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছিল। ডজন ডজন চেচেন মারা গেছে জিম্মিদের নিরাপদের বের করে আনতে গিয়ে।

'সে এক উন্মত্ত যুদ্ধ ছিল। সবার মাঝে তীব্র ভয় কাজ করছিল। কেউ ভাবেনি সে বাঁচবে,' ডিমা নামে একজন জিম্মি বলল, 'চেচেনরা মেশিনগান, আরপিজি, রাইফেল—যা পাচ্ছিল তা-ই দিয়ে গুলি করছিল। আমাদের ওপর তিনদিক থেকে হামলা হচ্ছিল। তারা রাশিয়ার কয়েকটা অবস্থানকে ধ্বংস করে। আমরা গর্ত এবং নদীর কিনারা দিয়ে পথ চলছিলাম কারণ রাশিয়ানরা ফ্লেয়ার ছুঁড়ছিল, ফলে চারপাশ একটু পর পরই দিনের আলোর মতো হয়ে উঠছিল, পালানোর কোন জায়গা ছিল না।'

যুদ্ধে ছেদ পড়ামাত্রই তাদেরকে তুষারের মধ্য দিয়ে দৌঁড়াতে হয়েছে। সাথে আহত ব্যক্তি, ভোর হওয়ার আগেই তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুতে হবে।

'আমরা জানি আলো ফুটতেই হেলিকপ্টারগুলো আমাদের খুঁজে খুঁজে আক্রমণ করবে, কিন্তু আমরা ততোটা দ্রুতগামী ছিলাম না,' আরকাদি নামে একজন গণিত শিক্ষক বললেন। 'ভোর ছয়টায় তারা এল। তিনটা হেলিকপ্টার মেশিনগান দিয়ে আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। হামলা শুরু হতেই আমরা মাটিতে মুখ দিয়ে শুয়ে পড়ছিলাম। এভাবে দু'কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে আমাদের তিন ঘন্টা লাগল।'

'তুমি কি জানো, নেকড়ে যখন কাছে আসে মেষশাবকের তখন কেমন

BanglaBook.org

লাগে? আমাদেরও তেমন লাগছিল। আর এক্ষেত্রে নেকড়ে হলো গোটা রাশিয়া,' মাগোমেদ নামে এক জিম্মি বলল।

পার্ভোমাইস্কোয়ের ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে রাশিয়ান আক্রমণ তুঙ্গে উঠল। শীতের মাঝামাঝি সময়টা বিগত একশ বছরের মধ্যে চেচনিয়ায় রাশিয়ান বাহিনির জন্য সেরা সময়। নদীর পানি কমে যাওয়ায় ভারি অস্ত্রশস্ত্র এবং যানবাহন সহজে চালিয়ে নেয়া যায় শুকনো রাস্তা দিয়ে। চেচেনদের লুকানোর জায়গা কমে আসে, জঙ্গলে ক্যাম্পিং কঠিন হয়ে পড়ে। রাশিয়ান বাহিনির আক্রমণের স্টিমরোলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলতে লাগল; সমতল থেকে শুরু হয়ে পর্বতে গিয়ে শেষ হয়। ডিসেম্বরে রুশ বাহিনি গুডারমেস থেকে শুরু করে নভোগ্রোজনি পর্যন্ত দখল করে নেয় যেটা গ্রোজনি থেকে দাগেস্তানের পূর্ব-পশ্চিম মহা সড়কের পাশে অবস্থিত।

ফেব্রুয়ারি-মার্চেও রাশিয়ান হামলা পুরোদমে চলতে লাগল। এবার ওদের নজর পশ্চিম চেচনিয়াতে। প্রথমে সারনোভডস্ক শহর তারপর সামাস্কি এবং বামুতেও আক্রমণ হলো।

মার্চে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পাভেল গ্রাচেভ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, কীভাবে তারা বোয়েভিকদের পর্বতে পাঠিয়েছে।

খ্যাতনামা মস্কোর কলামিস্ট পাভেল ফেলগেনহ্য়ের বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে লিখল, 'বসন্তের যুদ্ধ এখন তুঙ্গে।'

গত বছরের মতো একই জায়গাগুলোতে যুদ্ধ চলছে। যদিই চেচেনদের অবস্থা বেশি খারাপ। গত বছর তাদের কাছে ডজনখানেক ট্যাঙ্ক ছিল, এ বছর শুধু কিছু হ্যান্ডগান আর গ্রেনেড লঞ্চার। চেচেন মেডিকেল সিস্টেম পুরো ভেঙে পড়েছে।

ম্যাপ বলছে, আবারও চেচেনরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। রাশিয়ান সৈন্যরা ভেদেনো থেকে দক্ষিণ অঞ্চল এবং গুডারমেস থেকে আখোই মার্টান দখল করে নিয়েছে। কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখলে শুভঙ্করের ফাঁকিটা চোখে পড়ে। আর তা হলো, বোয়েভিকরা দৌড়ের ওপর থাকলেও তারা পরাজিত নয়। ধরা পড়ছে না কেউ। বরং তারা কৌশলগত কারণে পিছু হটছে কিন্তু অন্য কোনো গ্রামে উদয় হয়ে ঠিকই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এটা কোনো সম্মুখ যুদ্ধ নয় বরং কৌশলের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

BanglaBook.org

শুধু দক্ষিণের বামুত, স্ট্যারি আখোই এবং ওরেকোভোতে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে

অবস্থান ধরে রেখে ভয়াবহ যুদ্ধ করছে চেচেনরা।

তবে বোয়েভিকরা ঘন ঘন স্থানান্তরিত হবার কারণে রেডিও যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেল। আগে তো বোয়েভিকদের নিজস্ব রেডিও ছাড়া কোনো লিংকই পাওয়া যেত না আর এখন মধ্যমমানের কমান্ডাররাও মটোরোলা ওয়াকিটকি ব্যবহার করে। বোঝা যাচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। ছন্নছাড়া বাহিনি থেকে সংঘবদ্ধ যোদ্ধা বাহিনিতে পরিণত হচ্ছে। গ্রামের প্রান্তে যুদ্ধ করা বেশ কঠিন তবে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বিশ্বাস করত, যাই ঘটুক না কেন তারা রাশিয়ানদের বিতাড়িত করতে পারবে।

'প্রতিটা গ্রাম একটা দুর্গ,' আসলান মাসখাদোভ আমাকে জানুয়ারিতে বলল, 'প্রয়োজনে প্রতিটা গ্রাম এবং শহর শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে ইয়েলসিন এবং তার সৈন্যরা যাই করুক না কেন। তারা তো নিউক্লিয়ার বোমা ছাড়া সবই ব্যবহার করেছে। কিন্তু দিনশেষে তাদের হাতে চেচনিয়া ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো অপশন থাকবে না।'

সামাস্কিতে ভয়ানক, বর্বর যুদ্ধ হলো। আর্টিলারি, বোমার পাশাপাশি সম্মুখ যুদ্ধ। তিন থেকে চারশজন চেচেন যোদ্ধা প্রাণপণে লড়েও হেরে গেল। চল্লিশজন চেচেন মারা যায় এবং অনেকে আহত হয়। এক যুদ্ধে এতো সংখ্যক মৃত্যু গেরিলাদের জন্য অনেক বড় আঘাত। এমন ভয়ানক আক্রমণের মধ্যেও পাঁচদিন দিন যুদ্ধের পর যোদ্ধারা পালাতে সক্ষম হলো। আমার এএফপি কলিগ বরিস বাখোরব, যে বোয়েভিকদের সাথে ছিল, বলল যে, 'একটা সময় তারা রাশিয়ানদের থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে ছিল কিন্তু দুর্বল মনোবলের কারণে রাশানরা শত্রুকে আটকানোর চেষ্টাও করেনি। এমনটা চেচনিয়াতে প্রায়ই ঘটে। বোয়েভিকদের ছেড়ে দেয়া হয় আরেকদিন যুদ্ধ করার জন্য।

মার্চে চেচেনরা রাশিয়ানদের অন্যতম বড় একটা ধাক্কা দেয়। হঠাৎ এক ভোরে গ্রোজনির দক্ষিণাংশের অর্ধেক অংশে আক্রমণ করে বসে। তিনদিন ধরে রাশিয়ান চেকপয়েন্ট ও প্রশাসনিক ভবনে গুলি চলে। ১০০০ চেচেনকে হটাতে রাশিয়ান বাহিনিকে হেলিকপ্টার গানশিপ ও গ্রেড রকেট ব্যবহার করতে হয়। অফিসিয়াল রিপোর্ট অনুযায়ী ১০০ সৈন্য মারা যায়। যদিও যুদ্ধরত অফিসারদের হিসেবে সংখ্যাটা ৪০০।

রাশিয়ানদের জন্য বিব্রতকর আরেকটা সাফল্য চেচেনরা পায় এপ্রিলে। সেন্ট্রাল ফুটহিলে সাতোই-এর রাস্তায় আর্মড ভেহিকেলের বহর অ্যাম্বুশের

BanglaBook.org

শিকার হয়। গেরিলারা পথের পাশে শেয়ালের তৈরি গর্তে লুকিয়ে ছিল। ট্যাংক এপিসির লম্বা বহর ওই পথ দিয়ে আসামাত্রই চেচেনরা আরপিজি ও মেশিনগান ফায়ার করে তা ধ্বংস করে দেয়। রাশিয়ানদের পিছু হটার কিংবা প্রতিরক্ষার জন্য অবস্থান নেয়ারও সুযোগ ছিল না। চেচেনদের জন্য শ্যুটিং গ্যালারিতে টার্গেট প্র্যাকটিস করার মতোই সহজ ছিল এই অপারেশন। অফিসিয়াল বিবৃতি অনুযায়ী এই আক্রমণে ১৯৯ জন সৈন্যের ৭৩ জনই মারা যায়। এই অতর্কিত আক্রমণের কমান্ডার ছিল খাতাব নামের এক যোদ্ধা। সে নিজের ব্যাপারে এতোটুকুই বলে—সে আরবের লোক। রাশিয়ান সিকিউরিটি সার্ভিসের মতে, সে জর্ডানের লোক; শামিল বাসায়েভের অধীনে যুদ্ধ করে। আফগানিস্তান ও তাজিকিস্তানে তার অ্যাম্বুশের অভিজ্ঞতা রয়েছে। খাতাব ছিল যুদ্ধের প্রথম দিনগুলোতে হাতেগোনা কয়েকজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতার মধ্যে একমাত্র বিশেষজ্ঞ তরুণ কমান্ডার।

যে গতিতে গ্রাম এবং শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছিল, তাতে খুব কম লোকই পালাতে পারছিল। সাধারণ মানুষের জন্য বসন্ত এক বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গুডারমেসের এ যুদ্ধে প্রায় ১০০ জন হতাহত হয়েছে মর্টার ও গ্রেড রকেটের আঘাতে।

রাশিয়ান জেনারেল আনাতোলি স্কিরখো বলেন, ২৬৭ জন সাধারণ লোক মারা গেছে। যদিও পরবর্তী গণনায় ভুল হয়েছিল বলে দাবি করেন।

সারনোভডস্কের আবাসিক এলাকা ছাই হওয়া পর্যন্ত বোমা ফেলা হয়েছে। বড় বড় এলাকা মাটির সাথে মিশে গেছে।

শরণার্থীরা পালাতে গেলেও ঘেরাও করে রাখা রাশিয়ান বাহিনি গুলি করত। সাহায্য সংস্থা ও সাংবাদিকদের কাছে ভিড়তে দেয়া হতো না। এতে জেনেভাতে রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটিতে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ ওঠে।

এদিকে ভয়াবহ এক খবর প্রকাশিত হলো। রাশিয়ান টেলিভিশন গোপনে সারনোভডস্কের রাস্তা, বাড়ি, গাড়ি পোড়ার দৃশ্য ধারণ করেছিল। সেখানে দেখা গেল—শহরের মসজিদের পোড়ার দৃশ্য, দগ্ধ লাশ। বেঁচে যাওয়া লোকগুলো সৈন্যদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ আর লুটপাটের অভিযোগ তুলল। প্রায় পাঁচ হাজার সাধারণ মানুষ সেলারে আটকে পড়ে যুদ্ধের সময়। এপিসির ছাদে মানুষ বেঁধে রাখা হতো মানববর্ম হিসেবে যেন বোয়েভিকরা ফায়ার করতে না পারে।

এতো প্রোপাগান্ডা ও হামলার পরও বোয়েভিকরা সাধারণ মানুষের পূর্ণ

BanglaBook.org

সমর্থন পাচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে এছাড়া তারা দলগত যুদ্ধকে সফল করতেও পারত না। যোদ্ধারা গ্রোজনিসহ সমতলের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। সব কিছুর পরেও তাদের খাবার দরকার ছিল, অস্ত্র ও লুকানোর জায়গা প্রয়োজন ছিল। তারা দিব্যি সাধারণ মানুষের বেশে ঘুরত। সাধারণ লোকেদের বাসায় থাকত, রাস্তায় চলার সময় কোন অস্ত্র ধারণ করত না- যতোক্ষণ না কোনো অপারেশনের ডাক পাওয়া যেত। বাসায়েভ বলত, তার মানুষেরা জাভগায়েভের পুলিশ বাহিনিতেও ছদ্মবেশে অনুপ্রবেশ করার মতো দক্ষ। তার এ কথা যে ফাঁকা বুলি নয় তার প্রমাণ মিলেছিল মার্চে যখন গ্রোজনিতে তিনদিনের আক্রমণ চালায় বোয়েভিকরা। তখন জাভগায়েভের কিছু পুলিশ 'রহস্যময়ভাবে' প্রায় বিনা প্রতিরোধেই অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল!

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে সাধারণ জনগণের যোগাযোগের একটা মাধ্যম হলো চোরাই পেট্রোল ব্যবসা। তুরস্ক, জর্ডান, সৌদি আরব—ইত্যাদি বিদেশি সাহায্য ছাড়াও যোদ্ধাদের আয়ের আরেক খাত পেট্রোল বিক্রির অর্জিত অর্থ। এটা চেচেন এবং রাশিয়ান—উভয় সূত্র হতে পাওয়া তথ্য! প্রজাতন্ত্রের আহরিত ক্রুড অয়েল চুরি করে ঘরোয়া পদ্ধতিতে শোধন করা হতো এবং সেই তেল কাচের জারে করে রাস্তার পাশে বিক্রি করা হতো। মাঝে মাঝে পেট্রোল স্টেশনে বৈধ সরবরাহ বন্ধ থাকায় রাস্তার পাশের পেট্রোলই গাড়িগুলোর একমাত্র ভরসা। রাশিয়ানরা এই বিক্রি বন্ধ করতে পারত না। তাই বোয়েভিকদের অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকল।

চেচেন যোদ্ধাদের দলগত কাঠামো তাদের প্রকৃত সংখ্যা জানতে দিত না! বড়জোর কয়েক হাজার সব সময় যুদ্ধ করত কিন্তু প্রত্যেকেরই বন্ধু, স্বজন, পরিবার সন্তান ছিল; তারাও এদের সক্রিয় সমর্থন দিত। আর প্রত্যেক সক্রিয় সমর্থকদের পেছনে ছিল আরেকটা দল যারা হয়তো সক্রিয় সমর্থক নয় কিন্তু বিভিন্ন উপলক্ষে কিংবা উপলক্ষ ছাড়াই মৌন সমর্থন জানাত। মোটকথা, বোয়েভিকরা আসলে আইসবার্গের একটা চূড়া মাত্র।

১৯৯৬-এর শুরুর দিকে দুদায়েভ ঘন ঘন জায়গা পরিবর্তন করতে লাগল। প্রতিদিনই এক সেফহাউস থেকে অন্য সেফহাউসে ছুটে যেত। কোথাও দু'রাতের বেশি অবস্থান করত না। আগের চেয়ে আরো বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠল। তার প্রোপাগান্ডা এবং বক্তৃতা ছিল রসাত্মক।

পার্ভোমাইস্কোয়ে যুদ্ধের পর জানুয়ারিতে দুদায়েভ ভয়েস অফ আমেরিকাকে

BanglaBook.org

(VOA) তার স্যাটেলাইট টেলিফোনের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করল, 'এখন সাধারণ জনগণ এবং দাগেস্তানের নেতাদের রাশিয়ার কেন্দ্র থেকে উদয় হওয়া মানবতাবিরোধী শয়তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সময় এসেছে।'

ফেব্রুয়ারিতে তুর্কি সংবাদপত্র 'সাবাহ'তে সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় দুদায়েভ আরো রহস্যময় ছিল, 'চেচেন যুদ্ধ প্রথমে পুরো ককেশাসে ছড়িয়ে পড়বে, তারপর তুরস্কে, তারপর ইউরোপ এবং অবশেষে তা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে। চেচনিয়াতে শেষ মানুষটি বেঁচে থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।'

দুদায়েভ বরাবরের মতোই স্বমহিমায় রইল, যেমনটা সে সব সময় থাকে। একজন যোদ্ধা, মেধাবী জেনারেল। রাশিয়ানদের অধীনে জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করার পুরস্কার হিসেবে সে অর্জন করেছিল দূরদৃষ্টি। সে তার শত্রুর সক্ষমতা ভালোভাবেই জানত—তা বারবার প্রমাণ করেছে।

মার্চের সংবাদ সম্মেলনে একই ধরনের কথা বলল সে। সাথে এটাও বলল, 'গ্রোজনিতে তিনদিনের হামলাটা স্রেফ মহড়া।'

কথাটি কেউ আমলে না নিলেও বাস্তবে তা ছিল বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ।

ভেদেনো

শামিল বাসায়েভের সাথে ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করতে আমার দু'দিন লাগল। আমরা রাত দুটোয় একটা ছোট ফার্ম হাউসে সাক্ষাৎ করলাম। দেখা হতেই সে ভেদেনোতে তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল।

মাত্র একত্রিশ বছর বয়সেই সে বহুবার আহত হয়েছে। একটা জীবন্ত যুদ্ধ-জাদুঘর। দু'পায়েই শার্পনেল, এক বাহুতে আটকে আছে বুলেট। তার ষোলো জন আত্মীয় মারা গেছে। কিন্তু সে বেঁচে আছে। এমনকি বুদেনোভস্কেও সে বেঁচে গেছে। তার এমন দক্ষতার কারণে তার অনুসারীরা তাকে অন্ধের মতো মেনে চলে। একজন আমাকে বলেছিল, 'শামিলের একটা বিষয় হলো, সে কখনো আত্মসমর্পণ করে না। সব সময় শত্রুদের ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে যায়।'

তার দুটো চোখ গভীর। এমনকি সূর্যের আলোতেও তার চোখে গভীর দুঃখবোধ খেলা করে। তবে আজ রাতে ওদুটো ক্লান্তিতে মলিন। বাসায়েভ একটা হ্যাট পরে আছে উলের। নিচে সবুজ ব্যান্ড, তাতে সাদা কালিতে আরবি দোয়া লেখা।

বাসায়েভ নতুন যুদ্ধটা ব্যাখ্যা করে, যাকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বলে 'বুদ্ধি

BanglaBook.org

দিয়ে লড়াই'।

'আগে আমাদের অনেক সৈন্য পরিখাতে অলস বসে থাকত। কিছু করার ছিল না। এখন পর্বতে আমাদের দুই তিনটা ভালো ঘাঁটি হয়েছে। এগুলোর পাহারায় থাকে ছোট ছোট ইউনিট। এর ফলে আমার তিন থেকে চারটা ব্যাটেলিয়ন স্বাধীনভাবে সমতলে কাজ করতে পারছে।

***

১৯৯৬ সালের বসন্তের আগে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মস্কোর নীতি ধ্বসে পড়েছে। যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পার , দুদায়েভের সাথে সমঝোতার অনিচ্ছা এবং কমিউনিস্টদের সাথে প্রেসিডেন্শিয়াল নির্বাচনে পরাজয়ের আশংকা— সব মিলিয়ে ক্রেমলিন পুরো মুখ থুবড়ে পড়ল। সংস্কারপন্থী গভর্নর বরিস নেমসভ ইয়েলসিনের নামে পিটিশন জারি করলেন যুদ্ধ বন্ধের জন্য। সাথে দশ লক্ষ লোকের স্বাক্ষর। কিন্তু তার কথা কানেই তোলা হলো না। যুদ্ধ বন্ধ এবং সমঝোতার অর্থ— সত্যকে মেনে নেয়া। এটা ইয়েলসিনের ব্যক্তিগত সম্মানের জন্য হানিকর। এমনিতেই তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং রাজনৈতিকভাবে দুর্বল।

কনস্ট্যান্টিন বরভই একজন লিবারেল পার্লামেন্ট মেম্বার, তার সাথে দুদায়েভের নিয়মিত টেলিফোনে যোগাযোগ হয়, সে বলল, 'যুদ্ধ বন্ধ করে ইয়েলসিন সাধারণ ভোটারদের মন জয় করতে পারবে, কিন্তু এর ফলে সে তার আর্মি হারাবে। কারণ এটা পরাজয়ের মতো অনুভূতি দেবে সৈন্যদের। গ্রাচেভের মতো অবিশ্বস্ত মন্ত্রী নিয়ে তা খুবই বিপদজনক।'

এই আর্মি চেচেন প্রতিরোধ নস্যাৎ করতে অপারগ এবং জাভগায়েভও তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ। ক্রেমলিনের শেষ একটা পরিকল্পনা রয়েছে— প্রোপাগান্ডাকে অতিমাত্রায় ছড়িয়ে দেয়া। প্রথমে এমন ভাণ করা যে, কোনো যুদ্ধ নেই। তারপর নির্বাচনের আগে আগে জয়ের ঘোষণা দেওয়া—যুদ্ধের আসল ফলাফল যাই হোক না কেন। মস্কো এবং তার ভৃত্য ইতার-তাস নিউজ এজেন্সি ও জাতীয় টেলিভিশন ওআরটির মতে, কোন সামরিক দাঙ্গা নেই নেই চেচনিয়ায়, শুধু 'স্পেশাল অপারেশন' চলছে। তাহলে ধরে নিতে হয়, সাধারণের উপর কোন বোমা হামলা নেই, যে সব বিমান হামলা হচ্ছে সেগুলো গোপন বিমান বাহিনির মাধ্যমে দুদায়েভই করাচ্ছে!

BanglaBook.org

দক্ষিণের গ্রাম সালাজিতে ভারি বোমাবর্ষণের পর বিমান বাহিনির কমান্ডার ইন চীফ জেনারেল পিওতর ডিনকিন সংবাদ সম্মেলনে বলে, 'যে সকল গ্রামবাসীরা বলছে, গ্রামে তিনটা বিমান চক্কর দিয়েছে এবং রকেট হামলা করেছে তারা উস্কানিদাতা অথবা আবেগি।'

অফিসিয়াল হতাহতের পরিসংখ্যান একদমই অবাস্তব। দস্যুদের হতাহতের পরিমাণ তাদের হিসাব অনুযায়ী এতো বেশি যে, এটা সত্য হলে আর কোনো বোয়েভিকের বেঁচে থাকার কথা না! ওদিকে রাশিয়ান হতাহতের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে খুবই কম দেখানো হয়।

মে মাসের মাঝামাঝিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেনা কমান্ডার জেনারেল ভ্লাদিমির শামানোভ আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করে যে, ৮০ শতাংশ চেচেন অঞ্চল ফেডারেল সরকারের দখলে এবং মাত্র পাঁচ-সাতশ বিদ্রোহী যোদ্ধা টিকে আছে। এদের অনেকে আবার প্রজাতন্ত্র থেকে পালিয়ে যেতে চায়।

এপ্রিল মাসের অতর্কিত হামলার উদাহরণ সামনে এনে সামরিক বাহিনি এবং সরকার জনগণকে আশ্বস্ত করে যে, এটা এক ধরনের বিপর্যয়। প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন একে জাতীয় দুঃখগাঁথা হিসেবে আখ্যা দেন এবং আক্রমণকারী গেরিলা যোদ্ধাদেরকে কাপুরুষ বলেন।

৩১ মার্চ ১৯৯৬, নির্বাচনের ঠিক তিন মাস আগে ইয়েলসিন এক শান্তি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন যা আরেক শুভংকরের ফাঁকি। ইয়েলসিন চেচনিয়ায় যুদ্ধবিরতি, সমঝোতা ও দফায় দফায় সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। পশ্চিমা দেশগুলো এতে সাধুবাদ জানায়। কিন্তু চেচনিয়াতে লাভের লাভ কিছু হলো না। কারণ গ্রাচেভ, কুলিকভ ও অন্যান্য কঠোর যুদ্ধ সমর্থনকারীরা এই পরিকল্পনা মানতে আগ্রহ দেখাল না। চেচনিয়ায় রাশিয়ান সামরিক বাহিনির সর্বাধিনায়ক জেনারেল ভায়াচেলাভ তিখোমিরভ জানায়, তার পরিকল্পনার প্রতি সম্মান রয়েছে কিন্তু সশস্ত্র দস্যু ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে 'স্পেশাল অপারেশন' অব্যাহত থাকবে। এক কথায় বললে, যুদ্ধ চলবে।

প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরগুলো আড়ালে পড়ে রইল। মানবাধিকার কর্মী সার্গেই কোভালেভ এই শান্তি আলোচনাকে 'আগাগোড়া ধোঁকাবাজি' বলে অভিহিত করলেন। বললেন, গ্রামগুলোতে আক্রমণের সময় সাধারণ জনগণ আর যোদ্ধা দেখা হয় না। নির্বিচারে হত্যা চলে।

কোভালেভ জানতেন, তার কথার প্রভাব সামান্যই পড়বে যুদ্ধে। এমনকি

BanglaBook.org

যুদ্ধের শুরুতে, গ্রোজনি যখন প্রথম বিমান হামলার শিকার, তখনই তিনি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন।

তিনি একবার আমাকে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের বাইরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি ক্রেমলিনে ফিরে গিয়ে যা যা দেখেছি সব তাদেরকে বলব। যদিও আমার কথা শোনা বা বোঝার অনুভূতি তাদের নেই।'

আসলেই, কিছুই পরিবর্তন হয়নি।

এমএসএফ, যাদের চিকিৎসকেরা সবচেয়ে বিপদজনক জায়গায় কাজ করত যুদ্ধের শুরু থেকেই, তারাও চেষ্টা করল অভ্যন্তরীণ বিষয় বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে। মস্কোতে সাত জাতির জি-সেভেন-এর মিটিং-এর সময় এমএসএফ একটা রিপোর্ট প্রকাশ করল যে, চেচনিয়ায় সাধারণ মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে। হসপিটাল, স্কুল, মসজিদকেও ছাড় দেয়া হচ্ছে না। এটা জেনেভা কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির সুনিশ্চিত লংঘন। যে চুক্তিতে রাশিয়াও স্বাক্ষর করেছে।

এমএসএফ-এর মতে, শান্তি এবং স্থিতির নামে গ্রামগুলোকে এখনো ঘেরাও করে রাখা হচ্ছে, শেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ পালাতে গেলেই গুলি করা হয় অথবা 'ফিল্ট্রেশন ক্যাম্প'এ পাঠানো হয়। এমন ঘটনাও আছে, যেখানে মহিলাদেরকে একত্রিত করে মানববর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছে রাশিয়ানরা। সেনারা গ্রাম দখল করে সেখানে লুটপাট চালায়।

এমএসএফ'র প্রধান ডাক্তার এরিক জিওমেয়ার বলেন, 'পশ্চিমাদের উচিত এই হত্যাযজ্ঞের অবসান চাওয়া ।'

অপরদিকে ডাক্তার মারিও গেথালস, এমএসএফ-এর হেড অফ অপারেশন্স বলেন, 'আমাদের সরকার জানে কী ঘটছে কিন্তু তারা কিছুই করছে না। এখন প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার সময় এসেছে।'

মে মাসে একই বক্তব্য তুলে ধরল মানবাধিকার সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল হেলসিংকি ফেডারেশন—'পশ্চিমারা চেচনিয়া ইস্যু অবজ্ঞা করে সুবিবেচকের পরিচয় দিচ্ছে না। হাজার হাজার সাধারণ জনগণ মারা যাচ্ছে। শুধু যে যুদ্ধের কারণে হতাহত হয়েছে তা নয়, অযথা আক্রমণের শিকার হয়ে মারা গেছেন অনেকে। চেচনিয়া ইস্যু এখন আর রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ কোনো ব্যাপার নয় বরং এটা পুরো ইউরোপের নিরাপত্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দীর্ঘদিন চেচনিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায়

BanglaBook.org

আনল না। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলো চেচনিয়াতে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতোই না বলতে গেলে। তার পরিবর্তে মস্কোতে মন্ত্রীদের সাক্ষাৎকার নিত, টেলিভিশন সংবাদপত্রের মিথ্যা বিবৃতিকে তারা গ্রহণ করত। বেশিরভাগ সময় মস্কো থেকে দশটা গল্প নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য বলে চালিয়ে দিত।

এমনকি চেচনিয়ার রিপোর্টেও সারা বিশ্বের উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। মে মাসে আমাদের উরুস মার্টান যেতে হয়েছিল আর সে সময়েই সেখানকার ব্যস্ত রাস্তায় এবং সবচেয়ে বড় মার্কেটপ্লেসে রকেট বোমা হামলা চালানো হয়। আহত হয় বিশজন আর তিনজন যুবক নিহত। সংখ্যাটা ওইরকম একটা জনসমাগমের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে কমই বলতে হবে।

তাদের মহিলা আত্মীয়রা উঠোনে দাঁড়িয়ে গ্রীক মর্ম গাঁথার কোরাসের মতো কান্নাকাটি করছিল। সেখানে ষোল বছর বয়সী এক ছেলের বাবা আমাকে তার ছেলের লাশ দেখাতে নিয়ে গেল। ছেলের লাশ মূলকক্ষে সাদা কাফনে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে কবর দেওয়ার জন্য। ছেলেটা রাস্তার পাশে একটা পেট্রোলের ট্রাকে বসে ছিল, তখনই একটা রকেট এসে পড়ল সেটার ওপর। মুহূর্তেই ট্রাকটা জ্বলজ্যান্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়। ছেলেটার দেহের জায়গায় পড়ে রইল পুড়ে যাওয়া কাঠকয়লা।

এখন ঘরভর্তি পোড়া মাংসের গন্ধ। খুলিটা পুড়ে শক্ত আর কালো হয়ে গেছে। সিদ্ধ ডিমের মতো বিচ্ছিরিভাবে খুলে আছে মাথার ওপরের অংশ! শরীর থেকে ছিটকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিছু অংশ আর চেনা যাচ্ছে না। সেই অংশগুলো তার পায়ের কাছে একটা বালতিতে রাখা হয়েছে। বাবাটা কেঁদে বলল, 'দুঃখ এসেছে, দুঃখ! আজ আমার ঘরে এসেছে, কাল সবার ঘরে ছড়িয়ে পড়বে।'

বরাবরের মতোই প্রোপাগান্ডা নামক মাদকটা এর স্নায়ু অবশ করার ক্ষমতা আবার দেখাল। 'অজানা হেলিকপ্টার হামলা' প্রোপাগান্ডা বাস্তবায়নের জন্যে যথেষ্ট ছিল; সবার ভুলে যাওয়ার জন্যেও। কেবল উরুস মার্টান ভুলল না।

যুদ্ধের শুরুতে এই শহরটা দুদায়েভ বিরোধী দলের বিপক্ষে দুর্গ হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা হুড়মুড়িয়ে বেড়ে গেল। এখানকার হাসপাতাল দক্ষিণাঞ্চলে আহত বোয়েভিকদের চিকিৎসাদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হেলিকপ্টার হামলাটা ছিল সম্ভবত একটা হুমকি কিংবা তাদের কাজের শাস্তি। এই হামলাটাই উরুস মার্টান বা

BanglaBook.org

অন্যান্য শহরের আকাশে প্রথম বা শেষ হামলা নয়। রাশিয়ানরা শান্তি চুক্তির প্রতিজ্ঞা করার পরও এমন জায়গায় আঘাত করেছে যেখানে সত্যিকার অর্থে কোনো সক্রিয় যুদ্ধ বা প্রতিরোধ ছিল না।

বহির্বিশ্বে এ নিয়ে দুই একটা টু শব্দ আর হাত কচলানো ছাড়া কিছুই হয়নি। যেমন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লাউস কিঙ্কেল এপ্রিলে একে 'বর্বর যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিনকে তার বিদ্রোহপ্রবণ সেনাবাহিনির ব্যাপারে সতর্ক হতে বলেন। কিন্তু সত্যিকারের চাপ ক্রেমলিনের ওপরে কেউ-ই সৃষ্টি করেনি। উপরন্তু, জুগানোভের বিপক্ষে ইয়েলসিনের পুনঃনির্বাচনে বহিঃশক্তির শক্তিশালী সমর্থন ছিল।

এপ্রিলে জি-সেভেন সামিটে ইউএস প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন শুধু যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিকে উল্লেখ করতে ব্যর্থ হন তাই নয়, বরং তিনি ক্ষুদ্র চেচেন গোষ্ঠীর ওপর আক্রমণকে আমেরিকার একশ ত্রিশ বছর আগের গৃহযুদ্ধের সাথে তুলনা দিলেন। যখন ক্লিনটন ইয়েলসিনের সাথে আলাদা করে শীর্ষ বৈঠক করলেন তখনও চেচনিয়ার বিষয়টি আসেনি। বৈঠক শেষে ইউএস স্বরাষ্ট্র বিভাগের মুখপাত্র কূটনৈতিক ভাষায় বললেন, 'ইউএস প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিনের মধ্যকার মানবাধিকার বিনিময় বিষয়ক তথ্য সম্পর্কে আমি কোনো তথ্য প্রকাশ করতে পারব না।'

সম্ভবত সবচেয়ে বড় ধোকাবাজি হলো ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের ভোটে। এটি মানবাধিকার সমুন্নত রাখার প্রয়াসে জন্ম নেয়া সমগ্র ইউরোপব্যাপী এক প্রতিষ্ঠান। জানুয়ারি ১৯৯৬-এ রাশিয়াকে এ কাউন্সিলের সদস্যপদ প্রদান করা হয়। এরপর যুদ্ধ শুরু হবার সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হলেও কূটনৈতিকরা কোনোভাবে সবাইকে বুঝিয়ে ফেলেন—এগুলো রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ মামুলি ব্যাপার। এগুলোকে কেন্দ্র করে রাশিয়াকে শান্তিপ্রিয় সংগঠন থেকে দূরে রাখার মানে নেই।

সদস্যপদ একটা সরকারকে মানবতাবিরোধীদের শাস্তি প্রদান, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের যথাযথ সম্মান প্রদান, মৃত্যুদণ্ড বাতিল এবং অত্যাচার বন্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু একটাও কি মস্কো করতে পেরেছে? চেচনিয়াতে তো অবশ্যই পারেনি। সেটা কাউন্সিলের সদস্যরা ভালোভাবেই জানত। এগুলো জানার জন্য এমনকি তাদের সদরদপ্তর স্ট্রাসবার্গও ছাড়তে হবে না, কারণ এমএসএফের রিপোর্ট সব তাদের হাতের কাছেই রয়েছে।

BanglaBook.org

মস্কোর কেন্দ্রে থেকে ডকু জাভগায়েভের পক্ষে সত্য প্রকাশ এবং যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। আত্মরক্ষায় ওস্তাদ লোক জাভগায়েভ একই ছাঁচে তৈরি। নব্বইয়ের দশকে সে নর্থ ককেশাস অঞ্চলে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারি ছিল। তার নিজস্ব কোনো আদর্শ নেই। কেন্দ্রের সাথে লিঁয়াজো রক্ষা করে লভ্যাংশ ভোগ করাই তার কাজ। হোক কমিউনিস্ট বা ডেমোক্রেট—তার ভাগের মুরগি পেলেই সে খুশি। ভাগ্যের নানা বাঁক পেরোনো ছোট-খাটো মানুষ জাভগায়েভ প্রতিদিন টেলিভিশনের সামনে এসে শান্তির বুলি এবং সশস্ত্র বিদ্রোহীদের প্রতিহতে নিজের শক্ত ভূমিকার কথা আওড়ায়। তার বক্তৃতা ছিল বেশ মুখরোচক।

জাভগায়েভ ক্রেমলিনের কাছে পরিচিত নাম। ১৯৯১ সালে দুদায়েভ দ্বারা বিতাড়িত হয়ে প্রেসিডেন্সি ডিপার্টমেন্টের প্রধান হিসেবে কাজ খুঁজতে যায় রাশিয়ান ফেডারেশন রিপাবলিকের কাছে। যুদ্ধ শুরুর সময় সে চেচনিয়াতে সৈন্য পাঠানোর বিরোধিতা করলেও কেন্দ্রের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি হয় এমন কোনো কথা বলেনি। দুদায়েভের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা সব সময় ছিল তার। এখন সে ঠিক তাই বলে যা ক্রেমলিন শুনতে চায়। বিনিময়ে সে এবং তার অধীনরা রাশিয়ান বাজেট থেকে বাড়ি, গাড়ি, সম্মান ও মিলিয়ন ডলার পাচ্ছে। জাভগায়েভ বেশিরভাগ সময় মস্কোতে থাকত। চেচনিয়ায় গেলে উত্তর গ্রোজনি এয়ারপোর্ট বা পূর্ব খানকালা এয়ারপোর্টের দিকে থাকত। বাড়িগুলোকে মোটামুটি দুর্গ বানিয়ে ফেলেছিল সে। যুদ্ধ শেষে আরটিআর টেলিভিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, খানকালা এয়ারপোর্টের বাড়িতে এমনকি সুইমিংপুলও আছে। জাভগায়েভ গুনেও শেষ করতে পারবে না, কতোজন চেচেন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কতোজন তাকে 'বিমানবালা' বলে উপহাস করে!

আগের পুতুল সরকার ছিল সালামবেক খাদজিয়েভ। জাভগায়েভের প্রশাসন এখন ক্ষমতা হাতে পেয়ে কতো ডলার মারা যায় সেই চিন্তায় ব্যস্ত থাকে দিনরাত। মানবিক সাহায্য আসত কিন্তু তা মানুষের কাছে পৌঁছুত না। টাকা পাঠানো হতো গ্রোজনিকে পুনঃনির্মাণ করার জন্য কিন্তু আধডজন সরকারি ভবন ছাড়া কিছুই পুনঃনির্মাণ করা হয়নি সে সময়। রাশিয়ান রিপোর্ট অনুসারে, জাভগায়েভ ক্ষমতায় আসতেই নভেম্বর-ডিসেম্বর-এর মধ্যে পুনর্গঠন কাজের ২.৫ বিলিয়ন ডলার উধাও হয়ে যায়। রিপোর্টে বলা হয়—খাবার, বস্ত্র, কম্বল এবং অন্যান্য সামগ্রী মস্কো ছেড়ে মজডক সামরিক ঘাঁটি পর্যন্ত আসত, তারপর

BanglaBook.org

সেগুলো বিক্রি শুরু হতো। ঠিক একইভাবে মিলিয়ন ডলার দামের ঔষধ-ভ্যাকসিন মস্কো থেকে পাঠানো হতো কিন্তু তা চেচনিয়ার আক্রান্তদের কাছে পৌঁছুত না।

ফেডারেল নিরীক্ষা বিভাগের মতে, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ পর্যন্ত ১০,০০০ প্রতিশ্রুত পরিবারের মধ্যে মাত্র ১০৮২ পরিবার সাহায্য পেয়েছে তাদের বাড়ি নির্মাণের খাতে। এখনো চার মিলিয়ন ডলার স্টেট ব্যাঙ্কে পড়ে আছে। আরো কয়েক মিলিয়ন ডলার অন্যান্য ব্যাংকে কিন্তু তা যুদ্ধ বিধ্বস্ত চেচেনদের হাতে পৌঁছুয়নি।

জাভগায়েভের ইলেকশনের অর্ধ বছর পর মে ১৯৯৬-এ রাশিয়ান সরকার চল্লিশ মিলিয়ন ডলার ভাতা দেয় সামাজিক উন্নয়নের জন্যে। কিন্তু গ্রোজনিতে একজনও পাওয়া ভার ছিল যে তাদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে রাস্তাঘাট বা বাড়িঘর মেরামত বাবদ কিছু পেয়েছে। প্রাইম মিনিস্টার চেরনোমিরদিন ঘোষণা দেন, ১.৩ মিলিয়ন স্কয়ার মিটার অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু তার কোনো ইটও কেউ স্বচক্ষে দেখেনি; এমনকি স্বয়ং চেরনোমিরদিনও না।

একই মাসে জাভগায়েভের সহকারি, দুদায়েভের আমলে গ্রোজনির মেয়র বেসলান গান্তেমিরভ দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার হন। সে বলির পাঁঠা ছাড়া কিছু নয়; অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও প্রতিহিংসার শিকার। জাভগায়েভ এবং তার অন্যান্য সদস্যরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। ক্রেমলিনও জাভগায়েভের দুর্নীতির ছোবল থেকে রক্ষা পায় না। বাস্তবতা যাই হোক, সে স্থিতিশীলতার মুলো ঝোলাতে পেরেছে, তার নতুন রঙ করা প্রশাসনিক ভবন সাফল্যের পরিচয় বহন করে—এভাবেই প্রোপাগান্ডা চলতে থাকে।

ভেদেনো

ভেদেনো নামক জায়গায় রাশিয়ার দখল ছিল দুর্বল। কারণ জায়গাটা জঙ্গলময়, কৃষ্ণকায় পর্বতের শীর্ষে ঝুলে থাকে কুয়াশা। বৃষ্টি হলে পর্বত চোখের আড়াল হয়ে যায়। এটা রাশিয়ান সৈন্যদের জন্য একটা শ্বাপদসংকুল জায়গা, যেখানে প্রতিটা বাড়িতেই নীরবে বসে আছে শত্রুরা।

কালো পর্বতের দিকে আঙুল তুলে একজন অফিসার বলল, 'ওপরে বোয়েভিকরা থাকে। তারা আমাদের গুলি করলেও আমরা দেখতে পারব না। ওখান থেকে ওদের হঠানো কঠিন হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

কুঁড়েঘরের মধ্যে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী কন্ট্রাক্টনিক আলেকজান্ডার মিটিং বসিয়েছে। সে লম্বা, ন্যাড়া মাথা, পেশল বাহু, নীল সাদা ডোরাকাটা আর্মির পোশাক পরে আছে। আলেকজান্ডার জানাল, সে খুশি। কারণ সে সংবিধানের শৃঙ্খলা আনতে যুদ্ধ করছে। সে খুশি, কারণ সে মাসে মাসে কয়েকশ ডলার পাচ্ছে। সে আরো খুশি, কারণ সে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারছে ইচ্ছেমতো।

সোনালি চুল, ছিপছিপে দেহের এক তরুণ অফিসারকে বিব্রত দেখাল আলেকজান্ডারের বক্তব্যে। বাকিরা বাধ্য অস্থায়ী সৈনিক; তারা চুপ থাকল।

'আমাদের অস্ত্র বিশ্বসেরা। কালাশনিকভ নিয়ে পানিতে চুবিয়ে দেখো, কিছুই হবে না।' একঘেয়ে সৈনিক জীবনে সে সাধারণ গ্রামবাসীদের ওপর তার স্নাইপার রাইফেলের দক্ষতা পরীক্ষা করে। কখনো হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে দেয় মেষের দলের পেছনে; সেগুলো ভয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে।

আমি এক আর্মি অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'চেচনিয়াতে রাশিয়ানরা জিতবে কিনা।'

জবাব আসে, 'না, আমার মনে হয় না।'

আলেকজান্ডার এমন সময় আমাদের কথার মাঝে প্রবেশ করলে অফিসার চুপ হয়ে যায়। টেবিলের ওপাশ থেকে আমার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আলেকজান্ডার। চোখে অর্ধেক অপরাধবোধ, অর্ধেক ভয় নিয়ে বলল, 'রাশিয়া বিরোধী নয় এমন সকল চেচেনদের বের করে দিয়ে বাকিদের ওপর অ্যাটমবোমা মারা উচিত,' সে বলে চলল, 'এটা স্ট্যালিনের ভুল; সে এটা ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেনি। চেচেনরা আসলেই জঘন্য লোক।'

আমি আলেকজান্ডারকে সাধারণ রাশিয়ান আদিবাসীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম।

'ওরা সবক'টা কুত্তা। এখানে থাকতে এসেছে কেন? রাশিয়া কি ওদের জন্য যথেষ্ট না? আমি পারলে সবগুলোকে গুলি করে মারতাম।'

বৃষ্টি থামলে আমরা গাড়িতে করে ভেদেনোর ভেতর দিয়ে সমতলের দিকে চলতে শুরু করলাম। কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে আরো কিছু ফাঁড়ি চোখে পড়ল। সেখানে অফিসার, কনট্রাক্টনিক ও অস্থায়ী বাধ্যতামূলক সৈন্য; সবাই ইউনিফর্ম পরে আছে। শুকনা লিকলিকে এবং নোংরা।

একটা ফাঁড়িতে একজন সৈন্য সিগারেট চাইলে আমি তাকে পুরো প্যাকেটটাই দিয়ে দিলাম। সে বিহ্বল হয়ে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

BanglaBook.org

আমি তাকে পুরোটা নিতে বলামাত্রই জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখ।

'আমরা এক প্যাকেট পাই এক সপ্তাহের জন্য।'

'চিঠিপত্রের কী অবস্থা?'

'বিশ থেকে চল্লিশ দিনের মাঝেই এসে পড়ে সাধারণত। তবে আমরা যেগুলো পাঠাই সেগুলো আদৌ পৌঁছে কিনা তা জানি না।'

সার্জেন ইয়ার্ট-এর ওপর চেক পয়েন্টের সৈন্যরা এতোই মাতাল হয়ে ছিল যে তারা গাড়ির দিকে হেঁটে আসতেও পারছিল না। এক তরুণ সৈনিক শার্ট খোলা অবস্থায় টলতে টলতে উদয় হলো, সাথে তার চাইতে বয়স্ক আরেকজন সৈন্য। তার অবস্থাও বেগতিক।

আমি বয়ষ্কজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তার যুদ্ধে আসার কারণ কী? প্রশ্ন শুনে সে নাটকীয় ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল। যেন মাতাল অবস্থায় থেকেও নিজের গোপন কিছু তথ্য শেয়ার করতে চায়।

'আমার বাড়িতে কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল তখন এজন্য এসেছিলাম, কিন্তু এখন আমি এখান থেকে বের হতে চাই।'

আমরা পর্বত, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চলে এলাম শালির আগের আরেকটা চেক পয়েন্টে। আমরা ওখানে রাত কাটাব যদি তারা অনুমতি দেয়। সৈনিকরা এতোই মাতাল যে গাড়ি পর্যন্ত আসার অবস্থাও তাদের নেই। আমি গাড়ি থেকে নেমে এপিসির দিকে গেলাম। সেখানে তারা প্যারালাইজড রোগীর মতো শুয়ে আছে।

'অবশ্যই থাকতে দেবো, কিন্তু এক শর্তে। আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে যেখানে আমি ছেলেদের জন্য ভদকা কিনতে পারব,' নিকোলাই বলল। আমরা তাকে শালিতে নিয়ে যাওয়ার কথা বললাম। ভদকাও কিনে দেবো এবং ফেরতও দিয়ে যাব। নিকোলাই সামনের দিকে নিচু হয়ে রাইফেলের ওপর ভর দিয়ে বসে বলল, 'আমরা একটা টেপরেকর্ডার কিনতে গেছিলাম, সেখানেও কিছু বলদ আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়েছে। আমরা ফাঁড়িতে বসে গান শুনতে চাই; আমাদের এটা দরকার। আমরা চেচনিয়া চাই না, আমরা আমাদের টেপরেকর্ডার চাই।'

অবাক হয়ে দেখলাম কথাগুলো বলতে বলতে সে কাঁদতে শুরু করেছে।

নিকোলাই বেচারা ভাগ্যবান। শালিতে কিছু চেচেন তাকে দুই বোতল ভদকা এবং তাকে চেক পয়েন্টে পৌঁছে দিল।

BanglaBook.org

নিকোলাই যেটা জানবে না সেটা হলো, চেচেন লোকগুলো তাকে প্রায় বন্দি করে ফেলেছিল।

'আমরা তাকে সেলারে নিয়ে বন্দি করে সারা জীবন দাস বানিয়ে রাখতে পারতাম,' চেচেনদের একজন বলল, 'কিন্তু আমরা তাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ছয়
পুনরুত্থান

প্রধান পরিকল্পনা দুদায়েভকে হত্যা করা।

দুদায়েভ তার শেষ প্রেস কনফারেন্স করল দক্ষিণ চেচনিয়ার জঙ্গলে, মার্চ ১৯৯৬ সালে। মৃত্যুর এক মাস আগে।

জেনারেল দুদায়েভকে রাশিয়ান আর্মি ও বিমান বাহিনি সবসময় শিকার করতে চাইত। কিন্তু সে সবসময়ই ছিল গতিশীল এবং ক্লান্তিহীন। বিদ্রোহীদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারত। এতো কিছুর পরও মুখে হাসি লেগেই থাকত। তার সুন্দর করে ছাঁটা গোঁফ এবং এক্স-পাইলটের সোভিয়েত ইউনিফর্ম চেচেনদের শক্তিমত্তাকে উপস্থাপন করত। লোকটা পাঁচ বছর চেচনিয়াকে শাসন করেছে, জাতিকে অগ্নিতে পরিণত করেছে কিন্তু নিজে কখনই ঝলসে যায়নি। একজন ব্যক্তিত্ববান নেতার মতো সে-ও যেন অমরত্বের বাতাবরণে ঢাকা ছিল। তবে তার অমরত্ব কষ্টার্জিত।

রাশিয়ান সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদরা এফএসবি এবং কমান্ডোদের প্রশ্ন করত, কেন তারা দুদায়েভকে হত্যা করতে পারছে না? সে তো প্রায়ই সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেয়।

বার বার ব্যর্থতায় ষড়যন্ত্রের গন্ধ বেরিয়ে এলো যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গ্রাচেভ অথবা অন্যান্য উচ্চপদস্থ মস্কো অফিসারদের সাথে এক নাম্বার গণশত্রু দুদায়েভের গোপন চুক্তি রয়েছে।

অভিজ্ঞতা বলে, আধুনিক সেনাবাহিনির পক্ষেও দুদায়েভকে হত্যা করা কঠিন ছিল। কারণ মোগাদিসুতে সোমালিয়ার যুদ্ধ নেতা মোহাম্মদ ফারাদ আইদিসকে আটকের পরিকল্পনা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যদিও আমেরিকানরা হাইটেক হেলিকপ্টার গানশিপ এবং কমান্ডো বাহিনির

BanglaBook.org

ব্যবহার করেছিল। দুদায়েভের কাছাকাছি পৌঁছানোর অর্থ—বিদ্রোহী অঞ্চলে প্রবেশ করা। সেখানকার নারী-পুরুষ-শিশু সবাই এক একজন যোদ্ধা। আগন্তুকরা বেশিদূর যেতে পারত না। এমন অবস্থায় সেনাবাহিনি বীরদর্পে একজন মানুষকে খোঁজ করছে—এটা শুধু সিনেমাতেই সম্ভব।

আরেকটা পদক্ষেপ নেওয়া যেত, বিশাল সৈন্যবাহিনি বিস্তার করে ফাঁদ পাতা। যেন দুদায়েভের সম্ভাব্য অবস্থান বের করার সাথে সাথেই তার ওপর ঝাপিয়ে পড়া যায় । কিন্তু রাশিয়ান বাহিনি অতোটা দক্ষ নয়, হলে চেচেন যোদ্ধারা বারবার পালিয়ে যেতে পারত না। আরো সূক্ষ্ম পদক্ষেপ হলো, চেচেনদের মতো অতর্কিতে আক্রমণ। তারপরও দুদায়েভের নিরাপত্তাকর্মীদের পার হয়ে তার কাছে যেতে হবে। এটা সত্য যে সাংবাদিকরা তার সাথে দেখা করতে পারত। তবে প্রথমবার দেখা পাওয়ার জন্য টানা চব্বিশ ঘণ্টা গরুর মতো ছোটাছুটি করতে হয়। গ্রাম থেকে গ্রামে, ঘর থেকে ঘরে। শেষ পর্যন্ত তার দেখা মেলে সুরক্ষিত নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে।

সব বিবেচনায় বিমান হামলাই দুদায়েভকে মারার সেরা পদ্ধতি। এ কথা বিমান বাহিনি জেনারেল দুদায়েভ নিজেও ভালোমতো জানত। রাশিয়ানদের কাছে খবর ছিল, সে রোশনি চু থেকে গেকি চু এর মধ্যে কোনো গ্রামে বাস করে। তারা দুদায়েভের চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করতে পারত স্পাই এবং সার্ভেলেন্স এয়ারক্রাফটের মাধ্যমে। অবশ্য দুদায়েভ সতর্ক ছিল; সে বাংকার বা পরিখার মধ্যে থাকত না। ভয় পেয়ে নিজের ভাবমূর্তি নষ্ট করার পক্ষপাতি ছিল না সে। বিমান হামলাসহ কয়েকটা চেষ্টা নেয়া হয়েছিল ইতোমধ্যেই। রোশনি চু গ্রামের বিমান হামলায় সাতাশজন লোক মারা যায়, এর মধ্যে তার দেহরক্ষীও ছিল। কিন্তু দুদায়েভ মারা যায়নি কারণ যথারীতি সেখানে সে ছিল না। দুদায়েভ সর্বদা মোকাবেলায় বিশ্বাসী। বিশ্বাস করত, তার ভাগ্য পূর্ব নির্ধারিত। সে প্রথমে কমিউনিস্ট ছিল, পরে রাশিয়ান সেনাবাহিনিতে যোগ দেয়।

শেষ সংবাদ সম্মেলনে সে বলেছিল, তার কাছে গোয়েন্দা তথ্য আছে, প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন ব্যক্তিগতভাবে তাকে গুপ্তহত্যার নির্দেশ দিয়েছে।

এক মাস পর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ঘোষণা দিল, দুদায়েভ মারা গেছে রাশিয়ানদের এক রকেট হামলায়। এই খবর দুই পক্ষকেই স্তব্ধ করে দিল। তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্রোহী নিরাপত্তা কাউন্সিলের সব শীর্ষ ফিল্ড কমান্ডার এবং রাজনৈতিক নেতারা একটা গোপন মিটিংয়ের আয়োজন করল এবং

Banglabook.org

দলের প্রধান হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেলিমখান ইয়েন্দারবিয়েভের নাম ঘোষণা করা হলো। মস্কো ধরে নিল, এই নাম-পরিচয়হীন ইয়েন্দারবিয়েভ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে পারবে না। জাভগায়েভ বলল, 'ইয়েন্দারবিয়েভ কোনো কর্তৃপক্ষ নয়, তাকে নিয়ে বলার কিছুই নেই।'

গুজব ছড়ালো, ইয়েন্দারবিয়েভ নিজের লোকের গুলিতে নিহত হয়েছে।

আবার রাশিয়ানদের হতাশ হতে হলো। শামিল বাসায়েভ, আসলান মাসখাদোভের মতো প্রধান যুদ্ধনেতারা একের পর এক নতুন প্রেসিডেন্ট ইয়েন্দারবিয়েভের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। তারা এটা ব্যক্তিগত কারণে করেনি। চেচনিয়া-ইচকেরিয়ার সংবিধানেই বলা আছে—ভাইস প্রেসিডেন্ট মৃত প্রেসিডেন্ট এর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং একইসাথে কমান্ডার ইন চীফ হবেন।

বিদ্রোহীরা বিশ্বকে এর মাধ্যমে জানিয়ে দিল, তারা রাশিয়ান প্রোপাগান্ডার সেই দস্যু নয়। বরং দুদায়েভ যেভাবে বলতো, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত একটি বৈধ সংঘবদ্ধ সেনাবাহিনি—এটাই তাদের পরিচয়। চেচেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গভীর সংকট হয়তো গভীর রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হলো।

পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার খুনকার পাশা ইসপ্রাপিলভ বলেন, 'অবশ্যই এটা একটা বিরাট ক্ষতি। যোখার আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক ছিল এবং থাকবে। কিন্তু যারা ভাবছে প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর পর আমরা সব ছেড়ে দেবো, তারা ভুল ভাবছে। যদি আমাদের নতুন কমান্ডার আমাদের সংবিধান মোতাবেক হয়, তাহলে সে-ই আমাদের সেনাপ্রধান এবং আমরা তাকে কঠোরভাবে মেনে চলবো। আমরা ধার ধারি না কেউ আমাদের দেশকে চিনল নাকি চিনল না। সর্বোপরি, আমরা আমাদের চেনাতেও চাইছি না, এমনকি রাশিয়াকেও নয়।'

ইয়েন্দারবিয়েভের পূর্ব ইতিহাস দুদায়েভ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সে বোয়েভিক বা মিলিটারি কমান্ডার না। সে প্রাক্তন লেখক, একজন অভিজ্ঞ বিচ্ছিন্নতাবাদী। লাল টাই, ধূসর পালক লাগানো টুপির সাথে ক্যামোফ্লেজ স্যুট পরিহিত ব্যক্তি। যুদ্ধের সময় সে অস্ত্র ধরেনি কিন্তু খারাপ সময়ে সে গ্রোজনিতে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসে ছিল এবং স্বার্থান্বেষী ডামি সরকারের মতো প্রজাতন্ত্র থেকে পালিয়ে যায়নি। তার উল্লেখযোগ্য কাজ হলো, জাভগায়েভের সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলনকারী। এবং প্রথম বন্দিও সে-ই হয়েছিল।

ইয়েন্দারবিয়েভের কঠোর জাতীয়তাবাদী হিসেবে সুনাম রয়েছে। তার 'রাশিয়া' কবিতায় সে লিখেছে—

BanglaBook.org

দাসত্বের তরবারি
নোংরা বাহিনির তরবারি,
ছিন্নমূল মানুষের কণ্ঠস্বর
প্লেগের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইয়েন্দারবিয়েভের প্রথম সংবাদ সম্মেলন মানুষকে অভিভূত করল। লোকটা অনেক বেশি নমনীয়, বেশ কূটনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন; তার পূর্বসূরির মতো জ্বলন্ত আগুন নয়।

চেচনিয়ার স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সে বলল, শেষদিন পর্যন্ত সে পাশে থাকবে। দুদায়েভকেকে গুপ্তহত্যা সত্ত্বেও সে সমঝোতায় বসতে রাজি।

'আমি প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী বা শীর্ষ নেতাদের সাথে কথা বলতে চাই। তাদের সাধারণ মন্ত্রীদের সাথে কথা বলার জন্য তো আমাদেরও সাধারণ মন্ত্রী রয়েছে।'

চার সপ্তাহ পর সবাইকে অবাক করে দিয়ে চেচনিয়া-ইচকেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইয়েন্দারবিয়েভ মস্কোতে উড়ে গেল এবং প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন ও প্রধানমন্ত্রী চেরনোমিরদিনের সাথে ক্রেমলিনে সাক্ষাৎ করল। ১৯৯১ সালে সৃষ্ট চেচনিয়া সংকটের পর থেকে এই প্রথম ইয়েলসিন সরাসরি আলোচনায় বসতে রাজি হলো।

***

'আমাদের মনে দুদায়েভ মরেনি। সে সরাসরি জান্নাতে গেছে। আমরা এমন একজন প্রেসিডেন্ট পেয়েছিলাম যে কখনো পিছু হটেনি। একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে ঠিক আছে, কিন্তু আমরা ঠিকই সামলে নেবো। মৃত্যু তো আসবেই। তুমি কখন মরলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ না, কীভাবে মরলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ।'

দুদায়েভের মৃত্যু নিয়ে বাসায়েভের প্রতিক্রিয়া ছিল এটা।

অনেক লোক খবরটা বিশ্বাস করতে চাইল না। নন্দিত বা নিন্দিত যাই হোক—দুদায়েভকে সবাই মনে করত অপ্রতিরোধ্য। জনগণ কোনো লাশ দেখেনি, কোনো ছবি দেখেনি, কোনো কবর দেখেনি; প্রাথমিকভাবে শুধু শীর্ষ নেতাদের কথা শুনেছে। কিছু সমর্থক উন্মাদের মতো হয়ে গেল। বহু রাজনৈতিক-কূটনৈতিক মতবাদের সাথে জড়িত একজন ধর্মীয় কিংবদন্তী

BanglaBook.org

এভাবে চলে যাবে? অসম্ভব।

'তোমাদের বোকা বানিয়েছে। সে মরেনি, নিরাপদেই আছে,' রুসলান নামক একজন তরুণ যোদ্ধা মুখে রহস্যময় হাসি এনে আমাকে বলল।

যদি দুদায়েভের উধাও হয়ে যাওয়া কূটকৌশলের অংশ হতো, তাহলে নেতারা ঘটনা চেপে রাখত, রহস্য উন্মোচন করত না। দুদায়েভের মৃত্যুর ব্যাপারে বিদ্রোহী সরকারের বক্তব্য সবসময়ই অভিন্ন ছিল। সেটা হলো— ২১ কিংবা ২২ এপ্রিল দুদায়েভ একটা স্যাটেলাইট ফোন কল করতে বাইরে যায়। সে তার নিভা জিপে করে দেহরক্ষী ও সাহায্যকারীসহ গেকি চু'র এক জঙ্গলে প্রবেশ করে একটা সরু গলিতে জীপ পার্ক করল। ফোন সেটআপ করে মস্কোতে তার বন্ধু, পার্লামেন্টের ডেপুটি কনস্ট্যান্টিন বরভইকে কল করে। জানতে চেয়েছিল, আলোচনার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা। কিন্তু রাশিয়ান অ্যান্টেনায় এই কলের সিগনাল ধরা পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ান যুদ্ধ বিমান বিশেষভাবে টার্গেট করা এয়ার টু গ্রাউন্ড মিসাইল নিক্ষেপ করলে সরাসরি তা আঘাত হানে। এই বিমান হামলাটা কাকতালীয় ছিল না, বরং স্যাটেলাইট গাইডেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে পরিকল্পিত গুপ্তহত্যা বলা যায়। এতে শুধু রাশিয়ার সিস্টেমই ব্যবহার করা হয়নি বরং বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের স্যাটেলাইট সিগন্যাল ব্যবহার করা হয়েছে—এমনটাই প্রকাশ করে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা 'ইচকেরিয়া'। দুদায়েভ মারাত্মকভাবে আহত হয়। তার দীর্ঘদিনের মস্কো প্রতিনিধি খামাদ কুরবানোভ এবং সামরিক প্রসিকিউটর মাগোমেদ জানায়েভ সেখানেই মারা যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তরুণ বিদ্রোহী বলে, সে ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখেছে কারণ বিমান ওই পথ দিয়েই যাচ্ছিল হামলার সময়। দুদায়েভ অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছিল। কুরবানভ ও প্রসিকিউটর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। দেহরক্ষীরা কিছুটা দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তাদের একজন আহত হয় তবে গুরুতর নয়। রকেট বিস্ফোরণের ফলে নিভা জীপ পনেরো মিটার দূরে ছিটকে পড়ে। প্রেসিডেন্ট মাথা, বাম হাত ও ডান পায়ে আঘাত পায়। সে কিছুক্ষণ বেঁচেছিল একটা কথা বলার জন্য— 'লড়াই শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেও।'

শামিল বাসায়েভ কুরআন হাতে নিয়ে শপথ করে বলেছে যে, দুদায়েভ মারা গেছে। এটা তার নিজের অনুসারীদের বিশ্বাসের জন্য যথেষ্ট ছিল কিন্তু সাধারণের জন্য না। কোনো লাশ কেউ দেখেনি এবং সমাধিস্থল গোপন রাখা হয়েছে এই বলে যে, রাশিয়ানরা জানলে লাশ তুলে নিতে পারে। এমনকি

BanglaBook.org

দুদায়েভের ভাই বাসখানও শেষকৃত্য নিয়ে কিছু জানে না।

'কিছু লোক পর্বত থেকে গ্রোজনিতে এসে আমাকে বলল, 'যোখার মারা গেছে এবং তার কবর দেয়া হয়ে গেছে।' কথাটা যখন সে আমাকে বলল তখন তার বাড়িতে যিকির চলছিল।

গেকি চু'র জঙ্গলে সেদিন কিছু ঘটেছে এটা নিশ্চিত। একটা বড় গর্ত রয়েছে সেই গলিতে, বেশ কয়েক মিটার দূরে নিভার ধ্বংসাবশেষ, পোড়া টায়ার এবং ড্যাশবোর্ডের টুকরা পড়ে আছে। উরুস মার্টানের নিকটস্থ হাসপাতালে দুদায়েভের দেহরক্ষী শার্পনেলের আঘাত নিয়ে হামলার দিন এসেছিল। যেহেতু অগ্নিকুণ্ড মিথ্যা নয় সেহেতু ধরে নেয়া যায়, একটা বিস্ফোরণ সেখানে ঘটেছিল। এবং দেহরক্ষীরা যেহেতু ছিল ওখানে, দুদায়েভও ছিল।

কিন্তু বিস্ফোরণ কে ঘটায় এবং কীভাবে? দুদায়েভের স্যাটেলাইট ফোন দিয়ে প্রতারিত হওয়ার গল্পটা চমকপ্রদ হলেও সম্ভব। রাডারসহ একটা ইল্যুসিন-৭৬ এয়ারক্রাফট স্যাটেলাইট ফোনের সিগন্যাল ট্রেস করে নিখুঁতভাবে লক্ষ্যস্থির করতে সক্ষম। এরপর সুখোই-২৫ জেট ফাইটার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে। চিরশত্রুর মৃত্যু সংবাদে রাশিয়ানরাও হতবিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তারা নিজেরাও এটা আশা করেনি। সামরিক বাহিনি পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। বলেছে, তারা সেদিন বোমা হামলা করেছে কিন্তু টার্গেট দুদায়েভ ছিল না। প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন বললেন, 'আমরা তথ্য যাচাই করে দেখছি।'

ইয়েলসিনের চেচনিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা এপিল পাইন বলল, 'রাশিয়ান নেতারা এই ধরনের আদেশ দেয়নি এবং দিতে পারে না।'

আরেকটা চমক লাগানো তথ্য আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে এলো, যদিও ব্যাপারটা খানিক উদ্ভট। তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করল। ওয়াশিংটনের একজন বেনামী অফিসিয়াল বলল, 'সে দুদায়েভের মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত।'

এর আগে প্রেডিডেন্ট বিল ক্লিনটন চেচনিয়া সংকট নিয়ে রাশিয়াকে সাহায্য করার কথা বলেন। কিন্তু কী সাহায্য তা স্পষ্ট করেননি। তবে গুঞ্জনরত তথ্য হলো, ওয়াশিংটন রাশিয়াকে স্পাই স্যাটেলাইট প্রযুক্তি সরবরাহ করেছে।

কী ঘটেছিল? দুদায়েভ কি গুপ্তহত্যার শিকার? নাকি নিজেদের লোকেরা হত্যা করেছে তাকে? নাকি দৈবাৎ বোমা হামলায় মারা গেছে? সে কি চেচনিয়া ছেড়ে পালিয়েছে? আহত হয়ে তুরস্কে আশ্রয় নিয়েছে? তার লোক কি তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে রাশিয়ান গুপ্তচরদের চোখে ধূলো দেয়ার চেষ্টা করছে?

BanglaBook.org

রহস্য ঘনীভূত হলো যখন দুদায়েভের রাশিয়ান বংশোদ্ভূত স্ত্রী এলা চেচনিয়া ছাড়ল একটা ইসলামিক দেশের উদ্দেশ্যে। মস্কো কর্তৃক আয়োজিত একটা কূটনৈতিক চাল ছিল সেটা। কারণ এর বিনিময়ে তাকে টিভিতে এসে বলতে হয়েছে—'ইয়েলসিনকে পুনঃনির্বাচিত করুন।'

মৃত দুদায়েভ কি আবার ফিরে আসবে ঠিক ইমাম শামিলের মতো? মানুষ তখন ভেবেছিল তিনি গিমরির যুদ্ধে মারা গেছেন।

এমনকি যুদ্ধের এক বছর পরেও এসব প্রশ্ন ঘুরতে থাকল। দুদায়েভের একটা ভাস্কর্য বোমা হামলার স্থানে স্থাপিত হলো কিন্তু কবরস্থান কোথায় তা গোপন থেকে গেল। কারণ হিসেবে সরকার এবং আত্মীয় স্বজনেরা একই কথা বলল—অভ্যন্তরীণ বা বহিঃশত্রু কবর নষ্ট করতে পারে। কিছু চেচেন সন্দেহ করতে লাগল, পুরোটাই একটা নাটক অথবা দুদায়েভ অন্য দেশে চলে গেছে।

এটা সত্য যে তার ভাইকে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ডাকা হয়নি। যা সন্দেহের মেঘকে আরো ঘনীভূত করেছে। এর একটা কঠিন কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর বাসায়েভ আমাকে দিল।

'শেষকৃত্য গোপনে ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় যেন রাশিয়ান শুয়োরেরা এখানে নাক গলাতে না পারে। তার ভাই গ্রোজনিতে থাকে, যোদ্ধা নয় সে। তাই তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমরা তার ভাইয়ের চেয়ে তার বড় আত্মীয়। আমরাই তার পাশে ছিলাম যুদ্ধের সময়টাতে।' বাসায়েভ রাগত স্বরে বলল।

কিন্তু বিতর্ক রয়েই গেল। প্রায় সব চেচেনই বলল, দুদায়েভের তার নিজের লোকদের দ্বারা নিহত হবার সম্ভাবনা একদম নেই। এরকম মৃত্যু চেচেনদের সকল ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের পরিপন্থী। কিন্তু তবুও এই সম্ভাবনা একবারে উড়িয়ে দেওয়া গেল না। সবাই জানত ১৯৯৬-এর বসন্তে রাশিয়ানরা যুদ্ধ শেষ করতে চাইছে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে। কিন্তু দুদায়েভের সাথে আলোচনায় রাজি ছিল না তারা। দুদায়েভ তখন রাশিয়ায় সন্ত্রাসী হামলার হুমকি দেয়। সে বলেছিল, 'আমরা রাশিয়ার চেয়েও যুদ্ধ বজায় রাখতে বেশি উৎসাহী। কারণ আমাদের আর কী-ই-বা বাকি আছে? ধ্বংস হয়ে যাওয়া অর্থনীতি; কোনো শিল্প-কারখানা নেই, উৎপাদন নেই।'

অপরদিকে সাধারণ চেচেনদের আশা, ইয়েলৎসিনের সাথে সাক্ষাৎ করা। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তারা রাশিয়ান সরকারের চোখের সামনে থেকে অস্পষ্টতার পর্দা সরাতে এবং নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে। এ স্বপ্ন যেন

Banglabook.org

ঘরে এসে কড়া নাড়ল যখন ইয়েন্দারবিয়েভের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবার ঘোষণা এলো।

ষড়যন্ত্রতত্ত্ববিদরা অবশ্য ততক্ষণ সন্তুষ্ট হবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত দুদায়েভের মৃতদেহ পাওয়া যাবে না। দুদায়েভে পুনরাগমন রূপকথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১ আগস্ট ১৯৯৬, গ্রোজনি সংবাদপত্র রিপোর্ট করে—দুদায়েভের আগমন সমাসন্ন।

সে আসে না। কিন্তু তাতে রিপোর্ট বন্ধ হয় না। তার আগমনের কথা কয়েক সপ্তাহ পর পরই-মাঝে মাঝে তো একেবারে নির্দিষ্ট তারিখসহ-প্রকাশিত হতে থাকে। নতুন এফএসবি পরিচালক নিকোলাই কোভোলেভ জোর দিয়ে বলে যে, 'দুদায়েভ মৃত,' কিন্তু তাতেও ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। সে সতর্ক করে আরো বলে, 'চেচেনরা দুদায়েভের ডুপলিকেট বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

তবে সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা ছিল গেকি চু'র একটা বাড়িতে দুদায়েভের স্ত্রী এলার প্রেস কনফারেন্স।

এলা বিচিত্র মহিলা। রাশিয়ান হয়েও সে চেচেন কমান্ডারকে বিয়ে করেছে। সে কদাচিৎ বাইরে যেত। চেচেনরা তাকে পছন্দ করত না। সে পরিচিত ছিল তার চিত্রকর্ম ও কবিতার জন্য। কিন্তু সাংবাদিকদের কাছে এলা ছিল নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র যে দুদায়েভের মৃত্যু রহস্যের সকল জট খুলতে পারবে।

কনফারেন্স শুরু হতেই প্রেসিডেনশিয়াল গার্ড ইউনিফর্ম পরিহিত যোদ্ধা পরিবেষ্টিত এলা এসে চেয়ারে বসল। একটা চেচেন পতাকা তার পেছনে। শুধু বিদেশি সাংবাদিকরা সেখানে উপস্থিত ছিল। সে এক সময় তার লেখা কবিতা আবৃত্তি শুরু করল। প্রথমে আমাদের কবিতাটা বুঝতে কষ্ট হলো। পরে যখন আবার ভয়েস টেপ বাজিয়ে শুনলাম তখন বুঝলাম।

যখন আমি মারা যাই বন্ধুর প্রতারণায়,
আমার সমালোচনা কোরো না—আমি ভালোবাসায় বিশ্বাসী ছিলাম।
যখন আমি বিশ্বাসঘাতক এবং অশুভ ছায়া দেখতে ব্যর্থ হই,
আমার সমালোচনা কোরো না—আমার হৃদয় নির্মল।
যখন আমার চোখ বুজে যায় এক পরত মাটি দিয়ে,
তখন স্রষ্টা তোমার বিচার করবে—এবং তুমি আমার বিচার করতে পারবে।

BanglaBook.org

কবিতার মানে বুঝতে পারার আগেই এলা নাটকীয়ভাবে তার মুখের ওপর হাত নিয়ে ফোঁপাতে লাগল। কথা গলায় জমাট বেঁধে গেল। এক অসহায় মেয়ের প্রতিচ্ছবি।

তারপর সে ঘোষণা দিল, সে প্রধানমন্ত্রী চেরনোমিরদিনের সাথে শান্তি মিশন শুরু করতে আগ্রহী। সে ককেশিয়ান এক কিংবদন্তির যোগ্য স্ত্রী হিসেবে যুদ্ধ বন্ধ করতে চায়। সাংবাদিকেরা একে অন্যের দিকে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল।

অতঃপর একজন প্রহরী ঘোষণা করল, আমরা তাকে চাইলে প্রশ্ন করতে পারি কিন্তু কোনো রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়।

'যোখারের মৃত্যুর সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

একজন প্রশ্ন করে ফেলল। কাগজে কলম ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে। এটা হয়তো এক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য হতে যাচ্ছে।

কিন্তু বদলে গভীর আর্তনাদ ভেসে এল, তারপর আরেকটা কবিতা। এটা বেশি দীর্ঘ হলো না। দুটো লাইন বলে এলা তার মুখের ওপর আবার রেখে ঘরের সবাইকে হতবাক করে দিয়ে ঘর ত্যাগ করল। খালি পড়ে রইল আমাদের নোটবুক।

কেউ কোনো কথা বলার আগেই দরজা ভীষণ শব্দে খুলে গেল। এলা গার্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় উঠোনে রাখা ধূসর ভলগায় চড়ে ধূলো উড়িয়ে গ্রামের পথ দিয়ে চলে গেল। আমার মনে হলো, আমি মঞ্চে কোনো উদ্ভট নাটক দেখলাম। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এতো কিছুর পরও এলা কাঁদেনি। আমি তার থেকে মিটার দুই দূরে বসে ছিলাম। স্পষ্ট দেখেছি—এক ফোঁটা জল নেই তার চোখে।

BanglaBook.org

মস্কো

সালমান রুদায়েভ মার্চ ১৯৯৫-এ অন্য চেচেনদের অতর্কিত আক্রমণের শিকার হলো। রিপোর্ট এলো, মারা গেছে সে। পার্ভোমাইস্কোয়ে হামলায় জড়ানোর জন্য তাকে মারা হয়েছে বলে গল্প রটল। রাশিয়ানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

তারপর জুলাইতে বড় সানগ্লাস আর দাড়িতে টেলিভিশনে একজন লোকের আবির্ভাব ঘটল। সে নিজেকে সালমান রুদায়েভ বলে দাবি করল।

প্রথমে রাশিয়ানরা বলল, এটা অসম্ভব। সত্যি বলতে, চেহারায় পুরোটা মিল নেই; মুখে সার্জারির দাগ এবং বীভৎস রকমের ক্ষত। কিন্তু সেই তীক্ষ্ণ পাতলা গলার স্বরে কোনো পরিবর্তন নেই। রুদায়েভ প্রকৃত অর্থে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে। তার চিকিৎসা দেশের বাইরে হয়েছে।

তারপর এলো আরেকটা বড় ধাক্কা। রুদায়েভ বলল, ‘দুদায়েভ বেঁচে আছে। সে রকেট হামলায় বেঁচে গেছে এবং প্রবাসে চিকিৎসাধীন আছে।’

সে কুরআন ছুঁয়ে শপথও করল। রুদায়েভ ভুতুড়ে এক চরিত্র, কোনো সন্দেহ নেই। সবাই বলে, পার্ভোমাইস্কোয়ের যুদ্ধ তাকে বিপর্যস্ত করেছে। যুদ্ধের পর আমাদের একই ঘরে থাকার ভাগ্য হয়েছিল। সে আমাকে দেখলেই মজা করত ‘সেবাস্টিয়ান, বাখ, সেবাস্টিয়ান, বাখ’ বলে। প্রথমে মশকরাটা ধরতে না পারলেও পরে আবিষ্কার করলাম এটা ‘বাহ’ হতে পারে। ‘বাহ’ শব্দটা রাশিয়ার বাচ্চারা গোলাগুলির অভিনয় করার সময় বলে।

গুপ্তহত্যার চেষ্টা এবং সার্জারি তাকে আরো রসিক করে তুলেছে। তার মুখ নষ্ট হয়েছে, পোশাক নষ্ট হয়নি। আগে পরত সাধারণ যুদ্ধের পোশাক, এখন পরে বিশেষভাবে বানানো মিলিটারি পোশাক, সাথে মেডেল। চল্লিশজন ভয়ংকর দেখতে দেহরক্ষী সাথে থাকত। সে অধিকাংশ লোকের কাছে অদ্ভুত বটে, কিন্তু কিছু লোক আছে যারা তার কথা বিশ্বাস করেছিল। যে লোকটা মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে এবং যোখার সম্পর্কেও জানে, সে রুদায়েভ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

২৭ মে রাশিয়ান প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশনের তিন সপ্তাহ আগে জেলিম খান ইয়েন্দারবিয়েভ, মোভলাদি উদুগভ এবং অভিনেতা থেকে বদলে যাওয়া কমান্ডার জাকায়েভ ক্রেমলিনের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। চেচেনরা সব সময় এটাই চাইত। তখনো একটা সরল অনুভূতি বিরাজমান ছিল যে, ইয়েলসিন আসল সত্যটা জানেন না। চেচেন প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ হলে সে বুঝবে।

কাগজে-কলমে চেচেনরা অন্তত শক্তি দিয়ে সমঝোতা করার অবস্থানে নেই। ক্রেমলিনে আলোচনার ঠিক আগ দিয়ে রাশিয়ানরা দখল করে নেয় স্ট্যারি-আখোই, ওরেকোভো, এমনকি বামুত—যা ছিল প্রতিরোধের অসামান্য প্রতীক। টুপোলভ এবং সুখোই বোমারু বিমানের মাধ্যমে বামুতে এতো বেশি পরিমাণ বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল যে দশ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ছিল ধ্বংসের ব্যাপ্তি। পুরো জঙ্গলময় পর্বত উপত্যকা ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। সব সময়ের

BanglaBook.org

মতো চেচেনরা পিছু হটলো কারণ তাদের কোনো গোলাবারুদ ছিল না। চেচেনদের অধিকাংশ লোক রক্ষা পেলেও বামুত হাতছাড়া হওয়াটা মনস্তাত্ত্বিক আঘাত হয়ে দাঁড়াল। স্ট্যারি-আখোই-এর মতো ছোট শহর বোমা হামলায় নুড়ি পাথরের স্তূপে পরিণত হয় আর ওরেকোভোকে তো চেনারই জো রইল না। মোভলাদি চাঁদায়েভ, স্ট্যারি-আখোই থেকে বেঁচে ফেরা একজন বোয়েভিক আমাকে পরে বলেছিল, মাত্র চল্লিশ জন ওই সময় প্রতিরোধ করেছিল। এর মধ্যে আঠারো জন মারা গেছে।

চেচেনদের হাতের একমাত্র তুরুপের তাস হলো—ইয়েলসিন ১৬ জুনের আগেই যুদ্ধ বন্ধ করতে চান। ফলে তিনি আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করতে প্রস্তুত। এই যুদ্ধ তার সবচেয়ে বড় ভুল, এটাও স্বীকার করেন এবং বলেন, এই যুদ্ধ শেষ না হলে সে পুনঃর্নির্বাচিত হতে পারবে না। এসব কারণে সাধারণ মানুষের কাছে প্রকৃত অর্থে আশা বেঁচে ছিল। উৎসাহী মানুষ ভীড় জমাল যখন ইয়েন্দারবিয়েভ এবং তার দল পর্বত থেকে ইঙ্গুশেটিয়া বিমান বন্দরে পৌঁছায়। অকল্পনীয়ভাবে লিমুজিনে করে তারা রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো কিন্তু কোনো বোমা আঘাত করল না! দলের অন্যান্যরা শ্লোগান দিল—‘আল্লাহু আকবার’। বিদ্রোহীরা জয়ীর বেশে জীপ নিয়ে ঘুরতে লাগল বিদ্রোহী পতাকা লাগিয়ে। রাশিয়ান বাহিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে, ইয়েন্দারবিয়েভ এবং প্রধানমন্ত্রী চেরনোমিরদিন একটা ডকুমেন্ট সাইন করল যার মাধ্যমে এক সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হয়। ইয়েলসিন বললেন, শান্তির প্রধান সংকট সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু ক্রেমলিনের মিটিং-এর টেলিভিশন ফুটেজ দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল, সত্যিকার শান্তির আশা খুবই ক্ষীণ।

ইয়েলসিন ইয়েন্দারবিয়েভকে অবজ্ঞা ভরে অভ্যর্থনা জানালেন। ভর্ৎসনা করে বললেন, ‘আড়াই ঘণ্টা দেরি। প্রেসিডেন্টের মিটিংয়ে কেউ পাঁচ মিনিটও দেরি করে আসার সাহস পায় না।’

তারপর ইয়েলসিন লম্বা টেবিলের প্রধান আসন গ্রহণ করে ইয়েন্দারবিয়েভ ও তার প্রতিনিধিদের বাম পাশে বসালেন। প্রধানমন্ত্রী চেরনোমিরদিন ও তার প্রতিনিধিদেরকে, যেখানে জাভগায়েভও ছিল, ডান পাশে বসতে বললেন। দেখে মনে হবে, এটা চেচনিয়ার অভ্যন্তরীণ ঝামেলা এবং ইয়েলসিন হলেন মধ্যস্থতাকারী।

BanglaBook.org

ইয়েন্দারবিয়েভ প্রতিবাদ করে সভা বর্জনের হুমকি দিলে রাগত স্বরে ইয়েলসিন বললেন, 'বসো, বসো।' ঠিক যেন স্কুল মাস্টারের সুর।

শেষ পর্যন্ত চেচেনরা যথার্থ স্থান পেল। ইয়েন্দারবিয়েভের বিপরীতে ইয়েলসিন বসলেন। এবার দু'জনকে সমান অংশীদার মনে হলো। রাশিয়ান অফিসিয়াল লাইনের শেষে জায়গা পেল জাভগায়েভ। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সন্তুষ্ট হলো কিন্তু পরিবেশটা বিষাক্ত হয়ে রইল।

টেবিলের একপাশে চেচেনদের চিরায়ত ক্যামোফ্লাজ পোশাক আর আখমেদ জাখায়েভের পাইরেটদের মতো কালো পোশাক, অন্যপাশে স্যুটেড রাশিয়ানরা। দেখে মনে হবে তারা এর চাইতে দূরে ইতোপূর্বে আর কখনোই ছিল না। কোনো সংলাপ নেই, শুধু ইয়েলসিনের নির্বাচনপূর্ব সাহসিকতা প্রদর্শন এবং চেচেনদের সাথে দ্বিমত প্রদর্শনমূলক কথা হলো। উদুগভ তো ইয়েলসিনের কথার মাঝেই বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি কি জানেন কী ঘটছে?' তারপর তাকে যুদ্ধের ভয়ংকর ভিডিওগুলো দেখানোর প্রস্তাব করলেন। কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে পুরো সেশনে চিরায়ত প্রোপাগান্ডার মহড়া চলল। ইয়েলসিন যেন দস্যুদের সাথে কথা বলছিলেন। তার স্বর কঠোর।

ইয়েলসিন আরেকটা চাতুর্যের পরিচয় দিলেন। ক্রেমলিন আলোচনার পরের দিন যখন চেচেন নেতারা মস্কোতে প্রায় আটক অবস্থায় ছিল, ইয়েলসিন চেচনিয়াতে পাড়ি জমালেন। যুদ্ধের পর এটা চেচনিয়াতে প্রথম ভ্রমণ। মিলিটারি হেলিকপ্টারে চড়ে ইয়েলসিন প্রাভোবেরেজনায়া গ্রামে উড়ে গেলেন। এটা চেচনিয়ার উত্তরে এমন এক গ্রাম যেখানকার মানুষ কোনো রকম যুদ্ধই দেখেনি; যাদের পুরো জনসংখ্যাই কোসাক বা স্বাধীনতা বিরোধী চেচেন। এরপর তিনি গ্রোজনির একটা সামরিক ঘাঁটিতে নেমে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'যুদ্ধ শেষ, তোমরা জয় লাভ করেছো।'

চার ঘণ্টার মধ্যে ইয়েলসিন মস্কোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। কোনো যুদ্ধ বিধ্বস্ত লোকের সাথে কথা বললেন না, দেখা করলেন না গ্রোজনির কোনো বাসিন্দার সাথেও। তার পুরো যাত্রাপথে একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিংও তিনি দেখেছেন কিনা সন্দেহ আছে। ন্যাশনাল টিভিতে এসব উল্লেখও করা হলো না। সবাই শুধু দেখল, ইয়েলসিন চেচনিয়াতে। এখন ইয়েলসিন বলতে পারবেন, তিনি একটা গুলির শব্দও শোনেননি। যুদ্ধ শেষ, শান্তি স্থাপিত হয়েছে; শুধু কাগজে-কলমে নয়, বাস্তবেও।

Banglabook.org

এরপরও চেচেনরা কিছুটা আশাবাদী। ক্রেমলিনের পথ ধরে দুই পক্ষের মাঝে পুরোপুরি সমঝোতা স্থাপিত হলো নাজরান ও ইঙ্গুশেটিয়াতে। ১০ জুন, ইয়েলসিনের নির্বাচনী প্রচারণার ছয় দিন আগে কমিউনিস্ট প্রতিপক্ষ গেনাডি জুগানভের সাথে সামরিক বাহিনি প্রত্যাহারে নতুন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। ওএসসিই'র উৎসাহে শান্তিচুক্তি ১৯৯৫ সালের চুক্তির চেয়ে আশাব্যঞ্জক মনে হলো।

প্রথম দফায় নির্বাচন হলো খুবই হাড্ডাহাড্ডি। ইয়েলসিন মাত্র ৩ শতাংশ বেশি ভোট পেলেন জুগানোভের চেয়ে। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখ ৩ জুলাই। পুরো নির্বাচনের জন্য ইয়েলসিন শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলেন। যুদ্ধের কড়া সমালোচক রিটায়ার্ড জেনারেল আলেকজান্ডার লেবেদ প্রথম দফার নির্বাচনে তৃতীয় স্থানে ছিল। ইয়েলসিন ইলেক্টোরেট বাড়াতে তাকে হাইপ্রোফাইল জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বানালেন। যুদ্ধের অন্যতম সমর্থক, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পাভেল গ্রাচেভ, কুখ্যাত প্রধান ক্রেমলিন দেহরক্ষী আলেকজান্ডার কোরজোকভ, এফএসবি সিক্রেট সার্ভিস চিফ মিখাইল বারসুকোভ, সংস্কার বিরোধী প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী ওলেগ সস্কোভেট এবং নিরাপত্তা কাউন্সিল সেক্রেটারি ওলেগ লোবভকে শেষ মুহূর্তে বরখাস্ত করা হলো।

ইয়েলসিন জুগানোভকে দ্বিতীয় দফায় ৩ জুলাই পরাজিত করলে এটা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, শান্তি প্রক্রিয়া এখন বরফের মতো অস্থায়ী হয়ে পড়েছে।

যদিও যুদ্ধ সমর্থিত পার্টির লোকদের বরখাস্ত করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী কেউ-ই তাদের দেখানো পথের উল্টো চলতে পারবে না। ক্রেমলিন যদি যুদ্ধ বন্ধ করে দেয় তাহলে প্রমাণ হবে যে তারা এতোদিন ভুল করে এসেছে এবং এখন পরাজয় মেনে নিয়েছে। পুনঃনির্বাচিত হয়ে এখন সমঝোতার চাপ আরো বাড়বে। তার ওপর পঁয়ষট্টি বছর বয়সী প্রেসিডেন্টের একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে দুই দফা নির্বাচনের মাঝে। তিনি তার দ্বিতীয় মেয়াদ অকার্যকরভাবে শুরু করেন এবং ক্রেমলিনকে নীতি শূন্যতায় ফেলে দেন।

'সকল শক্তিশালী প্রতিরোধকারী দস্যুদের ধ্বংস করা হবে,' চেচেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কমান্ডার জেনারেল ভ্লাদিমির শামানোভ বলল। তারিখটা ছিল ১১ জুলাই, ইয়েলসিনের বিজয়ের এক সপ্তাহ এবং ইঙ্গুশেটিয়া শান্তি চুক্তির একমাস পর। 'আমাদেরকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। ওইসব হারামজাদাদের বিরুদ্ধে—সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, গণমাধ্যম;

BanglaBook.org

সকল ক্ষেত্রে।'

সন্ত্রাসবাদ রাশিয়াকে ঘিরে ধরেছে—এর উদাহরণ দিতে গিয়ে শামানোভ উল্লেখ করল মস্কোতে বোমা বিস্ফোরণের কথা। যদিও এগুলো চেচেনদের কাজ তার কোনো প্রমাণই নেই।

সামরিক পদক্ষেপ আরেকবার শুরু হলো। প্লেন এবং হেলিকপ্টার দক্ষিণের গ্রাম এবং পার্বত্য উপত্যকায় রকেট বোমা হামলা শুরু করল, পদাতিক বাহিনি ট্যাংক ও আর্টিলারি নিয়ে ছুটলো উপত্যকা বরাবর। ধীরে ধীরে ডার্গো থেকে ভেদেনো পর্যন্ত সকল গ্রাম তাদের দখলে চলে গেল। চেচেনদের বাধ্য করা হলো পিছু হটতে। সমতলে সবচেয়ে বড় গ্রাম গেকিতে আর্টিলারি আক্রমণে প্রতি দশটা বাড়ির মধ্যে একটা বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেল। এক চেচেন কমান্ডার মারা গেল; রাশিয়ান সৈন্যরা তার লাশ নিয়ে গেল মুক্তিপণ হিসেবে।

এবার পর্বতে বিমান হামলা অন্যবারের চেয়ে ভয়ানক ছিল। কারণ সেখানে অনেক সাধারণ মানুষের বাস। একবার তো ইয়েন্দারবিয়েভ এবং মাসখাদোভসহ সকল বিদ্রোহী নেতৃত্ব মারাই যেতে বসেছিল যখন মেখেটি (ভেদেনোর কাছে) পদাতিক বাহিনি দিয়ে ঘেরাও করে আকাশ থেকে বোমা ফেলা হচ্ছিল। পরিহাসের বিষয়, সেখানে চেচেনরা লেবেদের প্রেরিত একজন প্রতিনিধির সাথে নতুন শান্তি চুক্তি বিষয়ক মিটিং করছিল। বিমান হামলার সময় তাকে চিৎকার করে বলতে দেখা গেছে 'লেবেদ এসব বিমান হামলা সম্পর্কে কিছুই জানে না। এটা চূড়ান্ত দুঃস্বপ্ন! তিন দিন সময় দাও, আমরা যুদ্ধ বন্ধ করে দেবো।'

তার কথা কেউ শুনছিল না।

এমনকি চেরনোমিরদিন, যে আগে সমঝোতার মনোভাব বহন করত সেও বলল, 'চেচেনদের জন্যই এবারের যুদ্ধ শুরু হয়েছে।'

এবারের আক্রমণ ছিল তীব্র। পূর্বের দুর্নীতি এবং অদক্ষতা সত্ত্বেও এবার রাশিয়ানরা তাদের কাজ সমাধা করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। চেচেনরা বিবৃতি দিল, 'দুঃখজনকভাবে আমরা বলছি যে, নিজেদের বিশ্বের পরাশক্তি হিসেবে দাবি করা রাশিয়া তাদের কথা রাখল না।'

বিদ্রোহীরা প্রতিরোধ করার শপথ নিল কিন্তু বিমান হামলা এবং অগ্রসরমান হাজার হাজার সেনার কাছে তাদেরকে বড্ড ছোট মনে হলো।

জাভগায়েভ প্রতিক্রিয়া দেখাল—যুদ্ধবিরতি সত্যিকার অর্থেই হয়েছে।

Banglabook.org

মস্কোতে এসে জোর দিয়ে এটাও বলল, তার দেশে কোনো আক্রমণ হচ্ছে না।

'আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিতে পারি, শেষ ষাট দিনে একটা বোমাও পড়েনি, একটা গুলিও চলেনি।'

ওই সময় আমি ভাবলাম এটা হয়তো গত বিশ মাস ধরে যা করে আসছে সেই প্রোপাগান্ডারই আরেকটা অধ্যায়, যে প্রোপাগান্ডা জাভগায়েভকে এতোদিন পর্যন্ত ক্ষমতার চেয়ারে বসিয়ে রেখেছে। কিন্তু পরে অনুধাবন করলাম, আমি একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি। এটা 'এম্পেরোর উইথ নো ক্লথস' নাটকের শেষ দৃশ্য।

জাভগায়েভের বাহিনি এবং শান্তি সমঝোতাকারী—সকলেরই অগোচরে চেচেনরা তাদের অস্ত্র পরিষ্কার করে নামাজ পড়ে নিল। কারণ তারা বিস্ময়কর এক অভিযানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর তা হলো—গ্রোজনি পুনরুদ্ধার।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় সাত
প্রত্যাবর্তন

দেড় বছর আগে আমাদেরকে পিছু হটানো হয়েছিল। এখন পাল্টা আক্রমণের সময় হয়েছে। আমরা আমাদের শহরকে রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে মুক্ত করতে যাচ্ছি।

আখমেদ জুকারায়েভ, চেচেন যোদ্ধা, আগস্ট ১৯৯৬

রাশিয়ান সৈন্যদের অবস্থান ছিল গ্রোজনির উত্তর প্রান্তে ক্যান ফ্যাক্টরির পাশে। রাশিয়ান ফাঁড়িটা আঁকাবাঁকা, পরিখা সমৃদ্ধ। লম্বা ঘাস, কংক্রিটের স্তুপ, বালির বস্তায় ঢাকা। জায়গাটা পরিত্যক্ত মনে হয়, যদি না জানা থাকে, সৈন্যরা গর্তের এতোই গভীরে রয়েছে যে তাদেরকেও মাটির অংশ বলেই মনে হয়। তাদের মাথা থাকে ভূমির সমান্তরালে। একদিকে তারা খালি মাঠে শুয়ে আছে, অপর দিকে শহরের অন্য প্রান্তে যুদ্ধের দামামা বেজে চলেছে।

লেফটেন্যান্ট এক হাতে ওয়াকিটকি এবং অন্য হাতে কালাশনিকভ নিয়ে বেরিয়ে এলো। তার পরনে ট্র্যাকশুট ও ক্যামোফ্লাজ টিশার্ট। চামড়া ভাঁজ পড়ে গেছে, প্রচণ্ড রকমের অপরিষ্কার।

'বের হয়ে আসো,' সে আমাকে এবং ডব্লিউটিএন টেলিভিশন, ইএফই নিউজ এজেন্সি এবং রেডিও লিবার্টির কলিগদের বলল। আমরা আমাদের আর্মার প্লেটযুক্ত ল্যান্ড রোভার থেকে সাবধানে বেরিয়ে এলাম।

'এখানে যুদ্ধ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো না? চলে যাও এখান থেকে। এবং অবশ্যই ভিডিও করার চেষ্টা কোরো না, করলে আমি কিন্তু ক্যামেরা ভেঙে ফেলব।' তার মুখ ঘামে ভেজা।

BanglaBook.org

আমরা তাকে বোঝাতে চাইলাম, তর্ক করলাম। লাভ হলো না। আমরা মাত্র গ্রোজনিতে পৌঁছেছি আর সে দু’দিন ধরে চেচেনদের পুনরুদ্ধার অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমরা যতো কারণ দর্শাতে লাগলাম, সে ততো রেগে যাচ্ছিল।

তার পূর্ব অভিজ্ঞতাই তাকে দিয়ে এমন প্রতিক্রিয়া দেয়াচ্ছে। এটা ভয় কিংবা যুদ্ধ-জ্বর নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। এটা একটা মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠা চেচনিয়ায় অবস্থিত সমগ্র রাশিয়ান বাহিনির পতনের প্রতিচ্ছবি।

আগস্ট ৬ তারিখ ভোরে, ইয়েলসিনের দ্বিতীয় মেয়াদের শপথের তিন দিন আগে দুই থেকে তিন হাজার চেচেন বোয়েভিক গ্রোজনিতে ঢুকে পড়ল। যারা আগে থেকেই ভেতরে লুকিয়ে ছিল তারাও ট্রোজান ঘোড়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ল শহরের ভেতর। একদিনের মধ্যেই তারা সকল রাশিয়ান ঘাঁটি এবং শহরের চারিদিক ঘিরে ফেলল এবং অস্থায়ী কমান্ডের একটা কাঠামো দাঁড় করালো। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বড় শহর আরগুন আর গুডারমেস কোনো ধরনের গোলাগুলি ছাড়াই দখলে নিয়ে নিল তারা।

প্রথমে রাশিয়ার প্রথম উপ-অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী পাভেল গলুবেট বলল, ‘তেমন গুরুতর কিছু ঘটেনি। বিদ্রোহীরা চুরি করতে ঢুকেছিল, তাদের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। গ্রোজনি আমাদের দখলে ছিল এবং থাকবে। শহর দখল হয়েছে এই কথা একেবারেই বোগাস।’

এমন ‘সাহসী’ কথা হালে পানি পেল না। চেচেনরা জানত রাশিয়ানরা কোথায় কোথায় রয়েছে। তারা ওদের ঘিরে ফেলল, রিলিফ ইউনিটকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ভবনও দখল করা হয়েছে। চেচেনদের গতি এবং রাশিয়ানদের গড়িমসি অবাক করার মতো। চূড়ান্ত মুহূর্তে অভ্যন্তরীণ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় ভেঙে পড়ল। আক্রান্ত সৈন্যদের সাহায্য করতে শহরের প্রান্তের ঘাঁটি থেকে সাহায্য আসতে সময় লাগল ছত্রিশ ঘণ্টা। এই পরিস্থিতিতে এসে সৈন্যদের স্বীকার করতে হলো, যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

প্রোপাগান্ডা ম্যান মোভলাদি উদুগভ প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিনের গলায় আরেকটা কাঁটা আটকে দিলেন। তিনি স্যাটেলাইট টেলিফোনে রাশিয়ান স্টেট টেলিভিশনকে বললেন,বিদ্রোহীরা সাংবিধানিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনছে।

৬ আগস্ট সবার মধ্যে ভয় ছড়িয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

৮ আগস্ট, চেচেন প্রতি-আক্রমণের তৃতীয় দিন অবস্থার অবনতি হলো। পুরো সমতলে যুদ্ধ বেঁধে গেল। সৈন্যরা শহরে আসার সকল রাস্তা বন্ধ করে দিল। উত্তরাঞ্চলে ক্যানিং ফ্যাক্টরির কাছে রাশিয়ার ভারি অস্ত্র-শস্ত্র কাজ করছিল। আর্টিলারি এক সারি বাড়িতে আঘাত হেনেছে। কালো ধোঁয়ার পুঞ্জ বাতাসে ভাসতে থাকল। দু'শ মিটার দূরে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। মাথার ওপর দুটো যুদ্ধবিমান ঘুরছে। লেফটেন্যান্ট জানে, এর পুরোটাই লোক দেখানো, রাশিয়ানদের অবস্থা খুবই খারাপ। তার নিজেদের সৈন্যরা নিজেদের মারছে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে পড়ে।

'বের হও এখান থেকে,' সে চিৎকার করল, 'ওরা হেলিকপ্টার, ক্রোকোডাইল পাঠাচ্ছে। যে কোনো সময় তোমাদের গাড়ি উড়ে যাবে। ওরা গাড়ি পছন্দ করে না।' লেফটেন্যান্ট ভয় পেয়ে গেছে। 'তোমাদের গাড়ি আমাদের ফাঁড়ির বাইরে রাখলেও লাভ হবে না। চারটা গাড়িকে এভাবে গুলি করা হয়েছে। আমি মৃতদেহ দেখতে দেখতে অসুস্থ। আমাদের হেলিকপ্টারের আক্রমণে আমাদেরই চারজন আহত হয়েছে। বের হও।'

এমন সময় দুটো ক্রোকোডাইল গানশিপ গাছের ওপর দিয়ে ফাঁড়ির ডান দিক থেকে উঠতে লাগল, যেমনটা লেফটেন্যান্ট বলেছিল। তার মুখ রাগে বেঁকে গেছে। একটা গানশিপ আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ঘুরতে লাগল। দুটো বিস্ফোরণ ঘটল মেশিনগান ফায়ারের; বড় গাছের জঙ্গল আর মাঠের বড় ঘাসের মধ্যে। এর মাধ্যমে সতর্কবার্তা দেয়া হলো।

আমরা গ্রোজনিতে ঢোকার আরেকটা রাস্তা পেলাম। তবে সে ক্ষেত্রে কয়েক কিলোমিটার খালি মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হবে। জায়গাটা গ্রোজনি ও মুরল্যান্ড পার্বত্য অঞ্চলের মাঝামাঝি জায়গায়। এর অর্থ, সেই রাশিয়ান ঘাঁটি পার হতে হবে যেখান থেকে আজ সকালেই আমাদের ল্যান্ড রোভার লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। আমরা যে পথে যাচ্ছিলাম সেখান থেকে ওই ঘাঁটি দেখা যাচ্ছিল। রাশিয়ান পতাকা উড়ছে একটা বাড়ির ওপর।

'ওই ঘাঁটির লেফটেন্যান্ট কি জানিয়েছে, আমরা মিত্রভাবাপন্ন?' ওরা আমাদের দেখামাত্রই আমরা বলে উঠলাম।

'না, এরা আলাদা ইউনিট। আমাদের নিজেদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই।' জবাব এলো।

আমরা দ্বিতীয় রাশিয়ান ঘাঁটির পাঁচশ থেকে আটশ মিটার দূরত্বে আসামাত্রই

BanglaBook.org

তারা অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। কিছু বুলেট আমাদের ল্যান্ড রোভারের আর্মারড অংশে লাগল। আমাদের হাসি পেল, একই সাথে 'হারামজাদা' বলে গালি দিতেও ইচ্ছা হলো! তারপরই একটা বিস্ফোরণ ঘটল আমাদের ঠিক পেছনে, এটা সাধারণ রাইফেলের চাইতে অনেক গুণ ভয়াবহ আরপিজি অথবা লাইট ক্যানন থেকে ছোঁড়া হয়েছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখা গেল। ভাকো, ডব্লিউটিএন-এর বিশালদেহী জর্জিয়ান ড্রাইভার দ্রুত চালাতে লাগল যতোক্ষণ না গাড়ি একটা পাহাড়ের আড়ালে এসে পড়ে। রাশিয়ানরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তবে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ, ওদের হাতের নিশানা খুবই বাজে!

আমরা আরেক রাস্তা দিয়ে চেষ্টা করলাম। এবার গ্রোজনির পূর্ব দিয়ে ঢোকার চেষ্টা। আকাশে হেলিকপ্টারের শব্দ। সবগুলো রকেট, ক্যানন মেশিনগানে সুসজ্জিত। অগভীর বন আর মাঠের ওপর খুব নিচু দিয়ে উড়ছিল। ভূমিতে গোলাগুলি পর্যবেক্ষণের জন্য তাদের এই মহড়া। হঠাৎ ওড়ার ক্রম ভেঙে একটা বিমান নতুন পথ ধরল। রাস্তার দিকে আসছে এবং রাস্তায় আমাদের ল্যান্ড রোভারই একমাত্র গাড়ি। বোঝাই যাচ্ছে, আমাদের এটা সিভিলিয়ান গাড়ি, তাছাড়া আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে চালাচ্ছিলাম। কিন্তু গ্রোজনিতে দুঃস্বপ্নের মতো চেচেন আক্রমণ তাদের বিবেক বুদ্ধি খেয়ে নিয়েছে। তাদের কাছে এখন কোনো যুদ্ধক্ষেত্র নেই, সবখানে শত্রু। আমরাও তাদের শত্রু।

'ফাস্ট!' আমরা চিৎকার করলাম। সেই সময় নোভি সেন্তোরেই-এর লাল ইটের ফার্ম হাউস দেখা যাচ্ছিল গ্রোজনি থেকে সাত কিলোমিটার দূরে। হেলিকপ্টার কাছে চলে এলো। যখন তখন গুলি করে বসতে পারে। আমরা চাইলে গ্রামে ঢুকতে পারি সেক্ষেত্রে গাড়ি এখানেই রেখে হেঁটে যেতে হবে। তবুও এখানে আশ্রয় নেয়া যাবে না, এই সমতল আড়ালবিহীন পরীখায়। এমনসময় মেশিনগানের ভয়াবহ বিস্ফোরণে আমাদের রাস্তা কেঁপে উঠল। এবার গাড়িতে আঘাত করা বুলেট রাইফেলের 'আলতো ছোঁয়া'র মতো ছিল না বরং হাই ক্যালিবারের মেশিনগানের তীব্র আঘাত আর্মার আর চাকা লাগানো গাড়ি নামক বাক্সটাকে আচ্ছামতো ঝাঁকুনি দিল। মুহূর্তেই গাড়িটা চলমান কফিনে পরিণত হয়েছে।

'দ্রুত! থামো! দ্রুত! থামো!' পরস্পরবিরোধী ধরনের চিৎকার শোনা গেল গাড়ির মধ্যে। শক্ত হয়ে গেল ভাকোর মুখের পেশি। ব্রেক থেকে পা তুলে দিয়ে জোরসে কফিনটাকে পেছনে এনে নোভি সেন্তোরেই-এর দিকে ছোটালো।

BanglaBook.org

থেমে কোনো লাভ হবে না। সরলতা আমাদের বাঁচাবে না। আশ্রয় প্রয়োজন। একশ মিটার দূরে দ্বিতীয় মেশিনগানের বিস্ফোরণে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। গ্রাম এখনও পাঁচশ মিটার দূরে। হেলিকপ্টারের আগে যাওয়া সম্ভব নয়। ছোট গাছের ঝোপ দেখে বললাম, 'থামো, থামো।' মাটিতে লুকানোর একটা সুযোগ পাওয়া গেল। ঝাঁকুনি দিয়ে থামতেই ল্যান্ড রোভারের দরজা খুলে বের হলাম আমরা ছয়জন সাংবাদিক এবং একজন চেচেন, নোভি সেন্তোরেইতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট ভাগ্যবান ছিলাম না আমরা।

একটা প্রবৃত্তি কাজ করল। দৃষ্টিসীমার বাইরে যেতে হবে। আমি একটা ছোট ঝোপের আড়ালে লুকালাম। পঁচিশ মিটার দূরের পাশেরটিতে অন্যরা। কিন্তু ভুলটা করলাম আমিই। মেশিনগানের বুলেট ছুঁড়তে লাগল রাশিয়ানরা। বুঝতে পারলাম, তারা আমাকে দেখতে পেয়েছে। আমি মাটির সাথে মিশে যেতে চেষ্টা করলাম। কাঁটাযুক্ত গাছের ভেতরে সেঁধিয়ে দিলাম নিজেকে। কপাল আর হাত থেকে রক্ত ঝরতে লাগল কাঁটার আঘাতে।

শরীরের শক্তি ধরে রাখতে চেষ্টা করছি, তখনই দ্বিতীয় বিস্ফোরণ হলো। খোদা জানে, কোথায়! আমি ধূলায় মুখ লুকালাম। কানে তালা লেগে গেছে, বারুদের গন্ধ নাকে ঢুকে জ্বলতে লাগল। একটা গাছকে টার্গেট করে হেলিকপ্টার উড়ে যেতেই আমি দৌড়ে পাশের ঝোপের দিকে গেলাম কোনো দিকে না তাকিয়ে। আঁধারের নিস্তব্ধতায় পাতার সাথে ঘষা খাওয়ার শব্দ তখন কানে বাজছিল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ওখানে অন্যরাও আছে। ঘুপচির মতো গর্ত; পরিত্যক্ত সৈন্যঘাঁটি ছিল হয়তো, এই মুহূর্তে জীবন বাঁচানোর একমাত্র উপাদান।

হেলিকপ্টারের পাইলট সহজে হাল ছেড়ে দিল না। আমরা ঝোপের কোথাও আছি এটা সে বুঝতে পেরেছিল। ল্যান্ড রোভারের দরজা খোলা পড়ে আছে এবং লুকানোর অন্য কোথাও জায়গা নাই। পঁচিশ মিনিট ধরে মেশিনগান চালালো। পাতা গাছের শাখা যতোটা কেটে পরিষ্কার করা যায়, করল। আমাদের মারতে যথেষ্ট চেষ্টা করল কিন্তু আশ্রয়টা বেশ ভালো ছিল।

কিছুক্ষণ পর হেলিকপ্টারের আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছিল না। তখনও আমরা ঘাপটি মেরে পড়ে থাকলাম; ওঠার সাহস পাচ্ছি না। হঠাৎ গ্রাম থেকে লোক এলো দু'জন। ক্রোকোডাইল চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল তারা। এরপর দৌড়ে ঝাড়ের ভেতর দিয়ে দিয়ে ফেরেশতার মতো গর্তের ওখানে

BanglaBook.org

আবির্ভূত হলো। আমাদের বলল তাদের পিছে পিছে যেতে।

সে যাত্রায় বেঁচে গেলাম আমরা। কারণ হেলিকপ্টার কিছুক্ষণের জন্য চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল ঝোপের ওপর। আমরা ততক্ষণে গ্রামের মধ্যে চলে গেছি।

একটা গরম ঝড়ো বাতাস বয়ে যাচ্ছে ধূলিময় রাস্তায়। বাড়ির মহিলা আমাদের রং চা খেতে দিল। আমরা বাড়ির উঠোনে টেবিল পেতে বসলাম। সাথে একজন বৃদ্ধ লোক, সোনালি রঙের নামাজের টুপি পরেছে ধবধবে সাদা চুলের ওপরে।

‘আমরা ভেবেছিলাম তোমরা মরে গেছো,’ একজন মহিলা বলল।

ক্রোকোডাইল পাইলট এতোক্ষণে বুঝতে পেরেছে, আমরা ওখান থেকে পালিয়েছি এবং সে হয়তো নোভি সেন্তোরেই-এর ওপর ঘুরতে ঘুরতে আমাদের খুঁজছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা খালি বাড়িতে রকেট পড়েছে। তবে এখানে ভয় নেই। চেচেনরা তাদের গান শুরু করল, যা সব সময় তারা করে।

চেরি ফুটেছে। তুষারে স্বর্গীয় ছোঁয়া।
তাদের আতিথেয়তার গর্ব রয়েছে,
যখন তাদের কাছে দেয়ার আর কিছুই নেই।
গ্রামজীবনের মোহনীয় ছন্দ যুদ্ধকে ভুলিয়ে দেয়।

উঠানে বাতাস বয়ে যায়। লোকটা চা খেল, কিছু বলল না। তরুণরা সকালের সূর্যের আলোয় বসে তাপ নিচ্ছে, পাইলটের ব্যর্থতা নিয়ে মজা করছে। একটা চিকন ন্যাড়া মাথার ছেলে তার কারাতে কৌশল দেখাচ্ছিল। তার বাবা সালামু, যে আমাদের উদ্ধার করেছিল, সে তার ছেলের কলা-কৌশল দেখে হাসছে।

হেলিকপ্টারের ভোঁ ভোঁ শব্দ চলতেই থাকল। লাল চুলের দাড়িওয়ালা সালামু জানাল, স্বেচ্ছাসেবকরা আগামী দিন গ্রোজনিতে যাবে জঙ্গল দিয়ে। তারা আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে।

BanglaBook.org

গ্রোজনি

বিশ মাস আগে যে প্রথম কমান্ডারকে গ্রোজনিতে দেখেছিলাম, সে আর কেউ নয়,খিজির খাচুকায়েভ। এই বিশালদেহী মানুষটার সাথে আমার সাক্ষাৎ

হয়েছিল কারপিনস্কি পর্বতে।

খিজিরের ইউনিট এখন গ্রোজনিতে ছড়িয়ে পড়েছে নবম সিটি হাসপাতাল থেকে রেড হেমাল ফ্যাক্টরির দুটো বিশাল এভিনিউ-এর মাঝামাঝি এলাকায়। খুবই ধার্মিক লোক খিজির। পশ্চিম চেচনিয়ান লোক। মাথায় সবুজ টুপি, ক্যামোফ্লাজ জ্যাকেটের নিচে ইসলামিক সবুজ কলারবিহীন টিশার্ট। বিশাল মাথায় রাশিয়ান স্পেশাল ফোর্সের হেলমেট। সেখান থেকে ঝুলে থাকে কালো লম্বা দাড়ি। মানুষটা দেখতে ভয়াবহ! আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে পরিকল্পনা কী? নাকি মার্চে তিন দিন ধরে যেটা চলছিল তেমন কিছু?

খিজির বলল, 'আমরা ঘরে ফিরে এসেছি। মার্চে দেখিয়ে দিয়েছি, কতো দ্রুত জিততে পারি। আর এখন দেখাব, কতো দ্রুত দখল নিতে পারি। আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করব। হাল ছাড়ছি না।'

পরদিন যেখানে গেরিলারা আমাদের ছেড়ে দিয়ে গেল, সেখান থেকে রেডিও লিবার্টির আন্দ্রেই বেবিস্কি এবং আমি হাঁটা শুরু করলাম। ক্লান্ত মানুষজন ট্রাক্টর, ট্রাক, কারে চেপে কাপড়ের বস্তা নিয়ে যেদিকে যাচ্ছিল আমরা তার উল্টো দিকে যেতে লাগলাম। শুধু আমরাই সে দিকে যাচ্ছিলাম।

একটা রাশিয়ান ফাঁড়ি পড়ল পথে। বালির বস্তা আর কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সাদা পতাকা উড়ছে। সৈন্যরা কোনো সিগনাল দিল না দেখে আমরা দ্রুত এগোতে এগোতে নো-ম্যান'স ল্যান্ডে চলে এলাম। এখানে সাধারণ মানুষ, যোদ্ধা, রাশিয়ান—কেউ নেই। পরিত্যক্ত বাড়ি খালি পড়ে আছে।

এরপর যেখানে এলাম সেখানে যুদ্ধ তার সর্বোচ্চ নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে। আমরা সরু গলি পথে হাঁটছিলাম। সরু জায়গা তুলনামূলক নিরাপদ কিন্তু আমরা একটা প্রশস্ত এভিনিউতে এসে পড়লাম। পোড়া এপিসি রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে, টেলিফোন লাইন ভেঙে পড়েছে। চূর্ণ কাচ, সুড়কি। এখানে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছে, এখন চারদিক শুনশান। শূন্যতা একটা ফাঁদ। যে কোনো বাড়ির কোনায় স্নাইপার লুকিয়ে থাকতে পারে, যে কোনো রাস্তায় বোমা হামলা হতে পারে, যে কোনো খালি জায়গা হতে পারে মৃত্যুকূপ।

বেবিস্কি এবং আমাকে এভিনিউ পার হতে হলো। আমরা তিন পর্যন্ত গুনলাম এরপর মাথা নিচু করে দৌড় দিলাম সবেগে। পাশের গলিতে বিস্ফোরণের মতো শব্দ হতেই আমরা থেমে গেলাম। কেউ একজন বাঁশি বাজাচ্ছে। আমরা ধীরে ধীরে চারপাশে তাকালাম, তখনই ছায়া থেকে একজন বেরিয়ে এলো। চোদ্দ

BanglaBook.org

বছর বয়সী এক ছেলে চার তলায় শটগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন শক্তপোক্ত যোদ্ধা কালাশনিকভ হাতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমাদেরকে হাতের ইশারায় ডাকল। আমরা সেখানে পৌঁছে গেছি, যেটাকে এখনই ‘মুক্ত গ্রোজনি’ বলে ডাকা শুরু করেছে বোয়েভিকরা।

জয়ের জন্য বোয়েভিকরা মরিয়া। অভিযানের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। কঠোর মানসিকতার কমান্ডাররা সেক্টরে সেক্টরে ভাগ হয়ে গেছে। শামিল বাসায়েভ কেন্দ্রে, যেখানে এক সময় জাভগায়েভ আর তার অফিসিয়াল ভবন ছিল। দুই থেকে তিন হাজার মূল যোদ্ধাদের সাথে অনেক স্বেচ্ছাসেবক অস্থায়ী সৈনিক যোগ দিচ্ছে। কয়েক মাসে এমনটা এর আগে কখনো ঘটেনি চেচনিয়ায়।

‘অনেকেই সারা বছর ধরে যুদ্ধ করে কিন্তু অনেকেই প্রথমবারের মতো অস্ত্র ধরেছে।’ একুশ বছর বয়সী মাদজায়েভ বলল, খানকালা রাশিয়ান ঘাঁটির কাছেই থাকে সে। ‘যখন রাশিয়ানরা গ্রোজনি দখল করেছিল, যোদ্ধারা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। অনেকেই তাদের অস্ত্র তুলে রেখেছিল। এখন আবার তারা অস্ত্র হাতে নিয়েছে।’

অনেকদিন পর এতো বোয়েভিকদের একসাথে দেখলাম। সেই ইউনিফর্ম, জিন্স, কালাশনিকভ, আরপিজি। এটা আমাকে যুদ্ধের শুরুর দিকের সেই উন্মত্ততাকে মনে করিয়ে দিল। পার্থক্য হলো, এবার তারা পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ যোদ্ধা। এখন ওরা জানে, রাশিয়ানদের কাছে কয়টা প্লেন, কয়টা ট্যাংক, কতো সৈন্য আছে। তারা জানে, কতোটা ঝুঁকি নিতে হবে। তবু তারা এগিয়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধের কৌশল দুটো মোটা দাগে বিভক্ত। হালকা অস্ত্র এবং সংখ্যায় কম থাকায় অনেকেই সম্মুখযুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারবে না। তারচেয়ে ওই দলকে শহর ঘেরাও করার কাজ দেয়া হচ্ছে যেন তারা রাশিয়ান সৈন্যদেরকে আটকে রাখতে পারে। প্রায় ১২০০০ রাশিয়ান সৈন্য এই শহরে আছে। এরা আটকে থেকে সাহায্যের খবর পাঠাবে। বাকি বোয়েভিকরা ভারি অস্ত্রসহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রোজনির দিকে সাপোর্ট দিতে আসা সৈন্যদের মোকাবেলা করবে।

এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে কাজ করল। চেচেনরা আক্রমণকারী থেকে ডিফেন্সিভ ভূমিকায় চলে গেল। রাশিয়ান সৈন্যরা গ্রোজনিকে দেড় বছর দখলে রেখেছে। সেই বাহিনিকে বাঁচাতে বাইরের সৈন্যরা আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। রাশিয়ার সৈন্যদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শহরে পাঠানো একটা দুঃসাধ্য কাজ। শহরে ওঁত পেতে আছে বোয়েভিকরা আরপিজি ও স্নাইপার

BanglaBook.org

নিয়ে। শেখ মানসুর এয়ারপোর্টের বড় ঘাঁটি, যেটাকে রাশিয়ানরা বলে সেভার্নি বা নর্দান এয়ারপোর্ট, সেখান থেকে এবং পূর্বে খানকালা থেকে পাঠানো এপিসি এবং ট্যাংকগুলো অতর্কিত হামলার মুখে পড়ে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

মাইক্রোরায়নের সিনেমা হল ছিল ওখানকার শেষ ভবন। সেখান থেকেই হামলা হয়েছে। বোয়েভিকরা একটা ট্যাংক আর এপিসি ধ্বংস করেছে। সৈন্যদের মৃতদেহগুলো এখন সূর্যতাপে পুড়ছে।

'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাদের বাসায় একটা কাটা হাত নিয়ে এক কুকুর ঢুকে পড়েছিল।' একজন মহিলা বলল।

এমনকি অফিসিয়ালিই বলা হলো, সাতাশটা এপিসি এবং ছয়টা হেলিকপ্টার শেষ দু'দিনে হারিয়েছে রাশিয়ানরা। চেচেনরা কয়েকটা এপিসি এবং দু'টো ট্যাংক দখল করেছে, সেগুলো তারা রাশিয়ানদের ওপরেই চালাবে।

প্রথম আক্রমণের পর রাশিয়ানরা লং রেঞ্জ আর্টিলারি, হেলিকপ্টার, এরোপ্লেনকে খবর দিল যেন তারা চেচেন প্রতিরোধকারীদের বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু ১৯৯৪-৯৫ সালের সেই পরিস্থিতি এখন কাজ করবে না। কারণ হাজার হাজার সৈন্য যেখানে আটকে পড়ে আছে, বোয়েভিকরা সেখানেই। চেচেনদের মারলে বিশাল রুশ সৈন্যবাহিনিও মরবে।

৬ আগস্ট রাশিয়ানদের অবস্থা সেই ক্যান্সার রোগীর মতো হলো—মাত্র গতকালই যার ক্যান্সার ধরা পড়েছে; এর আগে সে নিজেকে সুস্থ ভাবত। এখন সেই ক্যান্সার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। পুরো টিউমার উপড়ে ফেলতে চাইলে রোগী মারা যাবে।

নোভি সেন্তোরেই, গ্রোজনি

বোয়েভিকরা কীভাবে গ্রোজনি গেল? এতো এতো চেকপোস্ট, সিক্রেট সার্ভিস, হেলিকপ্টার পাশ কাটিয়ে কীভাবে ভেতরে ঢুকল? নোভি সেন্তোরেই-এর মানুষজন আমাদের বোঝাল, উত্তরটা সোজাসাপ্টা দেওয়া সম্ভব নয়।

গ্রামবাসীরা আমাদেরকে অস্ত্র ছাড়া সাধারণ মানুষের পোশাকে যেতে বলল যেহেতু গত দু'দিন যাবত দিন-রাত মাথার ওপর হেলিকপ্টার ঘুরছে। আমরা একজন-দু'জন করে সাধারণভাবে হেঁটে যেতে থাকলাম। দু'জন সাইড-কারবিশিষ্ট মোটর বাইকে করে আমাদের পেছনে আসতে লাগল। যাওয়ার সময় আমরা ওপরের দিকে তাকাইনি।

BanglaBook.org

গ্রাম শেষে বন-জঙ্গল, তারপর ছোট পথ। আমরা এক সারিতে একজনের পেছনে আরেকজন হাঁটতে লাগলাম। কেউ একজন সাইড-কারের তেরপল ধরে টান দিতেই একটা আরপিজি ও রাইফেল দেখা গেল। ছয় জন চেচেন দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। এদের পোশাক সাধারণ মানুষের মতোই কিন্তু সাথে অস্ত্র। এর মধ্যে দু'জন অস্থায়ী বোয়েভিক কিশোর।

মোটর বাইক ফিরে এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমরা তখন ঘন জঙ্গলে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছি। একটু জিরিয়ে নিয়ে আরো দ্রুত পা চালালাম। কোনো রাস্তা নেই, আমরা ধীরে ধীরে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করছিলাম। জঙ্গল প্রচুর গরম ও কাঁটায় ভর্তি। আমি গাইডদের বললাম, 'তোমরা কীভাবে এই পথ চেনো?'

আমাকে বলা হলো, তারা এখানে ছোটবেলায় খেলেছে, তারপর শিকার করেছে আর এখন যুদ্ধ করছে।

আমরা একসময় ঘন জঙ্গলে এসে পৌঁছুলাম। হেলিকপ্টার এখন আমাদেরকে দেখতে পাবে না। মাথার ওপর নরখাদকগুলো ঘুরছে, বোয়েভিকদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু খুঁজে পাবে না। সকল প্রযুক্তি পাতায় ঢাকা পড়ে গেছে। কতো সহজ মনে হচ্ছে!

আমরা জঙ্গলের মধ্যে একটা খোলা মাঠের সামনে এসে পৌঁছুলাম। এখন দৌড়ে পার হওয়ার সময়। দেখলাম, আশেপাশে হেলিকপ্টার আছে কিনা। নেই। আমরা নিচু হয়ে ঝেড়ে দৌড় দিলাম।

নিচু হয়ে দৌড়ানোর সময় হৃদস্পন্দনের জোরালো শব্দ কানে আসতে লাগল। এমনকি হেলিকপ্টার ওপরে আছে কিনা তাও বোঝা যায় না।

আমরা আরেকটা বড় মাঠে এসে পৌঁছুলাম। একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনছি, কিন্তু দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই। তবে আমরা অন্য পাশে যাওয়ার আগেই চলে আসতে পারে। মাঠের মাঝখানে আমরা একটা আশ্রয় পেয়ে থামলাম। কোমর অব্দি গাছটা ফুলে ফুলে ছাওয়া। আকাশ ঢেকে ফেলেছে। ঠিক তখনই হেলিকপ্টার এলো। আমরা ফুলের আড়ালে লুকালাম। অবিশ্বাস্য হলেও, পাইলট আমাদেরকে দেখতে পায়নি। হেলিকপ্টার দৃষ্টিসীমার বাইরে যেতেই আমরা ফের কষে দৌড় লাগিয়ে বাকি মাঠটা পার হলাম।

শেষ বিপদ—রাশিয়ানরা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছে! কিছুক্ষণ পর পর একটা করে সিংগেল রাইফেল শট করছে। আমাদের গাইড এটা আশা করেনি। নতুন রাশিয়ান পেট্রোল। যদি তারা চিৎকার এবং গুলি না করত আমরা সোজা

Banglabook.org

হেঁটে তাদের সামনে গিয়ে পড়তাম! পরিবর্তে আমরা সতর্ক হয়ে লম্বা বিকল্প পথ ধরলাম।

কয়েক ঘণ্টা পর একদল মেষশাবক, একটা রাখাল, কিছু ছাগল, পতিত জমি, রাস্তা ইত্যাদি চোখে পড়ল। এরপরই নজরে এল, গাড়ি রাস্তা, পশ্চিমভূমি।

'গ্রোজনিতে স্বাগতম,' একজন বলল।

গ্রোজনিতে নতুন যুদ্ধ দেখা গৌরবের। প্রতিটা দিন নতুন করে বাঁচার অনুভূতি দেয়। দেখছি চেচেনরা জিতছে; বহু পরাজয়, বহু কষ্টের পর। কিন্তু সাধারণ জনগণের জন্য কোনো গৌরব নেই সেখানে। বোয়েভিক এবং রাশিয়ান সৈন্যদের মাঝখানে পড়ে গুলি খেয়ে মরা আরেকটা অধ্যায় তাদের জন্যে।

সারা বছর বোয়েভিকরা সাধারণ জনগণের ছত্রছায়া, আশ্রয়ে ঘুরে বেড়ায়। এখন সেটা বৃহৎ পরিসরে ঘটছে। শহরে পঁচিশ হাজার মানুষ। সামাস্কি, গেকি বা অন্য যুদ্ধের মতো নয়। এখানে বোয়েভিকরা যতোদিন খুশি থাকতে পারে। এটা তাদের নিজস্ব শহর। নিজের শহরের জন্য যুদ্ধ করছে। বিদ্রোহী জনগণ তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে। বোয়েভিকরা দাবি করে, তারা জনগণকে রক্ষা করছে। কিন্তু কখনো কখনো উল্টোটাই সত্য।

মনোবলহীন রাশিয়ান সৈন্যরা একে অন্যকে দোষ দিতে শুরু করল। তারা মাতাল থাকে, র‍্যাম্বোর রূপকথা বিশ্বাস করে। হাজার হাজার অস্থায়ী সৈন্যদের যুদ্ধে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। তারা ভীত হয়ে পরাজয় বরণ করছে। এবং এর প্রত্যুত্তর দিচ্ছে জঘন্যভাবে; সাধারণ জনগণকে গুলি করতে শুরু করেছে। শরণার্থীদেরকেও গুলি করল তারা। ফোর্থ সিটি হসপিটালে রকেট হামলা করল, রাস্তায় বোমা হামলা হলো। সাধারণ জনগণকে জিম্মি করা শুরু করল।

শহরের কেন্দ্রের দিকে রাস্তা-ঘাট জনশূন্য হয়ে গেল। অথচ এখানেই বেশি মানুষের বাস। সবাই সেলারে আশ্রয় নিয়েছে। গুজব ছড়িয়েছে, মূল বাজারে আক্রমণ হবে। এই ভয়ে অনেকে বেরিয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে ৬ আগস্ট বোয়েভিকরা কেন্দ্র দখল করে নিল। সিভিলিয়ানদের পালানো কঠিন হলো, শুধু যারা শহরের প্রান্তে থাকে তারা নিরাপদে পালাতে পারল।

যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহে নাজুক এলাকার জনগণ সেলারে লুকাত, যদি তাদের সেলার থাকত। কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই, পানি নেই, খাবার নেই। পানি বাইরের কল থেকে আনা বিপদজনক; বোমা বা স্নাইপার গুলির আঘাতে মারা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

BanglaBook.org

সেন্টারের একজন অ্যাম্বুলেন্স কর্মী রুসলান জানাল, কীভাবে সে সাতজন প্রসূতি মাকে এই যুদ্ধের সময় বাঁচিয়েছে। তারা একটা মাতৃসদনে থাকত। সাথে এক অথবা দুই দিনের বাচ্চা। তখন যুদ্ধ শুরু হলো। বের হলেই রুসলান দেখত রাশিয়ান সৈন্য। ওদিকে খাদ্য নেই, পানি নেই, মায়ের বুকের দুধও শুকিয়ে গেছে। চারদিকে বুলেট ছুটছে, শেল ফাটছে, এর মধ্যে তারা রাস্তায় বের হলো একটা নিরাপদ জায়গার জন্য।

নাইনথ সিটি হসপিটাল, যেখানে আমি আর বেবিস্কি খিজিরকে খুঁজে পেয়েছিলাম, সেখানে নিকোলাইয়ের সাথে কথা বললাম আমি। এথনিক রাশিয়ান সে। ভয়ে অ্যাপার্টমেন্টের দ্বিতীয় তলায় বাস করছে।

'আমরা এখানে মরতে বসেছি। খাদ্য নেই। শুধু এই এক বস্তা ময়দা আছে আমাদের সবার জন্য,' সে বলল।

নিকোলাইয়ের অ্যাপার্টমেন্টের আরো একশ জনের মতো সেলারে চলে গেছে। মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে সেখানে থাকছে। আমি একমাত্র বাইরের লোক। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তারা এতো নার্ভাস যে, সেলারে যেতেও ভয় লাগে তাদের। আমি যখন বললাম, আমার সাথে সকালে হাঁটতে চাইলে আমি ব্যবস্থা করতে পারি, নিকোলাই মানা করল। সে তার ভাগ্যকে মৃত্যুর কাছে সঁপে দিয়েছে।

চেচেনরা একটা ট্যাঙ্ক আর মর্টার গান দখল করল সে রাতে। আমি তখন দ্বিতীয়তলার মেঝেতে নির্ঘুম শুয়ে এলোপাতাড়ি ভাবছিলাম। হঠাৎ শেল নিক্ষেপের বিকট আওয়াজ পেলাম। চার-পাঁচ সেকেন্ড পর কয়েক কিলোমিটার পূর্ব থেকে বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল। ওখানে সম্ভবত রাশিয়ানরা খানকালা এবং মিনুতকার মধ্যে ভেঙে পড়া সংযোগ পুনরায় স্থাপন করতে চাইছিল।

রাশিয়ানরাও জবাব দিল। চার দফায় এ গোলাগুলি চলল। প্রথমে একবার, তারপর আরেকবার—পরেরবার একটু দুর্বল। শুরু হয় শেলের প্রচণ্ড শব্দে। যখন বোমা নিরাপদ জায়গায় পড়ে, তখনও শব্দে আত্মা কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝে শার্পনেল উঠোনে পড়ার অস্বস্তিকর শব্দে গায়ে কাঁটা দেয়।

রাশিয়ানরা ফ্লেয়ার গানের সাহায্যে গোলাগুলি করছে। প্রথমে বুম করে আওয়াজ হয় কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর বিস্ফোরণের পরিবর্তে উজ্জ্বল হলুদ ছটা চারদিক আলোকিত করে ফেলে। আলো খুব শক্তিশালী হলে বুঝতে হবে আশেপাশের কোনো বাড়িকে টার্গেট করেছে তারা। নিজের মাথা বাঁচিয়ে যদি

Banglabook.org

সেটা প্রতিবেশীর বাসায় গিয়ে পড়ে তাহলে ধরে নিতে হবে শেলের টার্গেট ছিল সে-ই। প্রতিবেশীর গায়ে পড়লে আপনি বেঁচে যাবেন—এই ভাবনা আপনাকে খানিকটা লজ্জিত করলেও স্বস্তি ঠিকই দেবে।

এই ভবনে কোনো সেলার নেই তাই আমি সিগারেট খেয়ে ভয় কাটাতাম এবং সকালের অপেক্ষা করতাম। গড়পড়তা সব অ্যাপার্টমেন্টই সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আমাদেরটা ব্যতিক্রম। ডিরেক্ট হিট না হলে বেঁচে থাকা সম্ভব।

যুদ্ধের কিছুদিন পর মানুষ ভয়ে অতিষ্ঠ হয়ে সাহসী হতে শুরু করল। আক্রমণকে স্বাভাবিকভাবে নিয়ে বাড়ির বাইরে মুক্ত বাতাসে শুয়ে থাকতে শুরু করল। কুকুরগুলো বাইরে খেলত, তরুণীরা যোদ্ধাদের সাথে দিনের আলোয় বসে গল্প করত, বৃদ্ধরাও যোগ দিত তাতে।

একদিন আমি গানের ছন্দ শুনতে পেয়ে জানালা দিয়ে মাথা বাইরে গলিয়ে দেখি চার তরুণী গান গাইছে, হাতে তালি দিচ্ছে আর একজন মাঝখানে নাচছে। তাদের ঐতিহ্যবাহী লেজঘিংকা নাচ। এই নাচে রুমাল নাড়াতে হয় কিন্তু এখন রুমালের পরিবর্তে তার হাতে দুই টুকরা ছেঁড়া কাগজ। 'আমরা যদি মরি তাহলে নাচতে নাচতে মরব।' নৃত্যরত তরুণী চিৎকার করে বলে মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগল।

ইলেকট্রিসিটি নেই। মানুষ গাড়ির ব্যাটারি খুলে টেলিভিশন চালায়, রেডিওতে খবর শোনে। আমাদের স্যাটেলাইট টেলিফোনেও ব্যাটারি লাগে। যখন ব্যাটারি শেষ হয় তখন আমরা পাশের মিউনিসিপ্যাল গ্যারেজে যাই, পার্ক করা ট্রাকের ব্যাটারি খুলে নিয়ে আসি। আমরাও লুটেরা হয়ে গেছি!

এরপর একদিন কোনো সতর্কবাণী, পূর্বাভাস ছাড়াই হেলিকপ্টার ফিরে এলো। স্বাভাবিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটল। জনশূন্য শত্রুভাবাপন্ন থমথমে পরিবেশ। কুকুরগুলো লেজ নাড়াতে নাড়াতে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে ঢুকল।

রেডক্রস বলল, দেড় হাজার সাধারণ মানুষ এই শহরে মারা গেছে। কে জানে, আরো কতোজন গণনার বাইরে রয়েছে। যুদ্ধের সময় আইসিআরসি অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার ও স্থানীয় চেচেনরা নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে রেখে হতাহত উদ্ধার করছে। তারা দুর্বল মিনি ভ্যান চালাত; কোনোটা শার্পনেলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ, কোনোটার দরজা নেই আর কোনোটা চলা শুরু করলেই লাফাতে থাকে। আহতদের জন্য একটাই হাসপাতাল। শুধু প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হতো সেখানে। ঔষধ নেই, বিদ্যুৎ নেই। তারপর গোলাগুলির মধ্যে পড়ে

BanglaBook.org

সেটাও পরিত্যক্ত হলো এক সময়।

আইসিআরসি কম্পাউন্ডে পৌঁছানোর জন্য আমরা নো-ম্যান'স ল্যান্ডে লাডা চালিয়ে জনহীন এলাকা দিয়ে গেলাম। গুলির শব্দ শুনলেই কড়া ব্রেক। সব সময় একটা চোখ থাকত আকাশে, হেলিকপ্টার এলো কিনা! সব সময় প্রার্থনা করতাম যেন কোনো রাশিয়ান ইউনিট এপিসির সামনে না পড়তে হয়।

নো-ম্যান'স ল্যান্ডকে বোঝা মুশকিল। যেই আমরা কম্পাউন্ডে পৌঁছুলাম, একটা গোলা সীমানার বাইরে একটা গাছ উপড়ে ফেলল। সাথে সাথে নার্স, ড্রাইভার, জনগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল যেভাবে বাতাসে পাতা বিক্ষিপ্ত হয়।

আইসিআরসি'র পরিচালক ফেরি এলান আমাকে কফি আর বিস্কুট অফার করলেন, যার স্বপ্ন আমি গত এক সপ্তাহ যাবত দেখছি। যদিও এই এক সপ্তাহ এক মাসের সমান!

'দুটো আর্টিলারি শেল কম্পাউন্ডে পড়েছিল। মানুষ ভয় পেলেও কোনো হতাহত হয়নি। রাস্তায় স্নাইপারদের গুলিতে চার জন আহত হয়েছে,' তিনি বললেন, 'কম্পাউন্ড প্রায় ব্লক, রাশিয়ানরা সাহায্যকারী দলকে পনেরো কিলোমিটার দূরে আটকে দিয়েছে। আমি বলেছি, আপনারা দু'ঘণ্টার জন্যে দলটাকে সাপ্লাই নিয়ে আসতে দিন তারপর নিজেরা নিজেরা খুনাখুনি করবেন!'

রাশিয়ান মিলিটারি তার কথার জবাব পর্যন্ত দেয়নি এবং চেচেনদের সাথে তার যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন।

গ্রোজনি

হাজার হাজার শরণার্থী গ্রোজনি ছেড়ে রওনা দিয়েছে। লরি, ট্রাক, কার-এর পাশাপাশি পায়ে হেঁটেও প্রচুর মানুষ যাচ্ছে। যানবাহনে সাদা পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো ভর্তি বাচ্চা, কার্পেট, কাপড়ের ব্যাগ। একটা কালো ভলগা গাড়ির ছাদের সাথে একটা মৃতদেহ বাঁধা।

স্টারায়া সুনঝার পূর্বের এলাকায় কোনো যুদ্ধ নেই এবং রাশিয়ানদের দখলেই আছে সেটুকু। কিন্তু শরণার্থীদেরকে দেশের মধ্যেও কোথাও যেতে না দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ রয়েছে রাস্তা, স্থানীয় বাড়িগুলো এবং গাড়ির সারিতে। শহরের কেন্দ্রে অনবরত বজ্রপাতের মতো মেশিনগান ফায়ার আর বিস্ফোরণ হচ্ছে।

অবশেষে এপিসি দ্বারা ব্লক করা রাস্তা খুলে সৈন্যবাহিনি ঘোষণা দিল,

BanglaBook.org

নারী-শিশুরা শহরের বাইরে যেতে পারবে কিন্তু পায়ে হেঁটে এবং কোনো পুরুষ মানুষ সাথে নিতে পারবে না। এগার বছরের ওপরের ছেলেরা বাইরে যেতে পারবে না বোয়েভিক সন্দেহে। অল্প কিছু নারীই এই প্রস্তাব গ্রহণ করল। কারণ প্রচণ্ড গরম, আর সবচেয়ে কাছের গ্রামও সাত কিলোমিটার দূরে।

জারিমা সুলতানোভ তার স্বামীর জন্য বিশেষ বিবেচনার অনুরোধ করল সৈন্যদের কাছে। জানাল, তার স্বামী বোয়েভিক নয়। বয়স চুরাশি, অচল; চুপচাপ বসে থাকবে লাডার প্যাসেঞ্জার সিটে। তার প্রস্তাব মানা হলো না। আদেশ আদেশই। এগারো বছরের ওপরে কোনো ছেলেই না।

জারিমা কাঁদতে শুরু করল। সেনাবাহিনির আশা বাদ দিয়ে সে এবার কয়েকজন চেচেন যুবকের সাথে কথা বলে। তারা রাজি হয়। স্ট্রেচারে করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চেক পয়েন্ট ঘুরে রাশিয়ান লাইন দিয়ে নিয়ে যাবে।

বৃদ্ধ কিছু বোঝে কিনা বলা মুশকিল। স্থবির, শূন্যে চেয়ে আছে শুধু।

জারিমা নিচু হয়ে বিদায় দেয় স্বামীকে। মুখে হাত বুলিয়ে দেয়। বৃদ্ধের মাথা নড়ে না। পুরো শরীর অনড় কিন্তু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। না, সে বোঝে।

***

নাইনথ সিটি হসপিটাল গ্রোজনির অন্যতম বড় হাসপাতাল। বোয়েভিক এবং রাশিয়ান—দুই দলই রোগীদের জন্য আতঙ্কের ব্যাপার। যুদ্ধের প্রথম দিনে খিজিরের দলবল হাসপাতালের পাশে অবস্থান নেয়। তাদের আশা ছিল, যুদ্ধে গেরিলাদের কেউ আহত হলে এখানে সেবা পাবে। এসব দেখে হাসপাতালের কর্মীরা তৎক্ষণাৎ তাদের গুরুতর রোগীদের সরিয়ে নেয় এবং নিজেরাও সরে পড়ে। তারা এর আগেও এসব দেখেছে।

এভাবে ডক্টর সাইপুদিন মামায়েভকে তৃতীয়বারের মতো তার কর্মস্থল ত্যাগ করতে হলো।

‘প্রথমবার, ১৯৯৪ থেকে প্রধান রিপাবলিকান হাসপাতালে কাজ করতাম। সেটা বোমায় ধসে পড়ে। তখন কয়েক মাস নিজ বাড়িতে থেকে সেবা দিয়েছি। তারপর নাইনথ সিটি হসপিটালে। এখন বোয়েভিকরা এখানে যুদ্ধ শুরু করেছে। এটা মোটেই ঠিক নয়। অবশ্য রাশিয়ানরা যখন এমন আচরণ করে তখন কী-ই-বা আর করার থাকে? রাশিয়ানরা ডেমোক্রেসি বলতে এ ছাড়া কিছুই বোঝে না।’

BanglaBook.org

হাসপাতালের স্টাফরা স্টারায়া সুনঝা'র উদ্দেশ্যে বাসের বহরে সাদা পতাকা উড়িয়ে এগোবার সময় রাশিয়ান হেলিকপ্টার হামলা চালায়। সবাই ফিরে আসে। দ্বিতীয়বার তারা হেঁটে রওনা দেয় সাদা এপ্রোন পরে শুভ্র পতাকা দোলাতে দোলাতে। কিন্তু এবার মর্টার হামলার শিকার হয়ে তিন জন ডাক্তার শার্পনেলের আঘাতে আহত হয়। এ পর্যায়ে রোগীদের স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চরমভাবে ব্যহত হয়। সক্ষম ব্যক্তিরা রোগীদের রেখেই পালিয়ে যায়। শুধু অল্প ক'জন মেডিকেল স্টাফ তাদেরকে এই অবস্থায়ও ছেড়ে যায়নি।

৯ আগস্ট রাশিয়ান সৈন্যরা হাসপাতালে প্রবেশ করে। আশেপাশে থাকা বোয়েভিকদের সাথে তীব্র সংঘর্ষ হয়, তারপর তারা চলে যায়। পরদিন পঁচিশ জন সৈন্য হাসপাতালের মধ্যে আক্রমণ চালিয়ে আহত গেরিলা সৈন্য খুঁজতে থাকে।

মেমোরিয়াল মানবাধিকার ব্যুরোর তথ্যমতে, রাশিয়ানরা খোঁজাখুঁজি শেষে হাসপাতাল ত্যাগ করার মুহূর্তে এক অফিসার স্নাইপারের গুলিতে মারাত্মক আহত হলে পুরো ইউনিট হাসপাতালের ভেতর আশ্রয় নেয়। আরেক সূত্র মতে, রাশিয়ানদের গাড়ির বহর গেরিলা আক্রমণের শিকার হলে তারা হাসপাতালে ঢুকে পড়ে।

কারণ যাই-ই হোক না কেন, রাশিয়ানরা হাসপাতালের প্রত্যেকটা জানালায় অবস্থান নিতে না নিতেই খিজিরের লোক পুরো হাসপাতাল ঘিরে ফেলে। মেডিকেল স্টাফদের মতে, রাশিয়ানরা রেডিওতে তাদের ঘাঁটিতে খবর পাঠালে জবাবে শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

এই কৌশল শামিল বাসায়েভ এবং সালমান রাদুয়েভের; কখনো শত্রুপক্ষের এলাকায় আহত সহযোদ্ধা নিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেলে হাসপাতালে ঢুকে পড়বে, হাসপাতালের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সমঝোতার রাস্তা বের করবে। সেই কৌশল মেনে 'শৃঙ্খলা রক্ষাকারী' বাহিনি এখন পরিণত হয়েছে দস্যুতে।

চরিত্রের এই পালাবদল চেচেনদের ফেলে দিয়েছে বিভ্রান্তিতে। ওরা কি এখন রাশিয়ানদের ধিক্কার জানাবে নাকি নিজেদের কৌশলের গুণগান করবে?!

'দেখলে! রাশিয়ানরা এখন রোগীদের জিম্মি করেছে। দ্বিতীয় শামিল বাসায়েভ হতে চায় ওদের অফিসার, কিন্তু কখনোই পারবে না,' একজন চেচেন যোদ্ধা বলল। সে সিঁড়ির গোড়ায় অবস্থান নিয়েছে, সাথে আধ ডজন যোদ্ধা।

BanglaBook.org

খিজির বলল, 'আমরা আদেশের জন্য অপেক্ষা করছি। আমাদের বলা হয়েছে, হাসপাতালে আক্রমণ না করতে। রোগীদের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু যদি আদেশ পাই, তাহলে দেখিয়ে দেবো কীভাবে বিল্ডিং কব্জা করতে হয়। পনেরো মিনিটেই হাসপাতাল খালি করে ফেলব।'

তবে ১১ তারিখে রাশিয়ানরা দ্বিতীয় শামিল বাসায়েভই হয়ে গিয়েছিল। প্রায় একশ জন রোগী এবং মেডিকেল স্টাফকে মানববর্ম বানিয়ে ক্রোধান্বিত চেচেনদের পাশ দিয়ে তারা বের হয়ে ঘাঁটিতে চলে গেল। যদিও প্রতিশ্রুতি মতো জিম্মিদের ঠিকই ছেড়ে দিয়েছে। অনেকেই হাসপাতালে হেঁটে ফেরত এসেছে। কিন্তু তারা ফেরত আসামাত্রই রাশিয়ানরা মর্টার বোমা হামলা শুরু করল।

শেল নিক্ষেপের কিছুক্ষণ আগে খিজির আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসে। চারপাশে কঠিন নীরবতা। শুধু একটু পরপর মর্টারের নিয়মিত বজ্রনিনাদে ভেঙে খানখান হয়ে যায় নীরবতা। উষ্ণ বিকেলের বাতাস ভারি হয়ে আছে। আমি সিগারেট খাচ্ছিলাম মেঝেতে শুয়ে। খিজির তার স্পেশাল ফোর্সের হেলমেট ঠিক করে হেলান দিয়ে বসে বিড়বিড় করে বলে, 'হারামজাদাগুলো এমন করবে জানতাম। যাইহোক, আসল কথা, বেঁচে থাকতে হবে যেন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারি।'

বাইরে একজন নার্স, যে জিম্মি হয়ে পুরো ঘটনার সাক্ষী ছিল, সে ফিরে এসে মর্টারের আঘাতে মারা গেছে। এছাড়াও দু'জন ডাক্তার, দু'জন নার্স, একজন রোগী আহত।

শেষ বাইশজন রোগীকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে এই ঘটনার পর। বিশাল হাসপাতাল ভবনটা যুদ্ধের বাকি দিনগুলোতে শূন্যই পড়ে ছিল। রোগীদের সবারই অবস্থা ছিল খুব আশঙ্কাজনক। হয়তো মারাত্মকভাবে আহত বা নড়তে অক্ষম। তাদেরকে হাসপাতালের পাশে এক দোকানের সেলারে নেয়া হয়েছে। তেলের কুপি টিমটিম করে স্যাঁতসেঁতে দেয়ালে জ্বলছে। মেঝেটা অবর্ণনীয় আবর্জনা আর কাদায় মাখামাখি। রোগীরা তাদের নিজেদের রক্তের মাঝে শুয়ে আছে। কিশমিশের মতো কুঞ্চিত চামড়ার এক বৃদ্ধ দম্পতি ভাবল, আমি কোনো সাহায্যকর্মী।

'আমাদেরকে আপনার লিস্টে রাখুন,' বলল বৃদ্ধা মহিলা, 'আমাকে আর আমার স্বামীকে দেখুন।'

আমি পারলাম না।

BanglaBook.org

এই অসহায় মানুষগুলোকে দেখার জন্য নাতাশা পাপোভা নামের কেবল একজন প্রশিক্ষিত প্যারামেডিক রয়েছে। ছাব্বিশ বছর বয়সী নারী; অদ্ভুত এবং শান্ত। সম্ভবত শোকাহত। স্তব্ধ, হতবিহ্বল। রাশিয়া থেকে চেচনিয়াতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এসেছে কয়েক মাস আগে। হয়তো কখনো কল্পনাও করেনি পরিস্থিতি এমন হবে।

'গতকাল ওরা শেল নিক্ষেপ করায় রোগীদের হাসপাতাল থেকে এখানে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে রাতে। বাইরে যাওয়ার উপায় নেই, খাদ্য পানীয় নেই, একটু কোকোয়া আছে শুধু। ব্যান্ডেজ খুবই কম আছে কিন্তু ইনফেকশন প্রতিরোধী ওষুধ একেবারেই নেই, এমনকি এনেস্থেসিয়াও না।'

গ্রোজনি

আন্দ্রেই বেবিস্কি আর আমি খুব দ্রুত হাসপাতাল এবং বোয়েভিকদের পেছনে রেখে দৌড়ে প্রাঙ্গনটা পেরিয়ে এলাম। হঠাৎ ১৫০ মিটার সামনের প্রধান সড়কে তিন-চারটা রাশিয়ান এপিসি এসে পড়ল। দৌড় থামিয়ে বসে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে। কয়েক সেকেন্ড পর এপিসিগুলো গাছের আড়ালে চলে গেলে আমি মুহূর্তের জন্য স্বস্তি পেলাম। তারপরই শরীরে এড্রেনালিনের ধারা বয়ে গেল যখন দেখলাম, সেগুলো এগিয়ে আসছে আমাদেরই রাস্তা লক্ষ্য করে। ওরা আক্রমণ করতে আসছে।

'এপিসি! এপিসি!' বেবিস্কি ও আমি চিৎকার শুরু করলাম। আমাদের ভাগ্যই বলতে হবে, আমরাই প্রথমে দেখতে পেয়েছি এপিসিগুলোকে—বোয়েভিকরা চারপাশে কোথাও লুকিয়ে ছিল। বোয়েভিকদের সতর্ক করতে গিয়ে কেমন অদ্ভুত অনুভূতি হলো। আমিও যুদ্ধে জড়িয়ে গেছি। অবশ্য সতর্ক না করলে আকস্মিক আক্রমণে ওদের সাথে আমরাও বেঘোরে মারা পড়তাম।

'কোথায়?' একজন চেচেন জিজ্ঞাসা করল।

'মেইন রাস্তা দিয়ে আমাদের দিকে আসছে,' উত্তর দিলাম।

শীঘ্রই এপিসি'র ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেলাম। কাছে চলে আসছে, আরো কাছে। চেচেনরা হামাগুড়ি দিয়ে অবস্থান নিল।

'তৈরি হও!' চেচেন কমান্ডার চিৎকার করে আদেশ দিতেই পুরো দল এক সারিতে দৃষ্টিসীমায় এলো পঁচিশ মিটার দূরে।

একজন যোদ্ধা ঘাড়ে আরপিজি নিয়ে চলে গেল বিল্ডিং-এর কোণায়। ডান

BanglaBook.org

হাঁটু গেড়ে বসেই ফায়ার করল। বিস্ফোরণে উড়ে গেল প্রথমে এপিসি। হলুদ অগ্নিশিখার কুণ্ডলিতে পরিণত হলো।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল রাইফেল এবং মেশিনগান। অতর্কিত আক্রমণের পর রাশিয়ানরা জবাব দিতে শুরু করেছে। তারপরেই দ্বিতীয় আরপিজির বিস্ফোরণ।

খালি জায়গাটা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আমি আর বেবিস্কি একটা পরিত্যক্ত বাড়িমুখো হলাম। ভেতরে যাওয়ার মিনিটখানেকের মধ্যে চারজন রাশিয়ান, যাদের এপিসি গুঁড়িয়ে গেছে, এসে আশ্রয় নিল আমাদের পাশের অ্যাপার্টমেন্টে। চেচেনরা পেছনেই ছিল কিন্তু ততোক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। রাশিয়ানরা অ্যাপার্টমেন্টের লোককে জিম্মি করে ফেলেছে। আবার মানুষ ঢাল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, টিকে থাকার শেষ চেষ্টা।

'গুলি করবে না, নইলে আমি এদেরকে মেরে ফেলব,' একজন সৈন্য ভবন থেকে চিৎকার করল।

'ইনচার্জ কে তোমাদের? অস্ত্র ফেলে বাইরে এসে কথা বলো,' পাতলা গড়নের টাক মাথা চেচেন কমান্ডার চিৎকার করে জানাল। উঠানের এক কোণায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ ভেসে এলো, 'আর একটা গুলি চললে বিল্ডিং উড়িয়ে দেবো।'

এমন সময় অপ্রত্যাশিত এবং নায়কোচিতভাবে চেচেন কমান্ডার রাইফেল ফেলে নিরস্ত্র হয়ে উঠোন পেরিয়ে সোজা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল।

এক মিনিট পর কমান্ডার বাইরে বেরিয়ে এলো। পেছনে চারজন আতঙ্কিত রাশিয়ান সৈন্যের লাইন, একজন আহত। রাশিয়ানদের কাছে পথ ছিল দুটো—আত্মসমর্পণ অথবা লড়াই করে মৃত্যু। কোন পথে হাঁটবে তা ভাবতে বেশি সময় লাগেনি। এটা একটা বিরল ঘটনা চেচনিয়ায়। হত্যাকাণ্ড এড়ানো গেছে, বেঁচে গেছে নিষ্পাপরা।

পরবর্তীতে আত্মগ্লানিতে ভোগা স্বাভাবিক ছিল। রাশিয়ানদের উচিত হয়নি সাধারণ লোকদের জিম্মি করা। আর আমাদের, মানে সাংবাদিকদের ভূমিকা কম হলেও যুদ্ধে জড়ানো উচিত হয়নি। কিন্তু ওই কঠিন মুহূর্তগুলোর কথা চিন্তা করলে মনে হয়, কারোই কোনো দোষ ছিল না। আত্মগ্লানি, অপরাধবোধ—সব কিছুর ওপর তখন বেঁচে থাকাটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

আক্রমণের এক সপ্তাহ'র মধ্যেই, ১১ থেকে ১৩ আগস্টের মাঝে

BanglaBook.org

বোয়েভিকরা সকল রাজনৈতিক, সরকারি, গুরুত্বপূর্ণ ভবন দখল করে নেয় অথবা পুড়িয়ে দেয়। ডকু জাভগায়েভের প্রশাসনিক ভবন পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ইস্পাত গলে গেছে কোথাও কোথাও। রাস্তায় রাস্তায় পোড়া এপিসি আর ট্যাঙ্ক পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে।

শহরের ভেতর রাশিয়ান সৈন্যদের ঘিরে রাখা হয়েছে, উপরন্তু বাইরে থেকে সৈন্যদের ঢুকতে বাধা দেয়া হচ্ছে। ফলে শহরের সবখানে চেচেন যোদ্ধাদের মুক্ত পদচারণা। আক্রান্ত রাশিয়ান ঘাঁটির বেহাল দশা। প্রচুর সৈন্য আহত, খাবার ও গোলাবারুদের তীব্র অভাব। অতিরিক্ত রাশিয়ান সৈন্যরা বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে পারছে না। এমনকি সেভার্নি এয়ারপোর্ট এবং খানকালার দুটো রুশ ঘাঁটিতে আক্রমণ করা হয়েছে। জাভগায়েভ খানকালাতে আশ্রয় নিয়েছে। তার শেষ প্রতিনিধি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ক্ষমতাহীন অবস্থায় গ্রোজনির স্ট্যারায়া সুনঝায় অবস্থান করছে।

অফিসিয়াল সূত্র বলছে, ৪০০ রাশিয়ান সৈন্য মারা গেছে, ১২০০ আহত এবং ১৩০ জন নিখোঁজ; হয় মারা গেছে অথবা বন্দি হয়েছে। শামিল বাসায়েভ নিজেও পায়ে গুলি খেয়ে আহত। তার মতে ২০০০ রাশিয়ান সেনা মারা গেছে। চেচেনদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ গেরিলার সংখ্যা হিসেবে বেশি কিন্তু কৌশলগত কারণে তা রাশিয়ানদের ক্ষতির ধারে কাছেও নয়।

বাসায়েভ সাংবাদিকদের বলেছে, ‘রাশিয়ানরা চাইলে গ্রোজনি পুনঃদখল করতে পারবে তবে তাতে ছয় মাস সময় লাগবে এবং শহরটার আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। আর যদি দশ পনেরো হাজার সৈন্যকে মরার জন্যে পাঠিয়ে দেয় তাহলে এক মাসেও পারবে।’ অত্যুক্তি মনে হলেও বাসায়েভ একদম সঠিক। গ্রোজনির অধিকাংশ চেচেনদের দখলে। শুধু তাই নয়, তারা রাশিয়ানদের ফাঁদে ফেলে বন্দিও করেছে। এখন দান উল্টাতে চাইলে বিশাল মূল্য চোকাতে হবে। চেকমেট।

১১ আগস্ট রাতে আলেকজান্ডার লেবেদ গোপনে চেচনিয়ায় প্রবেশ করল। লেবেদ ক্রেমলিন নিরাপত্তা কাউন্সিলের সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন চেচেন যুদ্ধের সকল দায়-দায়িত্ব তাকেই দিয়েছেন। তার উদ্দেশ্য, আসলান মাসখাদোভের সাথে সাক্ষাৎ করা। রাতের আঁধারে দাগেস্তান থেকে গাড়ি চালিয়ে লেবেদ বডিগার্ড আর এপিসি ছাড়াই চলে এলো। গ্রোজনির দক্ষিণে সমৃদ্ধশালী গ্রাম নোভি এটাগিতে এক মিলিয়নিয়ারের বাসায় সাক্ষাতের

BanglaBook.org

স্থান ঠিক করা হয়েছে। সেখানেই অপেক্ষা করছিল আসলান মাসখাদোভ। ভোর চারটায় তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তির খসড়া তৈরি করল এবং লেবেদ দ্রুত দাগেস্তানে ফিরে গেল।

১৩ তারিখ মাসখাদোভ এবং জেনারেল কনস্ট্যান্টিন পুলিকোভস্কি নোভি এটাগির বাইরে সাক্ষাৎ করল। পুলিকোভস্কি জেনারেল তিখোমিরভের অবর্তমানে সমগ্র রাশিয়ান বাহিনির অস্থায়ী কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। ১৭ তারিখ আবার তাদের সাক্ষাৎ হয়। পরিবেশ ছিল বেশ উদ্বেগজনক। মাসখাদোভ দলবলসহ জিপ এবং কনভয়ের সারি নিয়ে আসে এবং কনস্ট্যান্টিন পুলিকোভস্কি আসে হেলিকপ্টার গানশিপ নিয়ে। রাস্তার পাশে টাঙানো একটা খাকিরঙা তাঁবুর ভেতর ফোল্ডিং টেবিলে বসল দু'জন জেনারেল। চারিদিকে ঘুরছিল রাশিয়ান ট্যাংক, মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল গানশিপ। ট্যাংক আর গানশিপের বিকট শব্দে একজন আরেকজনের কথা শুনতে পাচ্ছিল কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে! তবে সাময়িক যুদ্ধ বিরতিতে একমত হলো তারা। যদিও প্রায় তিন সপ্তাহ লাগল এটা পরিষ্কার হতে যে, অবশেষে যুদ্ধ শেষ হচ্ছে।

লেবেদের শান্তিচুক্তি ভয়ঙ্করভাবে প্রত্যাখ্যান করল সরকারের যুদ্ধ সমর্থনকারী গোষ্ঠি এবং পার্লামেন্টে প্রভাব বিস্তারকারী কমিউনিস্ট ও ন্যাশনালিস্ট পার্টি। শান্তি পরিকল্পনার প্রধান শত্রু ছিল অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী আনাতোলি কুলিকভ। তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শুরুই হয়েছে যুদ্ধের মাধ্যমে। তার সৈন্য গ্রোজনির যুদ্ধে অপদস্থ হওয়ায় সে লেবেদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়াল। এদিকে পুলিকোভস্কি মত সম্পূর্ণ পাল্টে ১৯ আগস্ট গ্রোজনি পুনর্দখলের ঘোষণা দিল। এটাই সম্ভবত সেনাবাহিনির শেষ পাগলামি। শুধু বোয়েভিকরা নয় বরং দশ হাজার সাধারণ মানুষ এবং সকল রাশিয়ান সৈন্য শহরের মধ্যে গোলাবর্ষণের শিকার হলো। পুলিকোভস্কি তখন জনসাধারণকে ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিল শহর ছাড়তে। হাজার হাজার মানুষ পালিয়ে গেল আর্টিলারি এবং হেলিকপ্টারে আক্রান্ত হবার ভয়ে। আল্টিমেটাম শেষ হবার আগেই শহর খালি হয়ে গেল। বোয়েভিকরা একটু চিন্তিত হলেও সামলে নিয়ে আরো পরিখা খনন করে অপেক্ষা করতে লাগল দুর্ভোগের শেষটা দেখার জন্য।

চূড়ান্ত অশুভ ঘটনাটা আর ঘটল না। শেষ মুহূর্তে লেবেদ এবং নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইগর রোদিনভ এগিয়ে আসে। কর্তৃপক্ষ আবারও বুঝিয়ে শান্ত করতে সক্ষম হয় জেনারেলদের। এই ঘটনা একটা চরম সত্য উদঘাটন করল—

BanglaBook.org

যদি যুদ্ধ শেষ করতে হয় তাহলে মস্কোর সামনে দুটো পথ। হয় আত্মসমর্পণ অথবা পুলিকোভস্কির পদ্ধতি বেছে নিয়ে গণহত্যা চালানো।

প্রাক্তন প্যারাট্রুপার, আফগান যুদ্ধের সৈনিক লেবেদ অভিজ্ঞ লোক। অন্যান্য সমঝোতাকারীদের মতো সে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় হাঁটল না। ট্যাবু ভেঙে দিয়ে বলল, 'আমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি তারা সন্ত্রাসী নয়, তারা সাধারণ মানুষ।'

আরেকটা ব্যাপার হলো, সে একদিন প্রেসিডেন্ট হবার স্বপ্ন দেখত তাই তার বস ইয়েলসিনকে রক্ষার কারণ বা চেষ্টা—কোনোটাই তার মাঝে ছিল না। তাই আত্মসমর্পণই বেছে নিল লেবেদ। 'আমরা আর কখনোই আলটিমেটামের ভাষায় কথা বলব না,' সে বলল।

২২ আগস্ট রাশিয়ানরা গ্রোজনি এবং পর্বত থেকে সেনাবাহিনি সরিয়ে খানকালা ও সেভার্নি ঘাঁটিতে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সম্মত হলো। চেচেনদেরকে তাদের প্রজাতন্ত্র ফিরিয়ে দেয়া হবে। ৩১ আগস্ট লেবেদ এবং মাসখাদোভ চেচেন-দাগেস্তান সীমান্তের কাসাভইয়ার্টে সাক্ষাৎ করল। চেচেনদের স্বাধীনতা দাবির গর্ডিয়ান নট (যে গিঁঠ কখনোই খোলা যায় না) খুলতে বসল। উভয়পক্ষই বিতর্ক একপাশে সরিয়ে নিজেদের পাঁচ বছর সময় দিল। 'পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যাবে এ সময়ের মাঝে,' লেবেদ বলল। সূত্রটা সহজ, যুদ্ধ শেষ।

মস্কোর পার্লামেন্টে নেতারা লেবেদকে তিরস্কার করল। দেশদ্রোহী বলল। রীতিমতো গালাগালি শুরু হয় লেবেদ এবং কুলিকভের মধ্যে। একজন আরেকজনকে 'বিশ্বাসঘাতক', 'মাফিয়াপুষ্ট' ইত্যাদি বলে অভিযুক্ত করল। লেবেদের দুঃসাহস, রাজনৈতিক অন্তর্যুদ্ধে প্রবেশ, ভীতিহীন পাল্টা আক্রমণ এবং শান্তি পরিকল্পনা তার শত্রুর সংখ্যাই বাড়াল।

এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে ইয়েলসিনের হস্তক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছিল সবাই। একমাত্র তিনি-ই বলতে পারেন, শান্তিচুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হবে কিনা। হৃৎপিণ্ডজনিত সমস্যায় ভুগতে থাকা প্রেসিডেন্ট লেবেদের জনপ্রিয়তা দেখে কিছুই বললেন না।

১৭ অক্টোবর টেলিভিশনে এসে ঘোষণা করলেন, লেবেদকে অবাধ্যতার জন্য বরখাস্ত করা হচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধের গতিশীলতা এ ক'দিনে নষ্ট হয়ে গেছে। মস্কো নিজেই দূর্নীতিগ্রস্ত, অসহায়, উদাসীন। এখন আর ফিরে আসার সুযোগ নেই। অবশেষে ইয়েলসিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও শান্তিচুক্তির পরিকল্পনা মেনে নিয়ে

BanglaBook.org

শান্তি স্থাপন করলেন চেচেনদের সাথে। নভেম্বরের ২৩ তারিখে যোখার দুদায়েভের গ্রোজনিতে ট্যাংক হামলার প্রায় দুই বছর পর প্রেসিডেন্ট এক অচিন্তনীয় ঘোষণা দিলেন—চেচনিয়া থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে।

চেচেনরা জিতে গেছে।

বুদেনোভস্ক

গ্রোজনির যুদ্ধ শেষ হলে রাশিয়ান সৈন্যরা শহর এবং পর্বত ত্যাগ করল। সারি সারি ট্রাক এবং এপিসিতে ওড়ানো হলো সাদা পতাকা। চেচেন বোয়েভিকদের জিপ রাশিয়ানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এগিয়ে দিল। চেচেনরা বাস, জিপ, ট্রাকে করে নিজেদের গ্রামে ফেরত এলো, সাঁজোয়া যান দখল করে বহু মানুষ আনন্দ মিছিল করল।

একসময় ভয়ংকর, সাহসী, ভীত, মাতাল, নরম, রাগান্বিত—বিভিন্ন ধরনের সৈন্যতে পরিপূর্ণ রাশিয়ান ঘাঁটিগুলো খালি হয়ে গেল। ফক্সহোলের ছাদ হিসেবে ব্যবহৃত ঢেউটিনগুলো বাতাসে ঝাপটা খাচ্ছে। কাঁটাতারের বেড়া ঝুলে পড়েছে। পরিখাগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পিল বক্সের গ্রাফিতিগুলো বলে দিচ্ছে, সেনাবাহিনির এই ইউনিটটা কোথা থেকে এসেছিল এবং কোথায় ফিরে গিয়েছে—সামারা, মস্কো নাকি লেলিনগ্রাদ।

২০৫ এবং ১০১তম ব্রিগেডের জন্য সবচেয়ে অপমানজনক ব্যাপার ঘটল। তাদেরকে তৈরিই করা হয়েছিল চেচনিয়াতে স্থায়ীভাবে রাশিয়ান অস্তিত্ব জিইয়ে রাখার জন্য। তাদের এখন যাবার কোনো জায়গা নেই। তাদের জন্য কোনো আত্মীয় স্টেশনে অপেক্ষা করে থাকবে না। ঘরে ফিরে নরম বালিশে মাথা ঠেকানোর ভাগ্য তাদের নেই। স্ট্যাভ্রোপোলের খোলা প্রাঙ্গনটা তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বলা হয়েছিল, কিছু করে নেয়ার জন্য।

২০৫ তম ব্রিগেডের জন্যে বুদেনোভস্কের খোলা মাঠে তাবু খাটানো হলো। মাঠের অন্য প্রান্তে রয়েছে অসমাপ্ত এক ভবন। শীতকালে স্থানীয় লোকজন সৈন্যদের তাজা খাবার ও গরম পোশাক দিল। কিন্তু এই উষ্ণ অভ্যর্থনা মিইয়ে গেল শীঘ্রই। সৈন্যরা নিয়ম ভুলে বিশৃঙ্খলা শুরু করে দিল। এগিয়ে যেতে লাগল ধ্বংসের দিকে।

আমি যখন ওখানে পৌঁছুলাম, কোনো গার্ড ছিল না মেইন গেটে। ভবনটা যুদ্ধের আগে গ্যারেজ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছিল। এখন অসমাপ্ত এই ভবন

BanglaBook.org

রাশিয়ান সৈন্যদের দখলে।

কেউ কিছু বলতে পারল না, অফিসারদের কোথায় পাওয়া যাবে। একজন তরুণ মেজরের দেখা পেলাম। প্রথমে অবাক হয়েছিলাম তার বন্ধুসুলভ আচরণ পেয়ে। পরে বুঝলাম সে মাতাল!

সে আমাকে করিডোর ধরে নিচে নিয়ে গেল। কয়েকজন বাধ্যতামূলক সৈন্যকে দেখতে পেলাম, এখনও দাড়ি-গোঁফ ঠিক করে ওঠেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্টাইলে গ্রেটকোট পরে আছে সবাই, কারো হাতা তাদের হাতের চেয়ে লম্বা, আবার কারোটা খাটো।

'এখানে,' মেজর বলল। দরজা খুলতেই সিগারেটের ধোঁয়ার মেঘ চোখে এসে লাগল। এক ডজন অফিসার টেবিলে বসে আছে। টেবিলে আধখাওয়া খাবারের প্লেট, বোতল, গ্লাস। কেউ জ্যাকেট পরা, কেউ জাম্পারস, কেউ নীল-সাদা স্লিভলেস আর্মি ভেস্ট। আমার আগমনে ওদের মধ্যে উত্তেজনার ভাব তৈরি হলো। মেজর রিপোর্ট করার মতো করে বলল, 'ফ্রান্স থেকে আপনাদের জন্য একজন অতিথি নিয়ে এসেছি।'

একজন কর্নেল উঠে তার পাশে বসার জায়গা করে দিল আমাকে। তারপর নিজেই টলতে লাগল। সামলাতে গিয়ে টেলিভিশন ধরতে হলো তাকে। ধড়াম করে পড়ে গেল টেলিভিশনটা। এরপর সবাই একযোগে কথা বলতে শুরু করে দিল আমার সাথে। কে কার চেয়ে বেশি মদ ঢেলে দিতে পারে আমাকে তার প্রতিযোগিতা চলল।

'আরে নাও, নাও। আরেকটু ভদকা নাও। একটু নিয়ম ভঙ্গ করো,' কর্নেল বলল।

'তাকে একটু ওয়াইন দাও,' আরেকজন অফিসার বলল টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে। 'সে কি ওয়াইন চেখে দেখেছে? তুমি কি আমাদের ওয়াইন খেয়েছো?'

আরেকজন বলল, 'সম্ভবত সে ওয়াইন পছন্দ করে না। তাহলে একটু বিয়ার নাও।'

একজন সুদর্শন পেশীবহুল লেফটেন্যান্ট কর্নেলই শুধুমাত্র অস্ত্র বহন করছিল। একটা পিস্তল রাখা তার শোল্ডার হোলস্টারে। 'আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমার পিস্তলের দিকে তাকিয়ে আছো। এটা আমাকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী উপহার দিয়েছেন,' গর্বের সাথে বলল লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'এই নাও, দেখো,'

BanglaBook.org

বলে সে লোডেড গানটা বের করে দিল আমার হাতে। আরেকজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ছোঁ মেরে অস্ত্রটা নিয়ে অ্যামুনিশন ক্লিপ খুলে রাখল।

আমার ওপর থেকে আগ্রহ হারাতেও তাদের বেশি সময় লাগল না। একজন ঘুমাতে গেল, আরেকজন পাশেরজনের সাথে আবেগপ্রবণ গল্প শুরু করে দিল। হঠাৎ সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠল কর্নেল, আমার কাগজপত্র দেখতে চাইল। সে দাবি করল, আমি নিরাপত্তা লংঘন করেছি। তারপর ভালোমতো না দেখেই ফেরত দিল সেগুলো। বসল আরেক মগ ভদকা নিয়ে। মনে হলো, অ্যামনেশিয়ায় ভুগছে সে।

অবশেষে তাদের একজনের সাথে কথা বলতে পারলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'এদের কী হয়েছে?'

পিস্তল বহনকারী লেফটেন্যান্ট কর্নেল বলতে শুরু করল, 'সক্রিয় পরীক্ষিত ব্রিগেড ছিল এটা। এখন এক ছন্নছাড়া সৈন্যের দল ছাড়া আর কিছুই না। একজন অফিসারেরও কোনো অ্যাপার্টমেন্ট নেই। বাহাত্তর জন অফিসার ও তাদের পরিবার এমন একটা করে রুমে থাকে। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত, যারা দেশের স্বার্থের জন্য চেচনিয়াতে লড়লো, তাদেরকে দেশের আর দরকার নেই! এর অর্থ হয়তো কোনোদিনই আমাদের মাথায় ঢুকবে না।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় আট
শান্তির মূল্য

গ্রোজনি

সৈন্য প্রত্যাহার মানে আন্দোলনের স্বাধীনতা। কোনো চেক পয়েন্ট থাকবে না, এপিসি থাকবে না, রাস্তায় কোনো ট্যাঙ্ক গর্জে উঠবে না, আকাশে এয়ারক্রাফট আছে কিনা দেখতে বার বার ঘাড় বাঁকাতে হবে না। কোনো সেনাক্যাম্প নেই, হতাহত-গুম নেই, রাতের বোমা হামলা নেই। যেখানে খুশি যাও, যখন খুশি যাও। মনে খুশি আর স্বস্তি।

যুদ্ধের জন্যে যে বিয়েগুলো আটকে ছিল সেগুলো তাড়াহুড়ো করে হয়ে গেল। বর যাত্রী, ফুলে সজ্জিত গাড়িবহর, গ্রামবাসীর মধ্যে আবার সেই গতিময়তা। একদিকে পার্টি চলে অন্যদিকে আনন্দে গানফায়ার। আগে রাইফেল আর শটগানই থাকত, এখন অতিথিরা আকাশে মেশিনগান চালিয়ে উল্লাস করে! গুডারমেসে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে তো সবাই ভাবল, যুদ্ধ আবার শুরু হয়েছে। কে যেন আকাশে আরপিজি ফায়ার করেছিল!

আগে বিয়ের দিনেও অনেকে হতাহত হয়েছে। আজ বিয়ে হয়েছে, কাল শেষকৃত্য—এমন অনেক ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু চেচেনরা যেন গুলির শব্দকে ভালোবেসে ফেলেছে। এখন ইচ্ছামতো সেগুলো চালিয়ে আনন্দ করতে পারে। ওরা জিতেছে। ওরা আনন্দে মত্ত।

২৭ জানুয়ারি ১৯৯৭ সালে ইউরোপের নিরাপত্তা এবং সহযোগিতা সংগঠনের তত্ত্বাবধায়নে চেচনিয়াতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে শামিল বাসায়েভ ও জেলিমখান ইয়েন্দারবিয়েভকে হারিয়ে আসলান মাসখাদোভ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। রাশিয়ান সৈন্যদের অব্যাহতি দেয়া হয়। ১৯৯১ সালের পর প্রথমবারের মতো ওরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়তে পারবে।

BanglaBook.org

নির্বাচন জাতীয় উদযাপনের বিষয়ে পরিণত হয়ে গেল। সকল পোলিং স্টেশনে উপচে পড়া ভিড়, ভোটারের সারি তুষারের মধ্যেও অনেক লম্বা। ভোটগ্রহণের সময় দু'ঘণ্টা বর্ধিত করার প্রয়োজন দেখা দিল।

'জনগণ ভালো কিছু প্রত্যাশা করে। ওরা যুদ্ধে ক্লান্ত। ওরা ওদের দেশকে ভালো মতো গড়ে তুলতে চায়।' মেখেটিতে বাসায়েভের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণাকালে চল্লিশ বছর বয়সী আসুডিন এই কথা বলে। গ্রোজনি পুনরুদ্ধারের আগে গ্রোজনির এই গ্রামটিতেই সর্বশেষ বোমা হামলা হয়েছিল। সাহসী, ক্লান্তিহীন লিডার টিকস গুল্ডিম্যানসহ অভিজ্ঞ নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা অভিভূত হন। চেচেনদের উৎসাহ দেখে তারা ভোট কারচুপি এবং সংঘর্ষের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন।

বিজয়ের পর মাসখাদোভ ঘোষণা দেয়—চেচেন স্বাধীন রাষ্ট্র। এই স্বাধীনতা বহাল থাকবে ও রাশিয়াসহ বিশ্বের সকল দেশ এই স্বাধীন দেশকে চিনবে।

পয়তাল্লিশ বছর বয়সী মাসখাদোভ এই মুহূর্তে নির্বাচনে জিতে সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাংবাদিকদের সামনে বসে রয়েছে। তাকে দেখতে প্রেসিডেন্টের মতোই লাগছে অনেকটা। হোক ছোট, ক্ষতবিক্ষত দেশের প্রেসিডেন্ট, কিন্তু দেশটা এখন স্বাধীন।

এখনো চেচেনরা আসল স্বাধীনতা পায়নি। এটাই নির্মম সত্য। ওরা ডি ফ্যাক্টো স্বাধীনতা পেয়েছে। নিজেরা নেতা নির্বাচন করতে পারবে, নিজেদের আইন প্রণয়ন করতে পারবে। কিন্তু পূর্ণ ডি জুরি স্বাধীনতা, জাতিসংঘের সদস্যপদ, দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আত্মরক্ষা—এখনো অনেক দূরের পথ। খাসোভইয়ার্টের শান্তি চুক্তি অনুসারে, মাসখাদোভকে পাঁচ বছর সমঝোতায় থাকতে হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সমঝোতার টেবিলে বসার ফলে তার অবস্থান অনেকাংশে নড়বড়ে হয়ে গেছে। যদিও চেচেনদের সমৃদ্ধ কৃষি, তেলশোধন ব্যবসা এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা সম্পন্ন মানুষ রয়েছে-এসবের সাহায্যে স্বাধীন গতিশীল রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব-তবে সেক্ষেত্রে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সাহায্য প্রয়োজন হবে। মস্কোও এসব সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে সম্মত হয় তবে এর বিনিময়ে চেচনিয়াকে রাশিয়ান ফেডারেশনের সাথে যোগ দিতে হবে। মস্কো চেচনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে পারেনি কিন্তু তাদেরকে চাপে রেখে রক্তাক্ত করতে পিছপা হবে না।

মাসখাদোভকে পাঁচ বছর ধরে যুদ্ধ ও অস্থিতিশীলতাকে কেন্দ্র করে

BanglaBook.org

গড়ে ওঠা সন্ত্রাসী দল দমনে বেশ বেগ পেতে হয়। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে আইসিআরসি'র ছয় জন কর্মী নোভি এটাগিতে তাদের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হয়। এছাড়াও পুরো শীত জুড়ে রাশিয়ান সাংবাদিক অপহরণ চলে। এসব কর্মকান্ডের মূল অপরাধীদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। অনেক চেচেন মনে করে, এই খুন-গুম এফএসবি করেছে যেন বিশ্ব দরবারে চেচেন ও মাসখাদোভকে হেয় করা যায়। এফএসবিকে দোষ দেওয়া সহজ। অথচ রাশিয়ার মধ্যস্থতা ছাড়া মাসখাদোভের পক্ষে সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব ছিল। এই গ্রুপ কোনো আইন কানুনের ধার ধারে না। সাংবাদিক অপহরণ একটা বড় ব্যবসায় পরিণত হয়। তবে এফএসবিকে নিয়েও ভয় আছে। তারা হয়তো যুদ্ধ পরবর্তী চেচনিয়াকে ধ্বংসের চেষ্টা করছে।

স্বাধীনতার পর আগত স্বস্তিময় প্রথম শীতে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করা যোদ্ধাদের স্মরণ ও আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাদ থেকে তুষার পড়তে থাকে। দেয়াল ভেদ করে প্রবেশ করে কনকনে ঠান্ডা বাতাস। বরফ ভরা মাঠ দেখলে এখনো ল্যান্ডমাইনের ভয় জাগে।

কেউই হতাহতের আসল সংখ্যাটা জানে না। ধারণা করা হয় এক মিলিয়ন লোক হতাহত হয়েছে এই একুশ মাসের যুদ্ধে। এপ্রিল ১৯৯৬ পর্যন্ত এমএসএফ বলেছিল, মৃতের সংখ্যা চল্লিশ হাজার। আলেকজান্ডার লেবেদ তার মনগড়া পদ্ধতিতে বলে, আশি হাজার থেকে এক লাখ লোক মারা গেছে। সেটাই চেচেন কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছাড়াই। কিন্তু আপনি প্রতিটা গ্রামে সারি সারি কবর দেখতে পাবেন। যোদ্ধার কবর, সাধারণ মানুষেরর কবর। কবরস্থানগুলো একটি বড় পোল দ্বারা চিহ্নিত করা। ঠিক কতোজন বোয়েভিক মারা গেছে, তা শুধু ধারণা করাই সম্ভব। তবে যুদ্ধের ধরন দেখে বলা যায়, সে সংখ্যা সাধারণ নাগরিকদের চেয়ে অনেক কম। একজন ওএসসিই কূটনীতিক মনে করেন, এরকম একটা এলাকায় হতাহতের সংখ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গোটা সোভিয়েত মৃত্যুর প্রায় সমপরিমাণ।

রাশিয়ান সৈন্য এবং অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানানো উচিত রাশিয়ার। কিন্তু বিভিন্ন সময় মিথ্যা এবং অসম্পূর্ণ তথ্য সংখ্যার নির্ভরযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। লেবেদ বলেছে, ১৯৯৬-এর শেষ পর্যন্ত ৩৮২৬ জন সৈন্য মারা গেছে, ১৭৮৯২ জন আহত এবং ১৯০৬ জন নিখোঁজ হয়েছে। এই নিখোঁজেরা সম্ভবত মারা গিয়েছে অথবা বন্দি রয়েছে।

BanglaBook.org

মেমোরিয়াল মানবাধিকার যে তালিকা জড়ো করেছে তা অনুসারে, ১৯৯৭ সালের শুরু পর্যন্ত ৪৩৭৯ জন (সবার নামসহ) মারা গেছে। অন্য ১৪০৮ জন নিখোঁজ, বন্দি হয়েছে হয়তো। নিখোঁজ হওয়াদের কয়েকশ সৈন্য হয়তো এখনো বেঁচে আছে।

মানবাধিকার সংগঠন সোলজার্স মাদার্স পরিসংখ্যান প্রদান করে, মৃতের সংখ্যা প্রায় ৭০০০। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে ১০ হাজার সৈন্য মারা গেছে। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের হারিয়েছে ১৮০০ থেকে ২৫০০ জন এবং কয়েক'শ এফএসবি, বর্ডার গার্ড এবং নিরাপত্তা বাহিনির অন্যান্য শাখার লোক মারা গেছে।

পুরো ঘটনা কখনোই হয়তো সামনে আসবে না। শান্তি চুক্তির অনেকদিন পর, দক্ষিণ রাশিয়ার রোস্তভ-ডন-অন-এর মিলিটারি হিমাগারে তখনো বেনামী সৈন্যের মৃতদেহ রয়েই যায়। এছাড়াও নতুন করে চেচনিয়াতে অনেকগুলো কবরের খোঁজ পাওয়া গেছে। এমনকি আফগানিস্তান যুদ্ধের এক দশক পরেও অনেকে বিশ্বাস করে, রাশিয়ান মৃত সৈনের প্রকৃত সংখ্যা এখনো বের হয়নি। অফিসিয়ালি বলা হয়েছে, পনেরো হাজার সৈন্য মারা গেছে।

অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা তুলনামূলক অনেক সহজ। তেল শোধনাগার কমপ্লেক্স প্রচণ্ড রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যদিও তা সংস্কারযোগ্য। দক্ষিণে কংক্রিট ফ্যাক্টরি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। গ্রোজনির ধাতব ফ্যাক্টরিগুলোতে খুব স্বল্প পরিসরে কাজ চলছে। কৃষিজমির বিশাল অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে ল্যান্ডমাইনের জন্য। গ্রোজনিতে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং আগুনে ঝলসে গেছে ব্লকের পর ব্লক। শুধু বাইরের দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। সিটি সেন্টার বুলডোজারে উড়ে গেছে।

আশেপাশের ছোট বাড়িগুলো একেবারে উঠানসহ উধাও হয়ে গেছে। এরকম অবস্থা বেশি দেখা যায় দক্ষিণী গ্রামগুলোতে। লেবেদ ঘর-বাড়ি ধ্বংসের সংখ্যা বলে, ৪৬০০০। যুদ্ধ শেষেও এখন শরণার্থী সংখ্যা তিন থেকে চার লাখ। এর মধ্যে অনেক রাশিয়ানও আছে। এরা যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে, দুদায়েভের শাসনামলে এখানে রয়ে গিয়েছিল। কোথাও কোথাও পুনঃনির্মাণ কাজ খুব দ্রুত হয়েছে। আরগুন নদীর তীরে, যেখানে ১৯৯৫-এর শুরুর দিকে শত শত বাড়ি ধ্বংস হয়েছিল, যুদ্ধ সমাপ্তির সাথে সাথে সেখানকার বাড়ি পুনঃর্নির্মিত হয়েছে। শুধু গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটিগুলো দুর্যোগের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

Banglabook.org

আরগুন সৌভাগ্যবান শহর; এখানে কয়েক মাস যুদ্ধ চলেছে। দূরবর্তী যেসব গ্রামে পুরোটা সময় জুড়ে যুদ্ধ চলেছে, সেখানে নেমে এসেছে হতাশার ছায়া।

মাসখাদোভের নির্বাচনের আগে মাত্র দশটা পরিবার বামুতে ফিরে যায়। বাকি গ্রাম, যেখানে এক সময় ৬৫০০ লোকের বাস ছিল, পরিত্যক্ত দগ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকে। কারণ ল্যান্ডমাইন। কেউ নতুন করে বাড়ি তৈরির সাহস দেখায় না। কয়েক সপ্তাহ পর পর এখানে মানুষ মরতে থাকে অথবা বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। বামুতের রাস্তায় ঢালের নিচে যেখানে বোয়েভিকরা ঘাঁটি গেঁড়েছিল সেখানে চৌষট্টি বছর বয়সী আয়ুপ খানজাতভ নামক একজন তার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আমাকে দেখায়। শুধু ভিত্তিটা পড়ে আছে। সেখানে এককালে আঙুরের ক্ষেতও ছিল। এখন কালো হয়ে আছে। রাস্তার নিচের এক উঠোনে যোদ্ধারা বসে গল্প করছিল। দেখে মনে হলো ওরা রাশিয়ান বন্দি, যাদেরকে রাশিয়ান সৈন্যবাহিনি ফেলে রেখে গেছে। ওরা এখন টুকিটাকি কাজ করে জীবন নির্বাহ করছে।

'আমরা বাড়িটা চল্লিশ বছর আগে নির্মাণ করেছিলাম। এখন আমার বয়স চৌষট্টি। এখন আর পারব না,' আয়ুপ বলল।

বামুত কমান্ডার খামজাদ বাতায়েভকে আরো হতাশ মনে হলো, অন্তত তাকে যখন যুদ্ধের সময় দেখেছিলাম তার চাইতে বেশি। 'আমাদের মসজিদ গ্রামের সাহায্য সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল। এখন একেবারে ধ্বসে গেছে। আমাদের কবরস্থানে ওরা বোমা ফেলেছে। জীবিতদের সাথে যা করেছে এর জন্য না হয় ক্ষমা করা যায় কিন্তু তাই বলে কবরস্থানে? বিশ শতাংশ কবর ধ্বংস হয়েছে অথবা মৃতদেহ উড়ে গেছে। মানুষজন হতাশাগ্রস্থ—অর্থনৈতিক, শারীরিক এবং নৈতিকভাবে।'

স্ট্যারি-আখোই, বোরোকোভা, জোনি এলাকাগুলো বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। সামাস্কি, চাঙ্ক এবং এক সময়ের সমৃদ্ধশালী গ্রামগুলোরও একই অবস্থা। স্ট্যারি-আখোইতে চল্লিশ বছর বয়সী লেশে আত্মীয়-স্বজনের সাথে পাথর, সুরকি নিয়ে কাজ করছে নিজের ঘর পুনরায় নির্মাণের উদ্দেশ্যে।

'পুরো গ্রামে আর কেউ নেই। আমি যুদ্ধের মধ্যে অনেকবার এসেছি এখানে কিন্তু এখন চিনতে পারছি না। দুটো ঘর অবশিষ্ট আছে। যদি ছাদটা তৈরি করতে পারি তাহলে আমাদের কয়েকজন থাকতে পারবে,' লেশে বলল, 'কিন্তু সমস্যা হলো ল্যান্ডমাইন। আমরা জানি না কোথায় সেগুলো রয়েছে, আর ওগুলো খুঁজে পেলেই বা কী করতে হবে। শীত আসছে, ঠাণ্ডা বাড়ছে।

BanglaBook.org

এখন মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে—ডরমেটরি, তাবু, বন্ধুর ফ্লোরে। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, এই বর্বরতায় আমরা আমাদের যুবকদের হারিয়েছি। কীসের জন্য? এই গ্রামের ভবিষ্যত কী?

তবে আমাদের আশাবাদী হতে হবে। আমাদের আবাদী জমি আছে, নিজ বাড়িতে ফিরব না কেন? আমার বাবা, দাদা, পূর্বপুরুষ সবাই এখানে ঘুমিয়ে আছে।' সে কথার ইতি টানল।

অনেক বোয়েভিক এই যুদ্ধ পরবর্তী এই শান্তির সময়েও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। কোনো কাজ নেই, বাড়ি নেই। বৃদ্ধ প্রাক্তন যোদ্ধাদের পরিবার ছিল। কিন্তু অবিবাহিত যোদ্ধা, যারা ইতোমধ্যেই জাগতিক দায়িত্ব থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে, ওরা ভাসমান অবস্থায় আছে। এদের কেউ কেউ যুদ্ধনেতা বা নতুন মন্ত্রীদের দেহরক্ষী হলো। অন্যরা অপরাধে জড়িয়ে গেল বা নতুন নতুন যুদ্ধ খুঁজতে লাগল। কেউ কেউ তাজিকিস্তান গেল, সেখানকার নিষিদ্ধ ইসলামিক আন্দোলনে কাজ করতে। ওখানেও নব্য কমিউনিস্ট সরকার ও রাশিয়ান বাহিনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে।

সতেরো বছর বয়সী মাগোমেদ বামুতে যুদ্ধ করেছিল। সে বলল, 'আমি আরবদের মতো মুসলিম ভাইদের সাহায্য করতে চাই, যেভাবে ওরা আমাদের সাহায্য করেছে। অনেক জায়গা আছে যুদ্ধ করার মতো।'

তার দুই বন্ধু ভাখা (১৮) এবং ইসলাম (১৬) এই প্রস্তাবে সায় দেয়। তিনজনই গায়ে গতরে পাতলা, এখনও গালে ক্ষুর চলেনি। স্নেহতুল্য। তবে ভুলে গেলে চলবে না, ওরা গড়পড়তা কিশোরদের মতো না। মুখে হাসি থাকলেও ওদের দৃষ্টি গভীর কিছু বলে।

ভাখা বামুতে যুদ্ধ করেছিল। সে এমনভাবে গ্রোজনিতে সরকারি ভবন পোড়ার কথা বলে যেন এটা অত্যন্ত মজার কোনো ব্যাপার।

একজন চিকিৎসক শিশুদের ওপর যুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন, 'তারা আরো আক্রমণাত্মক, ভীতিপ্রবণ, অভদ্র হয়ে উঠেছে। বড়দের সম্মান করে না, ক্রমেই বিপদজনক হয়ে উঠছে। বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। অবশ্য বয়সের সাথে সাথে ওদের বিচারবুদ্ধিও কম; খুব সহজেই সবকিছু ভুলে যাযবে। কিন্তু দশ বছরের ওপরে যারা আছে, তারা সবাই সব দেখে এবং বোঝে। তারা সারাজীবন এটা মনে রাখবে।'

রাশিয়ান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আশা ভরসা রাশিয়ান সৈন্য প্রত্যাহারের সাথে

Banglabook.org

সাথে নস্যাৎ হয়ে গেছে। এদের সংখ্যা সোভিয়েত চেচনিয়া-ইঙ্গুশেটিয়াতে ছিল তিন লাখ। সবাই খুব দক্ষ চাকুরিজীবী ছিল এবং ক্ষমতাশালী সব পদে নিযুক্ত ছিল। গ্রোজনিকে ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়ান শহর বলে মনে করত তারা। এখন এদের সংখ্যা কমে গেছে। সর্বোচ্চ ত্রিশ হাজার থাকতে পারে। তেরেক নদীর তীরের কসাক গ্রামে এদের বসবাস। অধিকাংশই খুব গরিব বা পালানোর মতো সামর্থ্যবান নয়। সোভিয়েত শাসনের শেষ চিহ্ন ডকু জাভগায়েভ নিশ্চিতভাবেই আর ফেরত আসবে না। যুদ্ধের পরে তাকে তানজানিয়ায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। তার গল্প এখানেই শেষ। নিজ জাতি থেকে সে এখন বিচ্ছিন্ন।

শান্তি চুক্তির কয়েকমাস পর্যন্ত মস্কো সমঝোতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। কার্যকরী স্বাধীনতার জন্য বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল চেচনিয়ার। এমন পরিস্থিতিতে তারা সাহায্য প্রার্থনা করে বিভিন্ন দেশের। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভগানি প্রিমাকভ সতর্ক করে দেয় যে, মাসখাদোভের নির্বাচনের আগে চেচনিয়াকে কেউ স্বীকৃতি দিলে তার সাথে রাশিয়া সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তথাপি মাসখাদোভ যুদ্ধ পরবর্তী প্রথম সফর করে ১৯৯৭ সালের এপ্রিলে সৌদি আরবে। হজ্জ করতে যায় সৌদি আরবের বাদশা কিং ফাহাদ-এর আমন্ত্রণে। পশ্চিমাদের অনুৎসাহ সত্ত্বেও মাসখাদোভ স্বীকার করতে পিছপা হয়নি যে, রাজনৈতিক সমর্থন জয়ে এই মিটিং তাকে সাহায্য করবে। সেইসাথে অন্যান্য মুসলিম নেতাদের সাহায্যপ্রাপ্তির পথও সুগম করবে। সৌদি আরো এক হাজার চেচেনের জন্য প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করে। যা এক প্রকার মহানুভবতা এবং রাশিয়ানদের একগুঁয়েমি আচরণের সুস্পষ্ট বিরোধিতা।

মস্কোতে তখন ভাগ্যের খেলা চলছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়েলসিন আট মাস অসুস্থতা ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার পর ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দু’জন সংস্কারক নিয়োগ দিলেন—একজন আনাতোলি কুবাইস এবং অন্যজন দীর্ঘদিন ধরে নিযুক্ত নভগরদের যুদ্ধবিরোধী গভর্নর বরিস নেমৎসোভ। তিনি ছিলেন ইয়েলসিনের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী। এখানে বিশাল এক পরিবর্তন ঘটে। এরা দু’জন ছিল অভিজ্ঞ। আদর্শের চেয়ে অর্থনীতিতে বেশি মনোযোগ দেয় তারা। সরকারের এই উদার পরিবর্তন নিরাপত্তা কাউন্সিলের সেক্রেটারি ইভান রিবকিনকে উদ্বুদ্ধ করল লেবেদকে পুনঃনিয়োগ দিতে। লেবেদ একজন সত্যিকারের অর্থনীতি সচেতন রাজনৈতিক ব্যক্তি। দুর্ভাগ্যক্রমে ইভান

BanglaBook.org

রিবকিনের ডান হাত ছিল ওআরটি টেলিভিশনের বরিস বেরেকোভস্কি, যে শুরু থেকেই যুদ্ধের প্রণোদনা দিয়ে আসছিল সরকারকে।

চেচনিয়ার সাথে প্রকৃত সমঝোতার শেষ বাধা ছিল বুলডগের মতো চেহারার অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী আনাতোলি কুলিকভ। যুদ্ধ সমর্থিত দলের শেষ প্রতিনিধি সে। কুলিকভ সর্বাত্মকভাবে মাসখাদোভের ঝামেলাপূর্ণ নীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে পরবর্তী কোনো আলোচনার সম্ভাবনা থামিয়ে দিল। এপ্রিল ১৯৯৭-এ আরামাভি এবং পাটিয়াগোরস্ক রেল স্টেশনে সন্ত্রাসী বোমা হামলার দায় সে চেচেনদের ওপরে চাপিয়ে দেয়। ফলে সন্দেহের গন্ধ পাওয়া যায়, এই হামলা গ্রোজনি নয় বরং মস্কোর সিক্রেট সার্ভিস ঘটিয়েছে।

তবে ইভান রিবকিন অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী কুলিকভকে শান্তি আলোচনায় হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করে দেন। 'তারা যে পদেই থাকুক না কেন, জনগণকে তাদের ক্ষমতার উচ্চাকাঙ্খার বলি বানাতে পারে না', বললেন তিনি।

ইয়েলসিন স্বভাবসুলভ কলহরত মন্ত্রীদের নীরবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। অবশেষে শান্তির পথকেই বেছে নিলেন। নাটকীয়ভাবে ১২ মে হাসিমুখে ইয়েলসিন মাসখাদোভকে ক্রেমলিনে স্বাগতম জানালেন। তাদের সেই প্রথম মিটিং-এ বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্থায়ী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। ঠিক সে সময় কৌশলে কুলিকভকে রাশিয়ার দূরবর্তী এক অঞ্চলে তাৎক্ষণিকভাবে সফরে পাঠানো হয়েছিল।

ইয়েলসিন এবং মাসখাদোভ সিদ্ধান্ত নিল, আজ থেকে সম্পর্ক নির্ধারিত হবে 'আন্তর্জাতিক আইনে'। এটা দু'জন সমকক্ষীয় প্রেসিডেন্টের মধ্যে শান্তির ঘোষণা; রাশিয়ান-ককেশাসের ইতিহাসে প্রথম।

'এখন থেকে ইচকেরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের সাথে আমরা শান্তিচুক্তিবদ্ধ। এই চুক্তি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্ববহ। কারণ এর মাধ্যমে চারশ বছরের দীর্ঘ সময় ধরে চলা অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধ আর জনগণের অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটল,' ইয়েলসিন বললেন। অবশেষে প্রেসিডেন্ট সাধারণভাবেই 'ইচকেরিয়া' শব্দ ব্যবহার করলেন। করতে শুরু করলেন তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

এই শান্তিচুক্তি অবশ্য চেচনিয়ার ভঙ্গুর রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু এর মাধ্যমে ধনবানরা চেচনিয়ার অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করা নিয়ে আলোচনার সুযোগ পায়। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক চেচনিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে এক অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার মাধ্যমে রাশিয়ার কেন্দ্রীয়

Banglabook.org

ব্যাংক চেচনিয়ার নিজস্ব মুদ্রানীতি প্রণয়ন এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যকর দেখাশোনা করবে। চেচনিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি মহৎ পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়। এর মাধ্যমে রাশিয়ান এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ধনকুবেররাও বিনিয়োগ করতে পারবে। ভাগ্যের কী পরিহাস! শান্তিচুক্তির আরেকটি কারণ হচ্ছে আজারি তেল পাইপলাইন—যা ছিল যুদ্ধ শুরু হবার অন্যতম কারণ।

১৯৯৭ এর শেষদিকে কাস্পিয়ান সাগর দিয়ে তেল প্রবাহ নীতির সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। ক্রেমলিনের শক্তিশালী নতুন অর্থনীতিবিদরা বুঝতে পারেন, পথ নিরাপদ করতে চেচেনদের সাথে চুক্তি করতে হবে। কীভাবে জর্জিয়া, চেচনিয়া অথবা দক্ষিণ রাশিয়া হয়ে লাভজনক তেল পার্শ্ববর্তী দেশে পাঠানো যায় তা নিয়েও ভাবতে হবে। প্রাথমিকভাবে যে রুট ব্যবহার করা হবে তার অভিজ্ঞতার ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করবে।

সত্যি বলতে, চেচনিয়ায় উপনিবেশবাদের ইচ্ছা একেবারে মরে যায়নি মস্কোর মন থেকে। মস্কো থেকে চেচনিয়ার পাশ দিয়ে বাইপাস পাইপলাইন স্থাপনের ঘোষণা আসে এবং কুলিকভ ঘোষণা করে, সে সীমান্তে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করবে।

ক্রেমলিন চুক্তি অনুসরণ করে আরেকটা মাইলফলক অর্জিত হয়। ৩১ মে রাশিয়া, চেচনিয়া এবং উত্তর ককেশাস রিপাবলিকের অন্যান্য প্রতিনিধিরা দক্ষিণ রাশিয়ার খনিজ জলের শহর কিসলোভডস্কে সাক্ষাৎ করে আঞ্চলিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে বোঝা যায়, রাশিয়া দেরিতে হলেও উপলব্ধি করেছে, উত্তর ককেশাসের সমস্যা থেকে দূরে থাকার অর্থ নেই। চেচনিয়া কঠিন মূল্য দিয়ে আজ রাশিয়াকে তার প্রতিবেশী দেশ হিসেবে সম্মান দিতে শিখিয়েছে। কঠিন মূল্যটা অবশ্য উভয়পক্ষকেই দিতে হয়েছে।

আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং টেবিল চাপড়ানো চেচনিয়াকে কেবল দূরেই ঠেলে দিয়েছিল। এখন অর্থনৈতিক সংযোগ তাদেরকে আবার কাছে টেনেছে।

'রাশিয়া বিশাল এক ক্ষমতার নাম,' মাসখাদোভ মে মাসে বলে। 'সেটা আমাদের কাছাকাছি অবস্থিত এবং এখন আমরা অর্থনৈতিকভাবে সব দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত। সেজন্য আমি পশ্চিমা অন্যান্য দেশ বা মুসলিম বিশ্বের চেয়ে রাশিয়ার প্রতি বেশি কৃতজ্ঞ।'

Banglabook.org

মস্কো

নভেম্বর ১৯৯৬। মাসখাদোভ ক্যামোফ্লাজ গিয়ার বাদ দিয়ে কালো স্যুট-টাই পরেছে। প্রাক্তন শত্রু দেশের রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলন করছে প্রথমবারের মতো। আমি মনে করতে চেষ্টা করলাম, এই লোকটার ইন্টারভিউ আমি কোথায় নিয়েছিলাম আগে? প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের বাংকার, পর্বত, জঙ্গল নাকি দক্ষিণ চেচনিয়ার কোনো সেফ হাউজে? কিন্তু এখন সে মস্কোর হোটেল আরবাটে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্ট্যানলিক গোথিক টাওয়ারের ঠিক পেছনে বসে। পাশে আছে মোভলাদি উদুগভ এবং আহমেদ জাকায়েভ। আমার হিসেবে যুদ্ধ শেষ।

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, 'আসলান মাসখাদোভ, আপনি কি মনে করেন, আপনি জিতেছেন?'

মাসখাদোভ বরাবরের মতোই সতর্ক। কয়েক সেকেন্ড ভাবল। তারপর তার শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের উদ্দেশ্য রাশিয়াকে হারানো নয়। আমরা জানি, রাশিয়ান সৈন্যবাহিনি বৃহৎ এবং তাদের পরমাণু বোমা আছে। আমরা শুধু এ জন্য লড়েছি যেন একজন রাশিয়ান সৈন্যও আমাদের এলাকায় না থাকে এবং আমাদের জনগণকে হত্যা না করে। আমি মনে করি—আমরা সেটা অর্জন করেছি।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ষষ্ঠ পর্ব

স্বর্গের অনুসরণ

ককেশাসের পাহাড়গুলো আমার কাছে পবিত্র। এবং খুব সকালে! সকাল ১০টায়!

আহ, সেই রহস্য, সেই হারানো স্বর্গ কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আঁচড়ে বেড়াবে আমার মন।

-লারমন্টভ

কারাচায়েভস্ক

কারাচাইয়ের মুরুব্বিরা আমাকে মসজিদে দেখা করতে বলে। জনা তিরিশেক মুসল্লি নামাজ শেষে মসজিদে বসে আছে, তারা সবাই চেচনিয়ার কথা শুনতে চায়। টেলিভিশনে যা সম্প্রচার করা হয়েছে এরা কেবল তা-ই জানে।

'সরকার চেচনিয়ায় নিজেদের মানুষের ওপরই বোমা ফেলছে কেন?' টুপি পরা এক বৃদ্ধ মুসল্লি জানতে চাইলেন।

'কারা সঠিক—আমাদের স্রেফ এটা বলুন?'

'তারা টেলিভিশনে যা বলছে তা কি সত্য? মাঝে মাঝে আমাদের মনে হয়, ওখানে যা ঘটছে তার অর্ধেকও ওরা আমাদের বলে না!'

'চেচেনদের নাকি বিদেশিরা টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে? কথাটা কি সত্য? আপনি কি তাদের কাউকে দেখেছেন?'

'আপনাদের ক্লিনটন সাহেবকে বলবেন, এখানে নির্দোষ মানুষদের মেরে ফেলা হচ্ছে!'

আমার উত্তর শোনার চাইতে তাদের কাছে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি এক মুফতির পাশে বসা। বাকিরা বাকচারিতায় এতোই মশগুল যে আমার মনে হলো, আমি মসজিদ ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পরলেও কেউ খেয়াল করবে না।

আচমকা অন্যদের থামিয়ে উঁচু আসট্রাখান হ্যাট পরিহিত এক কর্তৃত্বশীল বৃদ্ধ আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যে এফএসবি নন সেটা আমরা কীভাবে বুঝব? আপনিও তো আমাদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে পারেন? কে পাঠিয়েছে আপনাকে?'

আমি ভাবলাম লোকটা বুঝি মজা করছে, এখনই হয়তো হেসে দেবে। কিন্তু নীরবতা অটুট রইল।

'উনাকে আপনার কাগজপত্র দেখান', আমার পাশে বসে থাকা মুফতি সাহেব বললেন। আমার গোলাপি রঙের প্রেস কার্ড তুলে দিলাম তার হাতে। সন্দেহ দূর না হওয়া পর্যন্ত হাতে হাতে সবাই পরীক্ষা করে দেখল কার্ডটা। আবার প্রশ্ন শুরু হলো। 'রাশিয়ানরা কেন সবসময় সংখ্যালঘুদের দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করে?'

উত্তর ককেশাসের মানুষদের আপনি দমিয়ে রাখবেন কীভাবে? আপনি পারবেন না। এখানে এলে এক ঘণ্টার মধ্যে বিশ্ব ও শতাব্দী ভ্রমণ হয়ে যাবে

BanglaBook.org

আপনার। একদিনে গোষ্ঠীপতি, দস্যুদল, মাফিয়া ও রাখাল ছেলের মতো বিচিত্র সব চরিত্রের সাক্ষাৎ পাবেন। এদের কোনোকালেই দমিয়ে রাখা সম্ভব না। উত্তর ককেশাস হচ্ছে হাজারো বিকৃত আয়নার হলঘরের মতো। একেকটায় একেক রকম প্রতিফলন দেখায়। আর এখানকার মানুষও অনেক আগেই ভুলে গেছে, কোনটা সরল আর কোনটা বিকৃত প্রতিচ্ছবি।

চোখ বন্ধ করে কল্পনায় ভেসে আসা ছবিগুলো দেখার চেষ্টা করলাম আমি। দাগেস্তানের পাহাড় দিয়ে ড্রাইভ করার কথা মনে পড়ল আমার। মনে পড়ল, সন্ধ্যায় পপলার আর এপ্রিকট বাগানের মিষ্টি ঘ্রাণে শ্বাস নেওয়ার কথা। পার হওয়ার সময় প্রতিটা গ্রামের পাদদেশ থেকে গ্রামের আঁকাবাঁকা রাস্তা দেখে গ্রামে কোন জাতির বসবাস তা অনুমান করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাতাম।

চেরকেস্ক-এর অ্যালেকের কথা মনে পড়ল আমার। ও চেরকেস। ওর সাবেক স্ত্রী ছিল আবাজা জাতির। বর্তমান স্ত্রী নোগাই জাতির, মঙ্গোলদের বংশধর। অ্যালেকের ছেলে আবাজা-চেরকেস কিন্তু বিয়ে করতে চায় এক রাশিয়ান মেয়েকে। একাধিক ভাষায় কথা বলে ওরা। কিন্তু একত্র হলে সবাই রুশ ভাষা ব্যবহার করে।

সময় কীভাবে সব বদলে দেয়, ভাবতে অবাক লাগে। অ্যালেকের কথাই ধরুন। অ্যালেক পেশায় একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। দেখলে একজন খুনি মনে হয়, এবড়ো-খেবড়ো হলুদাভ দাঁতের অধিকারী। কিন্তু ওর পারিবারিক নাম হচ্ছে শিউন। যার অর্থ হচ্ছে রাজাদের বাসস্থান। রাশিয়ানদের দখলের অনেক আগে ওদের পরিবার ককেশাসের একটা অভিজাত পরিবার ছিল।

উত্তর ককেশাসের ইতিহাস কেবলই যুদ্ধময়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যুদ্ধ। অনেক পুরনো যুদ্ধই আবার নতুন করে শুরু হবে। যতোসব যুদ্ধ নিয়েই এদের কারবার। জেট প্লেনের শব্দে আতংক গ্রাস করত আমায়। পরক্ষণেই দীপ্ত কণ্ঠে আল্লাহু আকবার রণ হুংকার দিয়ে চেচেন মুজাহিদরা যখন একটামাত্র শটগান নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ত, তখন শরীর বেয়ে ছড়িয়ে পড়ত এক অন্যরকম উত্তেজনা। আমাদের আশেপাশে যখন আর্টেলারি শেল এসে পড়ত, তখন আমরা বেঁচে থাকার উন্মাদনা অনুভব করতাম। স্ট্যারি-আখোইয়ের বাংকারের যিকিরের ধ্বনিতে শিহরণ খেলে যেত।

কেউ কেউ বলে যুদ্ধ শেষ। ১৯৯৬ সালে রাশিয়ার ভ্লাদিকাভকায ফুটবল ক্লাবে গিয়েছিলাম আমি। রাশিয়ার টপ স্কোয়াডে চৌদ্দটি ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর

BanglaBook.org

প্লেয়ার ছিল সেখানে। ওদের ম্যানেজার বাত্রাক বিতারভ ওসেটিয়ান জাতিভুক্ত। সেদিন সে শান্তির কথা বলছিল। বিতারভ হচ্ছে ওই সমস্ত লোকদের একজন যে খুব সহজেই দৃঢ়চেতা চেচেনদের সাথে চলতে পারত। তার হাতে ছিল অনেকগুলো স্বর্ণ, একটা লম্বা উটরঙা ওভারকোট এবং একটা সিল্ক স্কার্ফ। বিতারভ বলছিল, 'কাবার্ড, গ্রিক, জর্জিয়ান, ইহুদি, ওসেটিয়ান, রাশিয়ান—কতো জাতির মানুষ একই অঞ্চলে বসবাস করছে। চোদ্দটি দেশের মানুষ, এবং সবাই খুশি। চলুন, পার্থক্যের ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলি। ককেশাস হোক বা রাশিয়ান—একজন অপরজনকে রাশিয়ান নাগরিক বলি। ভালো বা খারাপ বলতে কিছু নেই—আমরা সবাই এক।'

কিন্তু বিতারভ ভুল ছিল। উত্তর ককেশাসে, বিশেষত উত্তর ওসেটিয়ায় সবাই সমান বা এক নয়। আর যুদ্ধ এই কথাটা সবাইকে মনে করিয়ে দেয়। প্রিগোরদনি এলাকাটা বিতারভের স্টেডিয়াম থেকে মাত্র এক ঘন্টার পথ। ওখানে ইঙ্গুশদের বাসাবাড়ির ধ্বংসস্তূপে আগাছা জমে আছে। যুদ্ধ সমাপ্তির এই চার বছর পরও বিতারভের দলে কোনো ইঙ্গুশ খেলোয়াড় নেই।

উত্তর চেচনিয়াতেও সবাই একই রকম না। কোসাকরাই বা কবে ভেবেছিল, পূর্ব পুরুষদের বানানো দূর্গ চেচেনদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। আদিজিয়ার বেলাতেও একই কথা। একজন আদিজিয় আমাকে বলেছিল, 'রাশিয়ানরা কোনো কিছুর যত্ন করে না। কারণ ওরা মন থেকে জানে, এটা ওদের দেশ না। ওরা কখনো এ জায়গাকে নিজেদের বাড়ি ভাবতে পারে না।' রাশিয়ানরা সেখানে শত বছরের বেশি সময় ধরে বাস করছে, কিন্তু আদিজেইদের ইতিহাস আরো পুরনো।

যুদ্ধ ছাড়াও আরো অনেক কিছু আছে উত্তর ককেশাসে। রোদ মাথায় হেঁটে বেড়ানোর পর বাড়িতে বানানো এপ্রিকটের জুস, উত্তর ওসেটিয়ায় পৌত্তলিক দেবতাদের উদ্দেশ্যে টোস্ট করা, আচমকা ককেশাসের আকাশে লাল টকটকে সূর্যের দেখা, নালচিকের পাহাড়ে ইহুদি বাচ্চাদের হিব্রু গান—এসব অন্য কোথাও নেই। মাত্র দশ মিনিটের পরিচয়ে এক চেচেন আমাকে এক মাথায় নিব আরেক মাথায় লাইটারওয়ালা একটা কলম উপহার দিয়েছিল। রুসলান কিরিমভ, যুদ্ধের পুরোটা সময় ছিল মধ্য-গ্রোজনিতে। তবুও ওর হাস্যরসে ভাটা পড়েনি। আমাকে লেজঘিংকা নাচ শেখানোর কতো ব্যর্থ চেষ্টাই না সে করেছে! দশ বছর বয়সী আসলানবেক, বয়সে বেড়ে ওঠার আগেই যাকে মানসিকভাবে

BanglaBook.org

বেড়ে উঠতে হয়েছে, কী জীবনরসেই না ভরপুর ছিল! পাহাড় থেকে কেনা ছাগলের সেই কাবাবের কথা খুব মনে পড়ে আমার। মাংস কেটে কেটে পেঁয়াজ মাখিয়ে সিগারেটের কার্টনে রেখে দেয় পাহাড়িরা। আর স্বাদ? আমাদের কল্পনার চাইতেও অনেক বেশি।

রাশিয়ান রাজ-রাজরাদের কাছে উত্তর ককেশাস একটা স্বর্গের মতো ছিল। প্রাচুর্যে ভরপুর, দুই পাশ থেকেই সাগর বিধৌত এই বিস্তৃত জনবসতিহীন অঞ্চলে সম্রাটদের আগমন ছিল এক কথায় অনিবার্য। কিন্তু ককেশাসের ওপর যেন অভিশাপ ছিল। এরকম একটা অঞ্চল কীভাবে শাসন করা যায়? ব্রিটেন কীভাবে প্রত্যেক অঞ্চলকে শাসন করবে, যেখানে বাসিন্দাদের সকলেরই স্বতন্ত্র ভাষা রয়েছে? দুর্দমনীয়দের কীভাবে দমন করা যায়? সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ককেশাস নিয়ে সবার মাথাব্যথা শুরু হয়ে যায়। অধিকাংশ রাশিয়ানই এ অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি ও সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু এখন আর মুখ ফেরানোর সুযোগ নেই। উত্তর ককেশাস শুধু কাস্পিয়ান সাগরের তেল রপ্তানির সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং মস্কোর সাথে পাহাড়িদের সম্পর্ক কেমন হয়—এর ওপর নির্ভর করছে রাশিয়ার গণতান্ত্রিক ভবিষ্যত। আর এটাই ওদের মাথাব্যথার কারণ।

এখনো কিছু আশা আছে। রাশিয়া আলোচনায় এসেছে। যেসব রুশ নাগরিকদের সন্তানদের 'সাংবিধানিক আদেশ পুনরুদ্ধার'-এর নামে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে আর বোকা বানাতে পারবে না রাজনীতিবিদরা। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যুদ্ধ যতোই ভয়ানক হোক না কেন এরও শেষ আছে। মোভলাদি উদুগভ বলেছেন, 'এটাই হয়তো রাশিয়ার গণতান্ত্রিক পার্টির সবচেয়ে বড় জয়। একটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে অস্বীকৃতি জানায় রাশিয়া—ককেশাসের ইতিহাসে এটাই রাশিয়ার সবচেয়ে মহান জয়।'

অবশ্য চেচনিয়া তাদের সাময়িক ধাক্কা হজম করেছে। কিন্তু যতোদিন না ইয়েলসিনের তৈরি রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটছে, ততদিন কোনো পরিবর্তন হবে না। এরকম কাঠামোতে সম্রাটতুল্য প্রেসিডেন্ট যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, কোনো ভারসাম্য রক্ষা করতে হয় না। ফলে অনেক রাজনৈতিক এডভেঞ্চার যেমন, 'সংক্ষিপ্ত, বিজয়সূচক যুদ্ধ'র পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ইয়েলসিন স্বৈরাচারী শাসক নন কিন্তু ক্ষমতার লোভ স্বৈরাচারী বানাতে কতোক্ষণ? সিস্টেমের সাধ্য নেই তাকে থামিয়ে রাখবে।

Banglabook.org

অনেক চেচেনই রয়েছে যারা কোনোভাবেই স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন কিছুর সাথে আপোষ করবে না। চেচনিয়া যদি স্বাধীন হয়েই যায় তবে তার পরবর্তী প্রভাব কী হতে পারে বলে আপনার ধারণা? অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলো নিশ্চয়ই বসে থাকবে না। তখন বালকার, ইসলামি মুজাহিদবাহিনি—এরাও স্বায়ত্তশাসন দাবি করবে। দাগেস্তানে শুরু হবে একটা নতুন ইঙ্গুশ-ওসেটিয়ান যুদ্ধ। কোসাকের প্যারামিলিটারি ইউনিট তখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনি হিসেবে কাজ করবে। হয়তো ১৯৯৭ সালের ক্রেমলিনের সাহসী শান্তির ঘোষণা এক দশকের মাথায় হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, রাশিয়ান আর্মি এতো সংস্কারের পর আবারও ককেশাস দখলের জন্য যুদ্ধ করবে।

১৯ শতাব্দীতে লিও তলস্তয় আভার বীর হাজী মুরাতকে একটা কাঁটাগাছের সাথে তুলনা করেন। একাই লড়ে গেছে হাজী মুরাত। স্বজাতি ভাইদের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী, তাদের কাছে কোনোমতেই নতি স্বীকার করতে রাজি হয়নি সে। এরকম কাঠিন্য পাহাড়ি ছাড়া আর কোনো জাতির মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। শত প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে টিকে থাকা মানুষরা প্রশংসা কুড়ায় একথা সত্য, কিন্তু এই কাঠিন্যের আড়ালে উত্তর ককেশাসের ভঙ্গুরতা আর ট্র্যাজেডি ঢাকা পড়ে গিয়েছে। পাহাড়ি জাতিগুলো ছোট আর শক্তিশালী হলেও নিপীড়ন সহ্য করা বা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। সর্বশেষ উবিখ ভাষী মানুষ ১৯৯২ সালে তুরস্কে মারা যায়—রাশিয়ানরা তার জাতিকে উত্তর ককেশাস থেকে বিতাড়িত করার একশ বছর পর। যা সকল পাহাড়িদের প্রতি সতর্কবাণীস্বরূপ। আদিজেই-সারকাসিয়ান জাতিদের সাথে সম্পর্কিত উবিখ নামের ছোট্ট এই গোত্র দীর্ঘদিন ধরে তুরস্কে নির্বাসিত। নতুন জায়গায় অতিমাত্রায় সংমিশ্রণের ফলে তাদের নিজ ভাষাও আজ বিলুপ্ত। একইভাবে দর্শনীয় স্থানগুলো পর্যটকদের ভিড়ে নিজস্বতা হারাচ্ছে। পাহাড়িদের শক্তিমত্তা অনেক, কিন্তু চিরস্থায়ী নয়।

প্রোখলাদনয়ি, কাবার্ডিনো-বালকারিয়া

জঙ্গল ধরে বামুত থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। ২৪ ঘন্টা পর চেচনিয়া ছেড়ে কাবার্ডিনো-বালকারিয়ার রুশ অধ্যুষিত প্রোখলাদনয়ি শহরে এসে পৌঁছাই। মেইন স্কয়ারে লেনিনের বিশালের ভাস্কর্যের ওপর হালকা তুষার জমেছে। প্রোখলাদনয়ি রেলওয়ে জাংশনের স্টেশন ম্যানেজার আমাকে দাওয়াত

BanglaBook.org

দিয়েছে। সে এই জাংশন-শহরে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তার দুই বন্ধুও এসেছে দাওয়াত পেয়ে। তাদের সকলের সাথেই কমিনিউস্ট পার্টি লিডার গিনেডি যুগানোভের অসম্ভব মিল আছে—আন্তরিক, সাম্প্রদায়িক, সমমনস্ক ও গোঁড়ামিপূর্ণ। পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে তারা কমিউনিস্ট প্রার্থীকে ভোট দেবে শুনে আমি মোটেও অবাক হইনি।

'সবাই অরাজকতায় বিরক্ত। তারা চায় নিয়ম-শৃঙ্খলা,' ভ্যালেন্তিন বলল।

'রাশিয়ানরা সব বিক্রি হয়ে গেছে। সব জায়গাতেই তারা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে—একতা। আরো কঠোর হওয়া উচিত আমাদের,' বরিস যোগ করল।

'সেটা ঠিক, আমাদের আগুনের জবাব আগুন দিয়ে দিতে হবে। আমেরিকায় যা ঘটেছে সেটা ভালো লাগে আমার। সেখানে একবার নিগ্রোরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। কয়েকশ নিগ্রোকে আগুনে পোড়ানো হলো, ব্যস সব ঠাণ্ডা।' ডেপুটি স্টেশন ম্যানেজার মন্তব্য করল।

ড্রিংকের প্রভাবে চেচনিয়াকে এখন অনেক দূরে মনে হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ ইলেক্ট্রিক শকের মতো বারবার আমার মাথায় চেচনিয়ার কথা ঝিলিক দিয়ে উঠছিল।

যখন আমার টোস্ট করার পালা এলো, আমি চেচনিয়ার শান্তির উদ্দেশ্যে টোস্ট করে বললাম, 'চেচনিয়ায় শান্তি নেমে আসুক।' কথাগুলো ওদের মনোপুত হলো। যদিও একটু আগেই চেচেনদের ডাকাত বলে গাল দিচ্ছিল। ওদের ভাষ্যমতে, কেবল কমিউনিস্টরাই মানুষকে সোজা করতে পারে।

এরপর আরো কয়েক দফা টোস্ট চলল বিশ্ববাসীর শান্তির উদ্দেশ্যে, আমাদের বন্ধুত্বের উদ্দেশ্যে। সবকিছু কতোই না আশাব্যঞ্জক শোনায়।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org